মাসুদ রানা
পপি
বুমেরাং
কাজী আনোয়ার হোসেন
দুটি বই একত্রে
সেবা
প্রকাশনী

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

পপি

এই প্রথমবার এক দুশ্চরিত্রা, নিষ্ঠুর মহিলা স্মাগলারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলো রানাকে। বিরাট স্কেলের এই চোরা কারবারে লাভের অঙ্কটা এতই বেশি যে দলনেত্রীর সামান্য অঙ্গুলী হেলনে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিতে দ্বিধা করছে না কেউ। ঘোরতর বিপদের মধ্যে জেনেশুনে পা বাড়াল মাসুদ রানা।

বুমেরাং

ইউনিয়ন কর্সের তাড়া খেয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে গিয়ে ঢুকে পড়ল রানা মেক্সিকোয়। আসলে ফুটন্ত কড়াই থেকে লাফিয়ে পড়ল সে জ্বলন্ত চুলোয়। স্থানীয় এক অভিজাত ক্ষমতাশালী ব্যক্তির চক্রান্তে মেক্সিকোর দুর্গম পার্বত্য এলাকায় বেকায়দামত আটকে গেল মাসুদ রানা।

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ৬৭ + ১৬১

পপি + বুমেরাং

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

বিয়াল্লিশ টাকা

ISBN 984 16 7612 5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৯
চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
POPPY

BOOMERANG
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা হংকং সম্রাট *কুউউ!*বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে * অনন্ত যাত্রা রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন শেষ চাল।

পপি

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৯

এক

ঝুরঝুর করে তুষার পড়ছে তেহরানে। ভেজা গায়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা যাত্রীবাহী বিমান নামল এয়ারপোর্টে।

অনেকদূর ছুটে গিয়ে রানওয়ের উপর থামল প্লেনটা। চার চাকার উপর বসানো সিঁড়িটা ঠেলে নিয়ে গিয়ে পেটের কাছে ঠেকাতেই ফাঁক হয়ে গেল একটা দরজা। বেরিয়ে এসে দরজার পাশে দাঁড়াল এয়ারহোস্টেস। হি-হি করছে শীতে। ঠোঁটের ফাঁকে দুই সারি সাদা মুক্তো।

কালো ওভারকোট পরিহিত একজন আরোহী বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াল। ভিজে রানওয়ে, তুষারের চাদরে ঢাকা এয়ার-টার্মিন্যাল ভবন, দূর-পাহাড়ের সাদা চূড়া—একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল সব।

অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাসল এয়ারহোস্টেস। মুখস্থ বিদায়-বাণী আওড়াল।

মৃদু হাসল রানা। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে।

ভুরু কুঁচকে উঠল মেয়েটার। আরোহীরা আর কেউ নামছে না। ব্যাপার কি?

দরজার আড়াল থেকে কাছিমের মত গলা বাড়াল দ্বিতীয় আরোহী। অন্যান্যরা তার পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। পথ ছাড়ছে না সে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মৃদু প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠল।

ছোটখাট লোকটা। রোগাটে। শিশুর মত নিষ্পাপ দুই চোখে রাজ্যের বিস্ময়। শরীরের তুলনায় ওভারকোটটা সবদিক থেকে বড়। দু'হাত দিয়ে ধরে খানিকটা উপরে তুলে নিল সেটা। আর একবার বাইরেটা দেখে নিল গলা বাড়িয়ে। তুষার ঝরছে।

বিশ্বাস করতে পারছে না গিলটি মিয়া। শুনে এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের গরমে গায়ে ফোসকা পড়ে যায়। অথচ! একটা সন্দেহ ঢুকেছে তার মনে। কোন ভুল হয়ে থাকলে এখনও বোধহয় সময় আছে শুধরে নেবার। দুই কাঁধ উঁচু করে ঘাড়টাকে তার মাঝখানে লুকিয়ে পিঠ বাঁকা করে শরীরটাকে আরও ছোট করে নিল সে। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এল নিচে। 'উড়োজাহাজটা আমাদেরকে অন্য কোতাউ নাবিয়ে দিয়ে যাচ্চে না তো, স্যার?'

সি-লেভেল থেকে পাঁচ হাজার ফিট উপরে রয়েছে ওরা। দীর্ঘ পদক্ষেপে কাস্টমসের ছাউনির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রানা। থামল না। হাত তুলে দূরের একটা গেট দেখাল গিলটি মিয়াকে। 'ওখানে অপেক্ষা করো।'

পেছন থেকে গিলটি মিয়ার চিৎকার শুনতে পেল রানা। 'স্যার, আমি যদি

হেরিয়ে যাই, এনকোয়েরিতে খোঁজ লেবেন!'

আধ ঘণ্টা লাগল কাস্টমসের ঝামেলা থেকে গাড়িটাকে মুক্ত করতে। বাজি জেতার একটা অনুভূতি নিয়ে ফিরে এল রানা। ল্যান্ডরোভারের কয়েক জায়গায় কিছু পরিবর্তন করেছে ও, ধরতে পারলে আঁতকে উঠত কাস্টমস অফিসার।

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে গিলটি মিয়ার পাশে দাঁড় করাল রানা গাড়িটা। গায়ে লেখা রয়েছে গোল্ডেন ফিল কোম্পানি—অ্যাডভান্স ইউনিট। 'উঠে পড়ো,' বলল সে।

হাতের সিগারেট আগেই ফেলে দিয়েছে গিলটি মিয়া, কিন্তু মুখভর্তি ধোঁয়া উদ্গীরণ করার অবকাশ মেলেনি। মস্ত একটা ঢোক গিলল সে। 'কোতায় যাবো একোন, স্যার?'

'রয়্যাল হিলটনে দুটো কামরা বুক করা হয়েছে,' বলল রানা। 'ট্রাফিক পুলিসকে জিজ্ঞেস করলে দেখিয়ে দেবে।'

'ড্রাইভিং সীটটা আমাকে ছেড়ে দিন, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া। 'কারোও সাহায্য লাগবেনি। গাড়ি লিয়ে আমিই পৌঁচে যেতে পারবো রয়্যাল হিলটনে।'

তাকাল রানা। দৃষ্টিতে কৌতুক। গিলটি মিয়া গম্ভীর। নিঃশব্দে পাশের সীটে সরে গেল রানা। উঠে বসল গিলটি মিয়া। মাথার চুলে হাতদুটো ঘষে নিয়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরল। পার্কিং স্পেসের দিকে দৃষ্টি। অসংখ্য গাড়ি যাচ্ছে, আসছে। স্থির হয়ে বসে আছে গিলটি মিয়া।

ঝাড়া এক মিনিট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'কি হলো?'

'কিচুটা দেরি হবে।'

আরও মিনিট দুই পর হঠাৎ ল্যান্ডরোভার ছাড়ল গিলটি মিয়া। একটা মাইক্রোবাসের পিছু পিছু বেরিয়ে এল এয়ার-টার্মিন্যাল ভবন থেকে।

রহস্যটা যে কি, ধরতেই পারল না রানা। জীবনে এই প্রথম তেহরানে পা দিয়েছে গিলটি মিয়া। নির্ভুল কায়দায়, সংক্ষিপ্ত পথ ধরে গাড়ি চালিয়ে নির্বিঘ্নে রয়্যাল হিলটনে পৌঁছে গেল সে। স্টার্ট বন্ধ করে নিচে নামল গম্ভীর মুখে। পোর্টারের স্যালুটের উত্তরে মাথা ঝাঁকাল। রানাকে পেছনে রেখে সুইংডোর ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

পোর্টারের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দিল রানা। ব্যাগ, ক্যামেরা ইত্যাদি কোথায় পৌঁছে দিতে হবে বুঝিয়ে দিল। ধাপ তিনটে টপকে বারান্দায় ওঠার আগে তীক্ষ্ণচোখে একবার চারদিক দেখে নিল ও। কাছেই দাঁড়ানো মাইক্রোবাসটার উপর দৃষ্টি পড়তেই মুচকি হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। ওটার গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে: রয়্যাল হিলটন।

একটা মেসেজ দিল রিসেপশনিস্ট ওকে। এনভেলপটা হাতে নিয়ে এলিভেটরে চড়ল ও। নামল পাঁচতলার করিডরে। চারশো দুই নম্বর সুইট। নক করতেই দরজা খুলে দিল গিলটি মিয়া।

চোখ জুড়িয়ে গেল ড্রয়িংরূমের সাজসজ্জা দেখে। মেঝেতে দামী কার্পেট।

হরেক রকম আরামকেদারা, সোফা, বুকশেলফ। পিয়ানো ও টিভি সেটও বাদ পড়েনি। এককোণে ছোট্ট একটা বার। কোটিপতি স্যার হ্যামিলটনের প্রকাণ্ড মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার। প্রতিশোধ নেবার জন্যে মুক্তহস্তে খরচ করছেন ভদ্রলোক।

এনভেলপটা ছিঁড়ছে রানা। অন্যমনস্ক। সাত বছরের নিষ্পাপ একটা মেয়ের মুখ আবছাভাবে মনে পড়ছে। টুকটুকে লাল দুটো ঠোঁট—অনবরত নড়ছে। কানে বাজছে এখনও কচি মিষ্টি গলাটা। রয়্যাল মিউজিক হলে শিশুদের কণ্ঠসঙ্গীত প্রতিযোগিতায় গাইছে তেরেসা। চমকে দিয়েছিল সে শ্রোতাদের নিখুঁত সুরে একটা বাঙলা গান গেয়ে। সেই সূত্রে রানার কৌতূহল, তারপর পরিচয়। মা বাঙালি, বাবা প্রখ্যাত ফিল্ম মেকার স্যার হ্যামিলটন। সেবার লন্ডনে যে ক'টা দিন ছিল রানা, প্রতিদিন গান শুনিয়েছিল ওকে তেরেসা। সেই শেষ। মাঝখানে দশ বছরের ব্যবধান। হঠাৎ ঘটনাচক্রে পেল মৃত্যু সংবাদ। ড্রাগ নিত তেরেসা। হেরোইনের ডোজ বেশি হয়ে যাওয়ায় মারা গেছে। নোংরা, অখ্যাত এক হোটেলে। নিঃসঙ্গ অবস্থায়। একা। ভুলতে পারছে না রানা টুকটুকে লাল কচি দুটো ঠোঁটের অনবরত নড়া। তালে তালে মাথা দোলানো। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে।

অল্প বয়সে কারও যেন মা মারা না যায়। ভাবছে রানা। মিসেস হ্যামিলটন মারা না গেলে তেরেসা হয়তো অসৎ-সংসর্গে পড়ত না, ড্রাগের প্রতি তার আসক্তি জন্মাত না…

এনভেলপটা ছিঁড়ল ও। রানা এজেন্সীর ব্রাঞ্চ-ইনচার্জ খায়েরের হাতের লেখা চিনতে পারল। 'সাড়ে সাতটায় আসছি আমি।' রিস্টওয়াচ দেখল ও। আর এক মিনিট বাকি।

ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করছে গিলটি মিয়া।

সোফায় বসে হেলান দিল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। চোখ বুজল ধীরে ধীরে। স্মৃতি বড় যন্ত্রণা দেয়। সাত বছরের তেরেসা নয়, এখন চোখের সামনে ভাসছে সতেরো বছরের একটি মেয়ের মুখ। এও তেরেসা, তবে জীবিত নয়। রক্তশূন্য, চোখদুটো কোটরাগত, দুই সাদা উরুতে অসংখ্য সূচ ফোটানোর দাগ, ঘা হয়ে গেছে। নিজেই সিরিঞ্জে হেরোইন ভরে ইঞ্জেকশন নিত তেরেসা। গত দুই বছর ধরেই নিচ্ছিল। অথচ, এসব কিছুই জানত না রানা। লন্ডনে বহুবারই এসেছে ও, কিন্তু কর্মব্যস্ততার জন্যে তেরেসার খবর নেয়া হয়নি। কে জানত সদ্য প্রস্ফুটিত তাজা ফুলটা দুষ্ট কীটের দংশনে এভাবে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে! যদি জানত রানা, চেষ্টা করে দেখত একবার মেয়েটাকে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা। জানল বটে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সমস্ত চেষ্টার উর্ধ্বে উঠে গেছে তেরেসা।

যোগাযোগটা বড় অদ্ভুতভাবে ঘটে গেল। এভাবে, এই অবস্থায় তেরেসাকে দেখবে আবার, দুঃস্বপ্নেও কখনও ভাবেনি রানা।

বিশ-বাইশ দিন আগের এক রোববার। লন্ডন। ডাক্তার বন্ধু পাওয়েলকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সক্কালবেলা বেরিয়ে যাচ্ছে রানা। উদ্দেশ্য: শিকার। নর্থ

হাম্পটনের বিলে হাঁসের ঝাঁক নামার খবরটা ডাক্তারই দিয়েছিল ওকে।

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা, গেটের কাছেই বাধা। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে পথ আটকে দাঁড়াল একটা পুলিস কার। ইউনিফর্ম নামল কার থেকে। পাওয়েলকে জানাল, ইন্সপেক্টর ফক্স দেখা করতে চান। মার্লবেরী এলাকার একটা হোটেলে তিনি অপেক্ষা করছেন। কি দরকার তার ডাক্তার পাওয়েলকে? এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল ইউনিফর্ম। তা সে জানে না।

যা-তা ডাক্তার নয় পাওয়েল। আত্মসম্মানে ঘা লাগল তার। ইউনিফর্মকে জানিয়ে দিল, যাবে না সে।

কিন্তু ইউনিফর্ম নাছোড়বান্দা। তার ভাবগতিক সুবিধের মনে হলো না রানার। শেষ পর্যন্ত পাওয়েলকে সে গ্রেফতার করে হলেও নিয়ে যাবে বুঝতে পেরে কৌতূহল জাগল ওর মনে। ব্যাপারটা কি জানা দরকার। পাওয়েলকে শান্ত করল ও। একরকম জোর করেই নিয়ে গেল মার্লবেরী এলাকার সেই অখ্যাত হোটেলে, যেখানে ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করছিল ইন্সপেক্টর ফক্স।

তেরেসা নামে কোন মেয়েকে পাওয়েল চেনে? ইন্সপেক্টরের প্রশ্ন। চেনে পাওয়েল। সে কি মেয়েটাকে ড্রাগ সাপ্লাই দিত? দিত। কি ড্রাগ? হেরোইন।

বিশালদেহী, রাগী চেহারার ইন্সপেক্টর ফক্স খেপে আগুন। ডাক্তারের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে শুরু করল সে। একজন ডাক্তার হয়ে কিশোরী একটা মেয়েকে সে ড্রাগ সাপ্লাই দেয় কি করে? নিঃসন্দেহে এটা একটা ক্ষমার অযোগ্য জঘন্য অপরাধ। ইত্যাদি।

বন্ধুপ্রীতির কারণে নয়, ইন্সপেক্টর অন্যায়ভাবে, আইন না জেনে, একজন ভদ্রলোককে অপমান করছে বুঝতে পেরে ব্যাপারটায় নাক গলাল রানা। ইন্সপেক্টরকে বলল, লন্ডনে ড্রাগ বিক্রি করা বেআইনী হলেও সরকার কিছু ডাক্তারকে অনুমতি দিয়েছেন যারা অ্যাডিক্টদের কাছে ড্রাগ বিক্রি করতে পারে। এই ড্রাগ সরকারই তাঁদেরকে সাপ্লাই দেন। ডাক্তার পাওয়েলও একজন সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত এম. ডি। তেরেসা নামে যে মেয়েটার কথা বলা হচ্ছে তাকে পাওয়েল হেরোইন দিয়েছিল সত্যি কিন্তু তা সে দিয়েছিল মেয়েটার চিকিৎসার জন্যে, মেয়েটাকে মেরে ফেলার জন্যে নয়।

মেয়েটার নাম শুনে তখনও কিছুই বুঝতে পারেনি রানা। লাশটা দেখেই চমকে উঠল ও। সাত বছরের প্রাণোচ্ছল তেরেসার সাথে সতেরো বছরের মৃত তেরেসার আপাতঃদৃষ্টিতে কোন মিলই নেই, কিন্তু কোথায় যেন একটা মিল আছেও। দেখেই বুঝল রানা, এ সেই স্যার হ্যামিলটনের কচি ফুল।

খবর পেয়ে পাগলের মত ছুটে এলেন হ্যামিলটন। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে হিমশিম খেতে হলো রানাকে। তিনিও ভুল বুঝলেন পাওয়েলকে। যা-তা তো বললেনই, উপযুক্ত ভাবে শায়েস্তা করার হুমকিও দিলেন।

স্যার হ্যামিলটনের নাম শোনেনি এমন লোক লন্ডনে খুব কমই আছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, অর্থ, খ্যাতি, প্রভাব প্রতিপত্তি কোনটাই কোনটার চেয়ে কম নয়। বেশ একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল পাওয়েল। তাকে অভয় দেবার দায়িত্বটাও নিতে হলো রানাকেই।

দু'দিন পর সব কথা খুলে বলায় স্যার হ্যামিলটন শান্ত হলেন। নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তিনি। রানা তাঁকে জানাল, চিকিৎসার-একটা কৌশল হিসেবেই পাওয়েল হেরোইন প্রেসক্রাইব করেছিল তেরেসাকে। তেরেসা হেরোইনের সাথে Methylamphetamine মিলিয়ে ককটেল তৈরি করে তা শরীরে ইনজেক্ট করেছিল। Amphetamine তাকে প্রেসক্রাইব করা হয়নি। ওটা সে অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করেছিল। তাছাড়া, পাওয়েল তাকে যে হেরোইন প্রেসক্রাইব করেছিল তা ছিল ব্রিটেনের Pharmacopoeia মানের, ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল অনেক কম। কিন্তু তেরেসা বাইরে থেকেও ভেজাল হেরোইন কিনে তা গ্রহণ করত।

পাওয়েলের কোন দোষ নেই বুঝতে পেরে স্যার হ্যামিলটন তাঁর কাছে মাফ-টাফ চেয়ে শান্ত হলেন বটে, কিন্তু অন্য হাজারটা প্রশ্নের উদয় হলো তাঁর মনে। তাঁর মেয়ে মারা গেছে। এইরকম শত শত ছেলেমেয়ে ড্রাগ নিয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিদিন। তাদের কি হবে? যে গেছে সে গেছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না—কিন্তু যারা যাবার পথে রয়েছে? তাদেরকে বাঁচাবার কি উপায়? কোথায় পাচ্ছে তারা ড্রাগ? এই ড্রাগ সাপ্লাই বন্ধ করা যায় না? কোত্থেকে আসছে এসব? কারা আনছে? কিভাবে বিক্রি হচ্ছে? পুলিস করছে কি? তাদেরকে ধরছে না কেন?

এক এক করে সব প্রশ্নেরই উত্তর দিল রানা। কিন্তু তার আগে ছোট্ট একটা ভূমিকাও করে নিল।

বলল: পৃথিবীর সব দেশেই ড্রাগ অ্যাডিক্ট আছে। কেউ আফিম, কেউ মরফিন, আবার কেউ হেরোইন অথবা অন্য কিছু নেয়। সরকারী অফিসে ড্রাগ অ্যাডিক্টদের তালিকা থাকে। শুধু তাদেরকেই সরকারীভাবে দেয়া হয় ড্রাগ। কিন্তু তালিকার বাইরেও হাজার হাজার অ্যাডিক্ট রয়েছে। এরা বেআইনী উৎস থেকে চড়া দামে ভেজাল ড্রাগ কেনে। আমেরিকার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। শুধু নিউ ইয়র্কেই চল্লিশ হাজার হেরোইন অ্যাডিক্ট রয়েছে। ইংল্যান্ডে সর্বমোট হাজার দুই। তবে প্রতি ষোলো মাসে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে। কমবেশি এই অবস্থা বাংলাদেশেরও।

কোত্থেকে আসছে ড্রাগ?

আসছে আমেরিকা থেকে। তবে, সরাসরি আমেরিকা থেকে নয়, আসছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমেরিকা হয়ে। বেআইনী পথে, চোরাচালানের মাধ্যমে, বলাই বাহুল্য।

এই চোরাচালান বন্ধ করা যায় না?

হেসেছে রানা। যায় না। আবার যায়ও। ফাঁদ পেতে ধরা যায় চোরাচালানীদের। কিন্তু তাদের পরিচয় জানা সহজ নয়। ড্রাগ যারা বিক্রি করে তারা চুনোপুঁটি, রুই-কাতলাদের খবর তারা জানেই না। কোন কোন অ্যাডিক্ট যদি বা জানে, নিজেদের স্বার্থেই তারা তথ্য ফাঁস করে না। তবে, চেষ্টা করলে এদের পরিচয় বের করা যায়। সময় লাগবে প্রচুর। প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে। কিন্তু লাভ হবে না বিশেষ।

কারণ?

কারণ, এদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গেলেই এরা টের পেয়ে যায়। টের পেয়ে সাবধান হয়ে যায়। তবু, শেষ পর্যন্ত যদি ফাঁদ পেতে এদেরকে ধরা যায়ও, তাতেও বিশেষ কোন ফায়দা নেই। একটা চালান হয়তো বন্ধ হবে তাতে। কিছু লোক হয়তো ধরা পড়বে। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই, কিংবা কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন পদ্ধতিতে শুরু করবে চোরাচালান। ফল হবে এই যে, ধর-পাকড়ের ভয় থাকায় ড্রাগের দাম যাবে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে। পাগল দশা হবে অ্যাডিক্টদের। ভয়ানক সব ক্রাইম সংঘটিত হবে টাকা সংগ্রহের জন্যে।

ভয় দেখিয়ে অ্যাডিক্টদের ড্রাগ ছাড়ানো অসম্ভব। সবাই তাদেরকে ঘৃণা করে, এমন কি পুলিসও—কিন্তু আর যাই হোক, নেশাখোররা ঘৃণার পাত্র নয়। তারা অসুস্থ, রোগী—ঘৃণা নয়, তাদের দরকার চিকিৎসা।

ড্রাগের উৎস ধ্বংস করা যায় না?

যায়। কিন্তু উৎস সম্পর্কে জানে ক'জন? মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের কোথায় এর চাষ হয়? সেখান থেকে কারা কিনে নিয়ে আসে? কিনে এনে কাদের কাছে বিক্রি করে? এসব তথ্য জানা আছে কার?

রানা জানে না?

কিছুটা জানে। সব তথ্য জানে না। আসলে সব তথ্য কেউ জানে না।

'জানার চেষ্টা করো,' স্যার হ্যামিলটন বললেন। 'আমার মেয়েকে খুন করা হয়েছে, আমি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে চাই, রানা। যত টাকা লাগে, দেব আমি, তুমি ওদেরকে উপযুক্তভাবে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করো। আর কারও দ্বারা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু তোমাকে দিয়ে সম্ভব। কারণ, এই ধরনের কাজ করার জন্যে তোমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে।'

প্রথমে রানা ভেবেছিল, স্যার হ্যামিলটনের ইচ্ছাটা বড়লোকের একটা খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। মেয়ের শোকে আধ-পাগল হয়ে আছেন, গায়ের জ্বালা মেটাবার জন্যে বড় বড় কথা বলছেন, দু'দিন পর সব ভুলে যাবেন।

কিন্তু ক'দিন পরেই ভুলটা ভাঙল ওর। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতেই লাগল রানা এজেন্সীর লন্ডন শাখায়। অধিকাংশ সময় রানাকে পান না স্যার হ্যামিলটন। যদি বা যোগাযোগ হয়, প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে রানা। শেষ পর্যন্ত স্যার হ্যামিলটন একদিন সশরীরে এসে হাজির হলেন। 'কি ভেবেছ তুমি?' জবাবদিহি চাইলেন তিনি। 'ভেবেছ এতবড় একটা অন্যায় হজম করে ফেলব? অসম্ভব, রানা! যা বলেছি তা করবই। আমি প্রতিশোধ চাই। কাজটা তুমি আমার হয়ে করে দেবে কিনা বলো। তুমি রাজি না হলে আমি অন্য উপায় খুঁজব।'

সেদিন রানা স্যার হ্যামিলটনকে নিরাশ ও ক্ষান্ত করার জন্যে সমস্যাটার বাস্তব দিকগুলো ব্যাখ্যা করেছিল।

নক হলো দরজায়। চোখ মেলে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। কাঁটায় কাঁটায় সাতটা বাজে। খায়েরের সময়জ্ঞানের প্রশংসা করল মনে মনে ও। নড়েচড়ে

বসল সোফায়।

'কাম ইন, খায়ের ভাই,' হাঁক ছাড়ল গিলটি মিয়া।

কমপ্লিট স্যুট পরা সুদর্শন এক যুবক ঢুকল ড্রয়িংরূমে। রানা এজেন্সীর ইরান শাখার ইন-চার্জ আবুল খায়ের। অল্প বয়স, একটু বেঁটে, কিন্তু বিশাল, বিয়াল্লিশ ইঞ্চির উপর চিতানো বুক। মুখটা লালচে, যেন সারাক্ষণ রেগে কাঁই হয়ে আছে। সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে কপালে হাত ঠেকিয়ে সালাম করল রানাকে।

সালামের উত্তর দিয়ে রানা সামনের সোফাটা দেখাল, 'বসো, খায়ের। খবর ভাল সব? তোমার বোনের পা? ওটা কি···?'

বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল খায়েরের চোখদুটো। ছোট্ট নয় বছরের বোনটার পায়ে ক্যান্সার হয়েছিল, ঢাকাতেই অপারেশন করে পা-টা কেটে হাঁটু পর্যন্ত ফেলে দেয়া হয়েছে গত মাসে—কিন্তু এ খবর মাসুদ ভাই জানলেন কিভাবে?

'জ্বী, কেটে বাদ দেয়া হয়েছে,' বলল খায়ের। 'কিন্তু···'

কিন্তুর উত্তরে কিছু বলল না রানা। 'বসো, এদিকের খবর কি বলো দেখি!'

উত্তর না পেলেও কয়েকটা রহস্যের সমাধান করে ফেলল খায়ের। চায়নি সে, তবু কেন তাকে এক হপ্তার ছুটি দেয়া হয়েছিল, কেন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতি মাসে মাত্র পঞ্চাশ টাকা করে কেটে নেবার ভিত্তিতে পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দেয়া হয়েছিল—সব সে বুঝতে পারল। মাসুদ ভাইকে আজ যেন নতুনভাবে চিনতে পারছে সে। শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল ওর বিশাল বুক। ভাবছে, ওর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আছে মাসুদ ভাইয়ের।

হাতদুটো বুকে ভাঁজ করে, মাথাটা একদিকে কাত করে ড্রয়িংরূমের একধারে দাঁড়িয়ে আছে গিলটি মিয়া। একদৃষ্টিতে লক্ষ করছে সে খায়েরকে। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। খায়েরের মনের কথাগুলো সব সে স্পষ্ট পড়তে পারছে। ভাবছে, খায়ের ভাই, তুমি তো জানো না, স্যার আমার শুধু তোমার একার ব্যাপারেই নয়, সকলের ব্যাপারেই সমস্ত ভালমন্দ খবর খুঁটিয়ে সংগ্রহ করেন···

বসল না খায়ের। দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'এদিকের খবর ভালই, মাসুদ ভাই। আমাদের সাবজেক্ট এই হিলটনেই উঠেছে। তার রিজার্ভেশন এক হপ্তার। আসার পর থেকে "বার" থেকে বড় একটা নড়েনি। বশির আছে ওখানে।'

চুরুটে নতুন করে আগুন ধরাচ্ছে রানা। 'খুব মদ খায় বুঝি?'

'জ্বী। বার বন্ধ হবার সময় হলে দুই বগলে দুটো বোতল নিয়ে রূমে ফেরে।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'আর কি জানতে পেরেছ ওর সম্পর্কে?'

পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল খায়ের। পাতা ওল্টাচ্ছে। 'এয়ারপোর্টে একজন ইরানী দেখা করে আরডেলের সাথে। সেই লোকটাই ওকে নিয়ে আসে এখানে। তার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। আমার মাত্র দু'জন লোক, তাছাড়া, অনেক রকম অসুবিধা···'

'আমি জানি। কিছুদিন ধৈর্য ধরো,' বলল রানা, 'সব অসুবিধে দূর করার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'ইরানী লোকটাকে সেই থেকে আর দেখিনি। পরদিন আরডেল রেল-স্টেশনের কাছে যায়, জায়গাটার নাম মৌলভী। ঠিকানা লেখা আছে এখানে। ওখান থেকে একটা মার্কিন জীপ নিয়ে বেরিয়ে আসে সে।'

'জীপ নিয়ে কোথায় গেল?'

'ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্টের একটা পাইক্যারী ফার্মে।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। আরডেল বি, পোমরয়ের উদ্দেশ্য কি? দ্রুত কয়েকটা কথা ভেবে নিল ও: ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্মে গিয়েছিল আরডেল, এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে অফিম থেকে মরফিয়া বের করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। এ বিষয়ে খুব সামান্যই জানে ও। এটুকু জানে সহজ একটা কেমিক্যাল পদ্ধতির সাহায্যে আফিম থেকে যে অ্যালকালয়েড বের করা হয় সেটাই মরফিন। আরও এক পদ্ধতিতে মরফিনের আণবিক কাঠামো পরিবর্তন করা হলে যা দাঁড়ায় সেটা হলো হেরোইন। হেরোইন খুব সহজেই পানিতে মিশে যেতে পারে। মরফিন মেশে না। মানুষের শরীরে বেশির ভাগই পানি, হেরোইন তাই সহজে শরীরের সাথে দ্রুত মিশে যায়, ক্রিয়াও শুরু হয় তৎক্ষণাৎ। আরডেল যদি এই তেহরানেই আফিম থেকে মরফিন বের করতে চায় তাহলে তাকে কিনতে হবে ফার্মাসিউটিক্যাল কোয়ালিটি লাইম, মেথিলিন ক্লোরাইড, বেনজিন, অ্যামিল অ্যালকোহল ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সাথে কাঁচের কিছু জিনিস। আর সে যদি মরফিন থেকে এখানেই হেরোইন বের করতে চায় তাহলে অ্যাসেটিক অ্যাসিডও লাগবে।

কিন্তু খবরটা সহজে হজম করার মত নয়। ভাবছে রানা। মরফিন বা হেরোইন, যাই বের করতে চাক আরডেল, আফিম তার লাগবেই। এই আফিম সে পাচ্ছে কোথায়? ইরানে আফিম নেই। বেআইনী আফিম এখানে এক ছটাকও পাবে না কেউ।

রহস্যটা কি তাহলে?

'ফার্মটার নাম ঠিকানা লিখে রেখেছ?' জানতে চাইল রানা।

'জ্বী,' বলল খায়ের। 'দেড় ঘণ্টা ছিল ওখানে আরডেল। তারপর হিলটনে ফিরে আসে, দিনের বাকিটা এখানেই কাটায়। আজ সকালে একজন লোক তার সাথে দেখা করতে আসে। আমেরিকান। নাম, জন ওয়েস্টম্যান। তিন ঘণ্টা ছিল সে আরডেলের কামরায়। বেরিয়ে দু'জনই হিলটনের ডাইনিংরুমে লাঞ্চ খায়।'

'ওয়েস্টম্যান···আমেরিকান? তার সম্পর্কে কিছু জেনেছ?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল খায়ের। 'আরডেলকে হারাবার ঝুঁকি নিইনি আমরা, মাসুদ ভাই। লাঞ্চের পর ওয়েস্টম্যান চলে গেছে, সেই থেকে আরডেল বারেই আছে।'

'যথেষ্ট করেছ,' সোফা ছেড়ে উঠল রানা। পিঠ চাপড়ে দিল খায়েরের। 'এখুনি আরডেলকে চিনে নিতে চাই আমরা—সম্ভব?'

'সম্ভব,' বলল খায়ের। একটা এনভেলপ বের করল ট্রাউজারের পকেট থেকে। 'এতে আরডেল সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আছে, মাসুদ ভাই।'

এনভেলপটা নিয়ে পকেটে ভরল রানা। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমি,' বলে নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকল রানা। সেখান থেকে সংলগ্ন বাথরুমে।

সবার শেষে বারে ঢুকল রানা। দেখামাত্র চিনতে পারল আরডেলকে। কাছ থেকে দূরে সরে গেল তখুনি। লন্ডনে মাত্র একবার তাকে দেখেছিল ও। তবে আরডেল ওকে চেনে না। তার কাছে ওর চেহারাটা অদেখা থাকাই ভাল, তাই কামরার দিকে পেছন ফিরে বার-কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, অর্ডার দিল ড্রিঙ্কের।

পাশে দাঁড়ানো লোকটা ফিরল রানার দিকে। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, হাতে ড্রাইজিনের পাত্র। প্রায় সাড়ে ছয় ফিট লম্বা, ছোট করে ছাঁটা চুল, পরনে ভাল কোন দর্জির কাটা স্যুট। 'বুঝলে ভায়া, আবাদানে আমরা ছয়শো মিলিয়ন ডলারের একটা গ্যাস লাইন বসাচ্ছি। ভাবতে পারো? তা, তোমার আগমনের উপলক্ষটা কি?'

শুধু মাতালই নয়, বাচালও। বিরক্তবোধ করছে রানা। 'ছবি তৈরি করছি,' বলল ও। মুখ ফিরিয়ে বারের পিছনে আয়নাটার দিকে চোখ রাখল। একটা টেবিলে বসে ওয়েটারকে ডেকে কিসের যেন অর্ডার দিচ্ছে গিলটি মিয়া।

'হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক,' রানার পাঁজরে কনুই দিয়ে মৃদু খোঁচা মারল মাতাল লোকটা।

ধাঁই করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা লোকটার নাকের উপর, অবশ্য মনে মনে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল শেষ মুহূর্তে। মাতাল, তাই ক্ষমা করে দিল। বলল, 'না। ধন্যবাদ। একজন বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'অ, হেল!' লোকটা আমেরিকান, কথা শুনে বুঝল রানা। রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'খাবার সময় হলো, গেলাম তাহলে। আবার দেখা হবে।'

দুই আউন্স হুইস্কি গলায় ঢেলে কাউন্টার থেকে সরে গেল রানা। অন্য একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। পাঁচ মিনিট পর ওর সাথে যোগ দিল গিলটি মিয়া।

'লালমুকো লোকটার সাতে কথা বলছিলেন—কে ও, স্যার?' রানার সামনে একটা চেয়ারে বসে জানতে চাইল গিলটি মিয়া।

'কেউ না।'

'আদেলকে তো দেকনু। এ্যাকোন, স্যার?'

উত্তর দিতে যাচ্ছিল রানা, একজন ওয়েটারকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল।

কাছে এসে দাঁড়াল ওয়েটার। 'মি. রানা, স্যার?' হাতে একটা এনভেলপ।

'হ্যাঁ।'

এনভেলপটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল বেয়ারা। 'আপনার মেসেজ।'

হাত বাড়িয়ে এনভেলাপটা নিল রানা। খুলছে।

বকশিশ দিয়ে বিদায় করছে বেয়ারাকে গিলটি মিয়া।

এক মিনিট পর বলল রানা, 'আরডেল কালই হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কোথায়, খায়ের তা জানে না। তার জীপ মাজাঘষা করা হচ্ছে, পানির ক্যান তোলা হচ্ছে পেছনে।'

'পেলিয়ে যাবে কোতায়! চিনেজোঁকের মত ওর ছায়া কেমড়ে থাকবো না!'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আরডেলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন তোমার ওপর। যখনই সে রওনা হোক, যেখানেই যাক, ওকে তুমি ফলো করবে।'

কি যেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেল গিলটি মিয়া।

বুঝতে পেরে রানা বলল, 'এই মুহূর্তে তেহরান ছাড়তে চাইছি না আমি। পরিস্থিতিটা বুঝতে চাই এখানে থেকে। অয়্যারলেসে যোগাযোগ রাখবে তুমি।'

উঠে দাঁড়াল গিলটি মিয়া। হাত কচলাচ্ছে। মাঝে মধ্যে এইরকম অভিনয়ের ঢংয়ে আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। 'স্যার, যদি অনুমতি দেন তো যেতে পারি আমি। তেল-পানি ঢেলে আমাদের চার-চাকাটাকেও রেডি করতে হবে তো!'

'যাও,' মেনুটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে রানা।

কপালে হাত ঠেকিয়ে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে সালাম করল, উত্তরের প্রত্যাশায় না থেকে আধপাক ঘুরে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল গিলটি মিয়া।

একটা চুরুট ধরাল রানা। মাথায় নানান চিন্তা। বিরাট একটা দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে ও। স্যার হ্যামিলটনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার দায়িত্বই শুধু নয়, এর সাথে জড়িত রয়েছে বাংলাদেশের স্বার্থ। জড়িত বি সি আই এবং স্বয়ং রাহাত খান।

এদিকে অ্যাসাইনমেন্টটা সম্পর্কে এখনও পরিষ্কার কোন ধারণা নেই রানার। স্যার হ্যামিলটনকে সব কথা তখনই ব্যাখ্যা করে বলেছিল ও।

বলেছিল: এটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। স্থায়ীভাবে এর সমাধান করা হয়তো কখনোই সম্ভব নয়। তাছাড়া, ড্রাগ স্মাগলিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ওর জানাও নেই। জানার মধ্যে জানে দু'জন মানুষের আর একটা জায়গার নাম। বাকি সবই গুজব।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে হেরোইন আমেরিকায় যাচ্ছে, সেখান থেকে মাফিয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার আর সব দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। কোথাও হেরোইন স্মাগলিং বন্ধ করতে হলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমেরিকায় এর চালান বন্ধ করতে হবে। ফ্রান্সের একটা ড্রাগ রিঙ আমেরিকায় স্মাগলিং করছিল, গত বছরের প্রথম দিকে সেটাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। সে সময় রানা ইংল্যান্ডের অ্যাডিক্টদেরকে এক রত্তি হেরোইনের জন্যে পাগলের মত আচরণ করতে দেখেছে।

সমস্যাটা কত বড় তা বোঝাবার জন্যে এই বেআইনী ব্যবসায় কি পরিমাণ টাকা খাটছে সে সম্পর্কেও একটা ধারণা স্যার হ্যামিলটনকে দেবার চেষ্টা করেছিল রানা।

নিউ ইয়র্কের সাধারণ একজন অ্যাডিক্ট কিভাবে হেরোইন সংগ্রহ করে? বেআইনীভাবে ইঞ্জেকশন বিক্রি ও পুশ করে এমন একজন লোকের কাছে যেতে হয় তাকে। আমেরিকায় হেরোইন বিক্রি করা বা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বেআইনী। কিন্তু ইংল্যান্ডে তা নয়। বেআইনী বলেই দাম খুব বেশি দিতে হয়। প্রতি ডোজ এক আউন্সের ষোলোভাগের এক ভাগ। এই রকম একটা ইঞ্জেকশনের দাম দিতে হয় ছয় থেকে সাত ডলার। চব্বিশ ঘণ্টায় দুটো ইঞ্জেকশন নিতে হয় তাকে।

আঁতকে উঠেছিলেন স্যার হ্যামিলটন।

কিন্তু, বলেছিল রানা, খাঁটি হেরোইনের চালান খুব বেশি নয় ওখানে। বছরে দুই কি তিন টন মাত্র, বড়জোর। একেক ডোজে হেরোইনের পরিমাণ থাকে খুবই কম। সাধারণত ল্যাকটোজ-মিল্ক সুগারের সাথে মিশিয়ে ডোজ বানিয়ে অ্যাডিক্টদের কাছে তা বিক্রি করা হয়। এতে হেরোইনের পরিমাণ থাকে মাত্র এক পার্সেন্ট।

কাগজ-কলম নিয়ে হিসাব কষতে শুরু করে দিয়েছেলেন স্যার হ্যামিলটন। একটা ইঞ্জেকশনে যদি খাঁটি হেরোইন এক আউন্সের ষোলোশো ভাগের এক ভাগ থাকে, এবং একজন অ্যাডিক্টকে যদি, ধরা যাক, সাড়ে ছয় ডলার দাম দিতে হয় প্রতি ইঞ্জেকশনের জন্যে···গড! এক আউন্সেরই দাম পড়ে প্রায় দশ হাজার মার্কিন ডলার!

হ্যাঁ। অর্থাৎ, এক পাউন্ড হেরোইনের দাম প্রায় এক লাখ সত্তর হাজার মার্কিন ডলার। তবে, এর সবটাই লাভ নয়। অ্যাডিক্টদের কাছে পৌঁছে দেবার একটা খরচ আছে। Papaver Somniferum, আফিম গাছ, পপি থেকে হেরোইন তৈরি হয়, যা আমেরিকায় জন্মায় না। উৎপাদনের ধারাটা এই রকম:

পপি থেকে কাঁচা আফিম, আফিম থেকে মরফিয়া, মরফিয়া থেকে হেরোইন। হেরোইন তৈরি করা এবং তা অ্যাডিক্টদের কাছে পৌঁছে দেয়া বেশ খরচসাপেক্ষ ব্যাপার।

এবার লাভের হিসাব।

অ্যাডিক্টরা এক পাউন্ড হেরোইন কিনতে খরচ করছে এক লাখ সত্তর হাজার মার্কিন ডলার। কিন্তু বেআইনী পাইকারী ব্যবসায়ীরা তা মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলারে কিনছে। এক লাখ বিশ হাজার ডলারই পাউন্ড প্রতি লাভ করছে এরা। এবং আমেরিকার বাইরে থেকে যারা মালটা সাপ্লাই দিচ্ছে, তারা কিনছে মাত্র বিশ হাজার ডলারে। এবং কেউ যদি সূত্র ধরে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে কাঁচা আফিম কিনতে চায়, মাত্র পঞ্চাশ ডলার দিয়েই এক পাউন্ড পেয়ে যাবে। দুটো ব্যাপার পরিষ্কার হয় এ থেকে। এক, হাত-বদলের প্রতিটি স্তরে জিনিসটার দাম লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ে যায়। দুই, স্মাগলিংয়ে ঝুঁকির পরিমাণ যেখানে যত বেশি, দাম সেখানে তত বেশি। লাভ বেশি বলেই ঝুঁকি নিচ্ছে মানুষ, প্রয়োজন হলে খুনখারাবি করতেও পিছপা হচ্ছে না।

এরপর গুজবের প্রসঙ্গ।

ফ্রান্সে ড্রাগ রিঙ ধ্বংস হবার পর হেরোইন ব্যবসায় একটা শূন্যতা আসে।

কিন্তু কিছুদিন পরই আর একটা সুসংবদ্ধ দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। গুজব হলো, দলটা মধ্যস্বত্বভোগীদেরকে কোন সুযোগ দিতে চাইছে না। পপি জন্মানো থেকে শুরু করে ছোট-ছোট চালানের মাধ্যমে আমেরিকায় পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত সবই তারা নিজেরা করতে চাইছে। তাদের এই পরিকল্পনা যদি সফল হয়, সব খরচ বাদ দিয়েও পাউন্ড প্রতি পঞ্চাশ হাজার ডলার লাভ করবে তারা। এ-থেকেই ধারণা করা যায় সংগঠন ও মেধা দুটোই আছে তাদের। পুঁজিপতিদের কৌশল অবলম্বন করছে ওরা। গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাটাকেই নিজেদের মুঠোয় ভরতে চাইছে।

এসবের তাৎপর্য হলো:

এক, অবিশ্বাস্য হারে লাভ করার সুযোগ থাকায় এই বেআইনী ব্যবসাটাকে যে কোন মূল্যে চালু রাখতে চাইবে দলটা। যে কোন ঝুঁকি নেবে তারা। যে-কোন বাধার মোকাবিলা করতে ইতস্তত করবে না। প্রয়োজন হলে দ্বিধা করবে না খুনখারাবি করতেও।

দুই, দলটার পরিকল্পনা যদি সফল হয়, সারা দুনিয়ায় আগের চেয়ে অনেক সস্তায় কিনতে পাওয়া যাবে হেরোইন। অ্যাডিক্টদের সংখ্যা হু হু করে বাড়তে শুরু করবে।

এই পর্যায়ে স্যার হ্যামিলটন মন্তব্য করেছিলেন, সুতরাং দলটার অসৎ উদ্দেশ্য বানচাল করার জন্যে রানার কিছু একটা করা একান্তই দরকার।

কিন্তু, রানা তাঁকে জানায়, ড্রাগ স্মাগলারদের এই নতুন দলটা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না ও। যে-দু'জনের নাম জানে তাদের একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। লোকটার নাম আরডেল বি পোমরয়। ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট। দুর্নামের অন্ত নেই এই লোকের। একটা ড্রাগ কেসে মাসছয়েক আগে বিপদে পড়েছিল। ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি তাকে বহিষ্কার করেছে। বরাত ভাল, জেল খাটতে হয়নি। লন্ডনেই আছে, স্যার হ্যামিলটনকে জানিয়েছিল ও, তবে রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই বাইরে যাবে। পপির ফসল সংগ্রহ করতে আরও কিছুদিন দেরি আছে। এই নতুন দল প্রচুর পরিমাণে আফিম সংগ্রহ করতে পারলেই ডেকে পাঠাবে আরডেলকে।

আর মেয়েটার নাম মাদাম দালিয়া পিলোরমি। এর সম্পর্কে কিছুই জানা নেই রানার। নাম শুনে মনে হয় ফ্রেঞ্চ। কোথায় থাকে, মধ্যপ্রাচ্যে কিনা, কিছুই জানা নেই ওর।

এই হলো অবস্থা। অর্থাৎ কাজ করার মত যথেষ্ট তথ্য রানার কাছেও নেই। তাছাড়া হাতে জরুরী অনেক কাজও রয়েছে—সময়াভাব।

স্যার হ্যামিলটন বললেন: তুমি চাইলে বিনা তথ্যেই কাজটায় হাত দিতে পারো। কাজে নেমে তথ্য সংগ্রহ করা তোমার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কঠিন নয়। সব খরচ আমার। আমার ফিল্ম কোম্পানির ক্যামোফ্লেজ নিয়ে ইচ্ছা করলে তুমি তথ্য সংগ্রহের জন্যে মধ্যপ্রাচ্যেও যেতে পারো।

তবু রাজি হয়নি রানা।

কিন্তু হঠাৎ রাজি হতে হলো ওকে। দায়িত্ব ঘাড়ে এভাবে চেপে বসবে,

ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি ও। পরদিন সকালে রানা এজেন্সীর অফিসে ঢোকার সময়ও কিছু বুঝতে পারেনি। ওকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল, সালাম করেছিল। কেমন একটা জড়তা লক্ষ করেছিল রানা সকলের মধ্যেই, কিন্তু গুরুত্ব দেয়ার মত কিছু বলে মনে হয়নি। সিগারেট ধরিয়ে নিজের কামরায় ঢুকেছিল ও।

ঢুকেই দেখে বাঘ! ওর রিভলভিং চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে আছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান।

কাঁচাপাকা ভুরুজোড়ার সামনে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল রানা। সিগারেটটা চট্ করে লুকিয়ে ফেলে দিয়েছিল ও। হাত তুলে সালাম করেছিল।

'বসো, রানা,' গুরুগম্ভীর স্বরে বলেছিলেন রাহাত খান।

পুরানো, অতি পরিচিত একটা পরিবেশের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল রানার। মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল এটা লন্ডন নয়, ঢাকা। মনে হয়েছিল এটা রানা এজেন্সীর অফিস নয়, সাততলার উপর বি সি আইয়ের অফিস, বুড়োর নিজের চেম্বার। ঠিক এইভাবেই বসতে বলত, কঠিন সব অ্যাসাইনমেন্ট চাপিয়ে দিত রানার কাঁধে। সেইসব দিন আবার কি কখনও ফিরে আসবে?

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে বসেছিল রানা বুড়োর সামনে একটা চেয়ারে। মনে অজস্র প্রশ্ন। বুড়ো লন্ডনে কেন? রানা এজেন্সীর অফিসে আসার হঠাৎ কি দরকার পড়ল? ওর ব্যক্তিগত চেয়ারটা দখল করারই বা মানে কি?

সব প্রশ্নেরই উত্তর পেয়েছিল সেদিন রানা। অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটেছিল সেই সাথে।

এক ঘণ্টা পর রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে বারে ঢুকল রানা। আরডেলের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল ও। আরডেলের টেবিলে বসে আছে গিলটি মিয়া। খুচরো একটা পয়সা টস্ করছে সে। জুয়া খেলছে আরডেলের সাথে।

দুই

পরদিন তীক্ষ্ণ চেহারার একজন ইরানী ড্রাইভারকে নিয়ে তেহরান থেকে রওনা হলো আরডেল। উত্তর-পশ্চিম দিকে ছুটছে ওদের জীপ।

শহর এলাকায় যানবাহনের প্রচণ্ড ভীড়। ল্যান্ডরোভার নিয়ে জীপটার পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকল গিলটি মিয়া। শহরের বাইরে এসে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ঝড়ের বেগে জীপটাকে ওভারটেক করে সামনে এগিয়ে গেল সে। তিন মিনিট পর ভিউমিররে জীপটাকে আর দেখা গেল না।

রাস্তার ডানদিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য। তুষারশুভ্র বরফের মুকুট পরে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলবুরুজ পর্বতশ্রেণী। চারদিকে ছায়াহীন ধূসর প্রান্তর। ধূলিময় আর বৈচিত্র্যহীন। একঘেয়ে।

রাস্তাটা সুবিধের মনে হচ্ছে না গিলটি মিয়ার। তাবরিজের দিকে যাওয়ার এটাই একমাত্র হাইওয়ে। এখন পর্যন্ত কোথাও দ্বিধাবিভক্ত হয়নি। এগিয়ে থাকার তাই ঝুঁকি নেই কোন। এই হাইওয়ে ধরে সোজা আসতে হবে আরডেলকে, আর কোন বিকল্প পথ নেই।

ফিক্ করে হেসে ফেলল গিলটি মিয়া আজ সকালের কথা মনে পড়ে যেতে। ভাবছে: কালকে রেতের বেলা আদেলের টেবিলে কি করছিলুম জানতে চাইলো স্যার। বললুম, চান্সটা পেয়ে গেলুম, হাতছাড়া করতে মন চাইলোনি। কিচু ফরেন কারেন্সী রোজগার হয়েচে।

তেহরান থেকে কাজভিন প্রায় একশো মাইল। বেলা একটার সময় শহরে ঢুকল গিলটি মিয়া। ম্যাপটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিল আর একবার। রিজেন্ট হোটেলটা মেইন রোডের উপরই কোথাও হবে, শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল ওটা। আরডেল থামলে ওখানেই থামবে।

হোটেলটা খুঁজে বের করল গিলটি মিয়া। গজ পঞ্চাশেক পিছিয়ে এসে ফুটপাথের ধারে দাঁড় করাল গাড়ি। 'খিদেতে শালার পেটটা চোঁ চোঁ কচ্চে,' বিড়বিড় করতে করতে ব্যাগ খুলে বের করল চিকেন স্যান্ডউইচ।

খাচ্ছে, এমন সময় আরডেলের জীপটা হোটেলের সামনে পৌঁছুল। লাফ দিয়ে নামল আরডেল। কোনদিকে না তাকিয়ে ঢুকে গেল হোটেলের ভিতরে। আধমিনিট পর ড্রাইভারও অনুসরণ করল তাকে।

কফি শেষ করে ঢেকুর তুলল গিলটি মিয়া। ব্যাগে লুকিয়ে রাখা প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা টোব্যাকো পাইপটা বের করল। তামাক ভরে আগুন ধরাল তাতে। ঝুঁটিওয়ালা তুর্কী টুপিটা মাথায় দিয়ে ভিউমিররে তাকাল। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে পাইপটা। খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। সন্তুষ্টির একটা হাসি ফুটল মুখে। গাইডবুকটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল।

পরের শহর জাঞ্জিন। ফের একশো মাইলের ধাক্কা। বরং এগিয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ, ভেবে স্টার্ট দিল সে গাড়িতে।

দশ মিনিট পর ল্যান্ডরোভারের স্পীড আরও কমিয়ে আনল গিলটি মিয়া। জীপটার দেখা নেই এখনও। দূর পাহাড়ের দিকে তাকাল সে। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন দৃশ্য দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। একশো মাইলের উপর পেরিয়ে এসেছে সে, গোমড়ামুখো পাহাড়গুলোর চেহারা কিছুমাত্র বদলায়নি। ভিউমিররে জীপটাকে দেখতে পেল গিলটি মিয়া।

গাড়ি ছুটছে তো ছুটছেই। অবশেষে জাঞ্জিন। শহরে ঢোকার মুখে গিলটি মিয়া স্থির করল গাড়ি থামাবে না। সূর্য অস্ত যেতে দেরি আছে, আরডেল এখানে থামবে বলে মনে হচ্ছে না তার।

কিন্তু মিনিট দুই পর ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ভয় হলো আরডেলকে বুঝি হারিয়ে ফেলেছে।

তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে থামল ল্যান্ডরোভার। অপ্রশস্ত রাস্তা, দু'দিকেই খাদ, খুব সাবধানে গাড়ির মুখ ঘোরাল গিলটি মিয়া। জাঞ্জিনের দিকে ছুটল আবার তীরবেগে।

শহরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা হোটেল আছে, মনে পড়ল গিলটি মিয়ার। সেটার গা ঘেঁষে বাম দিকে একটা রাস্তা দেখেছে বলে স্মরণ হচ্ছে।

জাঞ্জিনে ফিরে রাস্তাটা দেখল গিলটি মিয়া। পশ্চিম দিকে চলে গেছে। মুখেই আরবীতে লেখা একটা সাইনপোস্ট। গাড়ির স্পীড কমাল না গিলটি মিয়া।

অনেকদূর চলে গেছে আরডেল, জীপটাকে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না সামনে। সীটের উপর নড়েচড়ে বসল গিলটি মিয়া। আরডেল কি টের পেয়ে গেছে অনুসরণ করা হচ্ছে তাকে? ভাবল। স্পীড বাড়িয়ে দিল আরও।

নতুন রাস্তাটা এঁকেবেঁকে দুর্গম পাহাড়ী এলাকার ভেতর গিয়ে ঢুকেছে। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কখনও পঞ্চাশ-একশো গজের মধ্যে হঠাৎ বাঁক নিয়েছে দু'তিনবার।

গাড়ি কাঁপছে। লাফাচ্ছে। অবশেষে বহুদূরে ধুলোর ছোট্ট একটা মেঘ দেখতে পাওয়া গেল।

স্পীড কমিয়ে আনতে বাধ্য হলো গিলটি মিয়া। রাস্তাটা অসম্ভব খারাপ। পাহাড়ী বাতাস আশপাশ থেকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে এসে ফেলে রেখেছে ছোটবড় পাথর। গাড়ির গতি এখন মন্থর। ওদিকে সূর্য ডুবুডুবু।

একটা ক্লিপবোর্ডের সাথে ম্যাপটা আটকে নিয়েছে গিলটি মিয়া। কম্পাসের দিকে একটা চোখ রেখেছে সে। এখনও পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা। আরেকবার চেক করল ম্যাপটা। বোতাম টিপে অন করল অয়্যারলেস সেট। 'স্যারকে ডাকচি, আমি গিলটি মিয়া। স্যারকে ডাকচি, আমি গিলটি মিয়া। ওভার।'

সাথে সাথে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ভেসে এল রানার গলা, 'কি খবর, গিলটি মিয়া? ওভার।'

নিজের পজিশন জানিয়ে গিলটি মিয়া বলল, 'আদেল বাবাজী কুর্দিস্তানের দিকে যাচ্চে। এ্যাকোন-আমি কি করবো স্যার? ওভার।'

'এককালে ওটাই ছিল ইরান থেকে সিরিয়া আর জর্দানে আফিম পাচারের চোরাপথ,' বলল রানা। 'নতুন দলটা সম্ভবত পুরানো পথটাই ব্যবহার করছে। তুমি ওর পেছনে লেগে থাকো, গিলটি মিয়া। ওভার।'

'দেকে ফেলার ভয় আচে, স্যার। বেশি কাচে যেতে পারছি না।ঝুঁকি লেবো? ওভার।'

'প্রয়োজন হলে নিতে হবে। ওকে হারালে চলবে না। ওভার অ্যান্ড আউট।'

খানিকটা সরল রাস্তা সামনে। পুরো অংশটা এখানে পাহাড়ের গায়ে ঝুলছে। অপর পাশে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা। অনেক, অনেক নিচে বিশাল তেপান্তর—উপত্যকা।

উপত্যকার উপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে রাস্তাটা। মত্ত ষাঁড়ের মত ধেয়ে নামছে ল্যান্ডরোভার। রাখে আল্লা মারে কে! ভাবছে গিলটি মিয়া। মনপ্রাণ যাকে উৎসর্গ করেছে সেই বলেছে ঝুঁকি নিতে, আর চিন্তা কিসের।

উপত্যকা থেকেই আবার উঁচু হতে শুরু করেছে রাস্তাটা। অন্যদিকে একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে এঁকেবেঁকে। সেই বাঁকা জায়গার একখানে সূর্যের আলো লেগে লালচে দেখাচ্ছে উড়ন্ত খানিকটা ধুলো।

'পালাচ্চেন বাবাজী!' বিড়বিড় করছে গিলটি মিয়া। 'আমি দেকতে পাচ্চি, তার মানে বাবাজীও দেক্‌তে পাচ্চেন আমাকে। উপায় কি!'

আধঘণ্টা পর। নিচের ঠোঁট কামড়ে প্রায় রক্ত বের করে ফেলল গিলটি মিয়া। ব্রেক কষল। গাড়ি থামতেই লাফ দিয়ে নামল সে।

উপত্যকার উপর বিশাল একটা পাথুরে সমতলভূমি, পাঁচটা রাস্তা পাঁচ দিকে চলে গেছে সাপের মত এঁকেবেঁকে।

দিশেহারার মত ছুটোছুটি করছে গিলটি মিয়া। চাকার দাগ নেই কোথাও। লোহার মত শক্ত পাথর। আদেল বাবাজী পাঁচ দিকের কোন্‌দিকে যে গেছে বোঝার কোন উপায় নেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ির কাছে ফিরে এল সে। ক্লিপবোর্ড থেকে খুলে নিল ম্যাপটা। ম্যাপের গায়ে ছোট্ট একটা ক্রসচিহ্ন আঁকল সে। গাড়িতে উঠে অন করল অয়্যারলেস সেট। 'স্যারকে ডাকচি, আমি গিলটি মিয়া। স্যারকে ডাকচি, আমি গিলটি মিয়া। ওভার।'

'বলো। ওভার।'

'হেরিয়ে ফেলেচি আদেলকে, স্যার। পাঁচ রাস্তার এক মোড়ে ডেঁড়িয়ে আচি বেকুবের মতো। ম্যাপে এই জায়গার কোনো হদিস নেই। আদেল হয়তো এ্যাকোন ইরাকী বর্ডারের দিকে ছুটচে। ওভার।'

'শুরুতেই টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেল?' বলল রানা। 'ঠিক আছে, মন খারাপ কোরো না। রাতের মত তাঁবু ফেলো ওখানেই। রাস্তা থেকে যেন দেখা না যায়। কাল সকাল থেকে কুর্দিস্তান চষতে শুরু করবে তুমি। কোন্ দিকে যেতে হবে আমি জানাব তোমাকে। ওভার অ্যান্ড আউট।'

সেটটা অফ করে দিয়ে চুরুট ধরাল রানা। বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে তেহরানে। কিন্তু শীতের প্রকোপ কমেনি। আজ সারাদিন ধরে কেস ফাইলগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করেছে ও। রানা এজেন্সীর তেহরান শাখার ফাইল এগুলো। ছোটখাট কেস, কিন্তু সংখ্যায় প্রচুর। প্রতিটি কেস পড়ে দেখা সম্ভব হয়নি রানার পক্ষে। গোটা বিশেক পড়েছে। এবং ঠিক কোন্ পথে এগোলে মীমাংসা পাওয়া যাবে জানিয়ে দিয়েছে খায়েরকে। জ্ঞান হারাতেই শুধু বাকি আছে খায়েরের। যে-সব কেস নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে সে মাসের পর মাস, একবার চোখ বুলিয়েই সেগুলোর এত চমৎকার সমাধান কি করে দিচ্ছে মাসুদ ভাই? জটিল সব কেস জলবৎ তরলং হয়ে যাচ্ছে মানুষটার বুদ্ধির স্পর্শ লাগতেই…বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল তার।

সোফায় বসল রানা। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে চিন্তা করতে শুরু করল। আরডেলকে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বি সি আই-এর গোলাম পাশা আর এক্স নেভীম্যান বরাত খানের কথা মনে পড়ল। ওদের উপরই ভরসা

এখন।

সেই সাথে মনে পড়ল মেজর জেনারেলের সাথে ওর কথোপকথন:

কাঁচা-পাকা ভুরুর নিচে তীব্র একজোড়া চোখ। ঢিপঢিপ করছে রানার বুকে। হাতের তালু ঘামছে। মনে পড়ে যাচ্ছে ঢাকার কথা। পুরোনো দিনের কথা। ঠিক এই রকম অনুভূতিরই শিকার হত সে বুড়োর সামনে বসলে।

'স্যার হ্যামিলটনের প্রস্তাবটা তুমি গ্রহণ করেছ, রানা?'

চমকে উঠল রানা। স্যার হ্যামিলটনকে মেজর জেনারেল চেনেন নাকি? 'জ্বী না,' বলল ও। 'বারণ করে দিয়েছি। স্যার, আপনি তাঁকে···'

'না, পরিচয় নেই,' রাহাত খান পাইপ ধরাচ্ছেন। 'ওর প্রস্তাবটা গ্রহণ করে ফেলো, রানা। তাতে সুবিধেই হবে। ওর ফিল্ম কোম্পানির ক্যামোফ্লেজটা কাজে লাগাতে পারবে তুমি।'

'কিন্তু, স্যার···'

সেই পুরানো দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল। একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলেন ওকে মেজর জেনারেল রাহাত খান। 'এ ব্যাপারে বি সি আই ইন্টারেস্টেড। আমেরিকা থেকে বাংলাদেশেও যাচ্ছে হেরোইন। আমরা চাই চোরাচালানটা বন্ধ হোক।'

চটে গেলো রানা। সারা দুনিয়া জোড়া 'রানা এজেন্সী'র নেটওয়ার্ক চালু হয়ে যাওয়ার পর থেকেই বি সি আই চাপ সৃষ্টি শুরু করেছে। একের পর এক চাপানো হচ্ছে কাজের ভার। অথচ স্বীকৃতি নেই।

ছুটি দেয়ার নামে দূর করে দেয়া হয়েছে ওকে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে।

এভাবে ওকে ব্যবহারের কোন অধিকার কারও নেই। স্থির করল, ব্যাপারটা এক্ষুণি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া দরকার বুড়োকে। নইলে ভবিষ্যতে অনেক কঠিন সমস্যার উদ্ভব হবে। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রানা।

'সময় নেই, স্যার। এমনিতেই আমাদের কাজের অন্ত নেই, তার ওপর একের পর এক কাজ চাপিয়ে চলেছে বি সি আই। আপনারা যদি এভাবে প্রতি পদে আমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটান, বি সি আই-এর অনুরোধ রক্ষা করতেই যদি সর্বক্ষণ আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়, যদি'···হঠাৎ থেমে গেল রানা।

কথা বলার সময় রাহাত খানের কাছ থেকে এর চেয়ে বড়ো বাধা জীবনে কখনও পায়নি সে। মৃদু হাসলেন তিনি।

বোকার মত চেয়ে থাকল রানা। বোবা হয়ে গেছে যেন সে।

'কে প্রতিষ্ঠা করেছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স?'

হঠাৎ এই প্রশ্নে ঘাবড়ে গেল রানা। বলল, 'আপনি।'

'না। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কথা আমি জিজ্ঞেস করছি না—কে প্রতিষ্ঠা করেছে বি. সি. আই?'

আমতা আমতা করে বলল রানা, 'কয়েকজন মিলে···মানে সোহেল, রাশেদ, সলিল···সোহানাও ছিল, আপনিও ফিরে এসে···'

কাঁচা-পাকা ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠতে দেখে থেমে গেল রানা।

'বাজে কথা রাখো!' বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'সবাই জানে, আমাদের রেকর্ডে পরিষ্কার ভাষায় লিখে রেখেছে সোহেল। তুমি। ইউ আর দা ফাউন্ডার। সেই তোমার মুখে তো ওসব বাজে কথা শোভা পায় না! তোমার সময় আমরা নষ্ট করছি মানে? নিজেকে আলাদা করে ভাবছ কোন্ হিসেবে?'

'আমাকে যখন বের করে দেয়া হয়েছে…'

'হু সেয দ্যাট? কে তোমাকে বের করে দিয়েছে? এতবড় ক্ষমতা কার? তুমি অফিশিয়াল চিঠির মার্জিনে আমার হাতে লেখা নোটটা পড়ে দ্যাখোনি?'

বোকার মত চেয়ে রইল রানা। পরিষ্কার মনে পড়ছে, চিঠির মার্জিনে লেখা ছিল কিছু। কিন্তু চোখে অন্ধকার দেখছিল সে তখন—পড়া হয়নি। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

'পড়োনি? তাহলে এসব করছ কি করে?' ভুরুজোড়া কপালে তুললেন মেজর জেনারেল।

'কি সব? কি লেখা ছিল, স্যার?'

মুচকি হাসলেন বৃদ্ধ।

'যা করছ, ঠিক তাই করতে বলা হয়েছিল তোমাকে। অফিশিয়াল অর্ডার। ক্যামোফ্লেজ। মাই গড! তুমি দেখছি ভয়ঙ্কর মানসিক কষ্টে ছিলে এতদিন!'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিল ঘুরে কাছে চলে এলেন মেজর জেনারেল। একটা হাত রাখলেন রানার কাঁধে।

এতদিনের পুঞ্জীভূত অভিমান, ক্ষোভ দু'ফোঁটা জল হয়ে নেমে এল রানার গাল বেয়ে। তাহলে…তাহলে…আর ভাবতে পারছে না সে।

'আমি তাহলে এখনও আপনার সাথেই আছি?'

'একশো বার! তোমার জানা নেই, ওয়ান্স আওয়ার ম্যান, অলওয়েজ আওয়ার ম্যান?' ফিরে গিয়ে বৃদ্ধ আবার চেয়ারে বসলেন রানাকে চট্ করে চোখ মুছে নেয়ার সুযোগ দিয়ে। 'না জেনেও আমার মনের মত কাজ করে চলেছ দেখে খুব খুশি হলাম আমি, রানা। তোমাকেই তো সব…বয়স হয়েছে, আর তো খুব দেরি নেই, নিশ্চিন্তে বিদায় নিতে পারব আমি। যাই হোক, সে সব কথা পরে। এখন ড্রাগ রিঙের প্রসঙ্গে আসা যাক। কবে রওনা হচ্ছ তুমি?'

'ঠিক এই মুহূর্তে উপযুক্ত লোক হাতের কাছে নেই, স্যার। ভাবছি…'

'কি ধরনের লোক দরকার তোমার?'

'বি সি আই থেকে অন্তত একজন লোক দরকার আমার,' বলল রানা। 'গোলাম পাশাকে পেলে ভাল হয়।'

'পাবে। আর কাউকে?'

'ঢাকায় আমার পরিচিত একজন লোক আছে। এক্স নেভী ম্যান, বরাত খান। ইংলিশ রোডে তার একটা কারখানা আছে মোটর মেরামতের। আমার কথা বললেই লন্ডনে চলে আসবে। বরাত খান টর্পেডো মেকানিক ছিল, ওকেও আমার দরকার হবে। আর গিলটি মিয়াকে চাই।'

'আগামীকালই পৌঁছে যাবে ওরা,' রানার রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে

দাঁড়ালেন মেজর জেনারেল।

তড়াক করে দাঁড়াল রানাও। 'সে কি, স্যার। চা না খেয়ে…?'

'আরেক দিন হবে,' বললেন রাহাত খান, রানার মুখটা ম্লান হয়ে উঠতে দেখে গম্ভীরভাবে বসে পড়লেন আবার। রিস্টওয়াচ দেখলেন। 'পাঁচ মিনিট সময় আছে। চা নয়, কফি আনাও।'

কলিং বেলের দিকে দ্রুত হাত বাড়াল রানা।

এরপর টপাটপ ঘটতে শুরু করল ঘটনা। পরদিনই লন্ডনে পৌঁছুল ওরা তিনজন।

দেখে মনে হয় অনেক কম, কিন্তু পঞ্চাশের উপর বয়স হয়েছে বরাত খানের। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি এখনও, গাধার মত খাটতে পারে। গায়ের রঙ ভোমরের মত কালো, আলকাতরার মত চকচকে। জুলফি থেকে সারাক্ষণ সরষের তেল গড়াচ্ছে। তার কারখানায় গাড়ি মেরামত করাত রানা, সেই সূত্রে পরিচয়। একদল হাইজ্যাকারের কবল থেকে তাকে মুক্ত করেছিল রানা, সেই থেকে ঘনিষ্ঠতা। স্যার মাসুদ বলতে বরাত খান অজ্ঞান।

রানা এজেন্সীর লন্ডন শাখায় পা দিয়ে বরাত খান আনন্দে আত্মহারা। 'ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পর আবার সেই লন্ডনে আসার ভাগ্য হলো, স্যার মাসুদ। এখন বলুন, কি খেদমত করতে পারি আপনার!'

'কাজটায় বিপদের ঝুঁকি আছে,' বলল রানা। 'ভেবে দেখো, এর সাথে জড়াতে চাও কি না।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল বরাত খান। নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকে বলল, 'ইনি তো সেই কবেই হাইজ্যাকারের গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছিলেন। খোদা নিজে থেকে আপনাকে পাঠিয়েছিলেন, তাই আজও বেঁচে আছি। ভাল কোন কাজ করতে গিয়ে যদি মরি, তাতে দুঃখ কিসের? সে তো পরম সৌভাগ্য। বরাত খান বিপদ দেখে কখনও পিছিয়ে যায় না, স্যার মাসুদ।'

'কিন্তু স্ত্রী পুত্র আছে তোমার…'

'রোজগার তো কম করিনি,' বলল বরাত খান। 'আমি মরে গেলেও ওরা অভাবে পড়বে না।'

'তবু,' বলল রানা। 'এই অভিযানে যদি তোমার কিছু ঘটে, রানা এজেন্সীর মাধ্যমে তোমার স্ত্রী পাঁচ লাখ টাকা পাবে। আর একটা কথা। সাফল্যের সাথে এই অভিযান যদি শেষ করতে পারি আমরা, সেক্ষেত্রে তিন লাখ টাকা পাবে তুমি।'

'তাহলে অভিযানে যাচ্ছি আমরা, স্যার মাসুদ?'

'হ্যাঁ। কোথায় তা এখনও বলতে পারছি না,' বলল রানা। 'তার আগে তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই আমি।'

'করুন।'

'রয়্যাল নেভীর চাকরি ছেড়েছ ক'বছর আগে?'

'ঊনত্রিশ।'

'নেভীতে তো তুমি টর্পেডোম্যান ছিলে, তাই না?'

'মেকানিক ছিলাম। টর্পেডো মেরামত, অ্যাসেম্বলিং।'

'ঊনত্রিশ বছর,' চিন্তিতভাবে বলল রানা। 'যা শিখেছিলে নিশ্চয়ই সব ভুলে গেছ?'

স্বভাবসুলভ আরেকটা হোঃ হোঃ হাসি ছাড়ল বরাত খান। 'শিক্ষাটাই আমার ক্যাপিটাল, স্যার মাসুদ। যা একবার শিখি জীবনে কখনও তা ভুলি না।'

'ধরো, নেভীতে থাকার সময় যে-সব যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সেগুলো যদি আবার তোমাকে দেয়া হয়, সামলাতে পারবে? কাজ করতে পারবে সেগুলো নিয়ে?'

'পানির মত।'

'টর্পেডো সম্পর্কে সম্ভাব্য সবই তো তুমি জানো, তাই না?'

'জানি বললে গর্ব করা হয়, কিন্তু না বলেই পারছি না। জানি।'

'ধরো,' বলল রানা। 'হালকা কিন্তু খুব দামী একটা জিনিস কোন দেশে স্মাগল করতে চাই আমি। দেশটার একটা সি-বোর্ড আছে। টর্পেডোর মাধ্যমে তা সম্ভব?'

একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকল বরাত খান। তারপর জানতে চাইল, 'জিনিসটা কি, স্যার মাসুদ? সুইস ঘড়ি নাকি?'

'কেন, হেরোইন হতে পারে না?'

চিন্তিত দেখাল বরাত খানকে। মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর হাসল সে। 'সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। পুরানো মার্ক ইলেভেনের মাথায় সাড়ে সাতশো পাউন্ডের একটা করে ওয়ারহেড থাকত। ওখানে ওয়ারহেডের বদলে প্রচুর হেরোইন রাখতে পারবেন।'

'রেঞ্জ?'

'কমসে কম পাঁচ হাজার ফিট। তবে, আপনি যদি ব্যাটারিগুলোকে আগে থেকে গরম করার ব্যবস্থা করতে পারেন, তবেই।'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'এত কম রেঞ্জে কাজ হবে না। ব্যাটারির কথা বলছ, ওটা কি তাহলে একটা ইলেকট্রিক টর্পেডো?'

'হ্যাঁ। চোরাচালানের জন্যে ফার্স্টক্লাস হবে। বুদ্বুদ ওঠে না।'

'কিন্তু রেঞ্জ খুব কম,' চিন্তিত রানা। 'আমি চাইছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রসীমার বাইরে একটা জাহাজ নোঙর ফেলবে, ওখান থেকে তীর লক্ষ্য করে ছোঁড়া হবে টর্পেডোটা। তীরে পৌঁছুতে হলে অবশ্যই কমপক্ষে বারো মাইল ছুটতে হবে ওটাকে, তাই না? বারো মাইল, তার মানে একুশ হাজার গজেরও বেশি।'

'হ্যাঁ,' বলল বরাত খান। ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করল খানিক। 'স্যার মাসুদ, মনে হচ্ছে, তা-ও সম্ভব হতে পারে।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'কি বললে! তা-ও সম্ভব হতে পারে? কিভাবে?'

'মার্ক ইলেভেন তৈরি হয়েছে ঊনিশশো বিয়াল্লিশ সালে। তারপর অনেক এগিয়ে গেছে দুনিয়া।' ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল বরাত খান। তারপর মুখ

তুলল। 'কিন্তু, স্যার মাসুদ, টর্পেডো আপনি পাচ্ছেন কোত্থেকে?'
'এখনও পাইনি,' বলল রানা। 'তবে জোগাড় করা খুব কঠিন হবে না। সুইজারল্যান্ডে একজন আমেরিকান আছে, পুরানো যুদ্ধাস্ত্র কেনাবেচা করে সে। তার কাছে টর্পেডো থাকা সম্ভব।'
'পেলে মার্ক ইলেভেনই পাবেন,' বলল বরাত খান। 'ওর চেয়ে আধুনিক টর্পেডো খোলা বাজারে এখনও আসেনি।' জিভ বের করে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল সে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল, 'স্যার, ব্যাপারটা দারুণ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। কেন জানেন? মার্ক ইলেভেনে ছিল বাহান্নটা লিড অ্যাসিড ব্যাটারি। আজকাল আরও উন্নত ব্যাটারি পাওয়া যায়। লিড-অ্যাসিড ব্যাটারিগুলো বের করে তার জায়গায় হাই পাওয়ার মার্কারি সেল লাগাতে হবে আমাকে। স্যার মাসুদ, আশা করি তাতেই কেল্লা ফতে হবে। সার্কিটগুলো নতুন ডিজাইনে সাজাতে হবে, সত্যি—খরচও পড়বে বিস্তর—কিন্তু পারব বলে মনে করি। কিন্তু, স্যার মাসুদ, চোরাচালান ব্যাপারটা...'
'চিন্তার কিছু নেই তোমার,' বলল রানা। 'চোরাচালান আমার পেশা নয়। যে কাজের দায়িত্ব দেব তোমাকে তার সাথে চোরাচালানের সম্পর্ক আছে বটে, তবে চোরাচালানীরা আমাদের বিরোধী দল।'
'তাহলে আর কোন অসুবিধেই নেই,' বলল বরাত খান। 'লন্ডনে আমার পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা করতে হবে আমাকে। দেখি ওদের কারও কাছে একটা মার্ক ইলেভেনের ম্যানুয়াল পাওয়া যায় কিনা। সার্কিটের ডিজাইন বদলাতে হলে ওটা লাগবে।'
মুচকি হাসল রানা। বিপদের মুখোমুখি হবার, যুদ্ধাস্ত্র নাড়াচাড়া করার নেশাটা জাগিয়ে দিতে পেরেছে ও বরাত খানের মধ্যে। এইটুকুই চেয়েছিল ও। মগজটা একবার চালু হয়ে গেছে যখন, এর ব্যাপারে আর কোন চিন্তা নেই ওর। সত্যিকার প্রতিভা লোকটা।
দু'দিন পরই এল রানা এজেন্সীর প্যারিস-ইন-চার্জ সাদাতের রিপোর্ট। মোট ছয়জন মাদাম দালিয়া পিলোরমির সন্ধান পেয়েছে ও। এদের মধ্যে একজনের চরিত্র রীতিমত সন্দেহজনক। তার সম্পর্কেই বিস্তারিত জানিয়ে রিপোর্ট করেছে সাদাত। তথ্যগুলো হলো:
মাদাম দালিয়া পিলোরমি: জন্ম ১৯৪৭-এর ১৮ এপ্রিল, মা বাবা...
গোড়ার তথ্যগুলো বাদ দিয়ে চরিত্রটির কীর্তিকলাপের ব্যাপারে কৌতূহলী হলো রানা: *১৯৬৫ সালে ছোট্ট একটা ফ্রড কেসে তিন মাসের কারাভোগ। '৬৭ সালে ফ্রাঙ্কোস্প্যানিশ বর্ডার দিয়ে চোরাচালান করার দায়ে ছয় মাস কারাভোগ।*
'৬৮ সালে ফ্রান্স ত্যাগ।
ধারণা এবং সন্দেহ:
১৯৬৮-'৭০ সাল: তাঞ্জিয়ার থেকে স্পেনে চোরাচালানের সাথে জড়িত ছিল।
১৯৭১-'৭৩ সাল: আলজিরিয়ায় অস্ত্রের চোরাচালান।

১৯৭৩-'৭৮ সাল: ইটালী এবং সুইজারল্যান্ডে ড্রাগ পাচার।

মনে করা হয় নিম্নলিখিত লোকদের সে খুন করেছে:

১৯৭২ সালে হেনরী জেনকিনস (মার্কিন), ১৯৭৩ সালে কার্ল রেঙ্গার (জার্মান), আহমেদ বেন আউজা (আলজিরিয়ান) ১৯৭৬ সালে আমের আলী (লেবানীজ) এবং পিয়াত্রা জুয়েরা (ইটালিয়ান)।

যোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা:

পাত্রী একজন ভাল সংগঠক। বড়ো ধরনের গ্রুপ বা পার্টিকে চমৎকার সামলাতে এবং পরিচালনা করতে পারে। সাংঘাতিক নিষ্ঠুর স্বভাব, ভুলের কোন ক্ষমা নেই তার কাছে। স্মাগলিংয়ের সাথে ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। তবে ১৯৭৩ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের বিরাট একটা জুয়েল চোরাবাহিনীর ডিরেক্টর ছিল বলে মনে করা হয়।

বর্তমান ঠিকানা: বৈরুত, লেবানন।

বর্তমান অবস্থা: মেট্রোপলিটন ফ্রান্সে পুলিসের খাতায় তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। পুলিস তাকে খুঁজছে না।

সাদাত ফ্রেঞ্চ সুরতের কাছ থেকে কয়েকটা ফটোও সংগ্রহ করেছে। মাদাম দালিয়া স্বর্ণকেশী। চেহারায় বয়সের কোন ছাপ নেই। বত্রিশকে দেখে মনে হয় বাইশ।

রানার সামনে বসেছিল বি সি আই-এর কনিষ্ঠতম এজেন্ট গোলাম পাশা। পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি লম্বা ছেলেটা। গায়ের রঙ বাদামী। পেটা লোহার মত শরীর। মুখটা হাসি হাসি। মনে হয় সবকিছুতেই কি যেন একটা মজার ব্যাপার দেখতে পাচ্ছে সে সারাক্ষণ।

রিপোর্টটা তাকে পড়তে দিল রানা। একটু পরই ভুরু কুঁচকে উঠল তার। পড়া শেষ করে মুখ তুলল। 'মনে হচ্ছে, একেই আমরা খুঁজছি, মাসুদ ভাই।'

বৈরুতে লোহানী আছে। খবর পাঠাও ওকে। মাদামের ঠিকানা জানার চেষ্টা করুক। সাথে সাথে যেন রিপোর্ট করে এখানে। সারাক্ষণ নজরে রাখতে বলবে। এখান থেকে তোমরা গিয়ে দায়িত্ব বুঝে নেবে ওর কাছ থেকে।'

হাসিটা ফিরল পাশার মুখে। 'যাক, শেষ পর্যন্ত তাহলে বাতাস বইতে শুরু করেছে। দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম লন্ডনে। কিন্তু, মাসুদ ভাই, আরডেল যে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে!'

'নড়ার সময় হয়ে এসেছে ওরও,' বলল রানা।

'যাই, সুখবরটা বরাত খানকে দিয়ে আসি,' চেয়ার ছাড়ল পাশা। 'গিলটি মিয়া কোথায়, ওকে দেখছি না যে অফিসে?'

'সউদী দূতাবাসে গেছে। নতুন একজন বন্ধু জুটিয়েছে, সকাল-বিকাল দু'বেলা আরবী শিখছে প্রাণপণে।'

'গুণী লোক,' মাথা দুলিয়ে বলল পাশা।

তিনদিন পর নড়ল আরডেল। এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা প্লেনে চড়ে বসল গিলটি মিয়াকে নিয়ে রানা। সাথে নিল একটা ল্যান্ডরোভার।

গোলাম পাশা ও বরাত খান আগেই রওনা হয়ে গেছে লেবাননের উদ্দেশে।

তিন

বৈরুত।

ফাইভ-স্টার হোটেল সেন্ট জর্জেস। বারে বসে আছে ওরা। টু-পিস বিকিনি পরা একজন শ্বেতাঙ্গিনী ডাইভিং বোর্ডে উঠছে, গালে হাত দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে গোলাম পাশা।

পাশের চেয়ার থেকে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বরাত খান। 'ভাগ্না, এভাবে কদ্দিন আর ভেরেণ্ডা ভাজব বলো দেখি!'

'সেই কথাই ভাবছি,' সিধে হয়ে বসল গোলাম পাশা। 'আজই শেষ চেষ্টা, এরপর আমরা টেকনিক বদলাব।'

বৈরুতে পা দিয়েই রানা এজেন্সীর স্থানীয় ইন-চার্জ লোহানীর কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে ওরা। কিন্তু এগোতে পারেনি খুব একটা। মাদাম দালিয়া পিলোরমি লেবানীজ সোসাইটির মগডালে বিচরণ করে, তার সাথে পরিচিত হওয়া সহজ নয়।

হাম্পানার পাহাড়ে একটা ডিলাক্স ভিলায় স্বর্গ-নীড় রচনা করেছে মাদাম দালিয়া। হোটেল সেন্ট জর্জেসে নিয়মিত আসে সে, সাথে কেউ না কেউ থাকেই। গত কয়েকদিন ওদেরকে হোটেল থেকে অনুসরণ করার ফলাফল হয়েছে প্রকাণ্ড একটা শূন্য। প্রথম দু'দিন মাদামের সঙ্গী ছিল দু'জন ব্যাঙ্কার। তৃতীয়জন একজন খ্রীস্টান রাজনীতিক। চতুর্থজন ছিলেন একজন ধর্মীয় নেতা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে চারজনই কট্টর আদর্শবাদী। অর্থাৎ এদের কাউকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

গা থেকে পানি ঝরছে মেয়েটার। আবার উঠে এসেছে ডাইভিং বোর্ডে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পাশার দিকে। মুখে চাপা কৌতুকের ছটা। মুখ ফিরিয়ে দৌড় দিল সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল মেডিটারেনিয়ানের নীল পানিতে।

'তার চেয়ে স্যার মাসুদ যেটা বরাদ্দ করেছে তোমার জন্যে সেটার দিকে আরও বেশি করে নজর দিলে হয় না?' বলল বরাত খান। 'ভাগ্না, মাদাম দালিয়া লাখো মে এক। আর কারও দিকে নজর দেবার ফুরসত পাবে না তুমি···ওই যে, আসছে!'

বরাত খানের দৃষ্টি অনুসরণ করে পাশা দেখল রেস্তোরাঁ থেকে করিডরে বেরুচ্ছে মাদাম দালিয়া, সাথে দীর্ঘদেহী এক শ্বেতাঙ্গ। মাদামের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। মিথ্যে বলেনি বরাত খান। যৌবনের উত্তাল ঢেউ খেলানো একখানা শরীর বটে!

বিল মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। মার্সিডিজ স্টার্ট নিয়ে

ছুটতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে। পাশা উঠে বসতে অস্টিন ছেড়ে দিল বরাত খানও।

দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ। পাঁচ মিনিট পর একটা অভিজাত হোটেলের সামনে থামল মার্সিডিজ। মাদাম দালিয়া ও তার শ্বেতাঙ্গ সঙ্গী দু'জনেই গাড়ি থেকে নেমে হোটেলের ভেতর ঢুকল।

পঞ্চাশ গজ পেছনে দাঁড় করিয়েছে বরাত খান অস্টিনটাকে। দরজা খুলে নেমে যাচ্ছে পাশা। 'আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। মার্সিডিজে লোকটা থাকলে অনুসরণ করবে।'

গাড়ি থেকে নেমে দ্রুতপায়ে এগোল পাশা। হোটেলে গিয়ে ঢুকল।

দেড় ঘণ্টা পর সেন্ট জর্জেসে ফিরল বরাত খান। সুইটের একটা কামরায় পায়চারি করছে পাশা। দরজা খুলে দিয়েই জানতে চাইল, 'খবর কি, মামা?'

'শালাকে নিজের ভিলায় নিয়ে গিয়ে তুলেছে মাদাম দালিয়া,' বলল বরাত খান। 'মালপত্তরসহ। তার মানে, এখন থেকে ওখানেই থাকবে। মাদামের পেয়ারের লোক, বুঝলে না! কিছু জানতে পেরেছ ওর সম্পর্কে?'

'আমেরিকান,' বলল পাশা। 'নাম ওয়েস্টম্যান। মাত্র গতকাল নেমেছে বৈরুতে। কোত্থেকে এসেছে জানো?'

'কোত্থেকে?'

'তেহরান!'

'বলো কি, ভাগ্না! তার মানে, ওয়েস্টম্যানই আমাদের প্রথম সূত্র।'

পরদিন থেকে শুরু হলো ওয়েস্টম্যানের উপর নজর রাখার কাজ। দেখা গেল ওয়েস্টম্যানও সমাজের মগডালে চলাফেরা করে, কাছে ঘেঁষা কঠিন।

ইতোমধ্যে কয়েকদিন পেরিয়ে গেছে। রানা এজেন্সীর লন্ডন শাখা থেকে একটা চিঠি পেল পাশা। 'খারাপ ভাল দু'রকম খবরই আছে,' ঘোষণা করল সে।

'খারাপটা আগে শোনাও,' বলল বরাত খান। 'রি-অ্যাকশন হলে আমাকে সুস্থ করার জন্যে ভালটাকে কাজে লাগিয়ো।'

'গিলটি মিয়া হারিয়ে ফেলেছে আরডেলকে। কুর্দিস্তানের মাঝামাঝি কোথাও গায়েব হয়ে গেছে সে।'

'হুঁ।'

'ভাল খবরটা হলো, আরডেল যেদিন গিলটি মিয়ার চোখে ধুলো দেয় তার আগের দিন তার সাথে একজন লোক দেখা করেছিল। লোকটা কে, বলো তো?'

হাসতে শুরু করল বরাত খান। 'কে আবার, ওয়েস্টম্যান! তেহরান থেকেই তো এসেছে সে।'

'ঠিক ধরেছ,' বলল পাশা। 'এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মাদাম দালিয়ার সাথে আরডেলের একটা সম্পর্ক আছে। এই ব্যাপারটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল, বাকি সবই মাসুদ ভাইয়ের অনুমান।'

'হুঁ,' বলল বরাত খান। 'আচ্ছা, বিগট বাবাজী সম্পর্কে কি যেন বলবে

বলছিলে?'

ওয়েস্টম্যানের সাথে বিগটের যোগাযোগ ক্ষীণ। মাঝখানে অনেকগুলো সেতু রয়েছে। বিগট একজন লোককে চেনে, যে আরেকজন লোককে চেনে, এই আরেকজন লোক চেনে ওয়েস্টম্যানকে। পাশার ধারণা, বিগটকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। তার চেহারাটা তোবড়ানো। চোখ-মুখ দেখে মনে হয় বদমাশের ধাড়ি। সেটাই আশার কথা।

ইতোমধ্যে বিগট সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। সেদিনই সেন্ট জর্জেস ছেড়ে সস্তা একটা হোটেলে আস্তানা গাড়ল ওরা। সন্ধ্যার খানিক আগে গেল আরও সস্তাদরের একটা রেস্তোরাঁয় আড্ডা মারতে।

তথ্য বেচাকেনা বা বেচাকেনার দালালী করে যারা তাদের একটা অভ্যাস, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় সময় কাটানো। এই অভ্যাস রয়েছে বিগটেরও। ওদের আশান্বিত হবার সেটাও একটা কারণ।

বিগটের পৌঁছুবার কথা আটটার দিকে। পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে মামা-ভাগ্নে কথা কাটাকাটি শুরু করে দিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কথা কাটাকাটি পৌঁছুল তুমুল ঝগড়ায়। টেবিলে ঘুসি মেরে একটা গ্লাস ভাঙল বরাত খান এবং হুমকি দিল আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার কাছে যে মহামূল্যবান 'আইডিয়া'টা আছে তা যদি পাশা বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে না পারে, সে ফিরে যাবে জার্মানীতে।

আশপাশের টেবিলে লোকজন নেই, শুধু বিগট এসে বসেছে এইমাত্র। পাশার মুখ থেকে শত সহস্র অনুরোধ বেরুচ্ছে, 'চুপ করো, মামা, চুপ করো! লোকে শুনলে সব্বোনাশ হয়ে যাবে! আস্তে কথা...'

টেবিলে আরেকটা ঘুসি বসাল, সেইসাথে আরেকটা গ্লাস ভাঙল বরাত খান। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'আস্তে কথা বলব? তোমার স্পর্ধা তো কম নয়! দিনের পর দিন বসে আছি, আজ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা করতে পারলে না তুমি—আবার বলছ আস্তে কথা বলো। তুমি আমার ইয়ের ভাগ্না! এই আমার শেষ কথা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা যদি করতে পারো ভাল, তা না হলে রাস্তায় রাস্তায় চেঁচিয়ে বেড়াব—স্মাগলাররা আমার কাছে এসো, স্মাগলাররা আমার কাছে এসো! হুঁহ্!' বলে ঝড়ের বেগে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল বরাত খান।

পাশার দু'চোখে উদ্বেগ, কপালে চিন্তার রেখা, গালে হাত। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল সে। তারপর উঠল।

'মঁশিয়ে!'

বিগটের ডাক কানে যেন মধু বর্ষণ করল পাশার। টোপটা গিলেছে তাহলে বিগট। প্রয়োজনীয় অভিনয়টুকু নিখুঁতভাবেই করল পাশা। প্রথমে কথা বলতেই অস্বীকার করল বিগটের সাথে। বিগট প্রথমে অনুরোধ উপরোধ করল। তারপর জানাল, ওদের কথাবার্তা সবই সে শুনেছে। এরপরও কি বিশদ আলোচনা করতে রাজি নয় পাশা? না, বলল পাশা, ওদের মামা-ভাগ্নের মধ্যে এমন কোন ব্যাপার নেই যা তৃতীয় কারও সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। 'আমি তথ্য

বেচাকেনার দালালী করি,' বিগট জানাল। এবার একটু আগ্রহ দেখাল পাশা। এভাবে চলল আরও কিছুক্ষণ। তারপর দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত শুরু করল কথাবার্তা। পাশা বিগটকে জানাল তারা লেবাননে এসেছে কয়েক মিলিয়ন আমেরিকান ডলার রোজগার করতে। বলল. ওর মামা বরাত খান জার্মানীর একটা মোটর মেকানিক ফার্মে চাকরি করে। আর ও নিজে লন্ডনে সাংবাদিকতা করে। যে ধারণাটা ওরা বিক্রি করতে এসেছে সেটার অরিজিন্যাল মালিক ওর মামা, কিন্তু এই সফরের যাবতীয় খরচ ওর! ব্যবসায়ে যা আয় হবে তা দু'ভাগে ভাগ করে নেবে ওরা মামা-ভাগ্নে। ওদের ধারণাটা, বিগটের প্রশ্নের উত্তরে জানাল পাশা, স্মাগলিং জগতে বিপ্লব ঘটাবে। তাই রুই-কাতলাদের কারও সাথে দেখা করতে চায় ওরা।

বিগট কথা দিল, স্মাগলিং জগতের রাঘব-বোয়ালদের একজনের সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দেবে সে। বিনিময়ে তাকে এক হাজার লেবানীজ পাউন্ড দিতে হবে। পাঁচশো পাউন্ড এখুনি, বাকিটা কাজ শেষ হলে। বোকার মতো আচরণ করাই ঠিক হচ্ছে, ভাবল পাশা। পাঁচশো পাউন্ড দিল বিগটকে। কিন্তু ঠিকানাটা দিতে অস্বীকৃতি জানাল। বলল, 'রোজ সন্ধ্যায় এখানে তুমি পাবে আমাদেরকে।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল বিগট।

পরদিন কিছুই ঘটল না। রেস্তোরাঁয় এলই না বিগট।

তারও পরদিন। সন্ধ্যা। রেস্তোরাঁটায় যাবে বলে কাপড়-চোপড় পরা সবে শেষ করেছে ওরা, এমন সময় নক হলো দরজায়। স্থির হয়ে গেল দু'জনই, পরস্পরের দিকে তাকাল, কুঁচকে উঠল ভুরু। এখানে ওরা আছে তা কারও জানার কথা নয়।

'কে?' হেঁড়ে গলায় জানতে চাইল বরাত খান।

'বিগট।'

দরজা খুলে দিল পাশা। কটমট করে তাকাল বিগটের দিকে। 'আমরা এখানে থাকি তা তুমি জানলে কিভাবে?'

'ওসব কথা থাক,' ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে করিডরের শেষ মাথার দিকে তাকাল সে। 'এক ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছি, তিনি কথা বলবেন তোমাদের সাথে। আমার পাঁচশো পাউন্ড দাও এবার।'

'লাইনের লোক তো?' কামরার ভেতর থেকে উঁকি মেরে করিডরের শেষ প্রান্তটা দেখল পাশা। স্যুট পরা একজন দীর্ঘকায় শ্বেতাঙ্গ দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে। 'এই লোককেই আমরা চাইছি কিনা তা বুঝব কিভাবে? উঁহুঁ, টাকা দেবার আগে ওর সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে,' বলল বিগট। 'কাল রেস্তোরাঁয় গিয়ে বাকি টাকাটা দিয়ে এসো।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে সে।

দরজা ছেড়ে নড়ল না পাশা। তার পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মারছে বরাত খান। দীর্ঘকায় লোকটার সাথে কথা বলছে বিগট। বিগটকে ভাগিয়ে দেবার ভঙ্গিতে লোকটা হাত নাড়ল, তারপর এগিয়ে আসতে শুরু

করল ওদের দিকে।

দরজা ছেড়ে পথ করে দিল ওরা। কামরার ভেতর ঢুকল ছয় ফিট ছয় ইঞ্চি। 'আমার নাম ওয়েস্টম্যান।'

'তোমার চেহারার মত আশা করি পকেটটাও বেশ লম্বা?' জানতে চাইল বরাত খান।

সাথে সাথে পাশা বলল, 'টেকনিক্যাল কোন ব্যাপার ছাড়া মামার কথায় কান দেবে না তুমি, ওয়েস্টম্যান।' কামরায় একটাই মাত্র চেয়ার, সেটা দেখিয়ে আবার বলল পাশা, 'বসো।'

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে চেয়ারটা ঝেড়ে ধুলো পরিষ্কার করে নিল ওয়েস্টম্যান। তারপর বসল। রুমালটা ভাঁজ করার ফাঁকে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে দু'জনকে। 'কিছু নাকি বিক্রি করতে চাও তোমরা? শুরু করো।'

ঝেড়ে কাশল বরাত খান, গলা পরিষ্কার করছে। সাথে সাথে চোখ রাঙাল পাশা। 'কক্ষনো নয়! তোমার বৈষয়িক বুদ্ধি একেবারেই নেই। মি. ওয়েস্টম্যানের সাথে দর কষাকষি করব আমি।'

শুরু হলো বাকযুদ্ধ। ভুরু কুঁচকে গোটা ব্যাপারটা লক্ষ করল ওয়েস্টম্যান। বিরক্তির চিহ্ন ফুটল তার কপালে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আপোস করল বরাত খান। পাশাকে জানিয়ে দিল সে, 'দরদামের ব্যাপারে যে-কোন সিদ্ধান্তে আমার অনুমতি থাকতে হবে, ব্যস!'

'তাহলে শুরু করি,' বরাত খানের পাশে পা ঝুলিয়ে বিছানায় বসল পাশা। তাকাল ওয়েস্টম্যানের দিকে। 'বৈরুত স্মাগলারদের স্বর্গ একথা শুনে এখানে এসেছি আমরা। আমাদের কাছে একটা আইডিয়া আছে, সেটাই আমরা বিক্রি করতে চাই। আইডিয়াটা খুবই চমকপ্রদ এবং মূল্যবান। কিন্তু মুশকিল হলো, ওটাকে কাজে লাগাতে হলে প্রচুর রেস্ত দরকার। আমাদের তা নেই।'

'বেচতে চাও, ভাল কথা,' ওয়েস্টম্যান বলল, 'কিন্তু আইডিয়াটা কি তা না জেনে এক পয়সাও তোমাদেরকে দেবে না কেউ।'

'জানাতে আপত্তি নেই, কি বলো, মামা?'

গম্ভীর বরাত খান পকেট থেকে একটা নস্যির কৌটা বের করে খানিকটা নাকের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। কড়া এক হ্যাঁচ্চো ছেড়ে ঘন ঘন নাক টানল সে। বলল, 'দুনিয়ায় একমাত্র আমার পক্ষেই সম্ভব আইডিয়াটা বাস্তবে পরিণত করা। তবে এর মাধ্যমে খুব বেশি মালামাল পাচার করা সম্ভব হবে না।'

'আচ্ছা,' ওয়েস্টম্যানের দিকে ঝুঁকে পড়ল পাশা, 'আপনারা কি জিনিস পাচার করতে আগ্রহী?'

'ধরো—সোনা।'

বরাত খানের দিকে ফিরল পাশা। 'মামা, একবারে কতটা সোনা পাচার করতে পারবে তুমি?'

'পাঁচশো পাউন্ড।'

ওয়েস্টম্যানের দিকে সাগ্রহে তাকাল পাশা। 'আগ্রহী?'

'সম্ভবত। কিন্তু, মাধ্যমটা কি?'

'সাগর থেকে তীরে পাঠাবার জন্যে এই মাধ্যমকে ব্যবহার করা যাবে। টর্পেডোর সাহায্যে।' বলল বরাত খান।

'অযথা আমার সময় নষ্ট করলে তোমরা,' উঠে দাঁড়াল ওয়েস্টম্যান। 'দুঃখিত।'

'কি হলো! সব কথা না শুনেই চলে যাবে?'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ওয়েস্টম্যান। 'এর আগেও টর্পেডো কাজে লাগাবার চেষ্টা হয়েছে। কোন লাভ হয়নি। দুঃখিত, ভায়ারা, এ থেকে তোমরা কিছুই পাবে না।'

'এমনও তো হতে পারে যে,' ব্যঙ্গের সুরে বলল বরাত খান, 'আপনারা হয়তো ভুল টর্পেডো ব্যবহার করেছিলেন?'

বরাত খানের দিকে ফিরল ওয়েস্টম্যান। সামান্য কৌতূহল প্রকাশ করল সে। 'তোমরা কি ধরনের টর্পেডো ব্যবহার করার কথা ভাবছ?'

মৃদু হাসল বরাত খান। 'তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। একটা টর্পেডো জোগাড় করতে পারবেন?'

একটু ভাবল ওয়েস্টম্যান। 'জোগাড় করা কঠিন নয়। কিন্তু কি লাভ? শোনোনি, অস্ট্রিয়ান-ইটালিয়ান বর্ডারে টর্পেডো ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছিল একবার? ছোট্ট একটা লোক। আসলে, যেগুলো জোগাড় করা যায় সেগুলোর দূর-পাল্লায় পাড়ি দেবার রেঞ্জ নেই। যেগুলোর রেঞ্জ আছে সেগুলো জোগাড় সম্ভব নয়।'

'কি ধরনের টর্পেডো জোগাড় করতে পারবে তুমি?' জানতে চাইল বরাত খান। 'ব্রিটেনের মার্ক ইলেভেন?'

'তা পারব। খোলা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ওগুলোর ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ তিন মাইল। ওতে কাজ হবে না।'

ওয়েস্টম্যানের মুখের সামনে চুটকি বাজাল বরাত খান। চমকে উঠে কটমট করে তাকাল ওয়েস্টম্যান। নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকল বরাত খান। হাসছে। 'একটা মার্ক ইলেভেনই জোগাড় করে দাও আমাকে। ওটাকে যদি আমি পনেরো মাইল দৌড় খাটাতে না পারি, পনেরো মাইল নাকে খত্ দেব।'

ঝট্ করে পাশার দিকে ফিরল ওয়েস্টম্যান। 'তোমার মামার মাথা ঠিক আছে তো? নাকি মদ খেয়েছে?'

'তুমি কার সাথে কথা বলছ, জানো?' মুচকি হেসে বলল পাশা। 'আমার মামা বরাত খান রয়্যাল নেভীর সবচেয়ে ওস্তাদ টর্পেডো মেকানিক ছিল। একটা মার্ক ইলেভেনকে পনেরো মাইল দৌড় খাটানো ওর পক্ষেই শুধু সম্ভব।'

ঝাড়া দশ সেকেন্ড বরাত খানের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ওয়েস্টম্যান। তারপর ধীরে ধীরে আবার বসল চেয়ারে।

একনাগাড়ে দুই ঘণ্টা চলল আলোচনা। বিদায় নেবার আগে ওয়েস্টম্যান ওদেরকে দশ হাজার লেবানীজ পাউন্ডের একটা চেক দিয়ে গেল। জানাল, যথা শিগ্‌গির বসের সাথে ওদের দেখা করার ব্যবস্থা করবে সে।

তিন দিন পরের এক সন্ধ্যা। অভিজাতদের রাত্রিকালীন আড্ডা, পাওন রুজ। ঘড়ির কাঁটা ধরে রাস্তার নির্দিষ্ট একটা জায়গা থেকে ওদেরকে তুলে নিয়ে এসেছে একটা মার্সিডিজ। ক্লাবের বারে ওদের ঢুকতে দেখে পাশে বসা অপরূপ সুন্দরী মাদাম দালিয়াকে নিচু গলায় কি যেন বলল ওয়েস্টম্যান। তারপর উঠে দাঁড়াল।

কাছে এসে থামল ওরা। লোমশ একটা হাত লম্বা করে দিয়ে কাল্পো পিস্তলের মত তর্জনীটা মাদাম দালিয়ার দিকে তাক করল বরাত খান, তাকিয়ে আছে ওয়েস্টম্যানের দিকে। 'এই ভদ্রমহিলা···একজন ভদ্রমহিলা তোমার বস্?' কণ্ঠে বিস্ময়ের সাথে নৈরাশ্যের খাদ মেশানো।

জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল ওয়েস্টম্যান। মাদাম দালিয়ার সাথে ওদ্দের পরিচয় করিয়ে দিল।

গোলাপী রঙের ম্যাক্সি পরে আছে মাদাম দালিয়া। পোশাকটা শুরুই হয়েছে গলার ঠিক ছয় ইঞ্চি নিচে থেকে। 'ছুকরি সেজেছে,' পাশার কানে কানে বলল বরাত খান, 'কিন্তু যাই বলো, ভায়া, বেড়ে মানিয়েছে, ঠিক যেন টকটকে পাকা গোপালভোগ!'

'বসো তোমরা,' হাসিমুখে বলল মাদাম দালিয়া। নিজের পাশের চেয়ারটা চোখ-ইশারায় গোলাম পাশাকে দেখাল সে।

প্রায় ধাক্কা মেরে পাশাকে সরিয়ে দিয়ে সেই চেয়ারটায় বসে পড়ল বরাত খান। তিন সেকেন্ড অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর মাদাম দালিয়ার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল পাশা। হাসি চাপবার চেষ্টা করছে ওয়েস্টম্যান।

'জ্যাক যা বলেছে তা যদি সত্যি হয়,' বলল মাদাম দালিয়া, 'তাহলে সত্যি তোমরা খুব দামী লোক। সেক্ষেত্রে তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক হওয়া সম্ভব। কিন্তু, আমি প্রমাণ চাই।'

পঁচিশ গজ দূরে কলকল করছে ভূমধ্যসাগর। আওয়াজটাকে ছাপিয়ে উঠল বরাত খানের হাসি। 'সাগর সামনেই রয়েছে, সরঞ্জাম জোগাড় করো, প্রমাণ করে দিই।'

'আমার এক বন্ধু সাবমেরিনে চাকরি করে,' বলল মাদাম দালিয়া। 'মার্ক ইলেভেন সম্পর্কে তার ধারণা কিন্তু মোটেও উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়।'

'১৯৪৪ সালে তৈরি হয়েছিল মার্ক ইলেভেন,' বলল বরাত খান। 'লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি দিয়ে চালানো হত। তারপর কেটে গেছে তিনটে যুগ। এর মধ্যে নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার হয়েছে। আজকের ক্যালিয়াম সেল—মার্কারি-অক্সাইড জিঙ্ক—অনেক, অনেক বেশি পাওয়ারফুল।'

গভীর মনোযোগের সাথে বরাত খানের কথা শুনছে দালিয়া।

'এবং, এই পাওয়ার তুমি দু'ভাবে ব্যবহার করতে পারো, মাদাম,' আবার বলল বরাত খান। 'রেঞ্জ বাড়াতে পারো, আবার স্পীডও বাড়াতে পারো। আমি এই দুই কাজের জন্যেই সার্কিটের ডিজাইন তৈরি করেছি।'

'আমরা রেঞ্জ বাড়াতে আগ্রহী,' বলল ওয়েস্টম্যান।

'মার্কারি সেলের ব্যবস্থা করো। খুব কিন্তু দামী ওগুলো।'
'তবু কত?'
একটু চিন্তা করল বরাত খান। তারপর মুখ তুলল, বলল, 'একটা টর্পেডো ছুঁড়তে শুধু পাওয়ারের পিছনেই খরচ পড়বে প্রায় পাঁচ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং।'
'টর্পেডো কিনতে লাগবে আরও ছয় হাজার,' বলল ওয়েস্টম্যান। 'সারপ্লাস মার্কেটে মার্ক ইলেভেন এখন এই দামে বিকোচ্ছে।'
ওয়েটার এসে টেবিলে পানীয় সাজিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।
'খরচ যাই পড়ুক,' বলল মাদাম দালিয়া। 'আমি ভাবছি শেষ পর্যন্ত ডিম পাড়বে তো আইডিয়াটা?'
'ঠিকমত তা দিলে আলবৎ ডিম পাড়বে!' জোরগলায় বলল বরাত খান।
'না হয় তাই ধরে নিলাম,' শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল মাদাম দালিয়া। 'এ থেকে কতটুকু কি আশা করো তোমরা?'
'লাভের অংশ,' বলল পাশা।
'আইডিয়াটা তো তোমার মামা বরাত খানের,' বলল ওয়েস্টম্যান। 'তুমি এর মধ্যে আসছ কিভাবে?'
'আইডিয়া মামার, কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট আমার,' বলল পাশা। 'আমার খরচে এবং তত্ত্বাবধানে বৈরুতে এসেছে মামা। আমাদের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেছে, আইডিয়াটার দাম হিসেবে যা পাব তা আধাআধি বখরা হবে। কিন্তু, এসব বাজে প্রশ্ন কেন? তোমরা কি দামে কিনতে চাও সেটা বলো।'
মৃদু কণ্ঠে মাদাম দালিয়া বলল, 'সোনা পাচারের ব্যবসা কিন্তু তেমন লাভজনক নয় আর আজকাল।'
'ঠিক,' বলল পাশা। 'এবং সেজন্যেই তোমরা সোনা পাচারের ব্যবসা করো না। করো হেরোইন পাচারের ব্যবসা।'
ঝট্ করে ওয়েস্টম্যানের দিকে তাকাল মাদাম দালিয়া। তারপর পাশার দিকে ফিরল। 'কিভাবে জানলে?' আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল সে।
'দুয়ের সাথে দুই যোগ করে। লন্ডনে কানাঘুষা শুনেছি—শুনেই তো এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিই আমরা।'
'কত চাও তোমরা?' ওয়েস্টম্যানের প্রশ্ন।
'লাভের শতকরা বিশ ভাগ।'
খিলখিল করে হেসে উঠল মাদাম দালিয়া। তার বুক দুলল, চুল কাঁপল। 'কী বোকা লোক এরা!' ওয়েস্টম্যানের দিকে ফিরল সে। 'ওদেরকে জানিয়ে দাও, থোক কিছু টাকার বিনিময়ে আইডিয়াটা যদি বিক্রি করে, আমরা কিনতে পারি।'
'কত টাকা দিতে চান শুনি?' জানতে চাইল পাশা।
'ধরো, এক লাখ মার্কিন ডলার।'
'প্রত্যেককে?'
এক সেকেন্ড ইতস্তত করল মাদাম দালিয়া। 'অবশ্যই।'
ঢোক গিলে গলাটাকে ভিজিয়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করল পাশা। আবার মুখ

খুলতে বিশ সেকেন্ড সময় নিল সে। আড়চোখে লক্ষ করল বিস্ফারিত হয়ে গেছে বরাত খানের চোখজোড়া। 'উঁহু, রাজি নই। দুই লাখের কমে বেচব না আমরা। মোট চার লাখ দিতে হবে।'

'আসলেই তোমরা বোকা,' হাসছে মাদাম দালিয়া। 'আচ্ছা, আইডিয়াটা তো দিয়ে ফেলেছ, তোমাদেরকে ছাড়াই যদি ওটাকে কাজে পরিণত করি?'

'পারবে না। আমি ছাড়া দুনিয়ার কেউই আইডিয়াটাকে কাজে লাগাতে পারবে না।'

'ঠিক,' বলল পাশা। 'মুরগির দাঁতের মতই দুষ্প্রাপ্য এক জিনিয়াস আমার মামা। শুধু ওঁর পক্ষেই সম্ভব।'

'ঠিক আছে, এসো, একটা রফা করা যাক,' মাদাম দালিয়া চুমুক দিয়ে গ্লাসটা শেষ করে নামিয়ে রাখল টেবিলে। এটা ফিলটার সিগারেট ধরাল সে। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল পাশার দিকে। 'দেড় লাখ করে প্রত্যেকে পাবে। মোট তিন লাখ। এর চেয়ে এক পয়সাও বেশি নয়। এক লাখ তোমাদের নামে এখানকার কোন ব্যাঙ্কে জমা থাকবে, বাকি দুই লাখ কাজ শেষ হলে পাবে। রাজি?'

বরাত খানের দিকে ফিরল পাশা, 'মামা?'

বরাত খান ঢোক গিলল। 'ঠকা হয়ে যাচ্ছে না?'

'এর চেয়ে ভাল দাম আর কেউ দেবে না,' বলল ওয়েস্টম্যান। 'আমরাই সবচেয়ে বড় পার্টি, মনে রেখো।'

'ঠিক আছে,' চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে ছাড়ল পাশা। 'আমরা রাজি।'

ভুরু নাচাল মাদাম দালিয়া, 'এই শুভক্ষণে আমি তোমাদের একজনের সাথে নাচতে চাই,' পাশার দিকে তাকাল সে। পাশা চেয়ার ছাড়ছে দেখে হাসল। পরমুহূর্তে দুষ্টামিটা ধরা পড়ল তার। 'মি. বরাত খানের সাথে নাচতে পারলে খুশি হব আমি।'

'ইয়াহু!' বলে টেবিলে কড়া এক চাপড় মেরে উঠে দাঁড়াল বরাত খান। তাকে নিয়ে ড্যান্স ফ্লোরে চলে গেল মাদাম দালিয়া। ওয়েস্টম্যান বলল, 'তোমার সম্পর্কে লন্ডনে খবর নিয়েছি আমরা। নিজের সম্পর্কে সব সত্যি কথাই বলেছ। বরাত খানের ব্যাপারে কোন তথ্য এখনও এসে পৌঁছোয়নি আমাদের হাতে। সে যাক,—আচ্ছা, কানাঘুষার কথা বলছিলে, ব্যাপারটা কি? ঠিক কি শুনেছ তোমরা লন্ডনে? কার কাছ থেকে শুনেছ?'

'নির্দিষ্ট কারও মুখ থেকে সব কথা শুনিনি আমরা,' বলল পাশা। 'এখান থেকে একটা কথা, ওখান থেকে একটা—সবগুলো কথা যোগ করে বুঝেছিলাম লেবাননই হলো আমাদের আইডিয়া বিক্রি করার আদর্শ জায়গা।'

নানান প্রশ্ন ওয়েস্টম্যানের। সন্দেহমুক্ত হতে চাইছে সে। আধঘণ্টা পর বরাত খানকে সাথে নিয়ে ফিরে এল মাদাম দালিয়া। বলল, 'পাশা, তোমার মামা আধুনিক নাচের কিছুই জানে না। নাচতে গিয়ে আর একটু হলে ধর্ষিতা হতে যাচ্ছিলাম। চলো, তোমাকে নিয়ে ট্রাই করি এবার।'

'ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তার উল্টো, ভাগ্না,' ধপ্ করে চেয়ারে বসে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে বরাত খান।

ড্যান্স ফ্লোরে চলে গেল ওরা। পাশার কানের লতিতে ঠোঁট ঠেকিয়ে মাদাম দালিয়া ফিসফিস করে বলল, 'তোমাকে আমি ভারি সুখী করব, বিলিভ মি। তোমাকে···মানে, তোমার লোহার মত পেটা এই শরীরটাকে আমার খু-উ-ব ভাল লেগেছে!'

'ম্যান ইটার অভ লেবানন,' বলল পাশা।

'থ্যাঙ্কিউ ভেরি মাচ,' খিলখিল করে হাসল মাদাম দালিয়া, 'ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট।'

পাওন রুজে রাত দুটো পর্যন্ত আনন্দ-উৎসবে মেতে থাকল ওরা। ডিনার খেল, ক্যাবারে দেখল। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে সবাই উঠে বসল মার্সিডিজে। গাড়ি ছেড়ে দিল ওয়েস্টম্যান।

পেছনের সীটে একপাশে বরাত খান ও আরেক পাশে পাশাকে নিয়ে বসেছে মাদাম দালিয়া। গাড়ির ভেতর অন্ধকার। রাস্তার একপাশে সাগর। 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের?' জানতে চাইল বরাত খান।

'গেলেই দেখতে পাবে,' অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল মাদাম দালিয়া।

বৈরুত ছেড়ে এল গাড়ি। এখন ওরা ত্রিপোলিতে। কেন, কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছে না ওরা।

প্রকাণ্ড একটা কাঠের গেটের সামনে থামল গাড়ি। একজন লোক খুলে দিল সেটা। লোকটার চেহারা দেখে পাশা ধারণা করল, আরব। মস্ত উঠানে ঢুকল মার্সিডিজ। একধারে থামল।

নিচে নেমে চারদিকে তাকাল ওরা। কিছুই ভাল দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে। দু'চারটে ছড়ানো ছিটানো তারা নিয়ে মাথার উপর বিশাল আকাশ, তার গায়ে একটা শেডের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। পিছনে চাঁদের আলো গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ফুঁসছে উত্তাল সাগর। 'এদিকে, আমার সাথে,' বলল ওয়েস্টম্যান!

তাকে অনুসরণ করে একটা অফিসে ঢুকল ওরা। আলো জ্বলতেই নিজের সুটকেসটা দেখতে পেল বরাত খান দেয়ালের কাছে। 'ব্যাপারটা কি···?'

'এখানে তোমরা আমাদের অতিথি,' বলল ওয়েস্টম্যান। 'পাশের কামরায় দুটো বিছানা আছে। আলী তোমাদের রান্নাবান্না করে দেবে।'

বরাত খান ও পাশার পিঠে হাত রাখল মাদাম দালিয়া। 'এক্সপেরিমেন্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকছ তোমরা। কত সময় লাগবে তোমরাই জানো। গল্প করতে মাঝেমধ্যেই আসব আমি। বরাত খান, কদ্দিন সময় চাও তুমি?'

'যন্ত্রপাতি জোগাড় করো, দু'হপ্তার মধ্যে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব,' বলল বরাত খান। 'সবচেয়ে আগে একটা টর্পেডো চাই।'

'আমার সাথে এসো তুমি,' অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মাদাম দালিয়া। তাকে অনুসরণ করল বরাত খান।

উঠান পেরিয়ে প্রকাণ্ড শেডের ভেতর ঢুকল ওরা। ওদের সঙ্গ নিল আলী।

প্ল্যাটফর্মে চড়ল তিনজন। নিচে ওয়ার্কশপ। সেদিকে তাকাতেই মুহূর্তের জন্যে দম আটকে গেল বরাত খানের। 'বাপরে বাপ!' আঁতকে উঠল সে।

উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে টর্পেডোটা। সম্মোহিতের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকল বরাত খান।

চার

লাল কালির দাগে ক্ষতবিক্ষত হলো মানচিত্রটা। কুর্দিস্তান চষে ফেলাই সার হলো গিলটি মিয়ার। আরডেলের টিকিটিরও সন্ধান পায়নি সে। অয়্যারলেসে নির্দেশ দিয়ে পরিচালনা করছিল রানা তাকে। গিলটি মিয়ার অভিযান অশ্বডিম্ব প্রসব করছে বুঝতে পেরে ফিরিয়ে আনল তাকে তেহরানে। মাঝখানে গায়েব হয়ে গেছে বেশ ক'টা দিন।

পরদিন সকালে রানা এজেন্সীর অফিসে আলোচনা। আরডেলকে হারিয়ে ফেলার অপরাধবোধ এবং পরে তাকে খুঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতা অস্বাভাবিক গম্ভীর করে তুলেছে গিলটি মিয়াকে।

'প্যারিস ত্যাগ করার আগে আরডেল একটা ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্মে গিয়েছিল, মনে আছে তোমার?' ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিল রানা। ডেস্কের ওধারে একটা চেয়ারে বসে আছে ও। এধারের একটা চেয়ারে বসেছে খায়ের। কামরার একধারে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে গিলটি মিয়া।

'জী, স্যার,' বলল খায়ের। 'মনে আছে।'

'ওই ফার্মের কাছ থেকে আরডেলের ঠিকানা পাওয়া সম্ভব,' বলল রানা। 'আমার ধারণা ওদের কাছ থেকে প্রচুর কেমিক্যালস কিনেছে আরডেল অর্ডারের সাথে একটা ঠিকানাও থাকার কথা, তা নাহলে অর্ডারের মাল ডেলিভারি দেবে কোথায়?'

'কিন্তু, স্যার ঠিকানাটা ওরা দেবে কেন?'

'চাইলে দেবে না,' বলল রানা। 'তাই অন্য কোন উপায়ে অর্ডার বুকটা হাত করা যায় কিনা ভাবছি।'

মুহূর্তে কান দুটো খাড়া হয়ে গেল গিলটি মিয়ার। আড়চোখে তাকাল রানা, দেখল, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গিলটি মিয়ার মুখ।

'তোমার কিছু বলার আছে এ ব্যাপারে?' সরাসরি তাকাল রানা।

'জী, স্যার, আচে,' দ্রুত গম্ভীর হলো আবার গিলটি মিয়া। 'ফার্মটার সামনে লিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিন আমাকে, দু'ঘণ্টার মদ্যে অর্ডার বুকটা বগলদাবা করে লিয়ে আসচি।'

'চুরি?' খায়ের বিমূঢ়।

'ভাল করে ভেবে দেখেছ? পারবে তো?' জানতে চাইল রানা।

একটা হাত বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে মোগল আমলের কায়দা অনুকরণ করে কুর্নিশ করল গিলটি মিয়া। বিড়বিড় করে বলল, 'জাঁহাপনার আশীর্বাদ থাকলে অবশ্যই পারব, হুজুর,' খায়ের এবং রানা শুধু একটি শব্দ শুনতে পেল—পারব।

'তৈরি হয়ে নাও,' বলল রানা। 'আধঘণ্টার মধ্যে রওনা হচ্ছ তোমরা।'

এতক্ষণে সিধে হয়ে দাঁড়াল গিলটি মিয়া। ঘুরে দাঁড়াল। দরজার দিকে এগোচ্ছে।

'দাঁড়াও,' বলল রানা। 'অর্ডার বুকটা চুরি করে আনলেই হবে না, ওটা আবার ঠিক জায়গায় রেখেও আসতে হবে। পারবে?'

'জাঁহাপনার আদেশ পেলে তাও সম্ভব, হুজুর,' এবারও শুধু 'সম্ভব' শব্দটা কানে ঢুকল ওদের।

আবার যাত্রা হলো শুরু। কটা রঙের পাহাড়। রাস্তার উপর বাতাসের প্রচণ্ড উপদ্রব। প্রতি ইঞ্চিতে বিপদ, প্রতি বাঁকে ভয়। এদিকের রাস্তায় ঘুরপাক খেয়েছে এর আগে গিলটি মিয়া, তাই সেই চালাচ্ছে ল্যান্ডরোভার। নেভিগেশনের দায়িত্বে রানা। ম্যাপের গায়ে ছোট্ট একটা বিন্দুর উপর ওর চোখ, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে এই বিন্দুতে পৌঁছুতে হবে ওদের।

মুশকিল হলো, ভাবছে রানা, ম্যাপটা মোটেও সাহায্য করছে না। এদিকের রাস্তাঘাটের কোন চিহ্নই নেই ম্যাপে। আর রাস্তারও বলিহারি। মাঝেমধ্যেই গাড়ি ব্যাক করে বিপরীত দিকে এগোতে হচ্ছে ওদেরকে, অন্য কোন পথ ধরে সামনে এগোবার উপায় খোঁজার জন্যে।

খুব ধীরে হলেও এগোচ্ছে ওরা। এই এগোবার কাজে ডজন কয়েক রাস্তা ব্যবহার করা হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। আসলে রাস্তা বা পথ নামে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই এদিকে। সবটাই অনুমান এবং কল্পনার বাহাদুরি। অপেক্ষাকৃত কম উঁচুনিচু, কম বিপজ্জনক কোন জায়গা পেলেই সেদিকে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিচ্ছে ও গিলটি মিয়াকে। উঁচু পাহাড় আর নিচু খাদের মাঝখানে লম্বা, শক্ত পাথরের ঝুল-বারান্দা, মেঝেতে নুড়ি ছড়ানো। কোথাও দিগন্তবিস্তৃত সমভূমির মাঝখানে টানা একটা চওড়া দাগ। হাজার হাজার বছর ধরে উট চলাচলের ফলে তৈরি হয়েছে এই রাস্তা। এই পাহাড়ী পথগুলো ধরেই পারস্য জয় করতে এসেছিলেন আলেকজান্ডার। রানার মনে হলো, সেই থেকে একবারও মেরামত করা হয়নি রাস্তাগুলো।

যাযাবর কুর্দদের কয়েকটা খণ্ডদলের সাথে দেখা হলো ওদের। সবুজ খুঁজছে তারা। কিন্তু ঊষর পার্বত্য এলাকায় কোথায় তারা গাছপালার দেখা পাবে ভেবে পেল না রানা। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় প্রাণের কোন চিহ্নমাত্র নেই। শুধু নির্মম পাথরের রাজত্ব। গোটা এলাকাটা রোদের তাপে পুড়ে বিবর্ণ।

আরেকবার ম্যাপটা চেক করে নিয়ে পিন দিয়ে আটকানো তিনটে কাগজ বের করল রানা বুকপকেট থেকে। গিলটি মিয়ার চুরি করে আনা অর্ডার বুক থেকে এই কাগজগুলোয় টুকে নেয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় তথ্য। তথ্যগুলো পাবার

পর থেকে চিন্তায় আছে রানা। আরডেল কেমিক্যালের অর্ডার বুক করেছে, তা সে আগেই অনুমান করেছিল। কিন্তু তার পরিমাণ যে এত বেশি হতে পারে, কল্পনাও করতে পারেনি।

মেথিলিন, ক্লোরাইড, বেনজিন, অ্যামল অ্যালকোহল, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং ফার্মাসিউটিক্যাল লাইমের যা পরিমাণ তা দিয়ে কাঁচা আফিম থেকে কম করেও দুই টন মরফিন তৈরি করা যাবে।

দুই টন মরফিন!

গায়ে কাঁটা দিচ্ছে রানার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেআইনী বাজারে পুরো এক বছরের চাহিদাও দুই টন নয়। তার মানে এই মরফিন ওখান থেকে বিলি হবে দুনিয়ার সর্বত্র। নানান হাত ঘুরে মন দুয়েক পৌছোবে গিয়ে বাংলাদেশে। চড়া দামে বিক্রি হবে কয়েক সহস্র ভাগ্যহত বাঙালি তরুণ-তরুণীর কাছে।

ভাবছে রানা। দুই টন মরফিনের দাম কত? মাদাম দালিয়া কতবড় ধনী? একশো পাউন্ড মরফিনের দাম ফাইভ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, পঞ্চাশ লাখ ডলার। মাথা ঘুরছে। প্রায় বাইশশো পাউন্ডে এক টন। মনে মনে হিসাব কষছে রানা। এগারো কোটি ডলারের উপর পড়ে এক টন মরফিনের দামই।

'শেখ, তারপর কি যেন নাম লোকটার, স্যার?' জানতে চাইল গিলটি মিয়া। 'আর কদ্দুর তার রাজ পেরসাদ?'

'শেখ ফারাজী,' ম্যাপে চোখ রাখল রানা। 'সামনে বড় কোন বাধা না থাকলে ঘন্টাখানেকের মধ্যে পৌছে যাব।'

দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে গিরিপথটা। বিশ মিনিটের উপর ওর ভেতর ঢুকেছে ল্যান্ডরোভার। পিছনে ঘোর অন্ধকার। হেডলাইট জ্বেলে এগোচ্ছে ওরা। মাথার উপর পাথরের সিলিং, ফাঁক-ফোকর কিছুই নেই। 'ফাঁদে এঁটকে গেলুম না তো, স্যার?'

দূরে দিনের আলো দেখা গেল। 'অফ করে দাও হেডলাইট। স্পীড কমাও।'

ক্রমশ উঠে গেছে রাস্তাটা। একফালি নীল ফিতের মত আকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

মাথার উপরের পাথুরে সিলিংটা পিছিয়ে পড়ল। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দুপুর। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। উইন্ডস্ক্রীনে ধুলোর আস্তরণ। হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল রানার শরীর। 'রিভার্স, গিলটি মিয়া!' দ্রুত বলল ও। 'জলদি!'

দিগন্তরেখা দেখতে পেয়েছে রানা। বিদ্যুদ্বেগে গিয়ার বদল করে ফেলল গিলটি মিয়া। হেলেদুলে, লাফাতে লাফাতে পিছিয়ে আসছে ল্যান্ডরোভার। থামল!

'দরজা বন্ধ করার সময় শব্দ কোরো না।' নিজের দিকের দরজা খুলে লাফিয়ে নামল রানা। রাস্তা থেকে একপাশে সরে গিয়ে বড় বড় পাথরের মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। হাত দশেক এগিয়ে থামল। ধীরে মাথা তুলে তাকাল।

নিচে বিশাল উপত্যকা। ব্যাকগ্রাউন্ডে গম্ভীর চেহারার বিবর্ণ পাহাড়ের

সারি। উপত্যকার মাঝখানে সবুজ একটা মাঠের মত। ফসল ফলেছে। মাথা তুলে আছে গাছ-পালা। মাঝখানে মাটির ঘরবাড়ি। ছাদগুলো সমতল। তীক্ষ্ণ চোখে জায়গাটা দেখে নিল রানা। ভাবল, হয় এটা একটা ছোট্ট গ্রাম, নয়তো বড়োসড়ো একটা ফার্ম। শেখ ফারাজীর আস্তানা। কৃষিকাজে লাগে না এমন সব কেমিক্যালের অর্ডার এই লোকই দিয়েছে। এখানেই আরডেলের সন্ধান পাবে বলে আশা করছে ও।

তাল সামলাতে এদিক ওদিক বেঁকে যাচ্ছে গিলটি মিয়া। নুড়ি পাথরের উপর পা ফেলে এগিয়ে আসছে সে। রানার পাশে এসে হাঁটু মুড়ে বসল। কপালে হাত রেখে রোদ ঠেকিয়ে দেখল উপত্যকাটা। 'ব্যাটাদের ওপর দিয়ে বহুত মুসিবত গেচে।'

'মানে?'

'দেকতে পাচ্চেন না, স্যার?' বলল গিলটি মিয়া। 'ওগুলো কি?' গ্রামটার দিকে তর্জনী তুলল সে। তারপর আঙুলটাকে ধীরে ধীরে দূর পাহাড়ের দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। 'ওই গর্তগুলো। বোম মেরেচে কেউ।' আবার গ্রামের দিকে তর্জনী ধরল সে। 'বড়ো দালানটার গায়ের কাচেও একটা বোম পড়েচে—দেখতে পাচ্চেন?'

বিস্মিত হলো রানা। তাই তো! গ্রাম থেকে একসার বড় আকারের গর্ত দূর পাহাড় পর্যন্ত চলে গেছে। গর্তগুলো দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে উঁচু পাড়গুলো। আকাশ থেকে বোমা না ফেললে এ ধরনের গর্ত হতে পারে না। কিন্তু বোমা কেউ ফেলবে কেন এখানে? ফেললে একমাত্র ইরানীয়ান এয়ারফোর্স ফেলতে পারে। কিন্তু কেন?

খুঁটিয়ে দেখল আবার রানা। বোমা যদি হয়ও ওগুলো তেমন বড় ছিল না। তবে, কেন যেন মনে হচ্ছে গর্তগুলো বোমার ফলে তৈরি হয়নি। কি যেন একটা মনে পড়বে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু মনে পড়ছে না।

মাথার পেছনটা চুলকে নিয়ে গিলটি মিয়া জানতে চাইল, 'এ্যাকোন, স্যার?'

দ্রুত চিন্তা করল রানা। দশ সেকেন্ডের মধ্যে মাথা কাত করল আপন মনে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। 'বসতিটায় যাচ্ছি আমরা। মনে রেখো, আমরা গোল্ডেন ফিল্ম কোম্পানির অ্যাডভান্স ইউনিট। ছবির লোকেশন বাছাই করতে এসেছি। আর নতুন শেখা আরবী বিদ্যা জাহির করতে যেয়ো না!'

'জ্বী, স্যার!' বলল গিলটি মিয়া, কিন্তু মনে মনে বলল, 'হুঁহ্!'

ঢেউ খেলানো রাস্তা নেমে গেছে উপত্যকায়। উর্বর মরুদ্যানের সবুজ রঙে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে ওদের। কয়েকটা খুদে মাঠে কিছু বোনা হয়নি, বাকিগুলোয় ফসল ফলেছে। 'স্যার, দেক্‌লে আপনি চিনতে পারবেন আপিম গাচ?'

'কই, দেখছি না তো,' বলল রানা। 'দাঁড়াও একটু—ওদিকে নিয়ে যেতে পারবে গাড়ি?' সামনে হাত তুলে বলল রানা।

'খুব পারবো,' রাস্তা থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরে তুলে ফেলল ল্যান্ডরোভারকে

গিলটি মিয়া। আবার লম্ফঝম্প শুরু করল গাড়ি। 'কোতায় যেতে চাইচেন, স্যার?'

'তোমার বোমাগুলো কি রকম গর্ত করেছে দেখতে চাই,' ব্যাপারটা চিন্তিত করে তুলেছে রানাকে। কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে।

কাছের একটা গর্তের দিকে গাড়ি চালাচ্ছে গিলটি মিয়া। খানিকটা দূরে থাকতে ব্রেক কষল সে। নিচে নামল রানা। দূরে, বসতিটার দিকে তাকাল। পঞ্চাশ গজ পর পর একটা করে গর্ত, গ্রামের বড় বিল্ডিংটার দিকে চলে গেছে। আরও দূরে, গ্রাম ছাড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে গর্তের সারিটা। পা বাড়াল রানা। উঁচু নরম পাড় বেয়ে উপরে উঠে গর্তের ভেতর তাকাল। হেসে ফেলল ও।

উঁকি মেরে গর্তের ভেতরটা দেখে ঢোক গিলল গিলটি মিয়া। একটা ছোট্ট পাথর কুড়িয়ে নিল রানা। গর্তের ভেতর ছাড়ল সেটা। দীর্ঘক্ষণ কোন শব্দ এল না। তারপর অস্পষ্ট একটা শব্দ উঠে এল—টুপ্!

'কুয়ো!' বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে গিলটি মিয়ার চোখ। একবার গ্রামের দিকে, আরেকবার দূর পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে। 'এতো কুয়ো খোঁড়ার কারণ কি, স্যার? এখানকার লোকেরা শুধু পানি খেয়ে বাঁচে নাকি?'

'আরে দূর!' বলল রানা। হাসছে। 'কুয়ো কে বলল? এটা একটা কানাত।'

'কি?'

'কানাত—মাটির নিচে খাল। পাহাড়ী নদী থেকে জোয়ারের সময় এই খালে পানি আসে। কানাত সম্পর্কে কোথাও পড়েছিলাম, কিন্তু মনে পড়ছিল না। ইরানে দুই হাজার মাইল লম্বা কানাতও আছে।'

'বলেন কি, স্যার! তা, এদের মগজে এমন উল্টো বুদ্ধি কেন? মাটির নিচে খাল—আমার কিন্তুক হাসি পাচ্চে।'

'হেসো না,' বলল রানা। 'শুনলে ওরা তোমাকে গর্দভ ভাববে। তিন হাজার বছরের পুরানো এই কানাত। রোদের তাপে পানি যাতে বাষ্প হয়ে উড়ে না যায় তাই মাটির নিচে খাল কাটে এরা। গর্তগুলো আসলে ভেন্টিলেটর—মেরামতের কাজ করার জন্যে এই পথ দিয়েই ওঠানামা করা হয়।'

'মুশকিল আসান হয়েচে,' বলল গিলটি মিয়া। 'চলুন, তবে যাওয়া যাক।'

গাড়ি নিয়ে রাস্তায় ফিরে এল ওরা। গ্রামের দিকে হেলেদুলে এগোচ্ছে ল্যান্ডরোভার। বাড়িঘরগুলো প্রায় সবই একতলা, দেখে ভাবল রানা, সার্চ করতে সুবিধে হবে। কাছাকাছি পৌঁছে দেখল ছাগল চরাচ্ছে রাখাল বালক। গাড়ির শব্দে তাকাল। খুব একটা অবাক হলো না। হাতের লাঠিটা নাড়ল শুধু। এরা গাড়ি দেখে অভ্যস্ত, ভাবল রানা। বড় দোতলা বিল্ডিংটাও মাটির তৈরি। গায়ে সাদা চুনকাম। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ধাড়ি মুরগি ঘোরাফেরা করছে আশপাশে।

বিল্ডিংটার গা ঘেঁষে গ্রামের ভেতর ঢুকল গাড়ি। ছেলেপিলের দল চারদিক

থেকে ছুটে এসে পিছু নিয়েছে। তীক্ষ্ণ গলার শোরগোলে গোটা গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। গাড়ি দেখা মাত্র মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মেয়েরা দরজার ভেতর।

গাড়ি দাঁড় করাল গিলটি মিয়া। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের বাহিনী ঘেরাও করল ওদেরকে। হাত তুলে মার দেবার ভঙ্গি করে নিচে নামল গিলটি মিয়া। ভিড় ঠেলে রানাকে নামতে দেবার জন্যে জায়গা বের করছে সে।

নামল রানা। চারদিক থেকে পিঁপড়ের সাড়ির মত ছুটে আসছে আরও অনেক বাচ্চাকাচ্চা। হঠাৎ গুরুগম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। জাদুমন্ত্রের মত স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত শোরগোল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই লোকটাকে দেখতে পেল রানা। ইরানীয়ান, কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। পুরো ইউরোপীয়ান পোশাকে সজ্জিত। ক্লিনশেভ। পরমুহূর্তে ছেলেমেয়েরা তীরবেগে যে যেদিকে পারে ছুটতে শুরু করল।

সাত-আট বছরের একটা ছেলে পড়ে গেল লোকটার সামনে। ছোঁ মেরে মাথার চুল ধরে শূন্যে তুলে ফেলল লোকটা তাকে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল রানার। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারেনি, কিন্তু একটা অমঙ্গল আশঙ্কা কাঁপিয়ে দিল ওকে।

বাধা দেবার সময় পেল না রানা। আশ্চর্য শক্তি রাখে লোকটা গায়ে। এক হাত দিয়ে ধরে ছেলেটাকে ঘোরাল নিজের চারদিকে। তারপর ছেড়ে দিল।

শরীরের পেশী শক্ত হয়ে গেল রানার। প্রায় দশ হাত দূরে বালির উপর মুখ থুবড়ে পড়ল ছেলেটা। কোন শব্দ নেই। আতঙ্কে কাঁদতে ভুলে গেছে। এগোল রানা সেদিকে।

দীর্ঘ পদক্ষেপে রানার সামনে এসে একটা হাত মেলে দিয়ে বাধা দিল লোকটা। পরিষ্কার এবং শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, 'শেখ ফারাজীর প্রজা ওরা। আমি শেখ ফারাজীর ছেলে এবং প্রজাদের শিক্ষক। ছেলেটাকে আমি শাস্তি দিয়েছি মনে করলে ভুল করবে, ওকে আমি শিক্ষা দিয়েছি। ওদেরকে আমি দুর্ধর্ষ হিসেবে গড়ে তুলছি এভাবেই।' হাসি হাসি মুখ। 'আমি শেখ মাহমুদ। তোমরা এখানে কেন?' করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল মাহমুদ।

হাতটা ধরল না রানা। নিজেদের পরিচয় দিয়ে ল্যান্ডরোভারের গায়ের লেখাটা দেখাল ইঙ্গিতে, বলল, 'লন্ডনের গোল্ডেন ফিল্ম কোম্পানির লোক আমরা। একটা ছবির লোকেশন ঠিক করতে এসেছি।'

'ভুল পথে এসেছ তোমরা,' মাহমুদ বলল। 'তবু, আমার বাবা তোমাদেরকে অতিথি হিসেবে বরণ করবেন। অপেক্ষা করছেন তিনি। এসো।'

গিলটি মিয়া ইতস্তত করছে দেখে হাসল মাহমুদ। 'গাড়িতে তালা মারার দরকার নেই। কিছুই চুরি হবে না।'

'বত্রিশ বচোর লাইনে ছিলাম, বাওয়া—চোরদেরকে চিনতে পারবো না?' বিড়বিড় করে বলল গিলটি মিয়া, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদেরকে অনুসরণ করল।

'এমন পাথুরে জায়গায় এমন রসাল ইংরেজি আশা করিনি,' বলল রানা।

গ্রামের সবচেয়ে বড় একতলা বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে ওরা।

মাহমুদের হাসিটা একটু ব্যঙ্গাত্মক। 'এখানে ইংরেজি বলা হয়—এইরকম একটা সাইন বোর্ড থাকলে বোধহয় ভাল হত, না?'

বাড়ির ভেতর সুন্দর পরিবেশ। বেশ যত্নের সাথে ঘাস জমানো হয়েছে। একটা বড় ঘরে ঢুকল ওরা। ভেড়ার চামড়া বিছানা রয়েছে এখানে সেখানে। দেয়ালগুলো ঢেকে রাখা হয়েছে মখমলের পর্দা দিয়ে। মাঝখানে একটা পারশিয়ান কার্পেট বিছানো, তার চারধারে স্পঞ্জের কুশন, ভেলভেটের কাপড় দিয়ে মোড়া। একটা কুশনে বসে আছে শেখ ফারাজী। কুশনটা অন্যগুলোর চেয়ে উঁচু। পায়া আছে। পায়াগুলো চকচক করছে। সম্ভবত সোনা দিয়ে তৈরি। বাবার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল মাহমুদ। শেখ ফারাজী ইংরেজি জানে না। আরবীতে কথা বলল সে। হাত ইশারায় বসতে বলল সবাইকে। ইতোমধ্যে চোখের নিচে পর্যন্ত ঘোমটায় ঢাকা একটা মেয়ে রুপোর ট্রেতে করে কফি নিয়ে এসেছে।

'বাবা জানতে চাইছেন, তোমরা কতদিন ধরে আছ কুর্দিস্তানে?'

'খুব বেশিদিন নয়,' বলল রানা, 'জিলান থেকে দিন দুই আগে ঢুকেছি আমরা।'

আরবীতে তথ্যটা দিল মাহমুদ, শেখ ফারাজী আরেকটা প্রশ্ন করল।

'এই প্রথম তোমরা কুর্দিস্তানে এলে?' বাবা কৌতূহল প্রকাশ করছেন।

সত্যি কথা বলাই ভাল, ভাবল রানা। অকারণ মিথ্যা বিপদ ডেকে আনতে পারে। কফির কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকাতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল ও। এত বেশি মিষ্টি যে বমি বমি ভাব জাগছে। 'কয়েকদিন আগে আরেকবার এসেছিল আমার সহকারী, যা খুঁজছিল তা না পেয়ে বিশ্রামের জন্যে তেহরানে ফিরে যায় ও। এবার ওর সাথে আমিও এসেছি।'

'বাবা জানতে চাইছেন কি ছবি তৈরি করছ তোমরা?'

হাসিটা লেগেই আছে মাহমুদের মুখে। চাপ দাড়িওয়ালা বিশালদেহী বৃদ্ধ শেখ ফারাজীর মুখেও হাসির বিরাম নেই। বাপ-ছেলেতে হাসির কমপিটিশন শুরু করেছে যেন, ভাবল রানা। বলল, 'ছবি আমরা তৈরি করছি না। স্ক্রিপ্টের প্রয়োজন অনুযায়ী লোকেশন খুঁজে বের করার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাদেরকে।'

বাবার দোহাই দিয়ে শেখ মাহমুদ একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে। সহজভাবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে রানা।

'দলে তোমরা মাত্র দু'জন?'

'হ্যাঁ।'

'খুব সাহসী লোক তোমরা তাহলে, স্বীকার করতেই হয়।'

'কেন?' পকেট থেকে সিগারের বাক্সটা বের করল রানা।

হঠাৎ একটু কুঁচকে উঠল মাহমুদের চোখ। বাক্স থেকে সিগার বের করছে রানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে। বলল, 'কুর্দিস্তান সকলের জন্যে নিরাপদ নয়,' একটু কঠিন শোনাল কণ্ঠস্বর।

লাইটার জ্বেলে সিগার ধরাতে যাবে রানা, ছোঁ মেরে কেড়ে নিল মাহমুদ সেটা ওর ঠোঁট থেকে। ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল গিলটি মিয়া।

ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসি মাহমুদের। 'বাবার সামনে ধূমপান করলে বাবা অপমান বোধ করবেন, মি. রানা। ভাল চোখে দেখবেন না তিনি। আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমার কামরায় চলো, ওখানে ধূমপান মদ্যপান সবই চলতে পারবে।'

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল রানা। মৃদু হেসে বলল, 'ওহ্!'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বসল গিলটি মিয়া। ইতোমধ্যে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে তার কপালে।

শেখ ফারাজী কথা বলছে। মাহমুদ জানাল, 'বাবা বলছেন তিনি তোমাদেরকে ছাড়বেন না।'

'মানে?'

'মানে, সন্ধ্যা নামতে খুব বেশি তো আর দেরি নেই, রাতটুকু তাঁর অতিথি হিসেবে এই দীন-দুঃখীদের আস্তানায় কাটিয়ে যাও। তাঁর কথা অগ্রাহ্য করলে তিনি অপমান বোধ করবেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তোমার বাবার অপমানবোধ খুব প্রখর, বুঝতে পারছি।'

হাসল মাহমুদ, 'আগেকার দিনের মানুষ কিনা!'

শেখ ফারাজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাহমুদের কামরায় এল ওরা। সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশ এখানে। চেয়ার টেবিল সোফা দিয়ে সাজানো। শো-কেসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিদেশী মদের বোতল। ফ্রিজে রয়েছে বরফ। বরফ দেয়া স্কচ হুইস্কি ঢালল মাহমুদ দুটো গ্লাসে। মাথা নেড়ে গিলটি মিয়া জানিয়ে দিয়েছে মদ সে স্পর্শ করে না। কড়মড় কড়মড় শব্দ করে বরফ চিবোচ্ছে সে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা। জেনারেটর আছে গ্রামের কোথাও। সোফায় মুখোমুখি বসেছে দু'জন। গিলটি মিয়া খানিকটা দূরে আরেকটা সোফায়।

'বাবা মদ আর মেয়েমানুষের ঘোর বিরোধী,' বলল মাহমুদ। 'কিন্তু আমার কামরায় যা খুশি করতে পারি আমি। এই দুটো বদভ্যাস আমাকে উপহার দিয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা—সোজা কথায় লন্ডন।'

'তুমি তাহলে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম মানে? ওখানেই তো আমি মানুষ হয়েছি,' বলল মাহমুদ। 'সে অনেক কথা। কুর্দি পলিটিক্স সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'কুর্দদের সমস্যার কথা শুনেছি, বিশদ কিছু জানি না।'

হোঃ হোঃ করে হাসল মাহমুদ, যেন প্রচণ্ড একটা বোকামি করে ফেলেছে রানা। হাসি থামতে বলল, 'আমরা কুর্দরা এটাকে ইরানীয়ান অথবা ইরাকী সমস্যা বলে মনে করি, কিংবা বলে থাকি তুর্কী সমস্যা। নিজেদেরকে আমরা কোন সমস্যা বলে জানি না। তাহলে, গোড়া থেকেই শোনো।' গ্লাসে চুমুক দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিল মাহমুদ।

সিগার ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। হঠাৎ লক্ষ করল কামরায় নেই গিলটি মিয়া।

'তোমার সহকারী বোধহয় একটু চঞ্চল প্রকৃতির,' মৃদু হেসে বলল মাহমুদ। 'ঘুরেফিরে চারদিকটা সম্ভবত দেখতে গেছে।'

কিছু বলল না রানা।

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিদেশীদের দখলে চলে গিয়েছিল ইরান, তা নিশ্চয়ই জানো?' রানা মাথা দোলাল। আবার শুরু করল মাহমুদ, 'দক্ষিণ দিকটা দখল করেছিল ব্রিটিশরা, উত্তর দিকটা রাশিয়ানরা। দুই বিদেশী শক্তিই দখল ছেড়ে চলে গেল বটে, কিন্তু রাশিয়ানরা একটা ফিফথ্ কলাম রেখে গেল পিছনে। এই কাজে তারা ব্যবহার করল কুর্দদেরকে। জন্ম হলো মেহাবাদ কুর্দিশ রিপাবলিকের, রাশিয়ানদের পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু ইরানীয়ান আর্মি উত্তর দিকে অভিযান চালাতেই রিপাবলিকের আয়ু শেষ হয়ে গেল। সেটা ছিল ১৯৪৬ সাল। আমার তখন মাত্র দুই বছর বয়স।'

রানার হাত থেকে খালি গ্লাস নিয়ে সোফা ছাড়ল মাহমুদ। দুটো গ্লাসে হুইস্কি ভরে নিয়ে ফিরে এল আবার সোফায়। 'বাবা রাজনীতির সাথে এবং মোল্লা মোস্তাফা বারজানীর সাথে জড়িত ছিলেন। রিফিউজী হিসেবে তিনি চলে গেলেন রাশিয়ায়। কিন্তু যাবার আগে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন ইংল্যান্ডে, যেখানে আমি ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ছিলাম। এই হলো ঘটনা।'

'মোল্লা মোস্তফা বারজানী—কে সে?'

'কুর্দদের একজন নেতা। এখনও জীবিত। বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি ইরাকে রয়েছেন। আমরা বারজানী গোত্রেরই সন্তান।'

'তোমার বাবা ইরানে আবার ফিরলেন কিভাবে?'

'সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ পেয়ে। সরকার জানে বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন, রাজনীতি করার বয়স বা মানসিকতা তাঁর নেই। আমার কথা যদি বলো, পলিটিক্সের ধার ধারি না। আমাকে তুমি পারফেক্টলি ইনোসেন্ট, পারফেক্ট জেন্টলম্যান বলতে পারো।'

'শোল্ডার হোলস্টারে রিভলভারটা তাহলে রেখেছ কেন?' প্রশ্নটা করতে গিয়েও করল না রানা।

'একানে একটাও গরু নেই, সব ভেড়া আর ছাগল,' হঠাৎ কামরায় ঢুকে ঘোষণা করল গিলটি মিয়া। 'পেট ভরে দুদ খাওয়া যাবে, বুঝলেন, স্যার!'

পরদিন খুব ভোরে বিদায় নিল ওরা।

আতিথেয়তার কোন ত্রুটি করেনি শেখ মাহমুদ। প্রায় সারা-রাত ওদেরকে মাতিয়ে রেখেছিল সে। রানার হাতের গ্লাস শেষ হতে না হতে আবার সেটা হুইস্কি দিয়ে ভরে দিয়েছে। ভেড়া জবাই করে খানাপিনার ব্যবস্থা করেছে। এক হালি ইরানী যুবতীর সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে রানাকে। রানা উৎসাহ প্রকাশ করেনি দেখে আন্তরিকভাবে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে সে। আজ সকালেও সে বারবার অনুরোধ করেছে আরও একটা দিন তার অতিথি হিসেবে

থাকার জন্যে। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অনুরোধটা প্রত্যাখ্যান করেছে রানা।

উপত্যকার উপর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে ওরা। গাড়ি চালাচ্ছে গিলটি মিয়া। পাশে রানা। চিন্তিত। হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'কিছু বুঝতে পারলে, গিলটি মিয়া?'

'পেরেচি বৈকি!' সাথে সাথে জবাব দিল গিলটি মিয়া। 'রেতের বেলা ঘুমিয়েচি নাকি? জান্‌লা গলে সবগুলো ঘরে টুঁ মেরেচি। নেই স্যার!'

'কি নেই?'

'আপিম বলুন, মরফিন বলুন, কেমিক্যাল বলুন—কিচুই নেই।'

ঘরে থাকার কথা নয়, ভাবছে রানা। বড়সড় একটা ল্যাবরেটরি দরকার আফিম থেকে মরফিয়া, মরফিয়া থেকে হেরোইন তৈরি করার জন্যে। কম করে হলেও চারশো বর্গফুট জায়গা লাগার কথা। মাটির নিচে কোথাও জায়গাটা?

গ্রামে আবার ফিরতে হবে। চুপিসারে।

উপরে উঠতে শুরু করেছে গাড়ি। ভিউমিররে দেখা যাচ্ছে ফেলে আসা গ্রামটাকে। চার মাইল দূরে।

আরও একশো গজ এগিয়ে থামল ল্যান্ডরোভার। গ্রাম থেকে ওদেরকে এখন দেখতে পাচ্ছে না কেউ। ক্যামেরা হাতে নিয়ে নিচে নামল রানা। পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগোল। খানিকদূর এগিয়ে বসল। চোখের সামনে পোলারয়েড ক্যামেরা নিয়ে মাথাটা তুলল। বেশ কয়েকটা ছবি তুলল গ্রামের। কাজে লাগতে পারে।

তিন মিনিট পর দাঁতের ফাঁকে চুরুট নিয়ে ল্যান্ডরোভারের বনেটে বসল রানা। ছবিগুলো বনেটের ওপর ছড়ানো। সেগুলো দেখছে আর ভাবছে। দিনের বেলা গিরিপথ থেকে গ্রামের দিকে নামতে গেলে ধরা পড়ে যাবে। গ্রামটা থেকে এদিকে নজর রাখা হচ্ছে, সন্দেহ নেই। গিরিপথের পাদদেশ থেকে গ্রামটা চার মাইল, যেতে আসতে আট মাইল—রাতের জন্যে পায়ে হাঁটা পথ হিসেবে অনেক লম্বা। পৌঁছোলেই চলছে না, অন্ধকারে খুঁজে বের করতে হবে ল্যাবরেটরি বা গুদামটা। যেটার অস্তিত্বই হয়তো ওখানে নেই।

কানাতের কথাটা ভাবছে রানা। পাহাড় থেকে পানি সরবরাহ হচ্ছে গ্রামে। এ সম্পর্কে কি জানে স্মরণ করার চেষ্টা করছে ও। মানুষ চলাচলের মত জায়গা আছে নিচে? সম্ভবত আছে। মেরামতের জন্যে লোক নামানো হয়, এটুকু মনে পড়ছে ওর। একটা গর্তে নেমে গ্রামের কাছাকাছি কোন গর্ত দিয়ে ওঠা যেতে পারে। কিন্তু খালে পানির গভীরতা কতটুকু? সঠিক জানা নেই। তবে গভীরতা খুব বেশি হবার কথা নয়। এদিকে পানির খুবই অনটন, নেই বললেই চলে, সুতরাং হাঁটু সমান পানিও আছে কিনা সন্দেহ। এরপর খালের তলাটা। সমতল কিনা কে জানে।

দ্রুত একটা হিসেব কষে ফেলল রানা। রাতের আঁধারে গিরিপথ থেকে নেমে কানাতের একটা গর্তের কাছে পৌঁছুবে ওরা। কিছু একটা নামিয়ে মেপে নেবে পানির গভীরতা। পা ফেলে হাঁটতে যদি খুব অসুবিধে না হয় ঘণ্টায় দুই মাইল এগোতে পারবে। গ্রামের কাছাকাছি কোন গর্তের মুখ থেকে বেরুবে ওরা। ভোরের আগে পর্যন্ত সার্চ করতে পারবে গ্রামটাকে। তারপর আবার

কোন একটা গর্তে ঢুকে খালে নেমে ফিরে আসতে পারবে গিরিপথে।

গোটা ব্যাপারটা আরেকবার ভাবল রানা। মাথা নাড়ল আপনমনে।

রানার প্রস্তুতি দেখে চোখ কপালে উঠে গেল গিলটি মিয়ার। গাড়িতে এত কিছু ছিল, জানতই না সে। রানাকে হালকা নাইলন রোপ বের করতে দেখে থ হয়ে গেল সে।

এক জোড়া করে হাই-পাওয়ার ইলেকট্রিক টর্চ আর ছুরি বের করল রানা। একটা ছুরি আর টর্চ গিলটি মিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কোমরের বেল্টের সাথে গুঁজে নাও।'

এরপর রানাকে একটা ফটোগ্রাফিক ট্রাইপড খুলতে দেখে বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে গেল গিলটি মিয়ার। খুক্ খুক্ করে কাশল সে রানার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। কিন্তু রানা একমনে কাজ করছে। মুখ তুলে তাকালই না।

অগত্যা সাহস সঞ্চয় করে প্রশ্নটা করেই বসল গিলটি মিয়া। 'স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, অবশ্য যদি এটাকে বেয়াদপি বলে…'

ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল রানা। 'যা বলবে সরাসরি বলো।'

'জানতে চাইছিলুম, কি করবেন আপনি?'

হাত দুটো স্থির হয়ে গেল রানার। 'ধরো, ল্যাবরেটরিটা খুঁজে পেয়েছ, এরপর কি করবে?'

'ধ্বংস করবো!'

'কিভাবে?'

চিন্তা করল গিলটি মিয়া। তারপর বলল, 'আগুন জ্বেলিয়ে…'

'মাটির নিচে পোড়ানো হয়তো সম্ভব না-ও হতে পারে,' বলল রানা। অ্যালুমিনিয়ামের তিনটে পা ঝেড়ে ভেতর থেকে কয়েকটা খয়েরী রঙের সিলিন্ডার বের করল ও। 'ধ্বংস করতে হলে এই জেলিগনাইটগুলো লাগবে।'

জেলিগনাইট… জেলিগনাইট…স্মরণ করার চেষ্টা করছে গিলটি মিয়া। হঠাৎ মনে পড়তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখের চেহারা। বিস্ফোরক!

ইনসুলেটিং টেপ দিয়ে জেলিগনাইট সিলিন্ডারগুলো নিখুঁতভাবে বাঁধছে রানা। প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে গিলটি মিয়া।

কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে ঘড়িটা খুলছে রানা। খুলে ঘড়িটার পিছনে আটকানো একটা এক ইঞ্চি লম্বা ইস্পাতের পেরেক দেখাল গিলটি মিয়াকে। 'এটাই হচ্ছে ডিটোনেটর। ঘড়ির ভেতর যা করার করে রেখেছি। এখন শুধু একটা জেলিগনাইট স্টিকে এটা ঢুকিয়ে দিলেই ঘড়িটা আমরা বিস্ফোরণের জন্যে তৈরি করে ফেলতে পারি। বারো ঘন্টার মধ্যে যে-কোন মুহূর্তকে আমরা বিস্ফোরণের সময় হিসেবে বেছে নিতে পারি।'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে গিলটি মিয়া। 'বুজেচি, এটা একটা টাইম বোম। কিন্তুক, স্যার,' দুটো হাত এক করে পিস্তলের মত করল সে, রানার দু'পাশে তাক করে জিভ আর টাকরা সহযোগে টাশ্ টাশ্ শব্দে গুলি

করল, চরকির মত পেছন দিকে ঘুরে আরেকজনকে গুলি করল, তারপর ফিরল রানার দিকে। 'পিস্তল-টিস্তলও তো দরকার পড়তে পারে?'

মৃদু হাসল রানা। 'আচ্ছা, গিলটি মিয়া, একটা পিস্তল বা মেশিন পিস্তল দেখতে কেমন বলো দেখি?'

একটু চিন্তা করল গিলটি মিয়া। 'ওটার একটা ব্যারেল আচে, একটা ট্রিগার আচে। গুলি-গালাচও লাগবে।'

ল্যান্ডরোভারের পেছন দিকে চলে এল রানা। পিছনে গিলটি মিয়া। গাড়ির চাঁদোয়া টাঙানোর কাজে যে কয়টা খুঁটি আছে, তারই একটা খুলে নিল রানা। চাঁদোয়াটা একটু ঝুলে পড়ল এদিকে, কিন্তু খুব বেশি নয়। 'এটা তোমার ব্যারেল,' জিনিসটা গিলটি মিয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'আর কি চাই? ব্রীচ মেকানিজম, তাই না?'

ল্যান্ডরোভারের এখান সেখান থেকে একটা একটা করে জিনিস বের করে আনল রানা। ড্যাশবোর্ড থেকে নিল সিগারেট লাইটার, খোপ থেকে বের করল একটা অ্যাশট্রে, টুল বক্স থেকে নিল স্প্রিং—এবং দশ মিনিটে তৈরি হয়ে গেল এক ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্র।

ল্যান্ডরোভারের গা থেকে স্ট্র্যাপমুক্ত করল বেলচাটাকে। দু'হাত দিয়ে ধরে টানাটানি করতেই আলাদা হয়ে গেল হাতলটা। আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে ফিট করা হলো সেটা। চমৎকার একটা শোল্ডার রেস্ট তৈরি হয়ে গেল। 'তোমার হাতে ওটা এখন কি?' বলল রানা। 'একটা অটোমেটিক মেশিন পিস্তল। এসব জিনিস নিয়ে ইরানে আমরা ঢুকতে পারতাম না। তাই একটু কৌশল খাটাতে হয়েছে।'

'স্যার, আপনার পায়ে হাত দিয়ে...' ধমক খাবার ভয়ে ব্যাকুল ইচ্ছাটা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকল গিলটি মিয়া, জানতে চাইল, 'এরকম ভাল-মানুষ টাইপের পিস্তল কটা নিয়ে এসেচেন, স্যার?'

'দুটো। আরও একটা তেপয়ের সাথে ফিট করা যাবে, সেটা এয়ার-কুলড মেশিনগান। গোলা-বারুদ আনাই ঝামেলা, তাই খুব বেশি আনা যায়নি। আনএক্সপোজড ফিল্ম ক্যারিয়ার, ওর ক্যানগুলোর প্রত্যেকটাতে কিছু কিছু করে নিয়ে এসেছি।'

গিলটি মিয়া হতভম্ব।

'এছাড়া,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'ধরে নাও, একটা মর্টারও রয়েছে আমাদের সাথে।'

অনায়াসে একটা মুরগির ডিম ঢুকে যাবে, এতটা হাঁ হয়ে গেছে গিলটি মিয়ার মুখ। হঠাৎ করে হাসল সে। 'হেঃ হেঃ, স্যার, আপনি আমাকে বোকা বানাবার জন্যে মশকরা করচেন...'

'মর্টারটা খুঁজে বের করতে পারলে এক বছরের বেতন বোনাস হিসেবে পাবে তুমি,' বলে চলে গেল রানা।

সতৃষ্ণ নয়নে ল্যান্ডরোভারের দিকে তাকিয়ে আছে গিলটি মিয়া। পরমুহূর্তে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ঘণ্টাখানেক পণ্ডশ্রম করার পর ঘর্মাক্ত কলেবরে

গাড়িটার পাশে বসে পড়ল ধপ করে। মর্টার ছোটখাট কোন ব্যাপার নয়। ভাবছে সে। থাকলে তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারত না। আসলে নেই। মর্টারও নেই, মর্টারের গোলাও নেই। স্যার তার সাথে মশকরাই করেছে।

কিন্তু মনটা তবু খুঁতখুঁত করতে লাগল গিলটি মিয়ার।

প্রস্তুতি শেষ করে গাড়ি নিয়ে গিরিপথের মাথায় উঠে গেল ওরা। রাস্তা থেকে সরে কয়েকটা পাথরের আড়ালে থামল। সন্ধ্যার পর নামতে শুরু করল উপত্যকায়।

অন্ধকার এখনও তেমন গাঢ় নয়, সামনের কয়েক গজ দেখতে পাচ্ছে ওরা। কিন্তু দূর থেকে ওদেরকে কারও দেখতে পাবার কথা নয়।

'বোমার কাজ কি তা নাহয় বুজলাম, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া। সে-ই চালাচ্ছে গাড়ি। 'কিন্তু পিস্তল, মেশিনগান, মর্টার এগুলো লিয়ে এসেচেন কেন বুজতে পারচি না। দরকার হবে?'

'হবে মনে করেই তো এনেছি।'

গিরিপথের মাথা থেকে কানাতের প্রথম ভেন্টিলেশন শ্যাফটের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশি। ওরা যখন পৌঁছুল তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে। তবে ইতোমধ্যে দিগন্ত-রেখার বেশ খানিক উপরে উঠে এসেছে চাঁদটা।

গাড়ি থেকে নেমে একটা দড়ির ভাঁজ খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে গিলটি মিয়া।

'থামো,' হঠাৎ বলল রানা, 'এই শ্যাফটটা নয়।' এইমাত্র কিছু একটা মনে পড়ে গেছে ওর। 'এটা সম্ভবত হেড ওয়েল—এর তলায় পানির গভীরতা বেশি হতে পারে। পরের গর্তটা দেখি চলো।'

ওখান থেকে সোজা পঞ্চাশ গজ হেঁটে পরবর্তী গর্তের কাছে পৌঁছুল ওরা। দড়ি খোলা শেষ করল গিলটি মিয়া। জানতে চাইল, 'তল কদ্দূর, স্যার?'

ছোট্ট একটা নুড়ি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে গর্তের ভেতর ছেড়ে দিল রানা। রিস্টওয়াচটা কানে ঠেকিয়ে রেখেছে, টিকটিক আওয়াজের সাথে পানিতে পড়ার সময় যাচাই করে নিয়ে বলল, 'একশো ফিটেরও কম। দড়ির প্রান্ত এমন কিছুর সাথে বাঁধো যেটা টান খেয়ে সরে না আসে।'

খুঁজে একটা পাথর বের করল গিলটি মিয়া। একটা লূপ তৈরি করে সেটার গায়ে গলিয়ে দিল। টেনেটুনে পরীক্ষা করে দেখে নিতেও ভুলল না। দড়ির অপরপ্রান্ত সহ বাকিটা ফেলে দিল সে গর্তের ভেতর।

নিজের মেশিন পিস্তলটা গিলটি মিয়ার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'আগে আমি নামছি। তিনবার টর্চের আলো জ্বালব নিচে থেকে, তখন তুমি নামবে।' গর্তের কিনারায় বসল রানা, পা দুটো ঝুলছে। তারপর ঘুরে গিয়ে গর্তের কিনারায় পেট ঠেকাল ও, নামতে শুরু করল নিচের দিকে।

প্রায় তিন ফিট ডায়ামিটারের গর্ত। দড়ি ধরে ধরে নেমে যাচ্ছে রানা। দশ ফিট পরপর দড়িতে ওর বেঁধে রাখা কাপড়ের ছোট ছোট টুকরোগুলো এক এক করে উপরে উঠে যাচ্ছে। কতটা নামছে তার হিসেব রাখতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। ঠিক নব্বই ফুট নামার পরই শক্ত কিছুতে ধাক্কা খেল ওর বুট জোড়া।

গোড়ালির উপরে পানির স্পর্শ অনুভব করল ও। বরফের মত ঠাণ্ডা।

পাঁচ

উপর দিকে তাকাল রানা। ছোট্ট একটা ফোকর দেখা যাচ্ছে। কি যেন নড়াচড়া করছে। গিলটি মিয়া নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, বুঝল ও। হাতড়ে কোমর থেকে টর্চটা বের করল, উপর দিকে মুখ করে বোতামে চাপ দিল পরপর তিনবার। তারপর কানাতের চারপাশে ও নিচের দিকে আলো ফেলল।

ফুট তিনেক চওড়া খালটা, পানি থেকে ছয় ফুটের মত উঁচু সুড়ঙ্গ পথ। সামনে আলো ফেলে সুড়ঙ্গটা দেখছে রানা। অনেকদূর চলে গেছে, আলোর নাগালের বাইরে। নগ্ন মাটির দেয়াল ভিজে, স্যাঁতসেঁতে। খালে মাত্র ইঞ্চি নয়েক গভীর চলমান পানি।

দড়িটা দুলে উঠল। ঝুরঝুর করে মাটি পড়ছে রানার মাথায়। সরে গেল ও। 'নামচি, স্যার,' গিলটি মিয়ার কণ্ঠস্বর। সড়সড় করে নেমে এল সে।

তার হাত থেকে মেশিন পিস্তলটা নিল রানা।

'কদ্দিনের পুরানো খাল কে জানে,' হাঁপচ্ছে এখনও গিলটি মিয়া। 'দেয়াল যদি ধসে পড়ে, জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে।'

'তিন হাজার বছরের পুরানো হওয়াও বিচিত্র নয়,' বলল রানা। 'তবে দেয়াল ধসে পড়বে বলে মনে হয় না। এই কানাতে লোকেরা ওঠানামা করত না তাহলে। সে যাক,' প্রসঙ্গ বদলে বলল রানা, 'মনে আছে তো, পঁয়ত্রিশ নম্বর গর্ত দিয়ে ওপরে উঠব আমরা...'

'উঁহুঁ,' বলল গিলটি মিয়া। 'চৌত্রিশ নম্বর দিয়ে।'

'ওহ্, হ্যাঁ,' প্রথমটাকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টা দিয়ে নেমেছে ওরা, ভুলেই গিয়েছিল রানা। 'এগোবার সাথে সাথে দু'জনেই গর্তগুলো গুনব, ভুল হলে শুধরে নেয়া যাবে। আর একটা কথা। এই সুড়ঙ্গে শব্দের প্রতিক্রিয়া কি রকম হবে জানা নেই আমার, তাই নিঃশব্দে এগোব আমরা। পিস্তল নিয়ে আগে আগে আমি, তুমি আমার পিছু পিছু। চলো এবার।'

খুব সহজেই এগোতে পারছে ওরা। এতটা আশা করেনি রানা। ঘণ্টায় কম করেও আড়াই মাইল। পানির নিচে কাদা নেই, পিচ্ছিলও নয়, ঝুরঝুরে মাটি।

মাত্র একবার ছোট্ট একটা অসুবিধেয় পড়ল ওরা। পানির গভীরতা হঠাৎ বেড়ে দুই ফুট পর্যন্ত পৌঁছুল, তারপর তিন ফুট। গিলটি মিয়াকে দাঁড় করিয়ে রেখে একাই এগিয়ে গিয়ে পা দিয়ে লাথি মেরে মেরে নরম মাটি সরিয়ে পানি এগোবার পথ করে দিল রানা। সুড়ঙ্গের ছাদ ধসে খানিকটা মাটি পড়েছিল। জমে ওঠা পানি দ্রুত সরে গেল, স্বাভাবিক নয় ইঞ্চিতে পৌঁছুল আবার গভীরতা।

ঝামেলা নেই, তবে যতই এগোচ্ছে ওরা, মানসিক উত্তেজনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অবশেষে গিলটি মিয়াকে থামতে নির্দেশ দিল রানা। বলল, 'মাথার ওপর এই গর্তটা একত্রিশ নম্বর— তুমি কি বলো?'

'ঠিকই আচে। আমি ভাবচি কি…'

'কথা আস্তে বলো,' নিচু গলায় বলল রানা। 'মনে রেখো, আমাদের ঠিক ওপরেই গ্রাম। কি বলছিলে?'

'কিচু না, স্যার। ভয় লাগচে তো, তাই বেশি বেশি কতা বলতে ইচ্চে করচে।'

আবার এগোল ওরা। গুণে গুণে পা ফেলছে এবার গিলটি মিয়া। পঞ্চাশ গজ পেরিয়ে এসেছে মনে করে আরেক পা এগিয়ে থামতে যাবে, ধাক্কা খেল রানার পিঠের সাথে।

'কিছু শুনতে পেয়েছ?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা।

কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু পানির মৃদু কলকল ধ্বনি ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই।

কলকল শব্দটা যেন সম্মোহিত করে রেখেছিল এতক্ষণ গিলটি মিয়াকে। প্রায় পনেরো সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর ফিসফিস করে বলল, 'না তো…কই?'

ঠিক তখনই একটা অস্পষ্ট শব্দের স্পন্দন কানে ঢুকল রানার, দ্রুত মিলিয়ে গেল বাতাসে।

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে ওরা। কিন্তু আর কিছু শুনতে পেল না।

'আর মাত্র বিশ গজ,' অবশেষে বলল রানা। বিশ গজ পেরিয়ে গর্তের নিচে পৌঁছুল ও। ঝট্ করে পেছন ফিরে গিলটি মিয়ার উদ্দেশে নিচু গলায় বলল, 'ওপরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। দেখে বলো কি মনে হয় তোমার!'

রানাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এল গিলটি মিয়া, মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল। অনেক উঁচুতে গোল চাকতির মত ম্লান আকাশ দেখতে পেল সে, কিন্তু গর্তের গায়ে আরও একটা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে, খুব একটা উঁচুতেও নয় সেটা। মনে হলো, গর্তের গা থেকেই বেরিয়ে আসছে আলোটা। অনুমান করল, পঞ্চাশ ফুটের মত উঁচুতে রয়েছে।

মুখ নামিয়ে পিছিয়ে এল গিলটি মিয়া। বলল, 'মাটির নিচে কিচু একটা খুঁজচি আমরা, তাই না, স্যার? আমার মনে হচ্চে, এটাই সেটা। জায়গাটাতে বোধায় বাতাস আনাগোনার দরকার আচে, তাই গর্তের গায়ে বানিয়ে নিয়েচে কারখানা।'

'কিন্তু এত সহজেই পেয়ে গেলাম, কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না?'

'না। আমাকে লিয়ে এসেচেন তো,' বলল গিলটি মিয়া। 'অন্দোকারে আমার কপাল ভালো।'

একটা শব্দ হলো। খানিকটা দূরে, কিন্তু পরিষ্কার। কাশির শব্দ। 'কেউ জেগে আচে,' চেপে রাখা দম ফেলছে গিলটি মিয়া। 'এ্যাকনই কিচু করা যাবে না,' গর্তের উপর দিকে মুখ তুলল সে। 'ঘুমোতে যাবার আগে ব্যাটারা আলো

নিবিয়ে দেবে। পাহারায় থাকচি আমি, আপনি আরাম করুনগে।'

'একটা বিছানা পেতে দাও তাহলে,' বলে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

সময় বয়ে যাচ্ছে। ব্যথা করছে পা। রিস্টওয়াচের লিউমিনাস ডায়ালে অনেকক্ষণ পর পর চোখ রাখছে রানা। এক ঘণ্টা কাটল।

আলো নিবছে না।

দেড় ঘণ্টা কাটল। এভাবে অপেক্ষা করা কী যে যন্ত্রণাকর! আলো জ্বেলে ওখানে ওরা কি করছে? ভাবছে রানা। নাকি আলো জ্বেলে রেখেই নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে?

শরীরের ভার একবার এ-পায়ের উপর, আরেকবার ও-পায়ের উপর চাপাচ্ছে রানা। দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

'মশাগুলোকে একটু মানা করুন, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া। 'নইলে চটাশ করে মেরে বসবো।'

আর কোন শব্দ নেই। ওদের দু'জনের ধৈর্যের ভাণ্ডারও নিঃশেষ। আড়াই ঘণ্টার উপর কেটে গেছে।

ঠাণ্ডা পানিতে দাঁড়িয়ে ওরা। পাগুলোয় সাড়া নেই। তিনঘণ্টার মাথায় গিলটি মিয়া ফিসফিস করে বলল, 'স্যার, ঘণ্টাখানেক হয়েচে নিবেচে আলোটা। এতক্ষণে ওরা ঘুমিয়ে পড়েচে, কি বলেন?'

'চুপ করো!' কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছে রানা। 'হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকছে কারও।'

কাঁধ থেকে দড়ির কুণ্ডলী নামাল রানা। ভাঁজ খুলে গিলটি মিয়ার কাঁধের দু'পাশে নিখুঁতভাবে সাজাল, যাতে টান পড়লে প্যাঁচ না খেয়ে সড়সড় করে উঠে যায়। দড়িটার এক প্রান্তে একটা হুক লাগানো, সেটা উপর দিকে, আলোটা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল ও।

দেয়াল কেটে একটা জায়গা বের করা হয়েছে, আলোটা সেখান থেকেই আসছে, অনুমান করল রানা। হুকসহ দড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল দেয়ালের যেখানটায় কাটা হয়েছে। ঠক্ করে আওয়াজ ভেসে এল, মনে হলো কংক্রিটের উপর পড়েছে হুকটা। কিন্তু টানতেই হড়হড় করে নেমে এল সেটা, ঝুপ করে পড়ল নিচে। কয়েকবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু কিছুতেই কিছুতে আটকাল না হুক।

বিকল্প পথ ধরল রানা। গিলটি মিয়ার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে লোহার কয়েকটা লম্বা পাত বের করে একটা রেখে নিজের ব্যাগে ভরে নিল বাকিগুলো। দু'ইঞ্চি চওড়া পাতগুলো, একটা দিক ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। চাপ দিয়ে কোমর সমান উঁচুতে নরম দেয়ালের গায়ে ইঞ্চি দুয়েক সেঁধিয়ে দিল রানা। আট ইঞ্চি লম্বা এক একটা পাত। আরও তিন ইঞ্চি ঢোকাবার জন্যে আস্তে আস্তে হাতুড়ির টোকা মারতে হলো।

দু'হাত দিয়ে নিচের দিকে টেনে পরীক্ষা করল রানা পাতটা। তারপর বাঁ

পা-টা সেটার উপর তুলে দিয়ে দাঁড়াল। উল্টোদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখেছে ডান পা-টা।

আবার কোমর সমান উঁচুতে আরেকটা লোহার পাত গাঁথল রানা। এভাবে উঠে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

যা ভেবেছিল তাই। দেয়াল কেটে একটা জায়গা বের করা হয়েছে। দাঁড়াবার মত যথেষ্ট প্রশস্ত। হাতের স্পর্শ দিয়ে মেঝের কাঠিন্য টের পেল। কংক্রিট দিয়ে তৈরি। আরেকটা জিনিস ঠেকল হাতে। কিনারা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে একটা পিলার। ছাদের ভার মাথায় নিয়ে। সেটার সাথে দড়িটা বাঁধল ও। গিলটি মিয়া অনায়াসে উঠে আসতে পারবে এবার।

জায়গাটাকে মিনি একটা বারান্দা বলে মনে হলো রানার। হামাগুড়ি দিয়ে উঠল বারান্দায়। ঝুঁকি নিয়ে বোতাম টিপল টর্চের।

একটা দরজা।

গিলটি মিয়া না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। উঠে এসে শিশুর মত সরল দুই চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকাল সে দরজাটার দিকে। মেশিন পিস্তলটা হাতে নিয়ে কক করল রানা, ধাতব একটা শব্দ হলো—ক্লিক্।

'চিচিং ফাঁক!' বলে মৃদু একটা ধাক্কা দিল গিলটি মিয়া দরজার গায়ে।

ভেজানো ছিল, খুলে গেল কবাট দুটো। এক পা পিছিয়ে এল গিলটি মিয়া। হকচকিয়ে গেছে সে। ঠেলা দিতেই খুলে যাবে ভাবতে পারেনি।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে রানা। হাতে উদ্যত মেশিন পিস্তল। রানার পিঠের সাথে সেঁটে আছে গিলটি মিয়া। টর্চের আলো জ্বালতেই চারদিক থেকে উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব ঝিকমিকিয়ে উঠল। অনেকগুলো বেঞ্চের উপর অসংখ্য কাঁচের পাত্র। টর্চের গোল আলো কামরাটার এদিক থেকে ওদিক সরে যাচ্ছে। একটা বিছানার কাছাকাছি গিয়ে থামল। ঘুমোচ্ছে একজন লোক।

তীব্র আলোয় নড়ে উঠল লোকটা, এদিক ওদিক মাথা ঘষছে। 'সামলাও ওকে,' ফিসফিস করে বলল রানা।

লিকলিকে পা ফেলে তিন কদম এগিয়ে লোকটার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল গিলটি মিয়া। ওপাশের দেয়ালে তার ছয় থেকে আটগুণ বড় ছায়া পড়েছে। ছায়াটার হাতে ধরা হাতুড়িটাকে দুই হাত লম্বা দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে মনে বেশ সাহস পেল গিলটি মিয়া। ঘুম ভাঙবে ভাঙবে, ঠিক এমনি সময়ে কপালের পাশে আস্তে একটা ঘা মারল সে। ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো থ্যাচ করে। একটু নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল লোকটা।

আলো ঘুরিয়ে কামরাটা আরও একবার দেখল রানা। আর কেউ নেই। 'দরজাটা বন্ধ করো,' বলল ও। 'ল্যাম্পটা জ্বালো। তাড়াতাড়ি।'

ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় কামরাটার আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল। ঠিক জায়গা খুঁজে পেয়েছে ওরা, বোঝা গেল পরিষ্কার। কামরার কোথাও দ্বিতীয় কোন দরজা নেই। মেঝেটাই শুধু পাকা। দেয়ালের গায়ে পাশাপাশি বাঁশ দাঁড় করিয়ে রেখে মাটির ধস রোধ করা হয়েছে। সিলিংটাও বাঁশের। গুদামঘরই বলা চলে এটাকে। অর্ধেকের বেশি জায়গা জুড়ে রয়েছে কাঠের বাক্স,

র‍্যাকিটাতে লম্বা লম্বা বেঞ্চ। বেঞ্চগুলোয় যন্ত্রপাতি আর কাঁচের জিনিসপত্র, তিল ধারণের জায়গা নেই কোথাও।

খোলা কয়েকটা বোতলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঝুঁকে পড়ে শ্বাস টানতেই কুঁচকে উঠল মুখ। 'মাই গড, এই জিনিসই খুঁজছি।' একটা বোতল থেকে আঙুলের মাথায় খানিকটা সাদা পাউডার তুলে নিয়ে সাবধানে জিভের ডগায় ঠেকাল ও। মুখ বাঁকাল সাথে সাথে। 'এটাও।'

অজ্ঞান লোকটার দাড়িতে হাত বুলাচ্ছিল গিলটি মিয়া, হঠাৎ সে সিধে হয়ে দাঁড়াল। 'দাড়ি গজিয়েচে, তাই চিনতে পারিনি, স্যার। এ্যাকোন পারচি। এ ব্যাটা আর কেউ নয়—আদেল।' বিছানার নিচে চোখ পড়ল তার। কফি পট, নোংরা থালা-বাসন, হুইস্কির বোতল দেখে বলল, 'শেখ বাবাজীরা ব্যাটাকে এখান থেকে বেরুতেই দেয়নি, পাছে কেউ দেকে ফেলে!'

বাক্সগুলো দেখছে রানা। খোলা একটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েই আঁতকে উঠল ও। 'ইয়াল্লা!'

সাঁত করে রানার পাশে চলে এল গিলটি মিয়া। 'তেনাকে আবার ডাকাডাকি কেন, স্যার?'

বাক্সের ভেতর সিলিন্ডারের মত কি সব রয়েছে। গভীর আগ্রহের সাথে দেখছে রানা।

'কি ওগুলো, স্যার?'

'আফিম!' বলল রানা। 'টার্কিশ আফিম। কি আশ্চর্য। ইরানীয়ান নয়, টার্কিশ!'

'কিভাবে বুঝলেন এগুলো তুর্কী?' প্রায় চ্যালেঞ্জের মত শোনাল গিলটি মিয়ার কণ্ঠস্বর।

'আকার-আকৃতি দেখে। তুর্কীরাই এভাবে প্যাক করে,' এক পা পিছিয়ে এসে বাক্সের উপর সাজানো বাক্সগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। 'সবগুলো যদি ভরা থাকে কম করেও দশ টন আফিম আছে এখানে।'

এখান থেকে একটা, ওখান থেকে একটা করে বাক্স তুলে নিয়ে ওজন পরীক্ষা করতে শুরু করল গিলটি মিয়া। বলল, 'খিদে নেই—পেট সবগুলোরই ভরা আচে, স্যার।'

রাসায়নিক পদার্থগুলো কামরার এক কোণে রাখা হয়েছে। গিলটি মিয়ার চুরি করে নিয়ে আসা তালিকাটার সাথে অবশিষ্ট কেমিক্যাল যা আছে তা মিলিয়ে দেখছে রানা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'যতদূর বুঝতে পারছি, অর্ধেকের মত কেমিক্যাল ব্যবহার করেছে আরডেল —কিন্তু মরফিন কোথায়?'

'এটা কি জিনিস বলুন দিকি?'

ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল চারকোনা প্যাকেটের মত কি যেন হাতে নিয়ে একটা বেঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গিলটি মিয়া। এগিয়ে গিয়ে সেটা তার হাত থেকে নিল ও। নখ দিয়ে খুঁটে প্যাকেটের গা ছিঁড়ে ফেলল খানিকটা। 'এ-ও আফিম—পপি গাছের পাতা দিয়ে মোড়া। এটা আফগানিস্তান থেকে এসেছে।' একটা বেঞ্চের উপর প্যাকেটটা নামিয়ে রাখল ও। চিন্তিতভাবে এদিক ওদিক

তাকাল। 'আফিম নয়, আমি খুঁজছি মরফিন। কোথায়!'
'দেখতে কেমন?'
'সূক্ষ্ম শাদা পাউডার, মিহিন দানার লবণের মত। প্রচুর পরিমাণে থাকার কথা এখানে।'
নিঃশব্দে কামরাটা সার্চ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'জন। একটু পরই উত্তেজিত গলায় গিলটি মিয়া বলল, 'এটা কি।' বড়ো একটা কাঁচের পাত্র মাথার উপর তুলে ধরল সে। প্রায় অর্ধেকটাই সাদা পাউডারে ভরা।
নখের মাথায় একটু নিয়ে জিভ ঠেকিয়ে স্বাদ নিল রানা পাউডারের। 'মরফিন! খাঁটি মরফিন!' পাত্রটার ওজন সহ্য করতে পারছে না গিলটি মিয়া, বুঝতে পেরে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলল সেটা ও। বলল, 'পাউন্ড বিশেক হবে এখানে।'
মনে মনে হিসেব কষতে শুরু করে দিয়েছে গিলটি মিয়া। 'আরে বাপরে! পাঁচ লাক ডলার!'
'কিন্তু এর চেয়ে একশো গুণ বেশি মরফিন থাকার কথা এখানে। কোথায়? নেই কেন?'
বোকার মত চেয়ে আছে গিলটি মিয়া রানার মুখের দিকে।
ভাবছে রানা। আফিম যা রয়েছে, এক টন মরফিন বের করার জন্যে যথেষ্ট। আরডেল মাত্র অর্ধেক কেমিক্যাল ব্যবহার করেছে, তার মানে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কাজ শেষ করেছে সে। পঞ্চাশ ভাগ কাজ শেষ করেছে মানে এক টন মরফিন তৈরি করেছে। কোথায় সেই মরফিন?
আরডেলের দিকে ফিরল রানা। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে তার। জ্ঞান ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে ওকে, ভাবল। কিন্তু চেঁচিয়ে উঠে বিপদ ডেকে আনতে পারে। সাথে করে খানিকদূর নিয়ে যেতে হবে।
রুমাল দিয়ে আরডেলের মুখ বেঁধে ফেলল গিলটি মিয়া। ধরাধরি করে কামরা থেকে বের করে অজ্ঞান দেহটা মিনি বারান্দায় নিয়ে গেল ওরা। দড়ি দিয়ে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হলো তাকে। তারপর নিচে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। একটু একটু করে দড়ি ছেড়ে খালে নামিয়ে দিল রানা আরডেলের অজ্ঞান শরীরটা।
কামরায় ফিরে এসে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। এখন থেকে দুই ঘণ্টা পর বিস্ফোরণ ঘটবে, স্থির করল মনে মনে। খাল থেকে উঠে যাবার জন্যে এটা যথেষ্ট সময়।
সময় নিয়ে, খুব সাবধানে, বিস্ফোরণের আয়োজন সম্পন্ন করল রানা।
'পঁচিশ লাক ডলারের ওপর পড়বে, স্যার, আওয়াজটার দাম,' দুই কান পর্যন্ত হাসি গিলটি মিয়ার মুখে। 'মাহমুদ বাবাজীর টনক একদম নড়ে যাবে।'
'চলো, কেটে পড়া যাক,' বলে বেরিয়ে এল রানা কামরা থেকে।
প্রথমে গিলটি মিয়া, তারপর রানা নেমে এল নিচের খালে। টর্চ জ্বেলেই খলখল করে হাসল গিলটি মিয়া। 'আদেল ভায়ার হুঁশ ফিরেচে, স্যার।'
গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে আরডেলের রুমাল বাঁধা মুখ থেকে।

চোখদুটো বিস্ফারিত, মণিদুটো অস্থিরভাবে কোটরের ভেতর এদিক ওদিক ঘুরছে। গিলটি মিয়া একটা ছুরি বের করল। টর্চের আলোয় ছুরির রূপালি ফলা চকচক করছে। 'গলায় ছুরি চেলিয়ে—' ধড় থেকে মুণ্ডু কিভাবে আলাদা করতে হয় ভঙ্গি করে দেখাল সে। 'টুঁ শব্দটি করেচো কি মরেচো!'

আরডেলের পায়ের বাঁধন খুলে দিল রানা। 'হাঁটো।'

আগে আগে গিলটি মিয়া। মাঝখানে আরডেল। পিছনে রানা। হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা বলে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধে হচ্ছে আরডেলের। একবার এদিক হেলে পড়ছে, একবার ওদিক; ধাক্কা খাচ্ছে কানাতের দেয়ালে। হাঁটু ভেঙে পড়েও গেল দু'বার।

পৌনে এক ঘণ্টা পর দুটো গর্তের মাঝামাঝি এক জায়গায় থামল রানা। আরডেলকে দিয়ে কথা বলানোর জন্যে নিরাপদ জায়গা এটা। 'রুমালটা খুলে নাও,' বলল ও।

'কে তুমি?' গিলটি মিয়া রুমাল খুলে নিতেই চেঁচিয়ে উঠল আরডেল। রানার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। 'কি চাও?'

'কতটা মরফিন বের করেছ, আরডেল?' সরাসরি জানতে চাইল রানা। 'কোথায় সেই মারফিন?'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল আরডেল। দ্রুত ওঠানামা করছে বুক।

'উত্তর না দিলে এখানে খুন করে রেখে যাব তোমাকে,' বলল রানা। 'প্রশ্নের জবাব দাও। সময় নেই হাতে। দেরি করলে··· কতটা মরফিন?'

'ওরা আমাকে খুন করবে,' আরডেলের দু'চোখে আতঙ্ক। 'ওদেরকে তুমি চেনো না···'

'ওরা কারা?'

'ফারাজী আর মাহমুদ! তুমি জানো না ওরা কতটা ভয়ঙ্কর···'

'আমরা কতটা ভয়ঙ্কর তুমিও তা জানো না,' বলল রানা। 'দুটো পথ খোলা আছে তোমার সামনে, আরডেল, যে-কোন একটা বেছে নাও। হয় এখন মরো, নয়তো পরে মরো।' গিলটি মিয়ার হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে আরডেলের কণ্ঠনালীর উপর ধরল ফলাটা। 'কতটা মরফিন?'

মাথাটা যথাসম্ভব পিছিয়ে নিচ্ছে আরডেল। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। 'এ-এক হা-হাজার কিলোগ্রাম!'

'কোথায়?' চঞ্চল হয়ে উঠছে রানা। মূল্যবান সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তীব্রবেগে মাথা নাড়ল আরডেল। 'জানি না। ফর গডস সেক! জানি না।'

'কখন সরিয়ে ফেলা হয়েছে?'

'গত রাতে।'

'আমাদের চোকের সামনে দিয়ে পাচার করেচে, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া।

'কোথায় নিয়ে গেছে?' জানতে চাইল রানা। 'তুমি জানো।' ছুরিটায় একটু চাপ দিল ও, আরডেলের গলার চামড়া কেটে গেল, দুই ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামছে।

শিরশিরে একটা অনুভূতি গলা থেকে নিচের দিকে নামছে, কি নামছে বুঝতে পেরেই শিউরে উঠল আরডেল। 'ইরাকে! ইরাকে নিয়ে গেছে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'ছুরিটা সরাও!'

ইরাকে? ভাবছে রানা। এখান থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ইরাকী বর্ডার। সম্ভবত মিথ্যে কথা বলছে না আরডেল।

ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে লোকটা। ঠকঠক করে কাঁপছে। প্রশ্ন করার আগেই গড়গড় করে বলে ফেলছে সব কথা। 'উটের পিঠে করে নিয়ে গেছে ওরা। এখানেই হেরোইন বের করার কথা ছিল আমার, কিন্তু হঠাৎ ওরা সিদ্ধান্ত পাল্টে—'

'ইরাকের কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক জানি না। তবে, জায়গাটা সোলায়মানিয়ার কাছাকাছি কোথাও।'

'রুমাল বাঁধো মুখে,' গিলটি মিয়াকে বলল রানা। ভাবছে: শেখদের গ্রামের উপর দিয়েই চলে গেছে ইরাকে যাবার রাস্তা। গ্রামটা পেরোবার জন্যে টাইম-বোমা ফাটার সময়টাই আদর্শ।

'ব্যাটার ভবিষ্যৎ কি, স্যার?' জানতে চাইল গিলটি মিয়া। 'মাডার করে ফেলব নাকি?' আরডেলের কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জোর গলায় মাডার শব্দটা উচ্চারণ করল সে।

উদ্দেশ্য পূরণ হলো গিলটি মিয়ার। চমকে উঠল আরডেল। দু'চোখে আতঙ্ক।

'ওকে আমরা সাথে করে নিয়ে যাব,' গম্ভীরভাবে বলল রানা।

'কেন, স্যার? বোঝা বাড়াবার দরকার কি? হাত পা বেঁদে একানে রেকে গেলেই তো চলে।'

'সেটা খুন করে রেখে যাওয়ারই শামিল,' বলল রানা। 'পানির গভীরতা কখন বাড়ে না বাড়ে তার ঠিক নেই কিছু। তাছাড়া, বিস্ফোরণের সময় ধসে পড়তে পারে সুড়ঙ্গের যে-কোন অংশ।'

দ্রুত রওনা হলো ওরা। দু'জনের মাঝখানে আরডেল। হাতদুটো আগের মতই বাঁধা। শুধু পা-দুটো মুক্ত। দুই ঘণ্টা সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অবশ্য প্রায় পৌঁছেও গেছে ওরা। আর মাত্র একশো গজ বাকি। তারপরই উঠতে শুরু করবে। এমন সময় হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আরডেল ধাক্কা মারল রানাকে। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল রানা। এক লাফে ওকে ডিঙিয়েই প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল আরডেল পেছন দিকে। এরকম একটা পাগলামি করবে লোকটা, ভাবেনি রানা। অনুসরণ করার কথা ভাবল, কিন্তু ততক্ষণে ছপছপ ছুটন্ত পদশব্দ মিলিয়ে গেছে দূরে। রিস্টওয়াচ দেখল ও। প্রায় আঁতকে উঠল সাথে সাথে। আর মাত্র দশ মিনিট সময় আছে হাতে। এর মধ্যে ফাটবে বোমা। তার আগেই উঠে যেতে হবে উপরে। আরডেলকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় আর। সময় নেই।

না, ওর জন্যে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেবে না—স্থির করল রানা।

আরডেল ছুটে পালিয়েছে, দৌড়োচ্ছে এখনও, পঁচিশ সেকেন্ড পেরিয়ে

গেছে এর মধ্যে।
'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, চলো,' গিলটি মিয়াকে বলল রানা।
'আদেল কিন্তু বাঁচবে না, স্যার।'
'জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু কি করার আছে আমাদের? আমরা তো ওকে এভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাইনি।'
ইতস্তত করছে গিলটি মিয়া। কি যেন বলতে চাইছে। 'স্যার!'
'সময় নষ্ট করছ, গিলটি মিয়া,' রানার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট তিরস্কার।
'কিছুই কি করা যায় না, স্যার?'
চমকে উঠল রানা। গিলটি মিয়ার কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য একটা আর্তনাদ ফুটে উঠেছে।
'কি করতে চাও তুমি?'
'একবার চেষ্টা করে দেকতাম। যদি ফেরত লিয়ে আসতে পারি।'
'তা সম্ভব নয়,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও কঠিন হয়ে গেল রানার গলার স্বর। 'আর কোন কথা নয়, সামনে এগোও।'
প্রতিবাদ করার সাহস হলো না গিলটি মিয়ার। মাথা নিচু করে এগোল।
যে গর্ত বেয়ে নেমেছিল ওরা সেটা বেয়েই উঠল আবার।
উপরে উঠে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। তিন মিনিট বাকি এখনও বোমা ফাটতে। হঠাৎ কি যেন একটা সন্দেহ হতে ঘাড় ফিরিয়ে গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল ও।
নেই!
ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। দু'হাত দিয়ে কিনারা ধরে উঁকি দিল নিচের দিকে। অস্পষ্ট একটা ছুটন্ত ছপাৎ ছপাৎ শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।
'গিলটি মিয়া!'
নিচে থেকে ভেসে এল ওর ডাকের প্রতিধ্বনি।
সমস্ত পরিবেশ বিস্ফোরণের অপেক্ষায় নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। দ্রুত নিচে নেমে এল রানা। শুধু কলকল করে হাসছে পায়ের নিচে চলমান পানি। আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল একবার। ছুটছে ও। একবার চিৎকার করে ডাকল। গলার সবগুলো রগ ফুলে উঠল।
সাড়া নেই গিলটি মিয়ার। ছুটতে ছুটতেই রিস্টওয়াচ দেখল রানা। আর মাত্র এক মিনিট।
আর মাত্র চল্লিশ সেকেন্ড।
বোমাটার দিকে আরও বিশ গজ এগোল রানা। এখনও ছুটছে। আর মাত্র দশ সেকেন্ড। কিন্তু তার আগেই বিকট শব্দে বিস্ফোরণের সাথে পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠল থরথর করে।
ছ্যাঁত করে উঠল রানার বুক। গিলটি মিয়া কি··· নিজেকে চিন্তা করার অবসর না দিয়ে আবার ছুটল রানা।
টর্চের আলো বেশিদূর যায় না; শুধু আবছাভাবে দূরে দেখা গেল একটা দেয়ালের মত কি যেন। দেয়াল? অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল রানার। টর্চ জ্বালতে

সাহস হচ্ছে না। হাতটা কাঁপছে একটু একটু।
হঠাৎ শিউরে উঠল রানা। পায়ের নিচে পানি বাড়তে শুরু করেছে। এতক্ষণ খেয়াল করেনি। গোড়ালি থেকে দু'ইঞ্চি উপরে উঠে গেছে পানি।
এগোল রানা। যত এগোচ্ছে, পানি তত বাড়ছে। নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কলকল শব্দটা এখন নেই তাই। দাঁড়িয়ে আছে পানি। দেয়ালটা তাহলে ভুল দেখেনি ও। সুড়ঙ্গের ছাদ ধসে পড়েছে।
সাহস করে আবার টর্চ জ্বালল রানা। দেয়াল, সন্দেহ নেই। মাত্র পনেরো গজ সামনে। নিষ্প্রাণ একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের দিকে মুখ করে।
পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। শিশুর মত দুই চোখে রাজ্যের সরলতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গিলটি মিয়া। প্রচণ্ড একটা আঘাতে পাথর হয়ে গেছে যেন।
'গিলটি মিয়া!'
সাড়া দিল না গিলটি মিয়া। নড়ল না। তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। ভাবল, কেঁদে ফেলবে বুঝি! কিন্তু না। ধীরে ধীরে রানার দিকে তাকাল সে। 'মোটে বিশ গজ দূরে রয়েচে লোকটা, স্যার। ভাবতে বুকের ভেতরটা কনকন করচে, শত চেষ্টা করলেও ওকে আমরা বাঁচাতে পারচি না।'
'মাত্র বিশ গজ দূরে রয়েছে?'
'এঁটকে গেচে ব্যাটা দুই দেয়ালের মাজখানে,' নিচু গলায়, অনেকটা যেন ঘোরের মধ্যে থেকে কথা বলছে গিলটি মিয়া। 'ওর সামনে আর পিচনে ছাদ ধসে পড়েচে। আর হাত তিনেক যদি এগিয়ে থাকতাম, আটকা পড়ে যেতাম আমিও। চলুন, স্যার। আপনার কথা অমান্যি করেও কিচু করতে পারলাম না।'

গ্রামের সবচেয়ে কাছের গর্তটা থেকে বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। একটার সাথে আরেকটা কুণ্ডলী প্যাঁচ খাচ্ছে, উজ্জ্বল হয়ে উঠছে চাঁদের আলো লেগে।
তীব্রবেগে ছুটছে ল্যান্ডরোভার। গ্রামের গায়ে পৌঁছে গেছে হেডলাইটের আলো। প্রতিমুহূর্তে বিদ্যুদ্বেগে গা ঝাড়া দিচ্ছে দুই মুঠোর ভেতর স্টিয়ারিং হুইল, ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে রানা। মাটি কামড়ে নয়, লাফ দিয়ে দিয়ে খানাখন্দ ভরা রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি।
চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আরও কাছে চলে আসছে গ্রামটা। হেডলাইটের আলোয় সিনেমার পর্দার মত একটা সাদা দেয়াল দেখল রানা, কয়েকটা মোরগ-মুরগি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটছে গা ঘেঁষে। একটা খোলা জানালায় তামাটে একটা মুখ, আলো পড়তে চোখ কুঁচকে ফেলল। রাস্তায় আরেকটা তামাটে মুখ। উন্মত্ত-বেগে গাড়িটাকে ছুটে আসতে দেখে দুটো হাত দু'দিকে লম্বা করে দিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁটদুটো, আতঙ্কে বিস্ফারিত দুই চোখ।
অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল গিলটি মিয়া। 'স্যার, সাবদান! ফাটবে…'
ব্রেক কষল রানা। ল্যান্ডরোভারের পেছনটা শূন্যে উঠে পড়ল। ডিগবাজি খেতে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে ব্রেক রিলিজ করে দিয়ে শেষ রক্ষা করল রানা।

শূন্য থেকে পিছনের চাকাদুটো মাটিতে পড়ল।

ওদের সামনে তখনও ঘটছে কাণ্ডটা। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে দেয়ালের একটা লম্বা ফাটল। হুড়মুড় করে গোটা দেয়ালটাই ধসে পড়ল রাস্তার উপর। প্রচণ্ড শব্দ হলো। সেইসাথে সামনেটা ঢাকা পড়ে গেল বিপুল ধুলোয়। খক্‌খক্ করে কাশছে গিলটি মিয়া, গলায় ধুলো ঢুকেছে।

গিয়ার লিভার ধরে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারল রানা। পিছিয়ে আনছে গাড়ি। ধুলো কমে গেলে দেখল সামনের রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে ইঁট আর মাটির স্তূপ। কাছাকাছি কোথাও থেকে পিস্তল ছুঁড়ল কেউ।

অন্য পথ ধরতে হবে, কিন্তু গাড়ি ঘোরাবার মত জায়গা পাচ্ছে না রানা। প্রথম যে প্রশস্ত জায়গাটা পেল, সেখানেই ঘুরিয়ে নিল গাড়ির মুখ। দ্রুত দেখে নিচ্ছে কোনদিকে কোন পথ আছে কিনা।

'ওই পিচ্চি গলিটা দিয়ে...'

আবার গুলির শব্দ। কিন্তু এদিকে কোন বুলেট আসছে না।

হাতের বাঁ দিকে গলিটা। কোনরকমে ঢুকল গাড়ি। ঢোকার মুখে টং করে একটা শব্দ হলো গাড়ির গায়ে। বুলেট। পাশের জানালা দিয়ে মেশিন পিস্তলটা বের করে ট্রিগারে চাপ দিল গিলটি মিয়া। ফড়ফড় করে কাপড় ছেঁড়ার মত একটানা আওয়াজ করে থেমে গেল মেশিন পিস্তলটা। একটা ম্যাগাজিনের অর্ধেক শেষ করে ফেলেছে সে। 'হুঁশিয়ার করে দিলুম,' চিৎকার করে বলল রানাকে।

সামনে আরও সরু হয়ে গেছে রাস্তাটা। দেয়ালের সাথে ঘষা খেল একবার গাড়ি। কোত্থেকে যেন ছুটে বেরিয়ে এল একজন লোক, মাঝরাস্তায় এসে দাঁড়াল, হাতের রাইফেলটা ওদের দিকে তাক করছে। মুহূর্তে মাথা নিচু করে ফেলল রানা। লাফ দিয়ে ছুটছে গাড়ি, স্পীড বেড়ে গেছে। পরমুহূর্তে দড়াম করে শব্দ হলো। পলকের জন্যে দেখল রানা দুটো হাত উপর দিকে উঠে গেছে, রাইফেলটা ছুটে গিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে লোকটা অন্ধকারে।

রাস্তার বাইরে চলে এসেছে গাড়ি। প্রতিমুহূর্তে পিছিয়ে যাচ্ছে গ্রামটা। সামনে কিছু নয়, শুধু অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। মাথায় এখন নতুন চিন্তা ওর। যত তাড়াতাড়ি ইরাকী বর্ডারে পৌঁছোনো যায়। শেখ মাহমুদ প্রতিশোধ নেবার জন্যে রওনা দেবার আগেই ওখানে কাজ সেরে পালাতে হবে ওদেরকে।

ছয়

ত্রিশ বছর পর ফিরে পাওয়া সন্তানের গায়ে হাত বুলাচ্ছে যেন বরাত খান। তেল চকচকে মসৃণ গা টর্পেডোটার। 'মার্ক ইলেভেন—জীবনে আবার যে এর গায়ে হাত রাখতে পারব, ভাবিনি কখনও!'

'আদর-আহ্লাদ পরে কোরো,' বলল ওয়েস্টম্যান। গম্ভীর। 'ওটার কাছ থেকে কাজ আদায় করার ব্যবস্থা করো আগে।'

'আর কি কি লাগবে তোমার?' জানতে চাইল মাদাম দালিয়া।

'কিছু মেশিন টুলস। একটা লেদ, ছোট একটা মিলিং মেশিন, আর একটা ড্রিল প্রেস। ছোটখাট যন্ত্রপাতি অনেক লাগবে, সেগুলোর একটা তালিকা তৈরি করে দেব আমি।'

'এখুনি ওকে দিয়ে তালিকাটা তৈরি করিয়ে নাও, জ্যাক,' ওয়েস্টম্যানকে বলল মাদাম দালিয়া। 'যা চায় সব জোগাড় করে দাও ওকে। আমি বাড়ি চললাম।'

'আমি?'

'ট্যাক্সি নিয়ে এসো,' চলে গেল মাদাম দালিয়া।

ফ্যাচ্ করে হেসে ফেলল বরাত খান।

প্রায় রুখে দাঁড়াল ওয়েস্টম্যান। 'হাসছ যে?'

'ম্যাডাম আমাদের খুব কড়া বস্,' বলল বরাত খান। 'তবে,' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে গোলাম পাশার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'যদ্দূর মনে হয় আমার ভাগ্নের ওপর তার নেক-নজর পড়েছে, হেঃ-হেঃ!'

খেপে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ওয়েস্টম্যান, পাশা তাকে থামিয়ে দিল একটা কাজের কথা তুলে। টর্পেডোর মাথায় বসানো ক্যাপটা দেখিয়ে বলল, 'এই ওয়ারহেডে আশা করি নেই? খালি?'

'হ্যাঁ। খালিরই অর্ডার দেয়া হয়েছিল।'

'স্বস্তি পেলাম। পুরোনো টি-এন-টি-কে বিশ্বাস করা যায় না।'

'কিন্তু,' বলল বরাত খান, 'ওয়ারহেড খালি থাকলে কাজ হবে না, পরীক্ষায় ফেল মারবে টর্পেডো। টি-এন-টি না থাকুক, প্র্যাকটিস হেড জোগাড় করো। যেখান থেকে এটা জোগাড় করেছ সেখানেই অর্ডার দাও একটা প্র্যাকটিস হেডের।'

'ঠিক আছে। আর কিছু?'

'ব্যাটারি। তালিকায় লিখে দেব কি টাইপের ক'টা লাগবে।' টর্পেডোর দিকে তাকাল বরাত খান। 'এখানেই এটাকে নিয়ে কাজ করব আমি, তাই দুটো কংক্রিটের পিলার তৈরি করিয়ে তার মাঝখানে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'টর্পেডো এতবড় হয়, আমার ধারণা ছিল না,' বলল পাশা।

মুখস্থ বুলির মত আওড়াল বরাত খান, 'টোয়েন্টি ওয়ান ইঞ্চি ডায়ামিটার, টোয়েন্টি-টু ফিট ফাইভ-এ্যান্ড-ফোর ফিফথ-ইঞ্চেস লঙ। ওজন—থার্টি সিক্স হ্যান্ড্রেড এ্যান্ড থার্টি-ওয়ান পাউন্ডস।' ওয়ারহেডের গায়ে টোকা মারল সে। 'এর ভেতর সাতশো আঠারো পাউন্ড বিস্ফোরক টি-এন-টি থাকে।'

সতর্কতার সাথে প্রশ্ন করল ওয়েস্টম্যান, 'সাতশো পাউন্ডের বেশি জিনিস ভরতে পারব ওখানে আমরা?'

'পাঁচশো পাউন্ডের কথা বলেছি, তাতেই সন্তুষ্ট থাকো,' বলল বরাত খান।

'মাথায় কিছু ব্যাটারি ভরতে হবে আমাকে। কিভাবে ছুঁড়বে ওটাকে সে ব্যাপারে কিছু ভেবেছ তুমি?'

'তুমি বিশেষজ্ঞ,' বলল ওয়েস্টম্যান, 'তোমারই তা জানার কথা।'

তিনটে আঙুল খাড়া করল বরাত খান। 'তিনভাবে ছোঁড়া যায়। এক, পানির নিচে একটা টিউব থেকে, যেভাবে সাবমেরিন থেকে ছোঁড়া হয়। দুই, পানির উপর একটা টিউব থেকে, যেভাবে ডেস্ট্রয়ার থেকে ছোঁড়া হয়। এবং তিন, এরোপ্লেন থেকে। মূল্যবান কিছু পাচার করার ইচ্ছা থাকলে এরোপ্লেন থেকে ছোঁড়ার পরামর্শ আমি দিই না। গাইডেন্স সিস্টেম ফেল মারার ভয় তাতে খুব বেশি।'

'বুঝলাম,' বলল ওয়েস্টম্যান। 'এরোপ্লেন বাদ। বাকিগুলো সম্পর্কে বলো।'

'ডেস্ট্রয়ার জোগাড় করা তোমাদের কম্মো নয়,' বলল বরাত খান। 'সুতরাং ওটাও বাদ। পানির নিচে থেকে ছুঁড়তে পারো তোমরা। গোপনীয়তা রক্ষা পাবে এতে। তবে, জাহাজ লাগবে একটা।'

'লাগলে পাবে।'

'আর লাগবে সাবমেরিন-টাইপ টিউব একটা।'

'টিউবও পাবে।'

মস্ত একটা হাই তুলল বরাত খান। তুড়ি দিল। 'ক্লান্তি লাগছে। তালিকাটার জন্যে কাল এসো তুমি।'

'কিন্তু বস্ বলে গেলেন আজই!'

'তাড়াহুড়োর কাজ নয় এটা,' বলল বরাত খান। 'বললে করতে পারি, কিন্তু সাফল্যের গ্যারান্টি দিতে পারব না।' পাশেই দাঁড়িয়ে আছে পাশা, তার একটা হাত ধরল সে। 'চলো, ভাগ্না বিছানায় যাওয়া যাক। ওহে, ওয়েস্টম্যান, কাল বেলা দশটার আগে এসো না। ঘুম ভাঙতে দেরি হবে আমাদের।'

শেডের বাইরে বেরিয়ে এসে ওয়েস্টম্যান বলল, 'একটা কথা, আলী লোকটা তেমন সুবিধের নয়। পালাতে গিয়ে ওর হাতে আবার জানটা খুইয়ে বোসো না তোমরা কেউ—দুঃখ পাবে মাদাম দালিয়া।'

'এত দুঃখ মাদামকে আমরা দিতেও চাই না,' হাসতে হাসতে বলল পাশা।

তালিকাটা হাতে পেয়ে দ্রুত কাজ দেখাল ওয়েস্টম্যান। দু'দিনের মধ্যে সমস্ত যন্ত্রপাতি জোগাড় করে জায়গা বেছে বসিয়ে দিল সে।

টর্পেডো নিয়ে কাজ শুরু করে দিল বরাত খান। জিনিসটার জটিল মেকানিজম দেখে থ হয়ে গেল পাশা। কয়েকগুণ শ্রদ্ধা বেড়ে গেল তার বরাত খানের উপর।

বাহান্নটা লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি খুলে বের করে নিল বরাত খান। শেডের এক কোণায় সাজিয়ে রাখা হলো সেগুলো। 'পরে মোটর টেস্ট করার সময় ওগুলো কাজে লাগবে,' বলল সে। 'দামী ব্যাটারিগুলো ব্যবহার করার কোন

মানে হয় না। তবে, মোটর টেস্ট করা হয়ে গেলে সাগরে ফেলে দেয়া উচিত ওগুলো। নেভীর যে-কোন লোক যদি একবার দেখে—ব্যস, খেল খতম, পয়সা হজম!'

কাজপাগল লোক বরাত খান। যত দেখছে তাকে পাশা ততই অবাক হচ্ছে। পরিষ্কার করার জন্যে মোটরটাও বের করল সে। নেড়েচেড়ে দেখছে। বলল, 'বাহ্, তাজা ফুলের মত নিষ্কলঙ্ক!'

হেসে ফেলল পাশা। গভীর স্নেহে মোটরটার গায়ে হাত বুলাচ্ছে বরাত খান।

এরপর অত্যন্ত ধীর গতিতে, গভীর মগ্নতার সাথে টর্পেডোকে বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করল বরাত খান। পাশাকে সে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে পঁচিশ হাত দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। তারপর কি মনে করে কাছে ডেকে কাজ দিল তাকে। ছোটখাট যন্ত্রাংশগুলো বরাত খানের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রাখতে শুরু করল সে। পেট্রল দিয়ে পরিষ্কার করার ব্যাপারেও পাশাকে প্রতিটি যন্ত্রাংশের জন্যে আলাদা আলাদাভাবে অনুমতি প্রার্থনা করতে হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ছাড়া একটাও পাশাকে ছুঁতে দিচ্ছে না বরাত খান। গ্ল্যান্ডগুলো প্যাক করার জন্যে বিশেষ ধরনের তেল আর গ্রিজ চেয়ে বসল সে হঠাৎ করে। প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল ওয়েস্টম্যান, চোখ গরম করে তাকাল তার দিকে। ঘামে ভেজা কালো মুখটা রাগে লালচে হয়ে উঠেছে। ভয় পেয়ে গেল ওয়েস্টম্যান। বরাত খানের তাকাবার ভঙ্গিটা এমনই যে এখন সে যদি আধ সের ওজনের একটা ইস্পাতের যন্ত্রাংশ ওর কপাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নিজেই তেল আর গ্রিজ জোগাড় করতে বেরিয়ে গেল ওয়েস্টম্যান। আধঘণ্টা পর ফিরতেই নতুন একটা হুকুম করল তাকে বরাত খান। বিখ্যাত এক কোম্পানির নাম করে বসল, ওদের তৈরি সবচেয়ে দামী অয়্যার লাগবে সার্কিট রি-ডিজাইনের জন্যে।

ওয়েস্টম্যানের তালিম হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। বিনা প্রতিবাদে হুকুম তামিল করতে ছুটল সে।

গাইডেন্স সিস্টেম নিয়েই অধিকাংশ সময় মাথা ঘামাচ্ছে বরাত খান। 'এটাই টর্পেডোকে সোজা ছুটিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে,' চা খাবার ফাঁকে বা অন্য কোন অবসর মুহূর্তে টর্পেডো ছাড়া কোন গল্প নেই তার মুখে। পাশা তার একনিষ্ঠ শ্রোতা।

'মার্ক ইলেভেন ভাল একজন মেকানিকের হাতে পড়লে রাইফেলের বুলেটের মতই লক্ষ্যভেদ করতে পারবে—ধরো, একশো গজের মধ্যে এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হবে। সাধারণ একটা মার্ক ইলেভেনের রেঞ্জ কম, তাই, ঠিকমত যদি কাজ করে তাহলে আঘাত হানার ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের কাছ থেকে ছয় ফিটের মধ্যেই আঘাত হানবে ওটা। কিন্তু আমার এই সুন্দরী একাদশীকে ছুটতে হবে অনেকটা পানিপথ, তাই রেকর্ড ভেঙে লক্ষ্য আরও অব্যর্থ করার জন্যে খাটছি আমি। একশো গজে আধ ইঞ্চি, তার বেশি এদিক-ওদিক যেন না

হয় সে চেষ্টা করছি। কাজটা প্রায় অসম্ভব, তবু চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি।'

'কিন্তু, মামা, তোমার এই কৌশল যদি ওরাও জেনে যায়...'

হোঃ হোঃ করে হাসল বরাত খান। 'নো চিন্তা, ভাগ্না, ডু ফুর্তি। স্যার মাসুদের কথা আমার মনে আছে। মাত্র একবার, শুধু হাতেকলমে প্রমাণ দেবার সময়, টর্পেডোটা পনেরো মাইল ছুটবে। তারপর আর কখনোই না।'

প্রতিটি নাটবল্টু পর্যন্ত টর্পেডোটা থেকে আলাদা করে খুলে নেয়া হলো। বরাত খান তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করল একটা একটা করে। পরিষ্কার করল, গ্রিজ বা তেল দিল তারপর আবার জায়গামত বসিয়ে দিল। পুরো টর্পেডোটা আবার জোড়া লাগাবার পর ক্ল্যাম্পের সাহায্যে একটা বেঞ্চে নামানো হলো সেটাকে।

বেঞ্চ টেস্টের জন্যে তিন ঘণ্টা ধরে প্রস্তুতি নিল বরাত খান। ক্ল্যাম্প দিয়ে অত্যন্ত শক্তভাবে বাঁধা হলো টর্পেডোটাকে। মাত্র হাফ হর্স পাওয়ারে পরীক্ষা করা হবে, কিন্তু মজবুত করে বাঁধা না হলে শেডটাকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে দানবটা।

'টিউব কই?' ওয়েস্টম্যানকে শেডে ঢুকতে দেখে প্রশ্ন করল বরাত খান। 'টর্পেডোর সব কাজ শেষ করে ফেলেছি আমি।'

'এসো,' বলল ওয়েস্টম্যান।

উপকূল ধরে খানিকটা দূরে একটা ছোট শিপইয়ার্ডে নিয়ে গেল ওদেরকে ওয়েস্টম্যান। ঝোড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে ভাসছে ৩,০০০ টনের একটা কোস্টার। 'এটাই হলো আমাদের জাহাজ—ভয়েজার। পানামায় রেজিস্টার্ড।'

সন্দেহে ভুরু কুঁচকে উঠল পাশার। 'ওটায় চড়ে তুমি আটলান্টিক পাড়ি দিতে চাও?'

'আমি, তুমি—আমরা সবাই পাড়ি দেব ওটাতে চড়ে,' বলল ওয়েস্টম্যান। হাসছে সে। 'এর আগেও আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছে ওটা, আর একটিবার পাড়ি দিলেই ওর প্রয়োজন ফুরোবে আমাদের। তারপর ওটার খোঁজ কেউ কোনদিন পাবে না। এখন একটা আন্ডারওয়াটার টিউব বসাতে হলে ওর খোলের গায়ে একটা গর্ত করতে হবে। কিভাবে তা করা যায়?'

কাছ থেকে দেখার জন্যে ভয়েজারে গিয়ে উঠল ওরা। নিচে, বো-তে প্রচুর সময় কাটাল বরাত খান। একটা স্কেচ তৈরি করল। 'একটা কফার ড্যাম তৈরি করাও,' ওয়েস্টম্যানকে বলল সে। 'খোলের বাইরে এই যে এখানে যে দাগটা দিয়েছি, এখানে ওয়েল্ডিং করে লাগাতে হবে ওটাকে। তারপর আমি ভেতর থেকে এতটা গর্ত করে একটা টিউব বসাব। বসানোর কাজ শেষ হলে কফার ড্যাম খুলে নিলেই হবে। এমন একজন ডাইভার খুঁজে বের করো যে তার মুখে তালা মেরে রাখবে। মনে রেখো কাজটা স্বাভাবিক নয়। কোন শিপইয়ার্ড...'

নিঃশব্দে বেশ কিছুক্ষণ হাসল ওয়েস্টম্যান। 'শিপইয়ার্ডটা আমাদের।'

পুরো এক হপ্তা লাগল বরাত খানের লঞ্চিং টিউবটা ফিট করতে। 'জাহাজটাকে এখন শুধু লক্ষ্যের দিকে স্থির রাখতে হবে,' বলল সে। 'তাছাড়া

বাকি সব কাজ শেষ। আমরা ট্রায়ালের জন্যে রেডি।'

উদ্বেগ বাড়ছে পাশার। ওরা বন্দী, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এদিকে মাদামের দেখা নেই বেশ ক'দিন থেকে। দুশ্চিন্তার এটাও একটা কারণ। রূপের আগুনটাকে চোখে চোখে রাখতে পারলে বোঝা যেত কি সে ভাবছে, কি সে করছে।

প্রসঙ্গটা তুলল পাশা। ওয়েস্টম্যান প্রথমবার এড়িয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিরক্ত হয়েই জানিয়ে দিল, তার বস্ আমেরিকায় গেছে কাজ গোছাতে।

পরদিন কাকভোরে মার্সিডিজ নিয়ে এল ওয়েস্টম্যান, পাশাকে যেতে হবে। কোথায়? বলবে না ওয়েস্টম্যান। পাশা গেলেই দেখতে পাবে।

বেঁকে বসল বরাত খান। একা সে ছাড়বে না পাশাকে। অনেক বুঝিয়ে, অভয় দিয়ে তাকে রাজি করাল পাশা। ওয়েস্টম্যান কোন কথাই বলল না। কেন যেন তার মনটা খুব খারাপ।

বৈরুতের হৃৎপিণ্ড ভেদ করছে গাড়ি। পকেটে রাখা এনভেলপটা বাইরে থেকে স্পর্শ করে দেখল পাশা, আছে। কিন্তু রানা এজেন্সীর লন্ডন শাখায় পাঠাবার জন্যে পোস্টবক্সে ফেলার সুযোগ হবে কি? ভাবছে।

ইয়ট হারবারে থামল মার্সিডিজ। সুদর্শন, সুসজ্জিত একজন নাবিকের হিল্লায় পাশাকে ছেড়ে দিল ওয়েস্টম্যান। নাবিক ওকে নিয়ে চড়ে বসল একটা লঞ্চে।

'কোথায়?' যথাসম্ভব হালকা স্বরে জানতে চাইল পাশা।

'ইয়ট কুয়ান ডি, শান্তিয়ানায়,' আঙুল তুলে দূরে ইঙ্গিত করল নাবিক। 'ওখানে।'

কাছ থেকে দেখে ইয়টটা সম্পর্কে একটা ধারণা হলো পাশার। ভূমধ্যসাগরে এ ধরনের ইয়টই সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়। কোন ধনী লোকের শখের খেলনা। শ'দুই টনের বিলাসতরী, আরাম আয়েশের অত্যাধুনিক আয়োজনের কোন কমতি নেই।

সান ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো পাশাকে। মই বেয়ে ওঠার সময়ই নোঙর তোলার শব্দ পেল ও। তারপরই টের পেল ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার কম্পন। বুঝল, কুয়ান ডি শান্তিয়ানা তার অপেক্ষাতেই ছিল এতক্ষণ।

সান ডেকে দেখা হলো মাদাম দালিয়ার সাথে। সূর্যের প্রতি তার উদারতার বহর দেখে একটু অবাক হবার সাথে সাথে কিঞ্চিৎ লজ্জাও পেল পাশা। মাদাম দালিয়া টুপিস বিকিনি পরে আছে, এর চেয়ে ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখার সৌভাগ্য পাশার হয়নি। দ্রুত একটা হিসেব কষে ফেলল সে, বিকিনিটার ওজন এক আউন্সের আট ভাগের এক ভাগের বেশি নয় বলে মনে হলো। অন্তত, মাদাম দালিয়া রঙিন যে সানগ্লাসটা চোখে লাগিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে সেটার চেয়ে ওটার ওজন কমই হবে।

দুটো হাত উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙল মাদাম দালিয়া। ঢোক গিলে

অন্য দিকে তাকাল পাশা।

'খোকা নাকি?' বলেই খিলখিল করে হেসে ফেলল মাদাম দালিয়া, ইজি-চেয়ারের পাশে দাঁড়ানো ডেক-চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'বসো। চিন্তা কিসের? তোমাকে আমি সব শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। আমার হাতে পড়লে পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠবে দু'দিনেই।'

ডেক-চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাল পাশা। 'এখানে কি?'

'এখানে? এখানে মজা!' মাদাম দালিয়া পাশের তেপয় থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে পাশার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'ঢক ঢক করে মেরে দাও খানিকটা। পুরুষ মানুষরা গ্লাসে চুমুক দিয়ে মদ খাচ্ছে এ আমার একদম ভাল্লাগে না।' অকস্মাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল সে, 'টর্পেডোর কাজ কদ্দূর?'

'খতম,' বলল পাশা। 'দিন শেষ হবার আগেই একশো হাজার ডলার আমাদেরকে দেবার কথা তোমার, দালিয়া।'

সকৌতুকে পাশার মুখে কি যেন খুঁজছে মাদাম দালিয়া। 'শুধু দালিয়া? মাদামটা কোথায় গেল? বাহ্! উন্নতি হচ্ছে তোমার, স্বীকার করতেই হবে!'

'কাজের কথা বলো, দালিয়া,' পাশা গম্ভীর। 'যদি ভেবে থাকো কাজ করিয়ে নিয়ে…'

'আরে না! চেক কেটে রেখেছি, আশা করি দিতে পারব তোমাদেরকে।'

টর্পেডো পরীক্ষার ফলাফল শূন্য হলে তার শাস্তি কি হবে সে ব্যাপারে একটু আভাস রয়েছে মাদাম দালিয়ার কথাটায়। কপালে চিকণ ঘাম দেখা দিল পাশার। গভীর একটা নিঃশ্বাস টেনে যথাসম্ভব হালকাভাবে জানতে চাইল সে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' মাথা ঘুরিয়ে দ্রুত অদৃশ্যমান তীরের দিকে তাকাল।

হঠাৎ উঠে বসল মাদাম দালিয়া। ঝাঁকুনি লেগে ব্রেসিয়ার সরে গিয়ে একটা বুক বেরিয়ে আসতে চাইছিল, চট্ করে স্ট্র্যাপ টেনে ঠিক করে নিল। বলল, 'ভয়েজারে যাচ্ছি আমরা। দূরে, শিপিং রুটের বাইরে কোথাও আছে ওটা। দ্রুতগামী কয়েকটা বোটও আছে আমাদের, পাহারা দেবে, যাতে কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করতে আসার আগেই খবর পেয়ে যাই।'

'পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'দু'ঘণ্টা—হয়তো আরও বেশি।'

'ধরো, যেতে আসতে ছয় ঘণ্টা,' বলল পাশা। 'আর ট্রায়ালের পিছনে যে কত সময় লাগবে আন্দাজ করতে যাওয়া বৃথা। তার মানে সারাটা দিন জাহাজে থাকতে হবে। এরই মধ্যে সী-সিকনেস ফিল করছি…'

জিভের ডগা দিয়ে উপরের ঠোঁটের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ভিজিয়ে নিল মাদাম দালিয়া। 'সী-সিকনেসের অভিনব একটা ওষুধ জানা আছে আমার। অব্যর্থ, বিলিভ মি। সী-সিকনেস ফিল করার অবসরই তোমাকে দেয়া হবে না, খোকা ষাঁড়।' মাথার পেছনে দু'হাত নিয়ে গিয়ে বুক দুটো সামনে বাড়িয়ে দিল সে। কথাটা বিশ্বাস করল পাশা।

সকালের শান্ত সাগর। ভটভট, এবং আরও নানান জাতের ভোঁতা শব্দ তুলে

এগোচ্ছে ভয়েজার। মই বেয়ে ব্রিজে উঠে গিয়ে বলল বরাত খান, 'সব ঠিক আছে। ব্যাটারি গরম করতে দিয়েছি আমি।'

মাথা ঝাঁকাল ওয়েস্টম্যান। অফিসারের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'স্কিপার বেজার হয়ে আছে। ভয়েজারকে কন্ট্রোল করতে খুব নাকি অসুবিধে হচ্ছে।'

'খোলের গায়ে অতবড় গর্ত করলে যা হবার তাই হচ্ছে,' বলল বরাত খান। 'অন্য দিকে একই আকারের আরেকটা গর্ত করলে কিছুটা ভারসাম্য রক্ষা পেতে পারে।'

'হুঁ,' বলল ওয়েস্টম্যান। 'ব্যাটারি গরম করার ব্যাপারটা কি?'

'ঠাণ্ডার চেয়ে গরম ব্যাটারি অনেক দ্রুত এবং সহজে পাওয়ার ডেলিভারি দেয়। ত্রিশ ডিগ্রী ফারেনহাইটের ব্যবধান প্রচুর রেঞ্জ বাড়াতে সাহায্য করবে। সম্ভাব্য সবটুকু রেঞ্জ দরকার আমাদের।' একটা সিগারেট বের করল বরাত খান। 'টর্পেডো আমি এমনভাবে সেট করেছি যাতে বারো ফিট পানির নিচে দিয়ে ছোটে সে। এরচেয়ে আরও নিচে দিয়েও ছোটানো যেত, কিন্তু তাতে পানির ওপর উঠে আসার আশঙ্কা আছে। তা এলে, কোর্স এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে। দৌড় শেষ করে ঠিক একটা কর্কের মত ভেসে উঠবে ওটা।'

'উঠবে কিনা তা দেখার জন্যে ওখানে হাজির থাকবে তুমিও।'

'মানে? ফায়ারিং চেক করার জন্যে আমার তো এখানেই থাকার কথা।'

'দু'জায়গাতেই সশরীরে উপস্থিত থাকবে তুমি,' বলল ওয়েস্টম্যান। 'টর্পেডো ছোঁড়া হয়ে গেলেই একটা বোটে চড়ে তুমি অপর প্রান্তে চলে যাবে।'

দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালল বরাত খান। 'একটা টর্পেডোকে পিছনে ফেলা...'

'বোটটা যদি ফরটিফাইভ নটে ছোটে? তাহলে সম্ভব?'

সিগারেট ধরিয়ে বরাত খান ধোঁয়া ছাড়ল একমুখ। 'সম্ভব।'

শার্টের বোতাম লাগাল পাশা। এলোমেলো বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে পোর্ট-হোল দিয়ে বাইরে তাকাল।

সিধে হয়ে রিস্টওয়াচ দেখল ও। দু'ঘণ্টার উপর সাগরে রয়েছে ওরা। বাথরূম থেকে ঝর্ণার পানি পতনের ঝিরঝির শব্দ আসছে, তার সাথে মাদাম দালিয়ার গুনগুন সুর। দরজা খুলে গেল। কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মাদাম দালিয়া, নগ্ন গা বেয়ে পানি ঝরছে। একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিল সে পাশার দিকে। 'মুছে দাও।'

তোয়ালে দিয়ে যত্রতত্র মাদাম দালিয়ার শরীর চেপে ধরেছে পাশা। আবার গরম হয়ে উঠতে চাইছে নিজের শরীর। 'আমেরিকায় গিয়েছিলে কেন?'

পাশার দু'হাতের মধ্যে মাদাম দালিয়ার উরুর পেশী শক্ত হলো একটু। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

'ওয়েস্টম্যান বলেছে।'

'বেশি কথা বলে জ্যাক।' খানিকপর বলল, 'কাজ গোছাতে গিয়েছিলাম।'

'অভিযান সফল?'

'সম্পূর্ণ,' মোচড় খেয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল মাদাম দালিয়া। 'অঢেল টাকা রোজগার করতে যাচ্ছি আমি।'

'জানি,' বলল পাশা। 'নিজের জন্যে আরও বেশি টাকার ব্যবস্থা করা যায় কিনা ভাবছি আমিও।'

'হয়তো একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে, ট্রায়ালটা যদি সাকসেসফুল হয়। ওয়েস্টম্যান সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'

'টাফ বয়।'

'ওর সাথে তোমার বনিবনা হবে বলে মনে করো?'

'ওকে আমি মেনে নিতে পারব—ও যদি আমাকে মেনে নিতে পারে।'

ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ বাঁধছে মাদাম দালিয়া। 'কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা যাবে।' আয়নায় দেখছে নিজেকে। 'এমন কি তোমাদের মধ্যে বনিবনা না হলেও কিছু একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব।'

ডাইনী! ওকে দিয়ে ওয়েস্টম্যানকে সরাতে চাইছে। ওয়েস্টম্যানের আসনে ওকে বসাবে, তারপর পুরানো হয়ে গেলেই কামতৃষ্ণা মেটাবার জন্যে নতুন কাউকে জোগাড় করে তাকে দিয়ে সরাবে ওকে। কতজন লোককে খুন করেছে সে, মনে পড়ে যাচ্ছে পাশার। সাদাতের রিপোর্টে প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা লেখা আছে। তাদের মধ্যে কতজন দালিয়ার প্রেমিক ছিল কে জানে! মেয়ে নয়, মেয়ে-মাকড়সা!

আন্তরিকতার সাথে হাসল পাশা। 'ধন্যবাদ।'

ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষছে মাদাম দালিয়া। 'তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে, পাশা। আমি বুঝতে পারছি, আমি আমেরিকায় গেছি একথা ওয়েস্টম্যান তোমাকে বলেনি, তুমি ওয়েস্টম্যানকে দিয়ে বলিয়েছ।'

'বুদ্ধিমান বলার জন্যে ধন্যবাদ।'

'এতই যখন বুদ্ধি তোমার, তাহলে নিশ্চয়ই একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তুমি আমাকে? গোল্ডেন ফিল্ম সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

ওর দিকে পেছন ফিরে বসে আছে দালিয়া। কিন্তু আয়না দিয়ে ওকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে, অনুভব করছে পাশা। মুখের ভাব একটুও বদলাল না ওর। 'ওটা একটা ইংলিশ—ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি। বেশ বড়।'

'মাথায় কে আছে?'

'হ্যামিলটন নামে একজন লোক—স্যার হ্যামিলটন।'

ঘাড় ফিরিয়ে পাশার দিকে তাকাল দালিয়া। 'এবার বলো, মহৎপ্রাণ একজন ইংরেজ—মি লর্ড, আমার সাথে কেন লাগতে চায়?'

'মহৎপ্রাণ—হ্যাঁ, তা তুমি বলতে পারো স্যার হ্যামিলটনকে। তিনি কি তোমার পেছনে লেগেছেন?'

'তার কোম্পানি লেগেছে। প্রচুর টাকা খোয়াতে হয়েছে আমাকে, পাশা।'

একপাক নেচে ওঠার ইচ্ছাটাকে দমন করল পাশা। মুখটাকে নির্বিকার

করে রাখল। ছুরি তাহলে মাসুদ ভাই ডাইনীটার হৃৎপিণ্ডেই বসাতে পেরেছে। কাঁধ ঝাঁকাল। 'হ্যামিলটন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না আমি তবে জানি গোল্ডেন ফিল্ম কোম্পানি ভাল ছবি তৈরি করে। কয়েকটা আমি দেখেছিও।'

হাতের চিরুনিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আয়নার সামনে থেকে উঠে দাঁড়াল দালিয়া। 'ওরা আমার কত টাকা নষ্ট করেছে ভাবতেও পারবে না। ওরা···' ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। দালিয়া রিসিভার তুলল, 'ইয়েস?··· অল রাইট।'

পোর্ট হোল দিয়ে বাইরে তাকাল পাশা। ভয়েজারকে দেখা যাচ্ছে। খুব দূরে নয় এখন।

'চলো, ডেকে ডাকছে আমাদেরকে। ভয়েজারে বদলি হব আমরা।'

ডেকে কয়েকজন নারিক একটা বোট নামাতে ব্যস্ত। কুয়ান ডি শান্তিয়ানা দাঁড়িয়ে পড়েছে। অল্প ঢেউয়ে ছন্দহীন দুলছে। ইয়টের ডান পাশে, দু'শো গজ দূরে রয়েছে ভয়েজার।

দালিয়াকে অনুসরণ করে বোটে চড়ল পাশা। অলস ভঙ্গিতে একটা বৃত্ত রচনা করে ভয়েজারের দিকে এগোচ্ছে বোট। কোস্টারে উঠেই কাজের লোক হয়ে উঠল দালিয়া। 'তুমি তৈরি, বরাত খান?'

সহজভাবে হাসল বরাত খান। 'তৈরি।'

ছোট্ট, মাত্র এক সেকেন্ড স্থায়ী একটা হাসি উপহার দিল তাকে দালিয়া। পরমুহূর্তে গম্ভীর।

ডেক কেঁপে উঠল ইঞ্জিন স্পীড বাড়িয়ে দেয়ায়। 'কোত্থেকে, কিভাবে শুরু করছি আমরা?' জানতে চাইল পাশা।

'আরও পনেরো মাইল যাব আমরা,' বলল ওয়েস্টম্যান। 'তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুঁড়ব। টর্পেডো যদি কোর্স শেষ করার আগেই পানির উপর উঠে পড়ে, সেকথা ভেবে রুটের দু'জায়গায় দুটো বোট রাখা হয়েছে। তবে, টর্পেডোকে আমরা পিছু পিছু অনুসরণ করে যাব সারাক্ষণ। ইয়টের কাছাকাছি কোথাও ভেসে ওঠার কথা তার—যতটা রেঞ্জ আমাদের দরকার তা যদি পাই।'

প্রতি মিনিটে এক ডিগ্রী করে উত্তেজনা বাড়ছে ওদের শরীরে। পায়চারি করছে পাশা। বরাত খান গম্ভীর। ভয়েজারে চড়ার পর থেকে তিনটে সিগারেটে আগুন ধরাল দালিয়া। অস্বাভাবিক গম্ভীর ওয়েস্টম্যান।

পায়চারি করছে বটে, কিন্তু বরাত খানের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে পাশা। লোকটার প্রতিভা সম্পর্কে হঠাৎ করেই সংশয় জাগছে মনে। টর্পেডো নিয়ে গাধার মত খেটেছে লোকটা, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ফল কতটুকু কি হবে বলা মুশকিল। মার্ক ইলেভেনকে পনেরো মাইল দৌড় খাটানো অসম্ভব একটা স্বপ্ন, এ-কথা নিজেই স্বীকার করেছে বরাত খান। অসম্ভবকে সম্ভব করার দায়িত্ব হাতে নিয়েছে সে। পারবে তো?

না পারলে···মনে মনে আতঙ্কিত হলো পাশা। ব্যর্থ হলে দালিয়া ধরে নেবে ওরা তাকে বোকা বানিয়েছে। মস্ত একটা অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে সে ওদের এই ব্যর্থতাকে। নিজেদের সম্পর্কে ওদের দেয়া পরিচয় ভুয়া, সন্দেহ

করবে সে। সন্দেহ নিরসনের অনেক পন্থা জানা আছে তার। সবচেয়ে সহজ পন্থা শারীরিক নির্যাতন, নিশ্চয় এও জানা আছে।

গম্ভীর বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবছে বরাত খান। কি হবে? ট্রায়ালটা যদি সফল হয়, কি হবে তখন?

ট্রায়ালে সাফল্য এলে অধৈর্য হয়ে উঠবে মাদাম দালিয়া উপায়টাকে কাজে প্রয়োগ করার জন্যে। আটলান্টিক পাড়ি দেবে সে, সাথে ওকে আর পাশাকেও রাখতে চাইবে। পনেরো মাইল দূরে থাকতে হেরোইন ভরা টর্পেডো তীরের দিকে ছোঁড়া হবে। ছোঁড়া হবে, কিন্তু পনেরো মাইল পেরিয়ে তীরে সেটা কোনদিনই পৌঁছুবে না—যাতে না পৌঁছোয় তার ব্যবস্থা অবশ্যই করবে সে। কিন্তু, পৌঁছুল না দেখে মাদাম দালিয়া তখন কি করবে?

কি করবে তা অনুমান করা কঠিন কিছুই নয়, ভাবছে বরাত খান। যা করবে তা বিশদভাবে কল্পনা করা যাচ্ছে না বটে, তবে মোটামুটি ঘটনাটা সম্ভবত এইরকম হবে: কংক্রিটের কফিনের ভেতর ভরে ওদেরকে ফেলে দেয়া হবে সমুদ্রের মধ্যে।

চিন্তাটা রোমহর্ষক।

মাদাম দালিয়ার খপ্পর থেকে বেরুবার কি কোন উপায়ই নেই? হয়তো আছে। কিন্তু শুধু মুক্তি পাওয়াটাই তো আর ওদের উদ্দেশ্য নয়। হেরোইনের চালানটাকেও সেই সাথে ধ্বংস করতে হবে। কিভাবে তা সম্ভব?

যতক্ষণ না ওয়ারহেডে হেরোইনে ভরা হচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তারপর পরিস্থিতি বুঝে দু'জনের একসাথে কেটে পড়ার সুযোগ দেখামাত্র, সমস্ত হেরোইন ধ্বংস করে দিয়ে নও দো এগারা হয়ে যেতে হবে। কিন্তু সবই নির্ভর করছে মাদাম দালিয়া কি করে না করে তার উপর। অপেক্ষা করা ছাড়া ওদের কোন উপায় নেই।

পায়চারি থামিয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে রয়েছে পাশা। ঘুরতেই দেখল দালিয়া আর ওয়েস্টম্যানের মাথা প্রায় একসাথে ঠেকে আছে। মুহূর্তে বুঝে নিল সে, কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। আমেরিকায় গিয়ে কি কি ব্যবস্থা করে এসেছে সব শোনাচ্ছে দালিয়া ওয়েস্টম্যানকে। আহা, ভাবছে পাশা, যদি সে জানত কোথায় পাঠানো হচ্ছে হেরোইন, তাহলে আমেরিকার গ্যাংটাকে হেরোইন সহ ঘেরাওয়ের ব্যবস্থা করা যেত। এবং তাহলে ওর ও বরাত খানের ঘাড়ে কোন সন্দেহ পড়ত না, অথচ উদ্দেশ্য হাসিল হত পুরোমাত্রায়।

টেলিগ্রাফ বেলের শব্দে চিন্তায় বাধা পড়ল পাশার। ডেকের কম্পন কমে যাচ্ছে। নিচে গিয়েছিল বরাত খান, উঠে এল সে। ঝুঁকে পড়ে সাগরের দিকে তাকাল। 'পৌঁছে গেছি আমরা। নিচে ওটা কি তাকিয়ে দেখো, ভাগ্নে।'

পাশা দেখল তন্বী একটা হাঁস যেন বোটটা। দেখেই মনে হয় আশ্চর্য দ্রুত বেগে ছুটতে পারবে। ওদের পাশে এসে দাঁড়াল ওয়েস্টম্যান। 'ওটাই আমাদেরকে ইয়টে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। বরাত খান, কিভাবে কাজটা করতে যাচ্ছ বলো দেখি?'

'বোট থেকে এই জাহাজের সাথে কথা বলা যাবে?'

'যাবে। রেডিও কমিউনিকেশন আছে।'

'কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে রাখো স্কিপারকে। কম্পাসবক্সের কাছে বোতাম আছে একটা, কম্পাসের কাঁটা নর্থ ম্যাগনেটিকের দিকে নির্দেশ করলে বোতামটায় চাপ দেবে সে। ওই বোট থেকে টর্পেডোর রওনা হওয়াটা দেখতে চাই আমি। কম্পাসের দিকে চোখ রেখে ঠিক সময়মত বোতামে চাপ দিতে হবে শুধু তাকে। হুইলের দায়িত্ব তার হাতে থাকাই ভাল।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি সব,' বলে ব্রিজে উঠে গেল ওয়েস্টম্যান। চার মিনিটের মধ্যে ফিরে এল আবার সে।

ভয়েজার থেকে বোটে নামল ওরা। ধমকের মত একটা গর্জন ছেড়ে স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। ভয়েজার তার কোর্স ঠিক করে নিয়ে এগোচ্ছে।

বিনকিউলার চোখে রেখে ওয়েস্টম্যানকে বরাত খান বলল, 'স্কিপারকে জানিয়ে দাও সময় হলেই সে যেন বোতামে চাপ দেয়। আমি বললেই বোটের স্পীড থারটি নটে তুলতে হবে। কোর্স ডিউ-নর্থ ম্যাগনেটিক। সবাই পিছন দিকে নজর রাখো।'

স্কিপারের সাথে কথা বলল ওয়েস্টম্যান। গম্ভীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। তারপর বলল, 'বোতাম চাপ দেবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে সে।'

ভয়েজারের বো-এর দিকে তাকিয়ে আছে বরাত খান। দুই সেকেন্ড স্তব্ধতা। তারপরই বলল ওয়েস্টম্যান, 'টর্পেডো রওনা...'

ওয়েস্টম্যানের কথা শেষ হবার আগেই কানের কাছে বাজ ফেলে চেঁচিয়ে উঠল বরাত খান, 'আসছে! থারটিনট!' ভয়েজারের বো থেকে বুদ্বুদ উঠে স্রোতের সাথে ভেসে যেতে যেতে ফেটে যাচ্ছে।

থ্রটল খোলা হতেই কান ফাটানো গর্জন তুলল ইঞ্জিন। অকস্মাৎ গতিলাভ করায় সীটের সাথে আঠার মত সেঁটে গেল পাশার পিঠটা।

পানির দিকে চেয়ে আছে বরাত খান। 'নসিব ভাল, বিগড়ে যায়নি। দুশ্চিন্তায় ছিলাম...'

'মানে?' ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল ওয়েস্টম্যানের চিৎকার।

'মাত্র ছয় ফিট পানির নিচে ফিট করা হয়েছে টিউবটা,' বলল বরাত খান। 'অথচ আমি চেয়েছি টর্পেডো বারো ফিট পানির নিচে দিয়ে দৌড়োবে। ভয় ছিল নিচে নেমে গিয়ে আবার মাথা তুলে ওঠার সময় যদি বেশি উঠে পড়ে, পানির ওপর দেখা যাবে তাকে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনি।' সামনের দিকে ঝুঁকল সে। 'থারটি-ওয়ান নট স্পীডে যথাসম্ভব সোজা কোর্স ধরে এগোতে বলো তোমার হেলম্‌স্‌ম্যানকে।'

ঢেউয়ের মাথা থেকে লাফ দিয়ে আরেক ঢেউয়ের মাথায় গিয়ে পড়ছে বোট। বরাত খানের কনুই ধরল পাশা। 'কতক্ষণের দৌড় এটা?'

'ধরো আধঘণ্টা। টর্পেডো থারটি নটে ছুটছে। তার মানে খানিকটা আগে আছি আমরা।'

পেছন দিকে তাকাল পাশা। সুদীর্ঘ ঢেউগুলোকে মাঝখান থেকে ভেঙে

দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বোট একনাগাড়ে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না সে। কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ছে। মাথা ঘুরিয়ে আর সকলের দিকে ফিরল। প্রচণ্ড বাতাসের একটানা চাপ লেগে চোখ কুঁচকে উঠল ওর।

আশ্চর্য সুস্থির ভঙ্গিতে বসে আছে দালিয়া, একটা হাত রেলিংয়ের উপর অলসভাবে পড়ে আছে। সোনালি চুল উড়ছে বাতাসে। ব্লাউজটা সেঁটে আছে শরীরের সাথে। একটু ফাঁক হয়ে আছে ওয়েস্টম্যানের ঠোঁটদুটো, দাঁত দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মধ্যে মাইক্রোফোনে দু'একটা কথা বলছে সে।

বরাত খান গম্ভীর। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য নয়, বিজয়ের উল্লাস ফুটে বেরুচ্ছে। আজকের এই দিনটার সত্যিকার হিরো সে-ই।

দশ মিনিটের মাথায় এই প্রথম একটা জলযান দেখতে পেল ওরা। অলসভাবে একটা বৃত্ত রচনা করছে মোটর-লঞ্চটা। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল ওয়েস্টম্যান। যাত্রাপথটা পাহারা দিচ্ছে এই লঞ্চ। বসে পড়ল ওয়েস্টম্যান। লঞ্চের ঢেউয়ে বাড়ি খেয়ে ক্যাঙারুর মত একটা লাফ দিল বোট। এক মুহূর্ত পর আবার একটা। দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে লঞ্চটা।

বরাত খান যদি ভুল করে না থাকে, ভাবছে পাশা, তাহলে ঠিক ওদের পেছনেই রয়েছে টর্পেডোটা। রওনা হবার লক্ষণগুলো চাক্ষুষ করলেও ওটা যে সত্যিই পানির নিচ দিয়ে তীর বেগে অনুসরণ করছে বোটকে, এটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছে ওর।

আরেকটা লঞ্চকে পাশ কাটাল ওরা। ঢেউ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে অপ্রতিহত গতিতে ছুটে চলেছে বোট। রিস্টওয়াচ দেখল ওয়েস্টম্যান। 'আরও দশ মিনিট,' চেঁচিয়ে উঠল সে। তাকাল বরাত খানের দিকে, হাসল নিঃশব্দে। 'দশ মাইল পেরিয়ে এসেছি। আরও পাঁচ মাইল যেতে হবে।'

দ্রুত মাথা নাড়ল বরাত খান। 'স্পীড এক নট কমিয়ে ফেলতে বলো। খুব বেশি এগিয়ে থাকতে চাই না আমরা।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হেলমস্‌ম্যানের কানের কাছে মুখ নামিয়ে কথা বলল ওয়েস্টম্যান। ইঞ্জিনের গর্জন মৃদু পড়ে গেল। কিন্তু গতি কমল কিনা বুঝতে পারল না পাশা।

এক সময়, এই প্রথম, কথা বলল মাদাম দালিয়া। উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দেখাল সে, 'কুয়ান ডি শান্তিয়ানা।'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বরাত খান, দেখল ইয়টটাকে, তারপর হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওয়েস্টম্যানের। 'এখানে থেমো না। বর্তমান কোর্সেই পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাও। ঘোড়ার ডিম ইয়ট নয়, টর্পেডোটা চাই আমরা।'

হেলমস্‌ম্যানের সাথে কথা বলল আবার ওয়েস্টম্যান। চোখের পলকে ইয়টকে পাশ কাটিয়ে গেল বোট। সামনে আর কিছু নেই, শুধু দিগন্তরেখা—বোটের সাথে সাথে তা উঠছে আর নামছে। চেঁচিয়ে উঠল বরাত খান। 'পেছনে তাকাও সবাই। একটা পিলারের মত পানির নিচে থেকে উঠে আসবে ওটা। সামান্য ধোঁয়া দেখা যাবে, একটা আলো দেখা যাবে।'

তাকিয়ে আছে সবাই। কিন্তু কোথায় পিলার, কোথায় ধোঁয়া, আর

কোথায় আলো! দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে কুয়ান ডি শান্তিয়ানা। মাঝখানে পানি, ঢেউ, ফেনা—আর কিছু নেই।

সেকেন্ডের কাঁটা দেখছে বরাত খান চোখের সামনে রিস্টওয়াচ তুলে। এক চক্কর ঘুরে এল কাঁটাটা। তারপর আরেক চক্কর ঘুরল।

চুল উড়ছে বরাত খানের। বুকের ভেতর ছটফট করছে জানটা। কালো মুখ নীল হয়ে গেছে। ভুল হলো? ভূমধ্যসাগরের অতল তলে নরম মাটিতে নেমে গেছে মার্ক ইলেভেন? নাকি দিক বদলে…

মোট তেত্রিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। দ্রুত একটা হিসাব কষল বরাত খান মনে মনে। কম করেও ষোলো মাইল পাড়ি দিয়েছে ওরা। কোথায় মার্ক ইলেভেন? কোথায়?

কারও দিকে তাকাতে পারছে না পাশা। হাতের তালুতে ঘাম। কপালে শিরা দপদপ করছে। আড়চোখে তাকাল দালিয়ার দিকে। কোন ভাবান্তর নেই মুখে। কি করবে সে এখন? ভয়ঙ্কর কিছু করবে, নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু কতখানি ভয়ঙ্কর? ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে বরাত খান। বোকার মত চেয়ে আছে পেছন দিকে।

চৌত্রিশ মিনিট কাটল। কোথায় কি!

পঁয়ত্রিশ মিনিট। দূর! আর কোন আশা নেই। বরাত খানের চোখের দৃষ্টি নিজের দিকে টানতে চাইছে পাশা। কিন্তু দুনিয়া সম্পর্কে চেতনা হারিয়ে ফেলেছে যেন বরাত খান। একাগ্রদৃষ্টিতে পানির দিকে তাকিয়ে আছে সে। মাথা খারাপ, মানে, পাগল হয়ে যেতে পারে ও, ভাবল পাশা।

হঠাৎ যেন ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে নড়ে উঠল বরাত খান। 'ওই মাথা তুলছে!' মুঠো করা দুই হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল সে। উল্লাসে লাফাচ্ছে। 'স্টারবোর্ড কোয়ার্টারের দিকে! ঘোড়ার ডিম ইঞ্জিনগুলো বন্ধ করো!'

সাগরের ওপর দিয়ে দূরে তাকাল পাশা। ইঞ্জিনের গর্জন মরে যাচ্ছে। ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে টর্পেডোটা। প্রখর রোদেও তার মাথায় আবছা ধোঁয়াটে হলুদ শিখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নাক ঘুরিয়ে সেদিকে এগোচ্ছে বোট।

খুশিতে বাগবাগ বরাত খান। মহাব্যস্ত এখন সে। 'কি আশ্চর্য! বোট-হুক কোথায়? ওকে বাঁধতে হবে না?'

'শিখাটা কিসের?' জানতে চাইল ওয়েস্টম্যান।

'ওটা?' মুখ তুলে টর্পেডোর দিয়ে তাকাল রাহাত খান। 'ওটা হোমস লাইট। সোডিয়ামের শক্তিতে জ্বলে—যত ভিজবে ততই গরম হয়ে জ্বলবে।'

'মজার ট্রিক্স্, সন্দেহ নেই,' প্রশংসা উপচে পড়ছে ওয়েস্টম্যানের গলা থেকে।

'ইটস্ এ ব্লাডি মিরাকল্!' নিজের কৃতিত্বে নিজেই তাজ্জব হয়ে গেছে বরাত খান। 'ষোলো মাইল! আমার এই সাফল্য ধারণার বাইরে একটা অলৌকিক ব্যাপার। যাক, তোমরা খুশি হয়েছ তো?'

নিঃশব্দে হাসছে ওয়েস্টম্যান। তাকাল দালিয়ার দিকে। 'সম্ভবত, বরাত খান।'

'কই, চেক কোথায়?' দালিয়ার দিকে হাত পেতে জানতে চাইল পাশা।

হাত বাড়িয়ে পাশার কাঁধে মৃদু একটা চাপড় মারল দালিয়া। উজ্জ্বল হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত। 'ইয়টে গেলেই পাবে। শুধু চেক নয়, তার সাথে আরও অনেক···' একটা চোখ টিপল দালিয়া,··· 'অনেক কিছু!'

সাত

ইয়ট নিয়ে বৈরুতে এল ওরা। দ্বিতীয়বার চাওয়ার আগেই এক লাখ ডলারের একটা চেক লিখে দিল মাদাম পাশার হাতে। তারপর সকলের সামনেই, পাশাকে হতভম্ব করে দিয়ে, ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল, সরাসরি ঠোঁটে।

পলকের মধ্যে হাসিটা নিবে গেল ওয়েস্টম্যানের মুখ থেকে, দেখেও না দেখার ভান করল পাশা।

'বয়সটা যদি আরও কিছু কম হত!' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বরাত খান, করুণ চোখে তাকাল ওয়েস্টম্যানের দিকে। নিজের গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। 'ঢালো ইয়ার! আফসোস করে কি লাভ, তারচে,' এসো, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই!'

নির্বিকার থাকার চেষ্টা করছে ওয়েস্টম্যান। কথা বলল না।

'কাজের লোককে আমি কখনও বঞ্চিত করি না,' বরাত খানের দিকে চেয়ে বলল দালিয়া। মাথা দুলিয়ে চুল সরাল সামনে থেকে। 'টর্পেডো রেসের রেওয়াজ থাকলে তুমি চ্যাম্পিয়ন হতে, সন্দেহ নেই। আমার কাছে এখন তুমি সাত রাজার ধন, বরাত খান। কি চাও তুমি, বলো।'

কৃত্রিম আতঙ্কে বরাত খান পিছিয়ে গেল এক পা। দালিয়ার সামনে হাতদুটো নাড়ছে। 'রক্ষে করো! এই বুড়ো বয়সে ওসব আমার সইবে না!' হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গেল। 'মাদাম, সমস্যা কিন্তু মেটেনি।'

ভুরু কোঁচকাতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো দালিয়া। 'আবার কিসের সমস্যা?' দ্রুত জানতে চাইল সে।

গ্লাসের হুইস্কিতে এক টুকরো বরফ ছেড়ে সেটাকে ধীরে ধীরে পাক খাওয়াচ্ছে বরাত খান। 'সাধারণ একটা মার্ক ইলেভেনের রেঞ্জ কত, আশা করি ভুলে যাওনি?' প্রশ্নবোধক এবং কিছুটা ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে একবার ওয়েস্টম্যান, তারপর দালিয়ার দিকে তাকাল সে। 'তিন মাইলের কিছু বেশি হবে, তাই না? তিন মাইল দূরের একটা জাহাজকে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু পনেরো মাইল দূরের কোন জাহাজকে? অসম্ভব!'

'এটা আর তেমন কি সমস্যা,' বলল ওয়েস্টম্যান। 'একজন ভাল নেভিগেটর থাকলে যদি জানে ঠিক কোথায় সে রয়েছে···'

'খোলা সাগরের কোয়ার্টার মাইলের মধ্যে তার পজিশন কোথায় একথা নিশ্চিতভাবে বলা দুনিয়ার সেরা নেভিগেটরদের পক্ষেও সম্ভব নয়। ইনারশিয়্যাল গাইডেন্স সিস্টেমের সাহায্য পেলে আলাদা কথা, কিন্তু তা তোমরা পাচ্ছ না। নেভী যদি বিক্রি করেও, কেনবার সামর্থ্য তোমাদের নেই।'

'তাহলে?'

'ভয়েজারের সবচেয়ে বড় ওজন তোলার যন্ত্রটা সাগরের পানি থেকে পঞ্চাশ ফিট উঁচু,' বলল বরাত খান। 'ওটার মাথায় একটা কাকের বাসা তৈরি করে একটা লোককে যদি বসিয়ে দাও, সে দিগন্তরেখার দিকে মাইল আটেক পর্যন্ত দেখতে পাবে। এরপর, বাকি কাজটা হলো, তীরেও ওই রকম উঁচুতে বা ওর চেয়ে বেশি উঁচুতে একটা আলো জ্বালার ব্যবস্থা করা। যথেষ্ট উজ্জ্বল হলে সেটা ষোলো বা তার চেয়ে বেশি দূরে কাকের বাসায় বসে থাকা লোকটার চোখে পড়বে। বুঝতেই পারছ, কাজটা সেক্ষেত্রে রাতের বেলা সারতে হবে।'

'এমনিতেও রাতের কাজই এটা,' বলল ওয়েস্টম্যান।

মুখভাব কঠিন হতে যাচ্ছিল বরাত খানের, কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে।

ইয়ট হারবারে অপেক্ষা করছিল দালিয়ার গাড়ি। বরাত খান আর পাশাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল সে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওয়েস্টম্যানকে বলল, 'কাজের কথাটা মনে আছে তো? কোথাও কোন ফাঁদ আছে কিনা দেখো। এদেরকে আমি একটু অবাক করে দেবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।' গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

'কোথায়?' পাশ থেকে জানতে চাইল পাশা।

'তোমাদের আস্তানায়,' বলল দালিয়া।

'সবই দেখা আছে,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল পাশা। 'অবাক হওয়ার মত কিছু নেই ওখানে।'

মৃদু হাসল দালিয়া, কিছু বলল না।

টর্পেডো-শেডের কাছে পৌঁছে গাড়ি থামাল সে। 'ভেতরে একবার উঁকি মেরে দেখে অফিসে চলে এসো। কথা আছে।'

গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে শেডের ভেতর ঢুকল পাশা, পেছনে বরাত খান। ঘুরে দাঁড়িয়ে বরাত খানের মুখোমুখি হলো পাশা। 'শোনো, মামা। ওদেরকে সব সমস্যার সমাধান যদি জানিয়ে দাও, আমাদেরকে ওদের আর দরকার হবে কেন? তুমি...'

হাত তুলল বরাত খান। 'নো চিন্তা, ভাগ্না, ডু ফুর্তি। আমাদেরকে ওদের দরকার হবেই। টর্পেডোয় নতুন ব্যাটারি কে ঢোকাবে, শুনি? ওয়েস্টম্যান এ বিষয়ে ঘোড়ার ডিম কিছুই বোঝেনি। ফাইন্যাল এগজামিনেশন পর্যন্ত আমরা টিকে থাকতে পারব, কিন্তু তারপর কি হবে আমি জানি না। চলো, দেখা যাক অবাক হওয়ার মত কি আছে ভেতরে।'

খানিকটা এগিয়ে আলো জ্বালল ওরা। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়াল। নিচে চোখ পড়তেই বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল বরাত খান।

শেডের নিচতলায় পাশাপাশি তিনটে টর্পেডোকে লম্বা করে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

বুকের ভেতরটা হঠাৎ শুকিয়ে এল পাশার। আরও তিনটে টর্পেডো। ভাবছে সে। তার মানে পাচার করার জন্যে প্রচুর হেরোইন রয়েছে এঁদের কাছে। তথ্যটা কি ভাবে রানা এজেন্সীর লন্ডন শাখায় পৌঁছে দেয়া যায় ভাবতে গিয়ে হোঁচট খেল সে। কাজটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, কেননা সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা হয়েছে ওদেরকে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা। 'মামা, তোমাকে একটু অভিনয় করতে হবে।'

'কি রকম?'

'দালিয়াকে নিয়ে বাইরে যেতে চাইব আমি, ক্লান্তির অজুহাত দেখিয়ে তুমি যেতে চাইবে না।'

'উদ্দেশ্য?'

'ফিরে এসে বলব।'

'অভিনয় করার দরকার নেই,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল বরাত খান। 'এমনিতেই আমি ক্লান্ত।'

গাড়ির কাছে ফিরে এল ওরা। জানালার কাছে নিচু হয়ে পাশা বলল, 'অবাক হয়েছি, ঠিক—কিন্তু তুমি কি একসাথে চারটে টর্পেডো ছুঁড়তে চাও, দালিয়া?'

'ক্ষতি কি? খাটুনি তোমাদের বেশি পড়বে, কিন্তু সেজন্যে পারিশ্রমিকও পাবে বেশি।'

'কিন্তু কত বেশি?' একটু গম্ভীর শোনাল পাশার গলা। 'লেনদেনের আলোচনাটা এখুনি সেরে ফেলতে চাই আমরা।' হঠাৎ হাসল সে। 'কি যেন নাম সেই নাইট ক্লাবটার?...পাওন রুজ। আমাদের খরচে আজ ওখানে একটা উৎসব হতে পারে, কি বলো, দালিয়া? আমরা এখন রীতিমত বড়লোক। উৎসবের ফাঁকে আরও বড়লোক কিভাবে হওয়া যায় আলোচনা করতে পারব।'

পাশ থেকে বরাত খান বলল, 'তোমরা উৎসব করো আর কান্নাকাটিই করো, এর মধ্যে আমি নেই। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছি, ঘুমুতে চাই। গুড নাইট।'

রওনা দিয়েছে বরাত খান। ওকে কিছু বলতে যাচ্ছিল পাশা। গাড়ির ভেতর থেকে একটা নরম হাত বেরিয়ে এসে পাশার কনুই ধরল। 'যেতে দাও ওকে,' নিচু গলায় বলল দালিয়া। 'দু'জন হলে উৎসবটা অনেক বেশি জমবে। কথা দিচ্ছি...'

'জানি,' চকচকে চোখে মাদামের শরীরে দৃষ্টি বুলাল পাশা। প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল গাড়ির দরজা। উঠে বসল পাশা।

স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়ি। ভেতরে অন্ধকার। মৃদু একটা ধস্তাধস্তির শব্দ। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে দু'জনের। 'ইউ মনস্টার!' দালিয়ার গলা। 'তোমাকে খুশি করা একমাত্র আমার পক্ষেই সম্ভব। ক্লাব থেকে আমার বাড়িতে যেতে হবে

তোমাকে আজ, প্লীজ!'

'যেখানে খুশি,' বলল পাশা। 'তোমার সাথে মরণের দিকে ছাড়া যে-কোন দিকে যেতে রাজি আছি আমি।'

স্টার্ট নিলো গাড়ি।

পাঁচ ঘন্টা পর বিছানায় উঠে বসে তেপয় থেকে বোতল তুলে নিয়ে হুইস্কি ঢালল পাশা। 'ঠিক আছে, চুক্তি হয়ে গেল—কিন্তু আমাদেরকে তুমি ঠকালে, এতেও কোন সন্দেহ নেই।'

পাওন রুজ থেকে দালিয়ার এই প্রাসাদোপম বাড়িতে এসেছে ওরা। টয়লেটে যাবার নাম করে পাওন রুজে দালিয়ার চোখের আড়াল হবার একটা সুযোগ করে নিয়েছিল পাশা। একজন পোর্টারকে ঘুষ দিয়ে পকেটের খামটা পাঠিয়ে দিয়েছে মর্নিং সান দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন ম্যানেজারকে। একটা চিরকুটে কয়েকটা কথা লিখে খামে ভরার জন্যে যথেষ্ট সময় পেয়েছিল ও।

'টাকাটাই তোমার কাছে সব হলো?' আহত কণ্ঠে বলল দালিয়া।

'তা নয়,' বলল পাশা। 'টাকার চেয়ে অনেক বড় কথা তোমার মন পাওয়া। কিন্তু, মন তো তুমি ওয়েস্টম্যানকেও দিয়ে বসে আছ, দালিয়া। অস্বীকার করতে পারো যে…'

'কিছুই অস্বীকার করি না,' আশ্চর্য মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল দালিয়া। 'কিন্তু সেইসাথে তোমাকে আশ্বাস দিয়ে এটুকুও বলতে চাই, ওয়েস্টম্যান তোমার আমার মাঝখানে থাকবে কি থাকবে না তা ঠিক করার দায়িত্ব তোমার কাঁধেই চাপাব আমি। এটা তোমার সমস্যা, কিভাবে এর সমাধান করবে তুমিই ভাবো। পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে তুমি এ-ব্যাপারে। তবে এখুনি কিছু করতে যেয়ো না। আগে যোগ্যতা প্রমাণ করো নিজের। আরেকটু বুঝে নিই তোমাকে। ওয়েস্টম্যানের কাছ থেকে যতটা সম্ভব কাজ আদায় করে নিই। তারপর।'

ঢোক গিলে গলা ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে পাশা।

রানা এজেন্সী : লন্ডন শাখা।

বৈরুতের ইংরেজি দৈনিক মর্নিং সান টেবিলে বিছিয়ে বিজ্ঞাপনের পাতাটা খুঁটিয়ে দেখছে এজেন্সীর ইন-চার্জ আসাদ চৌধুরী। রোজ সকালে অফিসে পৌঁছে এটাই তার প্রথম কাজ।

ধড়াশ করে উঠল হঠাৎ বুকটা। কলম তুলে একটা নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনের চারদিকে একটা চতুষ্কোণ রচনা করল সে। অধীর আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল টেবিলের উপর। পড়তে শুরু করল:

'জাহলেহ-এর কাছে পাঁচমিশালি একটা ফার্ম বিক্রি হবে। ২০০০ (দুই হাজার) একরের সুন্দর একখণ্ড জমি। প্রকাণ্ড আঙুরের বাগান, চমৎকার ফার্ম-হাউজ, স্টক, সাজ সরঞ্জাম সহ। বক্স ১৯১।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল আসাদ। গলার কাছে লালের উপর সাদা বুটি দেয়া টাইটা ঢিলে করল একটু। অনেকগুলো হপ্তা কেটে গেছে, কোন খোঁজ-

খবরই পাচ্ছিল না সে. বরাত খান আর গোলাম পাশার। এখনও ওরা কোন বিপদে পড়েনি বুঝতে পেরে সাতাশ মন ওজনের একটা ভার বুকের উপর থেকে নেমে গেল যেন, এতই হালকা বোধ করছে। আবার পড়ল বিজ্ঞাপনটা। দুই ভুরুর মাঝখানে একটা রেখা ফুটল। কলমটা তুলে নিল সে।

পাঁচ মিনিট পর আবিষ্কার করল আসাদ, ঘামছে সে। হিসাবে কি ভুল করল পাশা? তাই হবে। বিজ্ঞাপনের দুই হাজার একরের মানে মাদাম দালিয়া দুই হাজার পাউন্ড হেরোইন পাচার করতে চাইছে। পরিমাণটা খুব বেশি। সাবধানে, সময় নিয়ে আবার হিসাব করা যাক।

হিসাবটা শুরু করল আসাদ, এবং শেষও করল। চূড়ান্ত অঙ্কটার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে:

প্রায় ৩৪,০০,০০,০০০ ডলার!

অ্যাডিক্টরা যে দামে কেনে সেই দাম অনুসারে দুই হাজার পাউন্ড হেরোইনের দাম এ-রকমই দাঁড়ায়।

আরও একটা সংখ্যা লিখল আসাদ:

১০,০০,০০,০০০ ডলার।

আমেরিকায় নিরাপদে পৌঁছে দিতে পারলে এই টাকাটা পাবে মাদাম দালিয়া।

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াচ্ছে আসাদ। একটু একটু কাঁপছে হাতটা। রিসিভার ধরার আগেই ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোন।

'হ্যালো?'

'হ্যামিলটন,' স্যার হ্যামিলটনের ভারী গলা ভেসে এল আসাদের কানে। 'ওদের কোন খবর পেয়েছ, আসাদ? রানার? পাশার?'

প্রতিদিন দশ-বারোবার করে ফোন করেন স্যার হ্যামিলটন ওদের খবরের জন্যে। কিন্তু আসাদ তাঁকে দিনের পর দিন নিরাশ করে আসছে—খবর নেই, দেবে কোত্থেকে!

'জরুরী খবর আছে, স্যার হ্যামিলটন,' বলল আসাদ। 'আপনি এক্ষুণি একবার চলে আসুন।'

আসাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে স্যার হ্যামিলটন বুঝতে পারলেন, সাংঘাতিক কোন খবর আছে। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

বিজ্ঞাপনটা স্যার হ্যামিলটনও দেখলেন। বিস্ময়ে কপালে উঠে গেল তাঁর চোখও। কি যেন চিন্তা করলেন দীর্ঘ বিশ সেকেন্ড ধরে। তারপর ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করলেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারিকে স্যার হ্যামিলটন জানালেন, 'অনির্দিষ্টকালের জন্যে আমার সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দাও। বৈরুতে যাচ্ছি আমি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্লেনের একটা সীট রিজার্ভ করো। সেই সাথে হোটেলের একটা সুইট। সেন্ট-জর্জেস হলে ভাল হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'আপনি বৈরুতে যাবেন?' আসাদ একটু অবাক হয়েছে।

'গোটা ব্যাপারটা এখন শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে,' বললেন স্যার

হ্যামিলটন। 'রানাও নিশ্চয়ই বসে নেই—এগিয়ে যাচ্ছে নিজ পথে। ঘটনা বা বিপদ-আপদ যা কিছু ঘটার এখনই ঘটবে। এই অভিযানের উদ্যোক্তা যদিও আমি, এতদিন গা বাঁচিয়ে ছিলাম, এবার খানিকটা ঝুঁকি না নিলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব।' আসল কথা তা নয়, দালিয়া প্রচুর হেরোইন পাচার করতে যাচ্ছে জেনে মাথায় আগুন ধরে গেছে স্যার হ্যামিলটনের। সবটুকু হেরোইন কিভাবে ধ্বংস করা যায় তার একটা উপায় বের করার জন্যে সশরীরে ওখানে যাচ্ছেন তিনি। দায়িত্বটা রানাকে দিতে পারলে নিশ্চিত হতে পারতেন, কিন্তু···

ছ্যাঁৎ করে উঠল আসাদের বুক, রানার কথা মনে পড়ে যেতেই। ওদের কোন খবর পাচ্ছে না সে। অনেকদিন ধরেই নিখোঁজ ওরা।

আট

ইরাকে ঢুকতে খুব একটা ঝামেলা হলো না। পিছু ধাওয়া করার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের যে-সব দেশে যেতে হতে পারে সে-সব দেশের ভিসা ওদের সাথে ছিল। মেজর জেনারেল রাহাত খান ডকুমেন্ট, চিঠিপত্র ইত্যাদি একগাদা গছিয়ে দিয়েছিলেন, বের করে দেখাতেই ফল প্রসব করল। কিন্তু বর্ডার-পোস্টে ইরাকী অফিসারের বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙে পড়ার অবস্থা হলো ওরা কুর্দিস্তান হয়ে এতটা উত্তর ঘেঁষে ইরাকে ঢুকছে দেখে।

অফিসারের অবাঞ্ছিত কৌতূহলের মাথায় ঝাড়া পাঁচ মিনিট বজ্র বর্ষণ করল গিলটি মিয়া অশুদ্ধ আরবীতে বক্তৃতা ঝেড়ে। দু'কান পর্যন্ত লম্বা হাসল অফিসার। তারপর আর কোন অসুবিধে হলো না।

পানি ও পেট্রল নিয়ে দ্রুত বর্ডার এলাকা ত্যাগ করল ওরা। দুপুরবেলা রাস্তার উপর একপাশে ল্যান্ডরোভার দাঁড় করাল গিলটি মিয়া। 'পেটে কিছু দিতে হয়, ইঁদুর দৌড়ুচ্ছে,' সামনে থেকে নেমে গাড়ির পেছনে গিয়ে উঠল সে। খুঁজে বের করল স্টোভ আর খাবারভর্তি কয়েকটা টিন।

'সোলায়মানিয়া এখান থেকে খুব দূরে নয়,' একটা চুরুট ধরিয়ে বলল রানা। অনুর্বর, নিঃস্ব ভূখণ্ডের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল ও। বর্ডারের ওপারে ফেলে আসা পাহাড়ী এলাকার সাথে এদিকের পাহাড়ী এলাকার কোন অমিল নেই। সেই ধুলো ভরা রাস্তা। সেই নির্জনতা। সেই ধূসর রঙের একঘেয়ে সারিবদ্ধ পাহাড়ের মিছিল।

স্টোভে বাতাস ভরছে গিলটি মিয়া। 'সোলায়মানিয়ায় কি ঘটবে মনে করচেন, স্যার?'

'এখনও জানি না,' বলল রানা।

অর্ধেক খাওয়া হয়েছে লাঞ্চ, এমন সময় প্রায় ফিসফিস করে কি যে বলল গিলটি মিয়া, পরিষ্কার শুনতেই পেল না রানা। প্রথমে ভাবল, আপন মনে কিছু বলছে। কিন্তু পরমুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল ও। স্মরণ করতে পারছে 'ওরা' এবং

'ঘিরে' এই শব্দ-দুটো উচ্চারণ করেছে গিলটি মিয়া। মুহূর্তে সব বুঝে নিল রানা।

হঠাৎ গিলটি মিয়া আবার অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এবং নিচু গলায় বলল, 'ঠিকই শুনেচেন আপনি, স্যার। ওরা আসচে। কিন্তু মুক তুলে তাকাবেন না।'

খেতে খেতে মুখ অবশ্য তুলল রানা। সহজ ভঙ্গিতে চারদিকটা দেখেও নিল একবার। 'কোথায়?'

'আমাদের সামনের পাহাড়ে দু'জন,' ফ্লাস্ক থেকে কাপে কফি ঢালছে গিলটি মিয়া। 'আরও তিন কিংবা চারজন পাহাড়টা ঘুরে আরাক দিক থেকে আসচে। ঘেরাও দিয়েচে, স্যার, কোন সন্দো নেই।'

'যদি কেটে পড়তে চাই?'

'লাভ হবেনি, স্যার? হাঁদারাম না হলে ওরা নিশ্চয়ই আগুপিছু পাথর ফেলে রাস্তা বন্দ করে রেখেচে। তাছাড়া, পিস্তল টিস্তলগুলো খুঁজে বের করার সময়ও নেই এ্যাকোন। ঝেড়ে অবশ্য দৌড় দেয়া যায়, কিন্তুক পায়ে হেঁটে কদ্দূর আর যেতে পারবো? অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেইকো।' ধূমায়িত কপির কাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'কারা হতে পারে বলুন তো, স্যার?'

কপির কাপে চুমুক দিয়ে হাসল রানা। গিলটি মিয়ার মুখ শুকিয়ে গেছে দেখে তাকে অভয় দিল। 'ভয় পাবার কিছু নেই। যাযাবর হতে পারে ওরা। আবার শেখ মাহমুদের লোক হওয়াও বিচিত্র নয়।' ধীরে ধীরে কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল রানা। আড়মোড়া ভাঙল হাত দুটো দু'দিকে প্রসারিত করে দিয়ে।

'পেছন থেকে আরও দু'জন আসচে এবার,' বলল গিলটি মিয়া।

'চেনাজানা কেউ?'

'বুঝতে পারচি না। দু'জনেই নাইটগাউনের মত কি যেন পরে আচে।'

পিছনে একটা পাথর গড়াবার আওয়াজ পেল রানা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে গিলটি মিয়া।

'বেশি নড়াচড়া কোরো না,' বলল রানা চাপা স্বরে। 'হাসিহাসি ভাব আনো মুখে।' কথা শেষ করেই ঘুরে দাঁড়াল ও।

দশ হাত সামনে শেখ মাহমুদকে দেখতে পাচ্ছে রানা। দাঁড়িয়ে ছিল, রানাকে ঘুরতে দেখেই এগোল ওর দিকে। 'হ্যাল্লো, মাই ফ্রেন্ড! কি খোঁজাই না খুঁজছি তোমাদেরকে আমরা! খুব ভুগিয়েছ কিন্তু...'

'খুঁজছ? কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

'এটা আবার একটা জিজ্ঞেস করার মত প্রশ্ন হলো? তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বাবা আমাকে পাঠালেন।' হাত নেড়ে চারদিক দেখাল সে। 'এসব এলাকায় কি ধরনের দুর্ধর্ষ লোকেরা ঘুরে বেড়ায় তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। বাবার হুকুম তোমাদেরকে খুঁজে বের করে নিরাপদ কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখি। তাই সাথে লোকজন নিয়ে বেরিয়েছি। এখন আর তোমাদের ভয়ের কিছু নেই। দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারদিকে আমার লোকেরা। দয়া

করে যদি ঘাড় ফেরাও, নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

'বাড়াবাড়ি করছ, মাহমুদ,' বলল রানা। 'তুমি বর্ডার ক্রস করেছ ইরাকী সরকার তা জানে?'

হোঃ হোঃ করে হাসল মাহমুদ। 'বর্ডার গার্ড মানে তো ঘুষখোর জী-হুজুরের একটা বাহিনী, তাই না? যাকগে, এসব ফালতু আলাপ করে সময় নষ্ট করতে চাই না। চলো, রওনা হওয়া যাক।'

ইতস্তত করছে রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল ঘিরে দাঁড়ানো লোকগুলোকে। হাতে রাইফেল। ওদের দিকেই তাক করা।

ঠোঁট বেঁকে গেল রানার। শুধু গিলটি মিয়াই ধরতে পারল হাসিটা। 'তুমি কি বলো, গিলটি মিয়া?' রসিকতার সুরে জানতে চাইল রানা।

'এত করে যখন বলচে, চলুন,' ঢোক গিলে বলল গিলটি মিয়া। 'জামাই-আদর করবে মনে হচ্চে।'

'চলো, চলো!' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল মাহমুদ। 'ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে বাবা নিশ্চয়ই নিজের হাত কামড়াচ্ছেন। খুব রাগী মানুষ কিনা!'

ল্যান্ডরোভারের পিছনে তোলা হলো ওদের। ড্রাইভার ছাড়াও সামনে বসল আরও দু'জন লোক। তারা পিছনদিকে চেয়ে বসে আছে। দু'জনের হাতেই পিস্তল। রানা এবং গিলটি মিয়ার দিকে তাক করে ধরা।

হেলেদুলে এগোচ্ছে গাড়ি। প্রতিটি জোর ঝাঁকুনির সময় দুরুদুরু করে উঠছে রানার বুক। পিস্তল দুটোর ট্রিগারের গায়ে এমন শক্তভাবে আঙুল জড়িয়ে রেখেছে লোক দু'জন, সেফটি ক্যাচ অন করা থাকলে যে-কোন মুহূর্তে গুলি বেরিয়ে আসতে পারে। ফোটোগ্রাফিক ইকুইপমেন্টের উপর জড়সড় হয়ে বসে আছে ওরা, গুলি বেরুলে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাবে শরীর।

যতটুকু বুঝতে পারছে রানা, ক্রমশ বাঁক নিয়ে পুবদিকে ছুটছে ল্যান্ডরোভার। দিক পরিবর্তন না করে প্রায় ইরানীয়ান বর্ডার পর্যন্ত এগোল গাড়ি। তারপর সোজা একটা রাস্তা ধরে আরও দুর্গম পার্বত্য এলাকার ভেতর ঢুকছে। তার মানে, সোলায়মানিয়াকে কেন্দ্র করে প্রায় একটা বৃত্ত রচনা করেছে ল্যান্ডরোভার। সোলায়মানিয়া এখন ওদের পিছনে। অবশ্য, এ সবই রানার অনুমান।

একটা প্রকাণ্ড ট্রাককে অনুসরণ করছে গাড়ি। ইস্পাতের কাঠামো দেখেই বুঝল রানা, সামরিক বাহিনীর জন্যে তৈরি করা হয়েছে।

দীর্ঘ যাত্রা। পথের যেন শেষ নেই।

সন্ধ্যার পর হেডলাইট অন করা হলো। স্পীড কমে গেল গাড়ির। পিস্তলধারীদেরকে গ্রাহ্য না করে গিলটি মিয়া তার পরম কর্তব্য একের পর এক পালন করে যাচ্ছে। বাক্স খুলে চুরুট বের করল সে। ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝাড়ল। রানার ঠোঁটের মাঝখানে সেটা লটকে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। একবার পানি এবং একবার কফি খাওয়াল ওকে। নিঃশব্দে দেখছে লোক দু'জন গিলটি মিয়াকে। কঠোর চেহারায় ভাবের কোন পরিবর্তন নেই।

আরও দুর্গম এলাকায় ঢুকছে গাড়ি। ম্যাপটা যতটুকু স্মরণ করতে পারছে রানা, এদিকে কোন রাস্তা নেই। আরও কমে গেছে স্পীড। কিন্তু ঝাঁকুনি বেড়ে গেল কয়েক গুণ।

মাঝরাতে ইঞ্জিনের শব্দ পাথুরে গিরি-সঙ্কটে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। অনবরত ঝাঁকুনি খেয়ে দুলছে রানা, মাথা তুলে সামনেটা দেখার চেষ্টা করল ও। হেড-লাইটের তীব্র আলোয় সোজাসুজি সামনে দেখা যাচ্ছে পাথরের নিশ্ছিদ্র পাঁচিল। ড্রাইভারের হাতে স্টিয়ারিং হুইল বনবন করে ঘুরছে। নব্বুই ডিগ্রী বাঁক নিচ্ছে গাড়ি।

গিরিখাতটা সাপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে, সেইসাথে সরু হয়ে গেছে ক্রমশ। অকস্মাৎ ফাঁকা একটা জায়গায় পড়ল গাড়ি, পাহাড়ের ধারে ছোট ছোট আলোর বিন্দু দেখা গেল। আরও কিছুটা এগিয়ে থামল ল্যান্ডরোভার।

পিছনের দরজা খুলে গেল। 'বেরিয়ে এসো,' শেখ মাহমুদের গলা শুনল ওরা অন্ধকার থেকে।

নিচে নেমে আড়মোড়া ভাঙল রানা। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পনেরো সেকেন্ড দৌড়ে রক্ত চলাচলটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল।

'মারপিট করার প্রস্তুতি নিচ্ছ নাকি?' ব্যঙ্গ করল শেখ মাহমুদ। 'এসো আমার সাথে।'

উপত্যকা থেকে খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছুল ওরা। ছায়ার মত রানার পিছনে রয়েছে গিলটি মিয়া। মৌনব্রত পালন করছে সে।

অপ্রশস্ত একটা পথ উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। দিনের বেলায় কোনমতে দু'জন লোক পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। অন্ধকারে যে-কোন লোকের জন্যে এ পথ মৃত্যুর ফাঁদ ছাড়া আর কিছু নয়। সাবধানে এগোচ্ছে রানা। ঠিক ওর পিছনেই গিলটি মিয়া।

পাহাড়টার অর্ধেক উঠে থামল ওরা। পথটা এখানে প্রশস্ত একটা জায়গায় এসে মিশেছে। দেয়ালের গায়ে বড় বড় গর্ত দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি অনেক গুহামুখ। ভেতর থেকে ল্যাম্পের আলো বেরিয়ে আসছে।

চওড়া জায়গাটা পেরোবার সময় উঁকি মেরে গুহার ভেতর তাকাল রানা। অনেক লোক সেখানে, শ'দুই তো হবেই। কোন মেয়ে চোখে পড়ল না ওর।

বড় একটা গুহার সামনে দাঁড় করানো হলো ওদেরকে। ভেতরে উজ্জ্বল আলো। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল শেখ মাহমুদ। রানা দেখল, শেখ ফারাজী একটা কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তার পাশে···

বিস্ফারিত হয়ে গেল রানার চোখজোড়া। গুহার ভেতর শেখ ফারাজীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদেহী, ইউরোপীয়ান পোশাক পরা কে ওই লোক?

গগল। ভিনসেন্ট গগল।

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গগল। হাসল না। হাত নাড়ল না। নড়ল না। যেন অবাক হয়েছে ওকে দেখে, কিন্তু চিনতে পারেনি।

গুহার বাইরে বেরিয়ে এল মাহমুদ। ওদেরকে নিয়ে গজ বিশেক এগিয়ে

থামল পাথরের দেয়ালে বসানো একটা দরজার সামনে। দরজার গায়ে কালো রঙের কি একটা নড়াচড়া করছে। রানা বুঝল, একজন লোক দরজার তালা খুলছে।

ঘাড়ের পেছনে রাইফেলের নল ঠেকল। নিঃশব্দে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। গিলটি মিয়াও। দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে। গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কেউ।

পকেট হাতড়ে একটা লাইটার বের করে জ্বালল গিলটি মিয়া। উঁচু করে ধরল আগুনের শিখাটা। ভূতুড়ে ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিছন দিকে অন্ধকার, সেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে গুহাটা। একদিকের দেয়ালের কাছে অনেকগুলো কাঠের বাক্স আর চটের বস্তা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে রয়েছে।

'পেয়েচি!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দেখল একটা শেলফ থেকে হাতখানেক লম্বা দুটো মোমবাতি তুলে নিচ্ছে গিলটি মিয়া।

মোমবাতি জ্বেলে একটা বাক্সের উপর বসল গিলটি মিয়া। 'একটু চা…থুড়ি, চা পাবো কোতায়… সিগার, স্যার?'

'আমরা এখন কোথায়, জানো, গিলটি মিয়া?'

'গেরিলাদের একটা আস্তানায়, স্যার।'

উত্তর শুনে গিলটি মিয়ার প্রশংসা করল রানা মনে মনে। তারপর ওর চিন্তা অন্য খাতে বইতে শুরু করল। গেরিলাদের সাথে ড্রাগস এর সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু সম্পর্ক একটা আছে, সন্দেহ নেই। কি সেই সম্পর্ক? ড্রাগের সাথে সম্পর্ক হতে পারে না গগলেরও। রুটির সাথে মাখনের যে-সম্পর্ক অস্ত্রশস্ত্রের সাথে গগলের সেই সম্পর্ক—সেটা না হয় বোধগম্য একটা ব্যাপার। গেরিলাদের অস্ত্র সরবরাহ করছে গগল, অবিশ্বাস্য কিছু নয়। কিন্তু ড্রাগের সাথে…অসম্ভব! ড্রাগ সংক্রান্ত যে-কোন ব্যবসাকে ঘৃণা করে সে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। আলজিরিয়ান বিদ্রোহীদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল গগল। এবং আলজিরিয়ায় অস্ত্র পাচার করেছিল আরও একজন।

মাদাম দালিয়া।

একটা সূত্র। সূত্রটা থেকে বোঝা যাচ্ছে মাদাম দালিয়ার সাথে যোগাযোগ আছে গগলের। যোগসূত্রটা অস্ত্র। কিন্তু ড্রাগ নিয়ে যারা কারবার করে তাদের সাথে কি অস্ত্রের কারবার করবে গগল?

একটু ভাবল রানা। গগলকে কতটুকু চেনে স্মরণ করার চেষ্টা করছে। আপন মনে মাথা নাড়ল ও: না। গগল ড্রাগ কারবারীদের সাথে কোনভাবেই জড়াবে না নিজেকে। স্মাগলার বটে, কিন্তু অন্য এক ধাতুতে গড়া একটা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের মানুষ এই গগল। তার একটা আদর্শ আছে। ড্রাগ স্মাগলারদেরকে সে ঘৃণা করে। শত্রু বলে মনে করে।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। এরা যে ড্রাগের সাথে জড়িত, সেকথা জানে না গগল।

'মন ভাল করার কোন দাওয়াই আচে, স্যার? মনটা হঠাৎ...' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল গিলটি মিয়া, দরজার তালায় চাবি ঢোকাবার শব্দ পেয়ে ঠোঁট মুড়ে ফেলল।

দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। পিস্তল হাতে একজন কুর্দ ঢুকল ভেতরে একপাশে সরে গিয়ে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে। ভেতরে ঢুকল মাহমুদ। হাতে একটা খাবারের ট্রে। 'মেহমানদের সেবা নিজের হাতেই করতে পছন্দ করি আমি,' একটা বাক্সের উপর ট্রে-টা নামিয়ে রাখল সে। সিধে হয়ে দাঁড়াল। 'তা, রানা, তোমাদের আর আমাদের মধ্যে যে সমস্যা, সেটার সমাধান কিভাবে করা যায়, ভেবেছ কিছু?'

'সমস্যা?'

'নয়?' হাসল মাহমুদ। 'তুমি দুঃসাহসী এবং বুদ্ধিমান—সমস্যা নেই একথা বলে সময় নষ্ট কোরো না, আচ্ছা, একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মি. ভিনসেন্ট গগলকে কি-রকম মনে হয় তোমার? আমাদেরও বন্ধু ও, শুনেছি, তোমাদেরও পরিচিত। আপত্তি আছে?'

জানল কিভাবে! ভাবছে রানা। গগল নিশ্চয়ই বলেনি! শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল গগল ওর দিকে, তাতেই বুঝে ফেলেছে?

রানার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন হেসে উঠল মাহমুদ। বডিগার্ডকে নিয়ে চলে গেল সে।

ট্রেতে দাঁড় করানো প্যারাফিন ল্যাম্পটা রানাকে দেখাল গিলটি মিয়া। 'ভদ্দরলোকের দয়া আচে, দেকেচেন।'

ঢাকনি তুলতে দেখা গেল মুরগির গরম রোস্ট, রুটি আর কফি দিয়ে গেছে মাহমুদ।

খেতে বসল ওরা। মুরগির একটা ঠ্যাঙ থেকে দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়তে ব্যর্থ হয়ে গিলটি মিয়া বলল, 'ওরে-ব্বাপ! ছেঁড়া যায় না! মুরগি বেটি বোধহয় খেলোয়াড়নি ছিলো!'

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা। ভাবছে। সম্ভবত তুর্কী বর্ডারের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে ওরা। ইরানীয়ান বর্ডারও এখান থেকে খুব বেশি দূরে হবার কথা নয়।

কুর্দিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে মাহমুদ ওকে কি বলেছিল মনে পড়ল রানার। কুর্দিদের নেতা, কি যেন নাম... মোল্লা মোস্তাফা বারজানী। এই গেরিলারা কি বারজানীর লোক?

কফি শেষ করে একটা চুরুট ধরাল রানা। গুহার বাকি অংশটা দেখার জন্যে মোমবাতি নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বিশেষ কিছু নেই গুহার ভেতর। লম্বায় গজ বিশেক। প্রস্থে গজ চারেক। কয়েকটা বাক্স আর বস্তা ছাড়া কিছু নেই।

বাক্স ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গিলটি মিয়া। ঢাকনি তুলে দেখল ভিতরটা। 'সার, স্যার।'

'মানে?'

'ক্ষেতে দেয়ার সার, স্যার।'
'সবগুলো বাক্স চেক করো।'
বেশির ভাগই খালি। কয়েকটা পাওয়া গেল যানবাহনের খুচরো যন্ত্রাংশ। একটা বাক্সের ভিতর একটা ডিজেল ক্যান পাওয়া গেল। অর্ধেক তেল ঢেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বাকিটা রয়ে গেছে। দুই বস্তা ভর্তি খড় পেল রানা। ল্যাম্পে বেশ খানিকটা কেরোসিন রয়েছে।
'আগুন জ্বেলে কিছু একটা, স্যার?' গভীর আগ্রহে রানার দিকে তাকাল গিলটি মিয়া।
'করা যায়। ধোঁয়ায় দম আটকে মরার ব্যবস্থা করা যায়।' দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কাঠের কবাটের উপর ইস্পাতের পাত মোড়া। মোটমাট ইঞ্চি চারেকের মত পুরু, অনুমান করল ও। হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। কান ঠেকাল কবাটের গায়ে। মুহূর্তে সরিয়ে নিল কান। দ্রুত পিছিয়ে এসে একটা বাক্সের উপর বসল।
'কেউ আসছে।'
তালা খোলার শব্দ শোনাই গেল না। কবাট দুটো উন্মুক্ত হলো ধীরে ধীরে। একমুখ হাসি নিয়ে ভিতরে ঢুকল গগল। এগিয়ে আসতে শুরু করল। হঠাৎ দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পিছনের দরজাটা। চমকে উঠে পিছনে তাকাল গগল।
'মনে হচ্চে দলটা ভারি হলো আমাদের।'
গিলটি মিয়াকে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে এসে রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল গগল। 'বেশ অনেকদিন পর দেখা, কেমন আছ, দোস্ত?'
'দেখতেই তো পাচ্ছ, বন্দী হয়ে আছি,' করমর্দন করে বলল রানা। একটা বাক্স দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল তাকে। 'তুমি এখানে কেন, গগল?'
উদ্বিগ্ন দেখাল গগলকে। বলল, 'প্রশ্নটা আমার। আমি এসেছি ব্যবসা উপলক্ষে। এখানে আমার কোন বিপদের ভয় নেই। কিন্তু তোমরা এখানে কেন? শেখ ফারাজী তোমাদের ওপর এমন খেপে আছে যে···রানা, এরা তোমাদের চরম বিপদ ঘটাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। ব্যাপারটা কি বলো তো?'
'মস্ত একটা ক্ষতি করেছি ওদের আমি,' বলল রানা। 'সে কথা পরে শুনো। এদের সাথে তোমার কিসের ব্যবসা, গগল?'
'অস্ত্রের, আবার কিসের!' বিরক্তির সাথে বলল গগল। 'প্রশ্ন শুনতে নয়, রানা, করতে এসেছি আমি। বাপ-বেটা পরামর্শ করে সেজন্যেই পাঠিয়েছে আমাকে এখানে।'
'কি জানতে চায় ওরা?'
সিগারেট ধরিয়ে মুখ তুলল গগল। 'তোমাদের সবকিছু জানতে চায়। কি ক্ষতি করেছ তুমি ওদের, আমাকে তা ওরা বলেনি। ফিল্ম কোম্পানির লোক বলে পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু ওটা যে একটা কাভার তা ওরা বুঝে গেছে।'
'বারজানীর অনুমানটা কি?'

'বারজানী!' অবাক হয়ে গেল গগল। 'বারজানী কি ভাবছে না ভাবছে তার আমি কি জানি?' হঠাৎ কষে এক চাপড় বসাল সে নিজের উরুতে। 'ওহ্হো, তুমি বোধহয় ভেবেছ, শেখ ফারাজী বারজানীর লোক? হাসালে দেখছি!'

'আসল ব্যাপারটা কি তাহলে?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'ফারাজীর নিজস্ব একটা দল আছে—নাম, আত্মত্যাগবাহিনী। বারজানী ইরাকের সাথে আপোস করার চেষ্টা করছে, তার লক্ষ্য স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু আত্মত্যাগীদের একমাত্র দাবি পূর্ণ স্বাধীনতা। ইরাকের সাথে বারজানীর একটা আপোস হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাই ফারাজী তার গেরিলাবাহিনীকে অস্ত্র দিয়ে সাজাতে চেষ্টা করছে। আমি তাকে সাহায্য করছি, কুর্দি পলিটিক্স এবং আমার ভূমিকা হলো এইটুকুই।'

'অস্ত্রশস্ত্র কেনার টাকা কে দিচ্ছে তাকে?'

'তা জানি না,' বলল গগল। 'আমার প্রাপ্য আমি পেয়ে যাব, সুতরাং, ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাই না।'

'হয়তো মাথা ঘামানো উচিত ছিল,' একটু গম্ভীর হলো রানা। 'অস্ত্র তুমি এখানে নিয়ে এসেছ কিভাবে?'

হাসতে লাগল গগল। 'প্রশ্নটা তুমি করতে পারলে? তোমার বোঝা উচিত ছিল, এটা একটা বিজনেস সিক্রেট!'

'অস্ত্র দিচ্ছ বিনিময়ে—মানে, দাম হিসেবে কি নিয়ে যাচ্ছ তুমি এখান থেকে?' রানার কণ্ঠে স্পষ্ট তিরস্কার।

'নিয়ে যাচ্ছি মানে?' গগল হতভম্ব। 'কিছুই নিয়ে যাচ্ছি না। বৈরুতে একটা ব্যাঙ্ক থেকে পেমেন্ট পাব আমি। আমেরিকান ডলার।'

'তুমি জানো না এমন একটা তথ্য তোমাকে আমি দিতে পারি,' বলল রানা। 'কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও। শেখ ফারাজীর অস্ত্র দরকার এ খবর প্রথম কে দেয় তোমাকে? কার কাছ থেকে সাপ্লাই পেয়ে এদের কাছে এগুলো বিক্রি করছ তুমি?'

আবার হাসল গগল। 'বিজনেস সিক্রেট। উত্তরটা কি দিতেই হবে?'

'মাদাম দালিয়া পিলোরমি নয়তো, গগল?'

কপালে উঠে গেল গগলের ভুরুজোড়া। 'গড! অনেক খবর রাখো! ফারাজী তাহলে সাধে খেপেনি!'

'কিন্তু খেপে ওঠার কথা তো তোমারও, গগল,' বলল রানা। 'নাকি ড্রাগের ব্যবসাকে এখন আর ততটা ঘৃণা করো না?'

কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে চেয়ে থাকল গগল। তারপর বলল, 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, রানা। কি বলতে চাইছ তুমি?'

'বলতে চাইছি শেখ ফারাজী ড্রাগের ব্যবসা করছে। গেরিলাবাহিনী পোষার যাবতীয় খরচ সে তুলছে এই ব্যবসা থেকে। তুমি হয়তো কিছুই জানো না, কিন্তু ব্যাপারটা হলো এই রকম: মাদাম দালিয়া ফারাজীর কাছ থেকে হেরোইন কিনছে, এই হেরোইনের দাম হিসেবে সে ফারাজীকে দিচ্ছে

অস্ত্রশস্ত্র, তোমার মাধ্যমে। মাদাম দালিয়া এই মুহূর্তে বৈরুতে রয়েছে, আমেরিকায় হেরোইন পাঠাবার জন্যে। তুমি জানো, এই গেরিলা ঘাঁটির কোথাও খাঁটি এক টন মরফিন আছে?'

অনড় পাথর হয়ে গেছে গগল। 'এসব কথা আমি বিশ্বাস করব, রানা?'

'তোমার ইচ্ছা,' বলল রানা। 'কিন্তু যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। ইরানে ফারাজীর ল্যাবরেটরি ধ্বংস করে দিয়ে এসেছি আমরা। আফিম ছিল ওখানে। কতটা জানো? দশ টন।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল গগল। 'তোমার কথা বিশ্বাস করছি আমি, রানা,' প্রায় অস্ফুটে বলল সে। 'কেউ আমাকে নিজস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করছে এ আমি ভাবতেই পারি না। দালিয়া জানে ড্রাগের ধারেকাছে যেতে পছন্দ করি না আমি। তোমার কথা যদি সত্যি হয়, যদি জেনে-শুনে এর মধ্যে আমাকে জড়িয়ে থাকে ও—রাক্ষসীটাকে নিজের হাতে খুন করব আমি।' ঝট করে রানার দিকে ফিরল সে। 'কতটা মরফিন বললে?'

'এক টনের মত। কোথাও পাচার করার আগে ওটাকে ওরা হেরোইনে রূপান্তর করবে বলে আমার ধারণা।'

'এক টন!' বিড়বিড় করছে গগল। রানার দিকে তাকাল। বলল, 'জিনিসটা এখানে আছে বলে মনে হয় না। এখানে আমি পৌঁছুবার পরপরই উটের একটা দল এসেছিল। কেমন যেন একটা উত্তেজনার পরিস্থিতি লক্ষ করেছিলাম তখন আমি। কিছু একটা উটের পিঠ থেকে নামিয়ে একটা ট্রাকে তোলা হয়েছিল। এই সময় কাছে-পিঠে কাউকে থাকতে দেয়া হয়নি। ট্রাকটা আজ সকালে রওনা হয়ে গেছে।'

'আমার বক্তব্য তো শুনলে। কি ভাবছ তুমি এখন, গগল?' স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'কাজের কথা তুলেছ,' বুক ভরে গভীর একটা শ্বাস নিল গগল। 'প্রথম কাজ তোমাদেরকে এখান থেকে বের করা—সেটা অলৌকিক কোন শক্তির সাহায্য ছাড়া সম্ভব বলে মনে হয় না। তারপর...তারপর অন্য কথা।'

'বাইরে থেকে একটা পিস্তল-টিস্তল এনে দিতে পারবে?'

'অসম্ভব, অতটা বিশ্বাস আমার ওপর নেই ওদের। সার্চ করে দেখে নিয়ে তবে এখানে ঢুকতে দিয়েছে আমাকে। দরজার বাইরে সারাক্ষণ পাহারায় আছে দু'জন সশস্ত্র লোক।'

দরজার দিকে আঙুল তুলল রানা। 'ওটাই একমাত্র মুক্তির পথ। গগল, কয়েক টুকরো কয়লা এনে দিতে পারবে তুমি?'

'কুর্দিস্তানে কয়লা!' আকাশ থেকে পড়ল গগল। 'অসম্ভব! কিন্তু কয়লা দিয়ে কি করবে?'

রানা গম্ভীর। 'বিজনেস সিক্রেট।'

হেসে ফেলল গগল। 'চারকোল হলে চলবে?'

'চলবে,' গিলটি মিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'ক্যানে কতটা তেল রয়েছে বলতে পারো?'

'হবে কোয়ার্টার গ্যালনের মতো,' বিশেষ আগ্রহ দেখাল না গিলটি মিয়া।

'দরজাটা বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি আমি,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'একটা ডিটোনেটর দরকার হবে। গগল, আমাদের গাড়িতে একটা ঘড়ি আছে, চারকোলের সাথে এটাও আনতে হবে তোমাকে।'

'ঘড়ি আনব কিভাবে? ধরা পড়ে যাব যে!'

'বুদ্ধি খাটালে ধরা পড়বে না,' বলল রানা। 'যাও।'

দরজায় নক করল গগল। বাইরে থেকে কেউ খুলে দিল সেটা। একবার ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেল গগল।

'চারকোল, তেল, ফার্টিলাইজার, খড়—এই তো পুঁজি। এ থেকে বোম? কিচু বুঝচি না! কিচুই ঢুকচে না মাতায়।'

বস্তায় হাত ভরে এক মুঠো সাদা পাউডার বের করে আনল রানা। 'এটা এগ্রিকালচারাল ফার্টিলাইজার—অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট—মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করার জন্যে এর জুড়ি নেই। কিন্তু ট্রেনিং নেয়ার সময় এটাকে আমরা অদ্ভুত একভাবে ব্যবহার করতে শিখেছিলাম। একশো পাউন্ড এই ফার্টিলাইজার, তার সাথে ছয় পাইন্ট ফুয়েল অয়েল, দু'পাউন্ড কয়লার গুঁড়ো মিশিয়ে দিলে যে জিনিসটা তৈরি হয় তাতে শতকরা চল্লিশ পার্সেন্ট থাকে জেলিগনাইট—বিস্ফোরক পদার্থ। ইন্দো-পাক ওয়ারের সময় কংক্রিট মিক্সচারের মেশিনে ঢেলে বোমা তৈরি করেছিল আমার কয়েকজন বন্ধু। সাউথ আফ্রিকার গোল্ড মাইনেও এই জিনিস ব্যবহার করা হয়—অনেক সস্তা পড়ে।'

'আমাদের কোনো খরচই হচ্চে না,' একমুখ হেসে বলল গিলটি মিয়া। 'বিনামূল্যে পাচ্চি।' হঠাৎ সন্দেহে কুঁচকে উঠল ভুরু। 'স্যার, বিনা পয়সার জিনিস ফাটবে তো?'

গিলটি মিয়ার কথা শুনতে পায়নি রানা। অন্য কথা ভাবছে সে। পাশা আর বরাত খান কতদূর কি করতে পারল কে জানে! কোন বিপদে পড়ল কিনা তা-ও জানার কোন উপায় নেই।

এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরল গগল। সামান্য একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে, লক্ষ করল রানা। সিগারেটের বদলে লম্বা একটা সিগার খাচ্ছে দেখে কৌতুক বোধ করল একটু।

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই সিগারের ডগার আগুন টোকা দিয়ে ফেলে দিয়ে সেটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল গগল। 'এই নাও চারকোল। চিন্তা কোরো না, আরও আছে।'

'ডিটোনেটর?' ব্যস্তভাবে জানতে চাইল গিলটি মিয়া।

কোমরের বেল্ট খুলতে শুরু করল গগল। কি মনে করে এক পা পিছিয়ে গেল গিলটি মিয়া। বেল্ট খুলে ট্রাউজারের চেন টেনে নামাল গগল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে নাইলনের কর্ডের সাথে বাঁধা ঘড়িটা বের করে আনল।

'সার্চ করেনি তোমাকে?' রানার গলায় নিখাদ বিস্ময়।

গম্ভীর হলো গগল। 'করেছে। কিন্তু খুঁজে পায়নি। একটা রোগের জন্ম দিয়ে তোমার এই ডিটোনেটর আনতে পেরেছি।'

'রোগ?'

'হ্যাঁ,' আরও গম্ভীর হলো গগল। 'পাইলস।'

গিলটি মিয়ার কথা কেউ শুনতে পেল না, বিড়বিড় করে বলল সে, 'বুজেচি!'

'কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'কিসের ঝামেলা? যা নয় তাই গল্প বানিয়ে বললাম তোমাদের সম্পর্কে। তবে কিছু ফাঁক রাখলাম এখানে সেখানে। সেই ফাঁকগুলো পূরণ করা জন্যে আবার পাঠিয়েছে আমাকে। এখুনি ওরা কেউ আসছে না এখানে। বুড়ো ঘুমুতে গেছে। আর মাহমুদ মদ নিয়ে বসেছে।' রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'ভোর হতে আর মাত্র তিন ঘণ্টা বাকি।'

'অন্ধকার থাকতেই পালাতে চাই...'

মাথা নাড়ল গগল। 'অন্ধকারে পালাবার পথ খুঁজে বের করা অসম্ভব, তার আগেই ধরা পড়ে যাবে তোমরা। ভোরের প্রথম আলোয় যা করার করতে হবে। ওদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরাতে চেষ্টা করব আমি। তা করতে হলে হাতে অন্তত ঘণ্টা তিনেক সময় দরকার আমার। তোমার ডিটোনেটর কতটা নিখুঁত?'

'মিনিটের কাছাকাছি পর্যন্ত।'

'গুড এনাফ। সময় নির্দিষ্ট করো পাঁচটা তিরিশে। ঠিক ওই সময় মহা হৈ-চৈ শুনতে পাবে তোমরা,' বলল গগল। 'তোমাদের ল্যান্ডরোভার জায়গামতই পাবে, ইগনিশন কী সহ।' নরম বালির মেঝেতে নকশা এঁকে দেখাল সে। 'এখানে থাকবে গাড়ি। আর এই পথ দিয়ে বেরুবে তোমরা। গুহা থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে মোড় নেবে, যে পথে এখানে এসেছ। সে-পথে যাবে না। বাঁদিকে মোড় নিয়ে একটু গেলেই একটা রাস্তা পাবে। কেউ ব্যবহার করে না। প্রায় খাড়া নেমে গেছে উপত্যকায়। বাইরের ঝুল-বারান্দার পাশ দিয়ে নেমে গেছে গজ দশেক...'

'কতটা খাড়া?'

'নামতে পারবে,' অভয় দিল গগল। 'এবার উপত্যকাটা থেকে বেরুবার উপায়। ঢোকার বা বেরুবার পথ একটাই, গিরিখাত গিয়ে। গাড়িতে উঠে গিরিখাতে ঢুকবে তোমরা, তারপর প্রথম বাঁকটার কাছে থামবে। মাহমুদের একটা ট্রাক নিয়ে তোমাদের পিছনে থামব আমি। রোড-ব্লকের জন্যে ওটাকে ব্যবহার করার ইচ্ছে আছে আমার।'

মৃদু হাসল রানা।

জুতোজোড়া খুলে ফেলল গগল। ঝাঁকুনি দিয়ে কালো রঙের ধুলো ঝাড়ল মেঝেতে খানিকটা। তারপর মোজার ভেতর থেকে কয়েকটা চারকোলের স্টিক বের করল।

'ধন্যবাদ, গগল,' বলল রানা। 'তোমার সাহায্য না পেলে...'

রানাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে গগল বলল, 'এ-ধরনের ছোটখাট কাজে আমি কিন্তু কাউকে ধন্যবাদ দিই না। ধন্যবাদের চেয়ে প্রতিদানের মর্যাদা আমার কাছে অনেক বেশি।'

বক্তৃতাটা চুপচাপ হজম করে নিল রানা। মানুষ হিসেবে গগল যে অদ্ভুত একটা দোষ-গুণের সংমিশ্রণ, জানে ও। রানা একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল লোকটাকে। কিন্তু বিনিময়ে সামান্য একটা মৌখিক ধন্যবাদও দেয়নি সে। কিন্তু অনেক বছর পর এক বিপদের মুহূর্তে দেখা গেল সেই উপকারের কথা ভোলেনি ও; প্রমাণ করে দিল, ফাঁকা বুলিতে বিশ্বাস করার লোক সে নয়, কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই অভ্যস্ত। ভূমধ্যসাগরের নিচ থেকে চার টন সোনা উদ্ধার করে ছোট্ট একটা চিরকুটের উপর লিখল সে 'ধন্যবাদ'।

'পাঁচটা ত্রিশে,' আরেকবার মনে করিয়ে দিয়ে চলে গেল গগল।

নির্দেশ পেয়ে কাজে লেগে গেল গিলটি মিয়া। একটা মসৃণ পাথরে চারকোল রেখে সেগুলো চামচের উল্টোপিঠ দিয়ে গুঁড়ো করতে শুরু করল।

স্পেয়ার পার্টসের বাক্স থেকে একটা পাইপ খুঁজে বের করে আনল রানা। পাইপটার একটা মুখ প্ল্যাগ দিয়ে বন্ধ করা। ইতোমধ্যে চারকোলকে পাউডারে পরিণত করেছে গিলটি মিয়া। ফার্টিলাইজার আর চারকোল মাপমত নিয়ে আলাদা করে রাখল রানা। কফি পটটা পরিষ্কার করল, তারপর শুকিয়ে নিল ভাল করে। তারপর একটু একটু করে ফার্টিলাইজার আর চারকোল গুঁড়ো ঢালতে লাগল তাতে। পরিমাণমত ঢালা হতে পটটা গিলটি মিয়াকে দিল ও। 'চামচ দিয়ে সারাক্ষণ নাড়তে থাকো, খুব ভালভাবে মেশা চাই।'

তেলের ক্যানটা বাক্স থেকে বের করল রানা। গন্ধ শুকে দেখল। খাঁটি ডিজেল। 'কিন্তু এ-কাজে আমরা ফুয়েল অয়েল ব্যবহার করতাম। কি হবে কে জানে!' গিলটি মিয়া পটটা বাড়িয়ে ধরল, তাতে খানিকটা তেল ঢালল রানা। 'নাড়তে থাকো।'

খানিকপর পটের মিক্সচারটা পরীক্ষা করে আরও একটু তেল ঢালল রানা। কিন্তু তেলের পরিমাণ বেশি হয়ে যাওয়ায় আবার খানিকটা করে ফার্টিলাইজার আর চারকোল মেশাতে হলো।

অনেকক্ষণ পর পদার্থটা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো রানা। 'হয়েছে। এবার আমরা বোমা তৈরি করব।'

ইস্পাতের টিউবটা তুলে নিয়ে প্লাগটা শক্তভাবে আঁটা আছে কিনা দেখে নিল রানা। খোলা মুখ দিয়ে ভিতরে বিস্ফোরক মিক্সচার ঢোকাতে শুরু করল, মুখ থেকে আঠাল মণ্ড টিউবের অভ্যন্তরে পাঠাবার জন্যে লম্বা একটা বোল্ট দিয়ে গুঁতো মারছে।

'হুঁশিয়ার!' ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল গিলটি মিয়া।

স্থির হয়ে গেল রানা। 'কি হলো?'

'ওই খোলটা ইস্পাতের, তাই না, স্যার?'

'তাতে কি?'

'বল্টুটাও ইস্পাতের। দুটোর ঘষা লেগে যদি আগুনের ফুলকি ওটে, তাহলে সব্বোনাশ—বুম্‌!'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বুকটা হালকা করল রানা। 'ঠিক আছে, আরও

সাবধানে কাজ করছি।'

খুক্ করে কাশল গিলটি মিয়া।

'আবার কি?' রীতিমত বিরক্ত হয়েছে রানা।

'সাবদান হলেও অনেক সোমায় বিপদ হতে পারে,' ইতস্তত করছে গিলটি মিয়া। 'তাই বলচিলাম...'

কথা শেষ করল না।

'ঝেড়ে কাশো।'

'আমার দাম যদি একশো টাকা হয়, আপনার দাম লাক টাকা—বোমটা যদি ফাটে, আমার হাতে ফুটলে অনেক কম খরচ পড়তো—এটুকুনই বলতে চাচ্চি।' হাত বাড়িয়ে টিউবটা ধরতে যাচ্ছে গিলটি মিয়া।

মুখ তুলে তাকাল রানা। দেখল, গিলটি মিয়ার সরল দুই চোখে নিষ্পাপ হাসি। ভেবেছে অকাট্য যুক্তি দিয়ে ঘায়েল করে ফেলেছে রানাকে। ওকে যে লোকটা কতখানি ভালবাসে, টের পেয়ে বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছটফট করে উঠল রানার।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলল রানা মুখের চেহারায়। ভুরু কুঁচকে কটমট করে তাকাল। তর্জনী তুলে দূরের একটা বাক্স দেখাল তাকে। 'ওখানে গিয়ে চুপচাপ বসো। আর একটা কথাও নয়।'

চুপ মেরে গেল গিলটি মিয়া। কিন্তু যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে একচুল নড়ল না।

টিউব ভরতে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। ঘড়িটা তুলে নিল এরপর রানা। টিউবের পিছনে ডিটোনেটর স্পাইকটা ঢুকিয়ে দিল। 'ডানদিকের বাক্সে ইস্পাতের কয়েকটা পাত আছে, পাশের বাক্সে আছে পেরেক, নিয়ে এসো ওগুলো।'

বোমটা দরজার গায়ে ফিট করতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল। প্রায় নিঃশব্দে কাজ করতে হচ্ছে, সেটাই দেরির কারণ। গিলটি মিয়ার ছুরিটা স্ক্রু-ড্রাইভারের কাজ দিল। কাজটা শেষ করে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'আর মাত্র আধ ঘণ্টা।'

কাঠের বাক্সগুলো টেনে হিঁচড়ে এক সারিতে রাখল গিলটি মিয়া। 'এ-পাশে মাথা নিচু করে শুয়ে থাকব আমরা।'

একটা সিগার ধরাল রানা। বাক্সের সারি টপকে বসল মেঝেতে। ইতোমধ্যেই শুয়ে পড়েছে গিলটি মিয়া। মৃদু কণ্ঠে বলল একবার, 'ভয় করচে, স্যার!'

তিন মিনিট পর, হালকা নাক ডাকার শব্দ পেল রানা গিলটি মিয়ার।

বাকি সময়টা নির্বিঘ্নে কাটলেই হয় এখন, ভাবছে রানা। কেউ যদি এসে পড়ে...

খুব ঢিমে তালে বইছে সময়। এগোতে চাইছে না কিছুতেই। অনেক...অনেকক্ষণ পর ঘনিয়ে এল সময়।

কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল গিলটি মিয়া।

'পাঁচ মিনিট বাকি, তৈরি হও,' বলল রানা।

বোমার কথা মনে পড়ে যেতেই চট করে মাথা নিচু করে শুয়ে পড়ল গিলটি মিয়া। একগাদা প্রশ্ন ভিড় করে এল তার মাথায়। স্যারের বোমটা যদি না ফাটে? ফাটলেও, যদি তেমন কাজ না করে? কিংবা, যদি খুব জোরে ফেটে পুরো গুহাটাকেই উড়িয়ে দেয়?

'চার মিনিট,' রিস্টওয়াচে চোখ রেখে বলল রানা। 'গিলটি মিয়া, আমি আগে বেরুব, তারপর তুমি।'

টিক্ টিক্ শব্দ করে সেকেন্ডগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। পেশীগুলো টান টান হয়ে উঠছে, অনুভব করছে রানা। গলাটা শুকনো শুকনো। পেটে অদ্ভুত একটা শিরশিরে অনুভূতি। 'তিন মিনিট,' শব্দটা উচ্চারণ করেই কান পাতল রানা, সাথে সাথে বুঝল, ভুল শোনেনি ও। 'সর্বনাশ! কেউ তালা খুলছে।'

'এখন যদি ফাটে হালুয়া হয়ে যাবে…'

সন্তর্পণে মাথা তুলে বাক্সের উপর দিয়ে দরজার দিকে তাকাল রানা। দরজাটা খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। একটা কালো ছায়ার মত ঢুকছে কে যেন। বাইরে ভোরের ক্ষীণ আলো। পাথরের দেয়ালে মাহমুদের ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলল, 'কি! দিব্যি ঘুমোচ্ছ দেখছি? ভয়-ডর বলতে কিছু নেই?'

মাটিতে দুটো কনুই ঠেকিয়ে মাথাটা আরও উঁচু করল রানা। ঘুমজড়ানো গলায় বলল, 'এই অসময়ে কি চাও তুমি?'

'বাবা বললেন, সূর্য ওঠার আগেই পুঁতে ফেলো। তাই তোমাদেরকে নিতে এলাম।'

সময় নষ্ট করতে চাইছে রানা। 'একটা ঘণ্টা পর এসো,' রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'সাড়ে ছ'টার সময়।' দেড় মিনিট বাকি আর।

'ঠাট্টা করছ মনে হচ্ছে?' দুই কোমরে হাত রাখল মাহমুদ। 'সিধে আঙুলে ঘি উঠবে না তাহলে?'

'রেগো না,' বলল রানা। 'নিয়েই যখন যাবে, চলো। এই গিলটি মিয়া, ওঠো!

নড়ছে না গিলটি মিয়া।

'ওঠো বলছি।' ধমকের সুরে বলল রানা। 'এক মিনিট সময় দিলাম তোমাকে, যদি না ওঠো এ্যায়সা গাট্টা মারব যে…'

কথার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না গিলটি মিয়ার, আর মাত্র এক মিনিট সময় আছে। 'কি হয়েচে, স্যার? একটু ঘুমুতেও কি দেবেন না?'

'ওঠো,' বলল রানা। 'শেখ ফারাজী আমাদেরকে পুঁতে ফেলার জন্যে ডাকছে।'

হেসে উঠল মাহমুদ। বোমাটাও ফাটল।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা। দরজাটার উড়ে আসা দেখতেই পেল না রানা। দাঁড়িয়ে হাসছিল মাহমুদ! তাকে সাথে নিয়ে বিদ্যুদ্বেগে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল দরজাটা। পতনের শব্দ শুনে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। তাজা রক্তে চুপচুপে ভেজা মাহমুদকে পলকের জন্যে দেখতে পেল ও। গিলটি মিয়া দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। নির্দেশ ভুলে গিয়ে রানার আগেই বেরিয়ে যাচ্ছে

সে। লাশটা টপকে ছুটল রানা। দূরে কোথাও চিৎকার করছে কেউ।

বাইরে বেরিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ছুটছে গিলটি মিয়া। ঝুল-বারান্দায় লম্বা হয়ে পড়ে থাকা একটা শরীরের সাথে ধাক্কা খেল সে, ছিটকে কিনারায় পৌঁছুল। পড়ে যাচ্ছিল, হাত লম্বা করে ধরে ফেলল তাকে রানা পিছন থেকে।

ঝুল-বারান্দার কিনারা ঘেঁষে ছুটল ওরা। শেষ মাথায় একজন গার্ড, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখ। ওদেরকে দেখেই কাঁধে ঝোলানো রাইফেলটা নামাচ্ছে। পা চালাল রানা। তলপেটে লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল লোকটা। পরমুহূর্তে পা তুলে দিল রানা তার গলার উপর। মট করে একটা শব্দের সাথে ভেঙে গেল কলার বোনটা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে আর গড়াগড়ি খাচ্ছে লোকটা। নিচে নামার সরু পথটা নিষ্কণ্টক হয়ে গেল।

বিপজ্জনক গতিতে অনুসরণ করছে রানা গিলটি মিয়াকে। ধুলো উড়ছে, পায়ের ধাক্কা খেয়ে দু'দিকে তীরবেগে ছুটছে নুড়ি পাথর। আলগা একটা পাথরের টুকরোয় পা পড়ল গিলটি মিয়ার, আছাড় খেতে যাচ্ছিল, ওর কোমরের বেল্ট ধরে ফেলল রানা।

মনে হচ্ছে তুমুল খণ্ডযুদ্ধ চলছে উপত্যকায়। গ্রেনেড ও স্মল আর্মসের আওয়াজ শুনে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে উটগুলো। নিচে নেমে দ্রুত চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতিটা আঁচ করে নিল রানা। পায়ের নিচে কেঁপে উঠল মাটি। ডান পাশের পাহাড়ের গায়ে ঝলকে উঠল তীব্র আলো। গুহার ভিতর পড়েছে বোমাটা। একটা পাথরের দেয়াল আশ্চর্য ধীর ভঙ্গিতে কাত হয়ে যাচ্ছে।

ভোরের অস্পষ্ট আলোয় ধুলোর আবরণ ভেদ করে রানার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ল্যান্ডরোভারটার উপর। ছুটল ও। পিছনে গিলটি মিয়া।

চারদিক স্মল আর্মসের আওয়াজ। বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট। চোখ বন্ধ করে ছুটছে গিলটি মিয়া। মাঝে মাঝে লাফ দিচ্ছে রানা। তাকে অনুসরণ করে সেই জায়গায় পৌঁছে লাফ দিয়ে লাশগুলো টপকে যাচ্ছে সেও।

কোন বিপদ ঘটল না, আরও একশো গজ নির্বিঘ্নে এগোল ওরা। গাড়িটা যখন আর মাত্র গজ বিশেক দূরে, প্রচণ্ড পরিশ্রমে জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো গিলটি মিয়ার। দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাচ্ছে মুখ হাঁ করে।

সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে রানার। বিশাল বুকটা দ্রুত ওঠা নামা করছে। গিলটি মিয়াকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করল ও। 'আর মাত্র পনেরো গজ...'

তিনজন কুর্দি বেরিয়ে এল গাড়ির আড়াল থেকে। যেন ওদের জন্যেই গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। একজন হাঁটু মুড়ে বসে রাইফেল তাক করতে শুরু করেছে। এত কাছ থেকে লক্ষ্য ব্যর্থ হবার প্রশ্নই ওঠে না। গিলটি মিয়াকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে গেল রানা, কিন্তু তার আগেই গুলি করল লোকটা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আকাশ থেকে পড়ল যেন উটের দলটা। রাইফেলের

আওয়াজের সাথেই ধরাশায়ী হলো একটা উট। দিগ্বিদিক, এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি শুরু করেছে বাকিগুলো। ঝড়ের বেগে এগোচ্ছে রানা। ওর সামনে একটা দিগ্‌ভ্রান্ত উট, তাকে ধাওয়া করছে ও।

আন্দাজে ভর করে যত্রতত্র গুলি ছুঁড়ছে লোকগুলো। একজন পিছিয়ে যেতে গিয়েও পারল না, উন্মত্ত একটা উট তাকে পায়ে মাড়িয়ে চলে গেল। তিন-চার হাত দূর থেকে হাড় ভাঙার শব্দ শুনল রানা, অনুমান করল এক পাশের পাঁজরের সবক'টা হাড়ই চুরমার হয়ে গেছে। দ্বিতীয় লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেলটা কেড়ে নিল সে। লোকটা প্রথমে কিছুই বোঝেনি। দেখতেই পায়নি সে রানাকে। ঘাড় ফেরাতে গিয়ে দেখল রাইফেলের নল সবেগে নেমে আসছে কপালের উপর।

'জিতে গেচি, স্যার!'

ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল তৃতীয় কুর্দির পিঠের উপর দাঁড়িয়ে ওকে কুর্নিশ করছে গিলটি মিয়া। লোকটার কোথায় লেগেছে বুঝতে পারল না রানা, তবে দেখল মুখ থেকে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে গলগল করে।

কুর্নিশ শেষ করেই লাফ দিয়ে উঠল গিলটি মিয়া ল্যান্ডরোভারে। ইগনিশন কী ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল। পরমুহূর্তে ছেড়ে দিল গাড়ি।

ছুটছে রানা গাড়ির সাথে সাথে। ঘাড় ফেরাল পিছন দিকে। ভোরের বাতাসে ওর চুল উড়ছে। পতপত করছে শার্ট। চারদিকে ধুলোর পাহাড়। পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে উটগুলো। অবিরাম গুলি ফুটছে এখনও। গগল? কোথায় সে? চারদিকে আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল রানা। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। তৈরি হয়েই ছিল গিলটি মিয়া, সাথে সাথে বাড়িয়ে দিল স্পীড। কোথাও দেখতে পেল না রানা গগলকে।

তিরিশ সেকেন্ড পর উইং মিররে দৃষ্টি রাখতেই প্রকাণ্ড ট্রাকটাকে দেখতে পেল রানা। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। বুঝতে পারল গগলের কোন বিপদ হয়নি। ট্রাকের উইন্ডস্ক্রীন হা হা করছে, কাঁচের কোন চিহ্ন নেই। রোদে পোড়া তামাটে মুখে শাদা দাঁত দেখতে পাচ্ছে রানা। সন্দেহ নেই, হাসল গগল। পলকের দেখার মধ্যেই রানার মনে হলো কি যেন একটা গোলমাল আছে ট্রাকটার। পরমুহূর্তে চোখে ধরা পড়ল ব্যাপারটা। কালো, মোটা একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমাগত ট্রাক থেকে বেরিয়ে পিছনের উপত্যকার দিকে ভেসে যাচ্ছে। বাঁক নিচ্ছে গিলটি মিয়া। ল্যান্ডরোভারের পিছনটা দেয়ালের প্রচণ্ড এক ঘষা খেল। উইং মিরর ফেটে গেল সাথে সাথে, তারপর গুঁড়ো হয়ে ঝড়ে পড়ল কাঁচটা।

গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করেছে গাড়ি। একশো গজের ভিতরই অকস্মাৎ বড়ো বাঁকটা আছে কোথাও, আবছাভাবে মনে পড়ল রানার। গিলটি মিয়াকে সাবধান করে দেবার জন্যে মুখ খুলতে যাবে ও, দেখল বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা।

কপালের দু'পাশে সবগুলো শিরা ফুলে উঠেছে গিলটি মিয়ার। বনবন করে ঘুরছে ওর হাতে ধরা স্টিয়ারিং হুইল। জানালা থেকে হাতটা সরিয়ে নিল

রানা। দেয়ালের সাথে ঘষা খেল জানালার বাইরেটা। হাতটা সরাতে এক সেকেন্ড দেরি হলে একটা হাত হারাতে হত তাকে। ব্রেক কষল গিলটি মিয়া। তীব্র ঝাঁকুনি। স্থির হয়ে গেল গাড়ি।

পিছনে সংঘর্ষের প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। গিরিখাতের দেয়ালে ট্রাকের নাক সেঁধিয়ে দিয়েছে গগল। প্রবেশপথটা সম্পূর্ণ বন্ধ এখন। উন্মুক্ত উইন্ডস্ক্রীন গলে বেরিয়ে আসছে সে। একটা হাত চোখের উপর। ধোঁয়া ঠেকাতে চাইছে। অন্য হাতে একটা সাব-মেশিনগান। লাফ দিয়ে নিচে নামল ট্রাক থেকে। ছুটে আসছে। নিমেষে কালো ধোঁয়া আড়াল করে ফেলল ট্রাকটাকে।

ছুটে এসে লাফ দিয়ে ল্যান্ডরোভারের পাদানিতে উঠল গগল। রানার নাকের পাশে ঠেকল সাব-মেশিনগানের ঠাণ্ডা নলটা। ঝাপটা মেরে সেটা সরিয়ে দিয়ে গগলের একটা হাত ধরে তাকে পাশে উঠতে সাহায্য করল ও। হাঁপাচ্ছে গগল। ঢোক গিলল।

'গাড়ি ছাড়ো!' দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠল গিলটি মিয়ার উদ্দেশে গগল। 'যে-কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হবে!'

'মানে?'

গিলটি মিয়া ছেড়ে দিয়েছে গাড়ি। শেষবার পিছন দিকে তাকাল রানা। আগুন ধরে গেছে ট্রাকে।

বাঁক নিচ্ছে গাড়ি। এমন সময় পিছন থেকে প্রথম বিস্ফোরণের আওয়াজ এল। গোটা একটা ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্ট র‍্যাপিডফায়ার এক্সারসাইজ শুরু করেছে বলে মনে হলো রানার। কানের পর্দা কাঁপিয়ে দিচ্ছে অবিরাম গুলিবর্ষণ।

'মর্টার বোমায় ট্রাকটা বোঝাই,' চেঁচিয়ে বলল গগল। গাধার মত চেঁচাচ্ছে সে। 'স্মল আর্মস অ্যামুনিশনের কয়েকটা পেটি খুলে বুলেটগুলো ছড়িয়ে রেখে এসেছি।' জিভ বের করে উপরের ঠোঁট থেকে লোনা ঘাম টেনে নিয়ে হাসল সে। 'আধঘণ্টার জন্যে ওটা একটা মরণফাঁদ, আত্মহত্যার ইচ্ছা না থাকলে কাছেপিঠে কেউ ঘেঁষবে না।'

'বেড়ে দেখিয়েছ, গগল,' বলল রানা।

'আরে!' হঠাৎ আঁতকে উঠল গগল। 'খেয়ালই ছিল না···রানা, সামনে মস্ত বিপদ!'

'মানে?' কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল রানা।

'গিরিখাতের মুখে শেখ ফারাজীর একটা আউট-পোস্ট আছে। মেশিনগান বসানো। ঝাঁঝরা করে দেবে, বেরুবার উপায় নেই।'

'উপায় একটা হবেই,' বলল রানা।

রানার নির্বিকার ভাব দেখে একটু অবাকই হলো গগল।

ইঙ্গিত পেয়ে হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল গিলটি মিয়া। পায়ের কাছ থেকে একটা এয়ার-ব্যাগ তুলে নিয়ে রানা নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে দেখে গগল বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'দেরি হবে না,' বলে নেমে গেল রানা।

জানালা দিয়ে মুখ বের করে গগল দেখল গিরিখাত ধরে পিছন দিকে ছুটছে রানা। বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

তিন মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। গগল লক্ষ করল এয়ার-ব্যাগের মুখ খোলা, ভেতরে কিছু নেই। গাড়ি ছেড়ে দিল গিলটি মিয়া।

কৌতূহল প্রকাশ করল গগল। 'কিছু রেখে এলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। ক্যালট্রপ—টায়ার-বার্স্টার,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'যেভাবেই পড়ুক মাটিতে, একটা ছুঁচোল দিক ওপর দিকে মুখ করে খাড়া করে থাকবে।'

'বুঝলাম। কোন গাড়িকে আর এগোতে হবে না।'

'এগোতে পারবে, তবে তার আগে ওগুলো সরিয়ে নিতে হবে। ঘণ্টা দেড়েকের কাজ।'

পিছন থেকে অবিরাম গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। 'কতটা যেতে হবে আর?' জানতে চাইল রানা।

'এ্যাকোনো আদ্দেক রাস্তা, স্যার।'

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে বসে থাকল ওরা, তারপর বলল গগল, 'সামনের বাঁকে থামতে বলো, রানা। বাঁকের পরই গার্ডদের পাহাড়।'

আরও পঞ্চাশ গজ এগোল গাড়ি। বাঁকটা দেখে স্পীড কমাল গিলটি মিয়া। পুরো বাঁকটা না নিয়েই ব্রেক কষল সে। লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা। গগলও নামল।

'কি অবস্থা?'

রাস্তার শেষ মাথাটা ইঙ্গিতে দেখাল গগল। 'বাঁকের মাথায় গিরিখাতের ইতি। কিছুদূরে ছোট একটা পাথুরে পাহাড় আছে, ওখান থেকেই রাস্তার ওপর নজর রাখা হয়।'

'ক'জন ওরা?' জানতে চাইল রানা।

'মাত্র বারোজন, কিন্তু বারোশো জনের সমান। মেশিনগানটাই ওদের শক্তি এতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। গিরিখাত থেকে বেরুবার একটাই পথ, সেটাকেই পাহারা দিচ্ছে।'

'লুকিয়ে গিয়ে সব ক'টাকে সাবড়ে দেয়া যায় না?' বলল গিলটি মিয়া।

ভ্রূ কুঁচকে ভাবছে রানা।

'অসম্ভব,' গিলটি মিয়ার বক্তব্য বুঝতে পেরে বলল গগল। 'গিরিখাত থেকে মাথা বের করলেই দেখতে পাবে। তারপর ফাঁকা রাস্তা, গা ঢাকা দেবার মত কিছু নেই।'

ভাবছে রানা।

'জোরে গাড়ি চেলিয়ে ভাগলে কেমন হয়?'

'না। গিরিখাতের মুখ থেকে তিনশো গজ দূরে আউট-পোস্ট, পাহাড়ের মাথায় মেশিনগান ফিট করে বসে আছে। সামনে ছয়শো গজ ফাঁকা জায়গা, পুরোটা কাভার করছে ওই একটা মেশিনগান।'

'তার মানে, লোকগুলো নয়, মেশিনগানটাই ঘাপলা করচে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওটাকেই ধ্বংস করতে হবে। লোকগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে যাক। অকারণে রক্তপাত ঘটাতে চাই না আমি।'

'মেশিনগান ধ্বংস করবে?' চোখ কপালে উঠে গেল গগলের। 'কিভাবে?'

'সবুর করো,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'ওপরে উঠে দেখে আসি একবার। এই ফাঁকে গিলটি মিয়াকে একটু সাহায্য করো তুমি। গাড়ি থেকে স্পেয়ার হুইলটা খুলে ফেলতে হবে। সাবধান, কোনরকম শব্দ যেন না হয়।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল গগল। 'স্পেয়ার হুইল…?'

ততক্ষণে সরে গেছে রানা। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে।

গিলটি মিয়া টের পেয়ে গেছে রহস্যটা। মর্টারের কথা বলেছিল স্যার। ভাবছে ও। থলে থেকে এবার বুঝি বেরুবে বিড়াল! কাজে হাত লাগাল সে। কৌতূহল ঠিকরে বেরুচ্ছে চোখমুখ থেকে। তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল গগল।

দু'জন মিলে বের করে আনল স্পেয়ার হুইলটা। সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গিলটি মিয়া। এদিক-ওদিক দেখছে, ঠিক কোথায়, রাখা যায় ভাবছে।

নিচে নেমে এল রানা। 'আউট-পোস্টের ওরা ঘাবড়ে গেছে বোমাগুলোর আওয়াজে। এদিকেই নজর ওদের।' গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল ও। 'তাড়াতাড়ি তৈরি হতে হবে। জ্যাকটা বের করো, কুইক!' একটা স্প্যানার হাতে নিয়ে ল্যান্ডরোভারের নিচে ঢুকছে রানা, দেখে হতভম্ব হয়ে গেল গিলটি মিয়া

গাড়ির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল রানা। জ্যাকটা বের করে আনল গিলটি মিয়া, নামিয়ে রাখল মাটিতে।

'একটু সাহায্য করো,' নিচে থেকে ভেসে এল রানার গলা।

মাটিতে হাঁটু রেখে বসল গিলটি মিয়া, মাথা নিচু করে গাড়ির নিচে তাকাল। দ্রুত হাত চালিয়ে এগজস্ট সাইলেন্সার খুলছে রানা। খোলা হয়ে যেতে সেটা ধরল গিলটি মিয়া, একটু গরম এবং অসম্ভব ভারী মনে হলো জিনিসটাকে। দু'জন ধরাধরি করে বের করে নিয়ে এল বাইরে। একজোড়া নাট খুলে দিয়ে ব্যাফলগুলো পিছলে বেরিয়ে আসার পথ করে দিল রানা। হুইলের দিকে ইঙ্গিত করল, 'এটাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে রাখো,' বলে জ্যাক আর টুলবক্সটা নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল

বুকে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে গগল। মাথাটা একদিকে একটু কাত করা। গভীর মনোযোগের সাথে রানার কীর্তিকলাপ লক্ষ করছে সে। 'এসব কি হচ্ছে জানতে পারি, রানা?'

'এগুলো জোড়া দিলে একটা মর্টার তৈরি হবে,' বলল রানা।

'কি?'

'এত আশ্চর্য হবার কি আছে?' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঘষে কপালের ঘাম মুছল রানা। 'মর্টার তো আর আকাশ থেকে পড়ে না, ওটা লোহা-লক্কড় দিয়ে পৃথিবীর মানুষই তৈরি করে!'

'মর্টার? ওগুলো দিয়ে মর্টার তৈরি করবে?' গগল এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না।

'করব। একটা মর্টারে কি কি লাগবে? বেস প্লেট লাগে? স্পেয়ার হুইলটা বেস-প্লেটের কাজ করবে। ওটার উঁচু কানা দেখতে পাচ্ছ? ওটা শক্তভাবে মাটি কামড়ে থাকবে। সাইলেন্সারটা হলো ব্যারেল। সাথে নানান যন্ত্রপাতি দেখেই বুঝতে পারছ ল্যান্ডরোভারের সাইলেন্সার আসলে নয় ওটা।' কথা বলছে বটে, কিন্তু হাতদুটো রানার ব্যস্ত রয়েছে কাজে। 'এই লাগগুলো হুইলের এখানে ফিট হবে। এসো, ধরো একটু।'

হুইলের ছিদ্রগুলোয় অনায়াসে ঢুকে গেল সবক'টা লাগ। প্রত্যেকটিতে একটা করে পিন ঢোকাল রানা। 'এটা, এই স্ক্রু জ্যাকটা হলো এলিভেটিং মেকানিজম,' গগলকে বলল ও। 'এভাবে ফিট হবে। হুইল ব্রেসটা ফিট করে ঘোরাও, গোটা ব্যারেল ওঠানামা করবে। নাটগুলো এঁটে দাও শুধু, ব্যস।'

বিস্মিত গগলকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল রানা গাড়ির কাছে। ফিরে এসে মাটিতে ফেলল সাধারণ একটা ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক প্রোট্র্যাক্টর। 'জ্যাকের সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকাতে হবে এটাকে, ড্রিল মেশিন দিয়ে আগেই গর্ত করা আছে।' জায়গামত প্রোট্র্যাক্টর বসিয়ে স্ক্রু এঁটে দিয়ে সহজ একটা রেঞ্জ স্কেল তৈরি করে ফেলল ও। 'এবার যাও, গগল, উপরে উঠে বেরাদারদের হালচাল দেখে এসো।'

উঠে দাঁড়াল গগল। একটা হাত রাখল রানার কাঁধে, চোখে চোখ, মুখে স্মিত হাসি।

'ভাবছি, কপাল ভাল আমার, তোমার সাথে ঠোকর লাগেনি আজও।'

গিরিখাত বেয়ে উপরে উঠল গগল। তিনশো গজ দূরে পাহাড়টা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছয়জন লোককে। চূড়ায় দাঁড়িয়ে গিরিখাতের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে আছে। 'ফারাজীর সাথে টেলিফোন যোগাযোগ আছে ওদের?' গগল নিচে নেমে এলে জানতে চাইল রানা।

এখনও দূর থেকে ভেসে আসছে বিস্ফোরণের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। 'না থাকলেই বা কি!' বলল গগল। 'ভয়ঙ্কর কোন গোলমাল যে বেধেছে তা ঠিকই টের পেয়ে গেছে ওরা। এগোলেই বাধা দেবে।'

'অতএব?' গিলটি মিয়ার প্রশ্ন।

'বাধা চুরমার করে দিয়ে এগোতে হবে। একটা লাইট-মেশিনগানও আছে আমাদের সাথে,' বলল রানা। 'দড়ি বেঁধে তুলে নাও ওটা ওপরে, গুলি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করো ওদের। ওদের মেশিনগান জবাব দেবে, দিলেই আমরা জানতে পারব কোথায় বসিয়েছে। তখন মর্টার ছুঁড়ে ধ্বংস করব ওটাকে।'

'ফাইন!' হাসল গগল।

'ওখান থেকে তুমি আমাদের আর্টিলারি স্পটারের ভূমিকাও পালন করতে পারবে,' বলল রানা। 'নিচে থেকে কিছুই না দেখে ফায়ার করব আমি, তোমার সিগন্যাল অনুযায়ী।'

'গুড,' বলল গগল। 'কিন্তু গিরিখাতের পিছন দিক থেকে যদি আক্রমণ

আসে…'

'ঠিক। পিছন দিকেও নজর রাখতে হবে। গিলটি মিয়াকে তোমার সাব-মেশিনগানটা দিয়ে পাঠাচ্ছি ওদিকে।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এটা-সেটা জোড়া দিয়ে তৈরি করে ফেলল রানা লাইট-মেশিনগানটা। খুব শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধল সেটা গগল। তারপর দড়ির একটা প্রান্ত নিয়ে উঠে গেল আবার উপরে। উপর থেকে দড়ি টেনে তুলে নিল সেটাকে। জানতে চাইল, 'রানা, মর্টার তো বানালে, শেল কোথায়?'

'শেল নয়, বোমা,' বলল রানা। 'অত্যন্ত মূল্যবান, মাত্র কয়েকটা আছে। গাড়িতে ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে। লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই? বনেটের নিচে ইঞ্জিনের ফাঁকে দুটো, ড্যাশের নিচে দুটো এবং পিছনে দুটো। মোট ছয়টা। গিলটি মিয়া, হাত লাগাও, বের করে ফেলা যাক ওগুলো।'

দ্রুত লাইট-মেশিনগানটা জায়গা বেছে বসিয়ে নিল গগল। আগেই দেখে নিয়েছে, এই গানে বেল্ট বা ড্রাম নেই। বুলেট ঢালার জন্যে শুধু একটা হপার আছে। বিশ রাউন্ড অ্যামুনিশন ভরে নিল সেটায়। সাইটে চোখ রেখে তাকাল পাহাড়ের দিকে। চূড়ায় দাঁড়ানো দলটাকে দেখতে পেয়ে মাথা ঘুরিয়ে নিচে তাকাল, ইঙ্গিত করল রানাকে।

সাব-মেশিনগানটা গিলটি মিয়ার হাতে তুলে দিল রানা।

'পিছন দিকে চলে যাও, প্রথম বাঁকটার কাছে দাঁড়াবে। কিছু নড়তে দেখলেই গুলি করবে।'

রানাকে স্যালুট করার ইচ্ছাটা দমন করল গিলটি মিয়া। সাব-মেশিনগানটা তার জন্যে অস্বাভাবিক ভারী, দু'হাত দিয়ে ধরতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে। তবে, রীতিমত ছুট লাগাল সে। এবং মুহূর্তে গিরিখাতের পিছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দু'মিনিট অপেক্ষা করল রানা। তারপর ইঙ্গিত করল গগলকে।

লাইট-মেশিনগানের বাঁটে চিবুক রাখল গগল, সাইটে চোখ রেখে তাকাল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পাঁচজন লোককে। ইচ্ছে করলেই লাইন ধরে শুইয়ে দিতে পারে। লক্ষ্য স্থির করল ওদের পায়ের ছ'ইঞ্চি নিচে। আস্তে করে ট্রিগারে চাপ দিল সে। নলটা ঘুরাল এপাশ থেকে ওপাশে। প্রতি সেকেন্ডে আড়াই হাজার ফিট বেগে তপ্ত সীসা ছুটতে শুরু করল। মনে মনে খুশি হলো গগল নিজের হাতের টিপ দেখে। কেঁপে গেছে ব্যাটাদের পায়ের নিচের পাথর। সাইট থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল। একজনকেও দেখা যাচ্ছে না চূড়ায়।

গুলিবর্ষণ বন্ধ রেখে কিছু ঘটার অপেক্ষায় থাকল গগল। সন্তর্পণে নড়ল সে. একমুঠো বুলেট ফেলল হপারে। প্রথমবারেই বেশ কিছু মূল্যবান বুলেট খরচ হয়ে গেছে। আরও কৃপণ হওয়া উচিত ছিল ওর, ভাবল সে।

পরপর দু'বার গর্জে উঠল একটা রাইফেল, কিন্তু একটা বুলেটও ওর কাছাকাছি এল না। আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে ওরা।

আবার রাইফেলের আওয়াজ। শব্দের পার্থক্য লক্ষ করে গগল বুঝল. দুটো রাইফেল থেকে বেরুল গুলিদুটো। বুলেট আকৃষ্ট করাই যখন উদ্দেশ্য, সুতরাং

আবার লাইট-মেশিনগান চালানো যেতে পারে। এবার আরও সাবধানে ট্রিগারে হাত রাখল সে। চাপ দিয়েই দ্রুত সরিয়ে নিল হাত। এক পলকে বেরিয়ে গেল পাঁচ রাউন্ড গুলি। সাথে সাথে জবাব পেল সে। একটা মেশিনগানের গুরুগম্ভীর কিন্তু চাপা আওয়াজ হলো। এক পশলা বুলেট-বৃষ্টি হয়ে গেল ওর ত্রিশ গজ বাঁ দিকে, দশ গজ নিচের পাথরের উপর।

কিন্তু ঠিক কোত্থেকে ছোঁড়া হলো গুলি, দেখতে পায়নি গগল। তাই আবার ট্রিগারে চাপ দিল সে। পরক্ষণেই জবাব পেল, সেই সাথে মেশিনগানটার অবস্থান জানা হয়ে গেল। পাহাড়ের বাঁকে কয়েকটা পাথরের স্তূপের আড়ালে রয়েছে ওটা।

গগলের কাছ থেকে সিগন্যাল পেয়ে ঝুঁকে পড়ল রানা, অ্যাডজাস্ট করে নিল মর্টার। তারপর ল্যানিয়ার্ড ধরে টান দিতেই গর্জে উঠল মর্টার। আকাশের গায়ে চিকণ একটা দাগ দেখল রানা, রঙধনুর মত উঠে গিয়ে নামতে শুরু করেছে—মুহূর্তে চোখের আড়ালে চলে গেল। ঝট্ করে চোখ সরিয়ে গগলের দিকে তাকাল প্রথম গোলার ফলাফল বুঝতে চাইছে ও।

'আরও বিশ গজ বাঁ দিকে, ত্রিশ গজ দূরে ছুঁড়তে হবে,' বলল গগল।

গিরিপথের মুখ লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়ে চলেছে মেশিনগান। কুৎসিত কট্‌কট্ শব্দ। দ্রুত এলিভেশন অ্যাডজাস্ট করে নিল রানা, তারপর লোড করল। ছুটল দ্বিতীয় গোলা।

মেশিনগান পজিশনের লম্বরেখার উপরই, কিন্তু খানিকটা পিছনে পড়ল বোমাটা। এক লোক কাভার থেকে বেরিয়ে ছুটছে, দেখতে পেয়েই ট্রিগারে চাপ দিল গগল। পরমুহূর্তে রেঞ্জ কমাবার জন্যে সিগন্যাল দিল রানাকে।

মর্টার অ্যাডজাস্ট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রানা। পাহাড়ের দিকে তাকাল গগল। একটানা গর্জে চলেছে মেশিনগান, তার পজিশনের ঠিক নিচেই শত-সহস্র টুকরো হয়ে যাচ্ছে পাথর। ছিটকে মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাথরের টুকরো বেরিয়ে গেল বাতাসে শিস কেটে। মাথা নিচু করে নিয়ে গড়িয়ে একটা বোল্ডারের পিছনে চলে এল সে। কয়েক সেকেন্ড পরই ছেড়ে আসা জায়গার মাটি ক্ষতবিক্ষত করে দিল এক ঝাঁক তপ্ত সীসা, ওর লাইট-মেশিনগানটাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেল দেড় গজ দূরে।

ইতোমধ্যে তৃতীয় বোমাটাকে ছুঁড়ে দিয়েছে রানা আকাশে। বিস্ফোরণের শব্দটা শুনল গগল। একই সাথে লক্ষ করল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে শত্রুপক্ষের মেশিনগান। কনুই আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে শরীরটা তুলল সে। ঝুঁকি নিয়ে মাথাটা উঁচু করে তাকাল পাহাড়ের চূড়ার দিকে। ভোরের বাতাসে লালচে ধোঁয়া দেখল সে, ঠিক যেখানে একটু আগে ছিল মেশিনগানটা। আকাশে আরও একবার দেখা গেল চিকণ একটা দাগ। পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের গম্ভীর আওয়াজ হলো। প্রায় একই জায়গায় পড়েছে চতুর্থ বোমাটাও।

ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল গগল, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর দরকার নেই।' হামাগুড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল সে। প্রায় গড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুত নেমে এল সে নিচে—দেখলে মনে হবে পা পিছলে যাওয়ায় পড়ে যাচ্ছে বুঝি। কিন্তু মাটিতে

পা-দুটোই পড়ল আগে। মুহূর্তে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, ছুটে চলে এল মর্টারের কাছে। 'ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ওরা! এই সুযোগে কেটে পড়া উচিত আমাদের,' রানাকে বলল সে। 'তোমার লাইট-গানটা গেছে।'

'যাক। সময়মত কাজে লেগেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা। মুখের ভেতর দুটো আঙুল ভরে তীক্ষ্ণ শিস দিল। তাকাল গগলের দিকে। 'শুনতে পাবে না গিলটি মিয়া?'

গিরিখাতের পিছন দিকে তাকাল গগল। ছুটে গিয়ে ল্যান্ডরোভারে চড়ল রানা। স্টার্ট দিল। ছুটন্ত পায়ের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে, শুনতে পেয়েই গাড়ি ছেড়ে দিল ও। দু'পাশে গাড়ির সাথে সাথে দৌড়াচ্ছে গিলটি মিয়া আর গগল। এক সাথে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল দু'জন দু'দিকে। স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। গিরিখাত থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে পাহাড়টাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। সীট টপকে গাড়ির পিছনে চলে গেছে গিলটি মিয়া, হাতে সাব-মেশিনগান। কিন্তু গুলি করার দরকার হলো না। কোথাও কোন শব্দ বা কোনরকম নড়াচড়া চোখে পড়ল না কারও।

নয়

দু'দিন পর লেবাননের খালদ্ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামল ওরা। ল্যান্ডরোভারটা মোসালে গগলের এক বন্ধুর কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে পৌঁছুল সবাই। তিন মিনিট পর হোটেল থেকেই ফোন করল রানা লন্ডনে, রানা এজেন্সীর অফিসে। কিন্তু অফিস থেকে ওকে জানানো হলো, স্যার হ্যামিলটন এই মুহূর্তে বৈরুতেই রয়েছেন, সেন্ট জর্জেস হোটেলে উঠেছেন তিনি। তাঁর কাছ থেকেই সব খবর জানতে পারবে রানা।

সেন্ট জর্জেসে ফোন করতেই সন্ধান পাওয়া গেল স্যার হ্যামিলটনের। 'এক্ষুণি আসছি,' বলে ফোন রেখে দিলেন তিনি, এবং সাত মিনিটের মাথায় সশরীরে পৌঁছে গেলেন ওদের সুইটে।

'পাশার খবর কি?' প্রথমেই জানতে চাইল রানা।

ওদিকে পায়চারি করছে গগল। নিচু গলায়, অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল সে। 'দালিয়ারও খবর চাই আমি।'

'পাশার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না, রানা,' রানার প্রশ্নের উত্তরে স্যার হ্যামিলটন বললেন। 'ওর কাছ থেকে যে মেসেজ পাওয়া গেছে তার অর্থ দাঁড়ায় মাদাম দালিয়া দুই হাজার পাউন্ড হেরোইন পাচার করতে যাচ্ছে: একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু হিসেবে কোন ভুল হয়েছে কিনা জানার জন্যে পাশার সাথে আর যোগাযোগ করতে পারেনি আসাদ।'

'কোন ভুল নেই হিসেবে,' বলল রানা। 'গিলটি মিয়া আর আমি এক টন

ধ্বংস করে দিয়েছি, তা না হলে দু'টন হেরোইন পাচার করত মাদাম দালিয়া।'

সিগার ধরাল রানা। তাকাল গগলের দিকে। 'মাদাম দালিয়া সম্পর্কে কতটা জানো তুমি সব বলবে আমাকে?'

'ওর সম্পর্কে সামান্য কিছু জানাও প্রায় অসম্ভব,' বলল গগল। 'কুয়ান ডি শান্তিয়ানা নামে একটা ইয়ট আছে, মালিকের নাম শেখ ফুয়াদ, কিন্তু শেখ ফুয়াদের কোন অস্তিত্বই নেই। আসলে ইয়টটার মালিক দালিয়া। অর্থাৎ নিজের নামে কিছুই নেই ওর। ওর সম্পর্কে জানা তাই সহজ নয়।'

'মরফিনকে হেরোইনে রূপান্তর করার কাজ এখনও বাকি আছে ওদের,' বলল রানা। 'আমার বিশ্বাস এই বৈরুতেই কাজটা করবে ওরা।'

'আরডেলের সাহায্য ছাড়াই?' প্রশ্নটা স্যার হ্যামিলটনের।

'কাজটা তেমন কঠিন নয়, যে-কোন কেমিস্ট করতে পারে,' বলল রানা। 'মাদাম দালিয়া যদি টর্পেডোর ফাঁদে পা দিয়ে থাকে তাহলে বরাত খান এবং পাশাকে প্রকাশ্যে দেখতে না পাবারই কথা আমাদের।'

'টর্পেডো জোগাড় করা কোন সমস্যাই নয় দালিয়ার,' বলল গগল। 'মেডিটারেনিয়ানের সব জায়গায় অস্ত্র পাচার করে আসছে কয়েক বছর থেকে। কিন্তু, টর্পেডোর ফাঁদে সে যদি পা দিয়ে থাকে, তার একটা জাহাজ দরকার হবে। উপকূল আর বন্দর এলাকাগুলোর ওপর নজর রাখলে আমরা হয়তো দেখা পাব তার।'

'কুয়ান ডি শান্তিয়ানা ছাড়া মাদাম দালিয়ার আর কি আছে?'

'আঙুর খেত, রেস্তোরাঁ, একজোড়া খামারবাড়ি, শিপইয়ার্ড, গ্যারেজ, জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক, হাউজিং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি, পিক্‌ল্ ফ্যাক্টরি...'

'কি বললে?' বাধা দিল গগলকে রানা। 'পিক্‌ল ফ্যাক্টরি?'

'হ্যাঁ—সসেজ আর পিকল্ ফ্যাক্টরি। কিছুদিন আগে কিনেছে। কেন?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রানার মুখ। 'মরফিনকে হেরোইনে রূপান্তর করার সময় তীব্র একটা গন্ধ ছড়ায়। গন্ধটা অ্যাসেটিক অ্যাসিডের। অনেকটা ভিনিগারের মত গন্ধটা।'

'ইকটু ইকটু করে হলেও এগোচ্ছি,' এক এক করে সকলের জন্যে কাপে কফি ঢালছে গিলটি মিয়া।

'এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ব আমরা,' বলল রানা। 'এক এক জন এক এক দিকে যাব। প্রত্যেকের কাজ ভাগ করে দিচ্ছি আমি। স্যার হ্যামিলটন এখানেই থাকবেন, হেড অফিসের দায়িত্ব তাঁর ওপর। আমরা সবাই ফোন করে যার যার খবর পাঠাব। এবার শোনো, কার কি দায়িত্ব...'

গুনগুন করে সুর ভাঁজছে বরাত খান। হাতে আর মাত্র একটা টর্পেডোর কাজ বাকি।

অনেকদিন হলো একটানা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে সে। খাবার-দাবারও তেমন ভাল পায়নি—অর্থাৎ বাঙালি খাবার পেটে পড়েনি। এই শেড এবং

শেডের বাইরে অল্প খানিকটা জায়গার মধ্যে একটানা আটকা পড়ে আছে। তবু আনন্দের কোন অভাব নেই মনে, কারণ সবচেয়ে প্রিয় কাজটা করার সুযোগ পাচ্ছে এখানে সে। মনের কোণায় একটু দুঃখ বরং এই জন্যে যে প্রিয় কাজটা করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হাতে যাচ্ছে সে শিগ্‌গিরই। কাজটার বিপজ্জনক অংশটা ক্রমশ কাছে সরে আসছে। তবে এই মুহূর্তে আটলান্টিকের অপর তীরে কি ঘটবে না ঘটবে তা নিয়ে মোটেও ভাবিত নয় সে। সমস্ত মনোযোগ এখন তার ওয়ারহেডটা খোলার দিকে নিবেদিত।

মনে মনে উত্তরোত্তর অস্থির হয়ে উঠছে ওদিকে পাশা। দালিয়া আটলান্টিকের ওপারে, আমেরিকায়, ঠিক কিভাবে কি করবে তা জানার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে ও। ঠিক কোন্ এলাকায় টর্পেডো পৌঁছুবে, কখন ইত্যাদি জানার জন্যে ছটফট করছে সে। কিন্তু দালিয়া এসব তথ্য ছিপি এঁটে দিয়েছে নিজের ভেতরেই। ওয়েস্টম্যান সম্ভবত এসব তথ্য জানে না।

টর্পেডো-টেস্টের পরদিন থেকে পাশাও আটকা পড়েছে এই শেডে। দৈনিক পত্রিকার একটা সংখ্যায় ওর বিজ্ঞাপনটা ছাপা হতে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিল ও। কিন্তু ওইটুকুই, তারপর আর আনন্দের কিছু ঘটেনি।

ভুরু কুঁচকে পিছন দিকে তাকাল পাশা। ঠিক, যা ভেবেছিল তাই—আরবটা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এ আরেকটা উপদ্রব, সারাক্ষণ নজরবন্দী হয়ে-থাকা।

ওয়ার্কশপে হঠাৎ সবকিছু স্থির হয়ে গেছে, অনুভব করল পাশা। বরাত খানের দিকে তাকাল ও। মাথা নিচু করে ওয়ারহেডটা দেখছে বরাত খান। কেমন যেন হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে। 'কি হলো, মামা?'

'শোনো,' পাশার কানে আশ্চর্য শান্ত লাগল বরাত খানের কণ্ঠস্বর।

বরাত খানের কাছে গিয়ে বসল পাশা। আলী তাকিয়ে আছে, ঘাড় না ফিরিয়েও বুঝতে পারল ও। মুখটা নির্বিকার রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু বরাত খানের হাত দুটোকে একটু একটু কাঁপতে দেখে ভড়কে গেল পাশা। অবাক চোখে ওয়ারহেডের দিকে তাকিয়ে আছে বরাত খান।

'এমন কিছু কোরো না যাতে লোকটার সন্দেহ জাগে ' নিচু গলায় বলল বরাত খান। 'ব্যাপারটা হলো, এটা একেবারে ভর্তি!'

'কি দিয়ে ভর্তি?' বোকার মত প্রশ্ন করল পাশা।

'টি-এন-টি দিয়ে, বুঝছ না কেন! টি-এন-টি ছাড়া একটা ওয়ারহেডে আর কি থাকে?' বিরক্তির জায়গায় কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের ছাপ ফুটল। 'এখানে যা আছে, যদি ফাটে, গোটা এলাকাটা এক মাইল উঁচুতে উঠে যাবে।'

বড় একটা ঢোক গিলল পাশা। 'কিন্তু ওয়েস্টম্যান বলেছিল এগুলো খালি অবস্থায় ডেলিভারি নেয়া হবে।'

'ভুলে এসে পড়েছে এটা,' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রাখল এক সেকেন্ড, তারপর ছেড়ে দিল আবার বরাত খান। 'শুধু তাই নয়, এর সাথে একটা ডিটোনেটরও রয়েছে। আশা করছি রেডি করা অবস্থায় নেই—থাকা উচিত নয়। কিন্তু ওয়ারহেডে ওটার তো কোন অবস্থাতেই থাকার কথা নয়। পাশা,

এটা আমি খুলে না নেয়া পর্যন্ত খুব সাবধানে নড়াচড়া কোরো তুমি।'

সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে পাশা ওয়ারহেডের দিকে। নড়ার শক্তি পাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে বরাত খান। ঘাম গড়াচ্ছে তার ঘাড়ে। অত্যন্ত সাবধানে, রুদ্ধশ্বাসে কাজ করছে। একটা বেঞ্চে ডিটোনেটরটা নামিয়ে রাখল সে। 'সামান্য একটু দূর হলো ভয়, কিন্তু বেশি নয়। কেন যে এটা আগে ফাটেনি, বলতে পারি না। ওয়ারহেডে ডিটোনেটর ঢুকিয়ে রাখা একটা ভয়ানক ক্রাইম।'

দরদর করে ঘামছে পাশা। 'এখনও আবার কিসের ভয়?'

'এক নম্বর খচ্চর জিনিস এই টি-এন-টি,' বরাত খান বলল। 'সময়ের সাথে সাথে মেজাজ সপ্তমে চড়তে থাকে বাবাজীর। এমন স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে যে আপনা থেকেই ফেটে যেতে পারে। তুমি বরং ওটার কাছ থেকে একটু দূরে সরে থাকো, ভাগ্নে।'

'তা না হয় থাকব,' বলল পাশা। 'কিন্তু ওটার ব্যবস্থা কি করবে ভেবেছ কিছু?'

'ব্যবস্থা? ওয়েস্টম্যান আসুক...'

'না।' চাপা কণ্ঠে বলল পাশা। 'আমি বলতে চাইছি, ওয়ারহেডটাকে আমাদের স্বার্থে কোন কাজে লাগানো যায় না?'

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বরাত খানের মুখ। 'তাই তো! সোনার চেয়ে দামী কথা মনে করিয়ে দিয়েছ তুমি আমাকে, ভাগ্নে।'

'যায় তাহলে?'

'যায় না মানে?' ধমক মারল বরাত খান। পরমুহূর্তে শান্তভাবে বলল সে, 'নেভীর লোকেরা এটাকে ধ্বংস করার কথা ভাবত। কিন্তু আমি ভাবছি সম্পূর্ণ অন্য কথা। বের করে সরিয়ে রাখব জিনিসটা, কিভাবে কাজে লাগানো যায় পরে ভাবলেও চলবে। খবরদার, আলী ব্যাটা যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।'

'দেখলেও কিছু বুঝবে না ও,' বলল পাশা। 'তবে ওয়েস্টম্যানের চোখে পড়ে গেলে ধরা পড়ে যেতে হবে। ওটাকে নিয়ে যা করার এখুনি করে ফেললে হত না?'

'টর্পেডোর ধর্ম কি, বলো তো, ভাগ্নে? বিস্ফোরণ ঘটানো, তাই না?' হাসছে বরাত খান। 'আমি একজন টর্পেডো মেকানিক, তাই কথাটা আমি বেশিক্ষণ ভুলে থাকতে পারি না। আমি চাই এই হিংসুটে মাছগুলো গন্তব্যে পৌঁছে পেট ফেটে মারা যাক। তারই ব্যবস্থা করব আমি। সুতরাং, একটু সময় আমাকে তোমার দিতেই হবে।'

মানসপটে রোমাঞ্চকর একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে পাশা: চারটে টর্পেডো প্রত্যেকটি ২৫,০০০ ০০০ ডলারের উপর হেরোইন নিয়ে আমেরিকার তীরে একের পর এক বিস্ফোরিত হচ্ছে অপেক্ষারত রিসেপশন কমিটির আতঙ্কিত চোখের সামনে। 'কিন্তু এই অতিরিক্ত ওজনের ফলে টর্পেডো...?'

'সব রহস্য কক্ষনো ফাঁস করি না আমি,' বলল বরাত খান। 'কিছু কিছু

আমার নিজের কাছেই থাকে।'

'মাত্র একটা ডিটোনেটর আছে তোমার কাছে।'

'ভালভাবে তৈরি করা হলে কৃত্রিম একটা ডিটোনেটরেও কাজ হয়,' বলল বরাত খান। 'কিন্তু তার আগে ওয়ারহেড থেকে ওটা বের করতে গিয়েই সম্ভবত তোমাকে সাথে নিয়ে মারা যাব আমি। সুতরাং সমস্যাটা এখন তোলা থাক।' নিবিষ্টভাবে তাকাল সে ওয়ারহেডের দিকে। 'কিছু ব্রাস টুল দরকার হবে আমার।'

ধীরে ধীরে পা ফেলে ওখান থেকে সরে গেল পাশা। সেই সার্বক্ষণিক হাসিটাকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে ও।

দিন চারেক পর টর্পেডোগুলোকে খুঁটিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলো ওয়েস্টম্যান। 'সব কাজ শেষ, রওনা করে দিতে আর কোন বাধা নেই, বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল বরাত খান। 'ওয়ারহেডগুলো শুধু ভরতে বাকি। ভরা হয়ে গেলে টিউবে ঢুকিয়ে ছোঁড়া যাবে।'

'বস্ এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন,' ওয়েস্টম্যান বলল। 'তিনি চান এই ভরার কাজটা নিজের হাতে করবেন। যাতে কোথাও কোন ভুলত্রুটি না হয়।'

'তা সম্ভব নয়,' দ্রুত মাথা নেড়ে প্রতিবাদের সুরে বলল বরাত খান। 'কি ভেবেছে সে? কাজটা ছেলেখেলা নাকি? কোনরকমে ভরলেই যদি চলত, তবে তো কথাই ছিল না। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে নানান কৌশল খাটাতে হবে আমাকে। কাজটা যদি আর কারও হাতে হয়, আমি কোন গ্যারান্টি দিতে পারব না। টর্পেডো নিচে নেমে গেলে আমি দায়ী থাকব না।' ওয়ারহেডের ভিতর কেউ হাত ভরতে গেলে তার হাত কেটে ফেলতেও ইতস্তত করবে না সে। 'কাছে থাকুক, উঁকি মেরে দেখুক, তাতে আমার আপত্তি নেই।'

'ঠিক আছে, বস্ এলে কথাটা তাকেই বোলো।'

তর্ক করল দালিয়া, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় মানতে হলো তাকে। বলল, 'তবে আমার চোখের সামনেই হবে সব। ওয়ারহেড সীল না করা পর্যন্ত আমি থাকব।'

'আমাদের ওপর দেখছি বিশ্বাস নেই তোমার,' মৃদু কণ্ঠে বলল পাশা।

'কাউকে বিশ্বাস করি না আমি,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল দালিয়া। 'যাও, ওগুলো নিয়ে আসতে সাহায্য করো জ্যাককে।'

বড় একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স ধরাধরি করে নিয়ে এল ওরা শেডে। দ্বিতীয় বাক্সটা আনতে গেল আবার। পা দিয়ে বাক্সের গায়ে টোকা দিল দালিয়া। 'খোলো এটা।'

ছুরি দিয়ে বাক্সের উপরটা কেটে ফেলল বরাত খান। বাক্স ভর্তি পলিথিন ব্যাগ, ভিতরে সাদা পাউডার। 'প্রতিটি ব্যাগে হাফ কিলোগ্রাম করে আছে,' বলল দালিয়া। 'মোট পাঁচশো ব্যাগ—একটা টর্পেডোর জন্যে।'

সিধে হলো বরাত খান। 'তা কথা ছিল না। পাঁচশো পাউন্ডের কথা বলেছি আমি, দুশো পঞ্চাশ কিলোর কথা বলিনি। পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি হচ্ছে।'

'কোনরকমে ঢোকাও।'

'বুঝছ না কেন,' অধৈর্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বরাত খান, 'পাঁচশো পাউন্ড লোডের জন্যে টর্পেডোগুলোর ভারসাম্য নির্দিষ্ট করেছি আমি, অতিরিক্ত দশ পার্সেন্ট ওজন যদি বাড়ে, ভারসাম্য নষ্ট হবার ভয় আছে—তার মানে আবার নতুন করে ভারসাম্য নির্ধারণ করতে হবে আমাকে—তাও সম্ভব কিনা জানি না।'

'আরও একশো হাজার ডলার দেব, বলল দালিয়া। 'শুধু তোমাকে। কিছুই জানবে না পাশা। তবু পারবে না?'

'ঠিক আছে, যেভাবে হোক একটা ব্যবস্থা করব,' বলল বরাত খান। সে-ও চায় যথাসম্ভব বেশি হেরোইন ভরা হোক। টর্পেডোর পিছনে যেন এতটুকু পড়ে না থাকে। ভারসাম্য নষ্টের ব্যাপারটা আসলে তেমন কিছু নয়, ভুয়া। 'কিন্তু একশো হাজার ডলারের বিনিময়ে কাজটা করছি, ভুলে যেয়ো না আবার!'

হাসল দালিয়া। 'আমি জানতাম তুমি রাজি হবে।'

সস্তাতেই বাজি মাত করছে, ভাবল বরাত খান। অতিরিক্ত দুশো পাউন্ড হেরোইনের দাম ১০,০০০,০০০ ডলার, মাত্র ১০০,০০০ ডলার খরচ করলেই পেয়ে যাচ্ছে—অবশ্য তাকে যদি ঘুষটা দেয়, তবেই।

পাশা আর ওয়েস্টম্যান আরেকটা বাক্স নিয়ে ফিরে এল। অত্যন্ত সাবধানে, ধীর গতিতে ওয়ারহেডের ভিতর প্যাকেট সাজাচ্ছে বরাত খান। 'ঘনত্বেরও একটা ব্যাপার আছে,' বলল সে। 'এটা তো আর টি-এন-টি-এর মত সলিড কিছু নয়—জায়গা বেশি নেবেই, বিশেষ করে এই প্লাস্টিকের প্যাকেটে থাকায়।'

'ঠিক জানো তুমি ওয়ারহেডগুলো ওয়াটারপ্রুফ?'

'জানি।'

আশ্চর্য একটা পরিবর্তন লক্ষ করছে বরাত খান দালিয়ার মধ্যে। ভিতরে প্রচণ্ড উত্তেজনা, কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে বরাত খানের কাজের হাত দুটোর দিকে।

কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে ওয়েস্টম্যান। এটা সেটা নাড়াচাড়া করছে। বেঞ্চের কাছে এসে দাঁড়াল একবার। বেঞ্চভর্তি যন্ত্রপাতি, খামোকা সেগুলো নাড়াচাড়া করছে লক্ষ করে রাগে গা জ্বালা করে উঠল বরাত খানের। অথচ, কেন, কিসের জন্যে তার উপর এই রাগ, নিজেই বুঝল না সে।

কিছু একটা আবার তুলে নিল ওয়েস্টম্যান, না তাকিয়েও বুঝতে পারল বরাত খান।

জিনিসটা তুলছে ওয়েস্টম্যান, হঠাৎ তা দেখতে পেল পাশা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। জমে পাথর হয়ে গেল যেন শরীরটা। ওয়েস্টম্যান বেঞ্চ থেকে ওয়ারহেডের ডিটোনেটরটা তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে।

'কি এটা?' জানতে চাইল ওয়েস্টম্যান।

মুখ তুলল বরাত খান। দেখল ডিটোনেটর হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েস্টম্যান। না তাকিয়েও বুঝল, প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে দালিয়া এবং হতভম্ব

দৃষ্টিতে পাশাও দেখছে ওকে। মুখ ফিরিয়ে নিল ও। কোন ভাবান্তর হয়নি চেহারায়। উত্তর দিল না। তিন সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা। ওয়েস্টম্যান রেগেমেগে প্রশ্নটা ফের করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখ না তুলে, হাতদুটো চালু রেখেই স্বাভাবিকভাবে বরাত খান বলল, 'বি সার্কিটের জন্যে কন্ট্যাক্ট ব্রেকার। ওটা ভাল কাজ করছিল না বলে আরেকটা তৈরি করে নিয়েছি আমি।'

শূন্যে ছুঁড়ে দিল সেটা ওয়েস্টম্যান, একহাত দিয়ে লুফে নিল, তারপর রেখে দিল বেঞ্চের উপর।

'আমি সন্তুষ্ট,' কাজ শেষ হতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দালিয়া। 'এটাকে ভয়েজারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো, জ্যাক। কাল বাকি বাক্সগুলো নিয়ে আসব, বরাত খান। পরশু সকালে রওনা দেবে ভয়েজার।' পাশার দিকে তাকাল সে। একটা চোখ টিপল। 'সব কাজ শেষ হলে আবার তোমার সাথে··· কেমন?'

ঢোক গিলল পাশা।

আলোচনার জন্যে স্যার হ্যামিলটনকে ঘিরে বসল ওরা। গিলটি মিয়ার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে, কারণ ওকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সে-ব্যাপারে তেমন সুবিধে করতে পারেনি সে। 'ফ্যাক্টরি তো নয়, ছিপি আঁটা বোতল। সাইনবোর্ট টেঙিয়ে রেখেচে: মেরামতের কাজ চলচে, তাই বন্দ।'

'সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি তোমার?' জানতে চাইল রানা।

'ভিনিগারের একটু গন্দো নাকে ঢুকলো, তবে বেশি না। কাউকে ঢুকতে দেকিনি, বেরোতেও না। গোটা দিনটাই মাটি হয়ে গেলো আমার।'

'আমি ঢুকতে দেখেছি,' বলল রানা। 'মাদাম দালিয়াকে ফলো করেছিলাম। ওর সাথে একজন আমেরিকান, ওয়েস্টম্যান ছিল। পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকে ওরা। ঘণ্টাখানেক ছিল।' গগলের দিকে তাকাল ও। 'তোমার খবর কি?'

'শিপইয়ার্ডটা খুব একটা বড় নয়,' বলল গগল। 'ভিতরে ঢোকা অসম্ভব। দালিয়াকে কোথাও দেখতে পেলাম না। একটা বোট ভাড়া নিয়ে সাগর থেকে যতটুকু দেখা যায় দেখে এসেছি। কুয়ান ডি শান্তিয়ানা নোঙর ফেলে রেখেছে, সাথে মান্ধাতা আমলের একটা কোস্টার, গায়ে লেখা রয়েছে—ভয়েজার। ব্যস, এইটুকুই। বাইরে থেকে মনে হয়, কাজকর্ম তেমন হচ্ছে না। তবে, গেটে জনাকয়েক তাগড়া যোয়ান আছে—পাহারা দিচ্ছে।'

'পুরানো কোস্টার? কি নাম বললে, ভয়েজার? দেখে কি মনে হলো, আটলান্টিক পাড়ি দিতে পারবে?'

'পারবে। তিন হাজার টনের কোস্টার। সে যাক, আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। বিকেলের দিকে একটা ট্রাক ঢুকেছে গেট দিয়ে, পিছনে অস্বাভাবিক লম্বা একটা ট্রেইলার ছিল। তারপুলিন দিয়ে ঢাকা, নিচে কি আছে দেখতে পাইনি।'

'টর্পেডো?'

'অসম্ভব নয়।'

'একটা ব্যাপার বুঝছি না,' বলল রানা। 'বরাত খান আমাকে বলেছিল একটা টর্পেডো পাঁচশো পাউন্ড মাল বহন করতে পারে। এদিকে দালিয়া একটন হেরোইন পাচার করতে যাচ্ছে, বরাত খান যদি একটা টর্পেডো ছোঁড়ার ব্যবস্থা করে দেয় তাহলেও পৌনে এক টন হেরোইন হাতে থাকবে মাদাম দালিয়ার।'

'এবং,' বলল গগল, 'বরাত খান এবং পাশা যদি পাঁচশো পাউন্ড হেরোইন সহ টর্পেডোটা ধ্বংস করে দেয়, সাথে সাথে দালিয়া তার দলবল এবং হেরোইন সহ আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাবে। জান বাঁচানো দায় হয়ে যাবে তখন আমাদের।'

'বরাত খান একা নয়, তার সাথে গোলাম পাশা আছে,' বলল রানা। 'পাশা কাঁচা কাজ করার ছেলে নয়। আমার ধারণা, যে একটা টর্পেডো জোগাড় করতে পারে তার পক্ষে আরও তিনটে টর্পেডো জোগাড় করা অসম্ভব নয়। মাদাম দালিয়া তাই করেছে এবং ওরাও একটা নয়, চারটে টর্পেডোই ধ্বংস করার তালে আছে।'

'এ-সবই কিন্তু অনুমান,' বললেন স্যার হ্যামিলটন। 'আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না বরাত খানের টর্পেডো-ফাঁদে দালিয়া পা দিয়েছে কিনা!'

'আমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি এখনও,' বলল গগল। 'শিপইয়ার্ড থেকে ট্রাক আর ট্রেইলারটা বেরিয়ে এল। আমি ফলো করলাম। উপকূলেই আরেক জায়গায় গেল সেটা। এ জায়গাটাও ওয়েল প্রোটেকটেড, পাঁচিল ঘেরা, ভিতরে ঢোকার কোন উপায় নেই। কাছাকাছি একটা বাড়ির চিলেকোঠায় ওঠার জন্যে একটা কেয়ারটেকারকে পকেট খালি করে ঘুষ দিলাম, সেখান থেকে পাঁচিলের ওধারে জায়গাটার চার ভাগের এক ভাগ দেখা যায়। একজন আরবকে দেখলাম, সম্ভবত চাকর-বাকর হবে। আরেকজন লোককে দেখলাম। নিগ্রোদের মত কালো...'

'বরাত খান!' বলল রানা।

'আর একজন, লোহা-পেটা শরীর। চিতানো বুক। হাসি হাসি মুখ... গোলাম পাশা নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'একটা গাড়ি ঢুকল ভিতরে, কয়েক মিনিট পর আবার বেরিয়ে গেল...'

'ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা,' বলল রানা।

'গোলাম পাশা আর বরাত খানের নিরাপত্তার কথা ভাবছি আমি,' বলল গগল। 'ওরা যদি টর্পেডো ধ্বংস করে দেয়, দালিয়া স্রেফ দাঁত বসাবে ঘাড়ে।'

'এর একমাত্র সমাধান শত্রুপক্ষ অপ্রস্তুত থাকতে থাকতে আক্রমণ করা,' বললেন স্যার হ্যামিলটন। 'এখন প্রশ্ন হলো, কোথায় আঘাত হানব আমরা? পিক্‌ল ফ্যাক্টরিতে, নাকি শিপইয়ার্ডে?'

'পিকল্‌ ফ্যাক্টরিতে নয়,' বলল রানা। 'ইতিমধ্যেই হয়তো ওরা সরিয়ে ফেলেছে হেরোইন। আক্রমণ যদি করাই হয়, শিপইয়ার্ডেও নয়, জাহাজে করতে হবে।'

'সেই সাথে গোলাম পাশা এবং বরাত খানকেও উদ্ধার করতে হবে আমাদের।' রানাকে সমর্থন করল গগল।

'সেক্ষেত্রে জাহাজ রওনা হবার ঠিক আগের মুহূর্তে হামলাটা চালাতে হবে,' স্যার হ্যামিলটন পাইপ ধরালেন। 'কিন্তু জাহাজ ঠিক কখন রওনা হবে তা আমরা জানি না।'

'আরও একটা ব্যাপার জানা যাচ্ছে না, জাহাজে সবটা হেরোইন থাকবে কিনা,' রানা চিন্তিত। হঠাৎ ঝট করে গগলের দিকে ফিরল ও। 'চিলেকোঠা থেকে পাঁচিলের ওপারে ওদেরকে দেখেছ তুমি, ওখানে কোন্‌দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলে? রোদ লাগছিল চোখে?'

'রোদের জ্বালায় ভাল করে তাকাতেই পারছিলাম না। কেন বলো তো?'

'বরাত খান নেভীতে ছিল, নিশ্চয়ই মোর্স জানে। একটা আয়না দরকার আমার। হেলিয়োগ্রাফের সাহায্যে যোগাযোগ করতে পারব ওর সাথে।'

'ভেরি গুড!'

সভা ভেঙে গেল। রানা একধারে টেনে নিয়ে গেল গগলকে। 'তোমাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব আমি।'

'কি?' অবাক হয়েছে গগল।

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝি না। আইন-শৃঙ্খলার প্রতি তোমার দরদ খুব বেশি নেই। নিজেও তুমি একজন চোরাচালানী। অথচ ড্রাগের নাম শুনলেই তুমি তেড়ে ওঠো। ব্যাপারটা কি?'

হাসি হাসি মুখটা মুহূর্তে কঠোর হয়ে উঠল গগলের। চাঁচাছোলা গলায় বলল, 'এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও চলবে তোমার।'

'বর্তমান পরিস্থিতিতে সবকিছু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার আমার।' অত্যন্ত সাবধানে কথাগুলো বলছে রানা। 'তোমাকে বিশ্বাস করা যায়, কিছু মনে কোরো না, কিন্তু একটা সীমা পর্যন্ত, তার বেশি নয়। সেই সীমারেখাটা ঠিক কোথায় টানতে হবে পরিষ্কারভাবে জানা না থাকলে তোমার সাথে এই ধরনের কাজ করা সম্ভব...'

'তোমার ভয়টা কোথায় আমি জানি,' বলল গগল। 'ভেবেছ তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে হেরোইন নিয়ে কেটে পড়াও আমার পক্ষে বিচিত্র নয়। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার, লোভ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, তুমি নিশ্চিত থাকো, রানা, সে-ধরনের কিছু আমি করতে যাচ্ছি না। ড্রাগ না হলে অন্য কথা ছিল...'

'কিন্তু কেন? ড্রাগ সম্পর্কে তোমার...?'

'বেশ। তাহলে শুধু এটুকু জেনে রাখো, একসময় আমার একটা ছোট ভাই ছিল, খুবই প্রিয়, আজ সে নেই। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হোক, কি বলো?'

'আই সি!' বলল রানা, 'দুঃখিত, গগল। আমি না বুঝে তোমাকে...'

'আমি কিছু মনে করিনি, রানা।'

হতভম্ব হয়ে গেল রানা। দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে গেল গগল।

কেন যেন বার বার ছেলে দুটোর কচি মুখ মনে পড়ছে বরাত খানের।

ওদেরকে চোখে দেখার সুযোগ কি আর পাবে সে?—ভাবছে বরাত খান। আটলান্টিকের অপর তীরে হেরোইন সহ চারটে টর্পেডো বিস্ফোরিত হলে কি ঘটবে ওর কপালে? তাৎক্ষণিক মৃত্যু?

মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভয়ানক কাঁদবে ওরা। সেই দৃশ্যটাই মানসপটে ভেসে উঠতে চাইছে বারবার। নিজেকে মুক্তপুরুষ ভাবতে ভাল লাগত ওর—কবে যে অষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেছে স্ত্রী-পুত্র-সংসারের মায়ায় টেরই পায়নি। মন আজ ভাল নেই। দুটো টর্পেডো ইতোমধ্যে নিয়ে চলে গেছে ওরা। বাকি দুটোও প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। কাজ করতে করতে হাঁফ ধরে গেছে তার। অভিযানের পরবর্তী পর্যায় সম্পর্কে দুশ্চিন্তারও অন্ত নেই মনে। ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবার কোন সুযোগ এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে না সে। এ-ব্যাপারে পাশার সাথে আলাপও হয়েছে তার। ভয়ঙ্কর একরোখা দুঃসাহসী ছেলে ওটা। হেরোইন ধ্বংস করতে হবে এটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় কাজ। প্রাণ বাঁচবে কি বাঁচবে না সেটা যখনকার সমস্যা তখন বিবেচনা করার চেষ্টা করবে সে।

চোখের পাতা দ্রুত ওঠানামা করল কয়েকবার। বেঞ্চের উপর দিয়ে, ওর বুক স্পর্শ করে গেল একটুকরো রোদ।

পাশার বক্তব্য সমর্থন করেছে বরাত খান। হেরোইন ধ্বংস করার দায়িত্ব দিয়েই স্যার মাসুদ পাঠিয়েছেন ওদেরকে।

এই মুহূর্তে চেষ্টা করলে হয়তো পালানো অসম্ভব নয়। কিন্তু সেটা উচিত হবে না। পালালে দালিয়া সন্দেহ করবে টর্পেডোগুলোয় নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল আছে। চেক করার ব্যবস্থা করবে সে। গণ্ডগোলটা ধরা পড়বে, এতদিনের এত কঠোর পরিশ্রম সব ভেস্তে যাবে। না, টর্পেডোগুলোকে রওনা করে না দেয়া পর্যন্ত পালাবার কথা ভাবা যায় না।

কেন যেন খুঁতখুঁত করছে মনটা বরাত খানের। কি যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছে না সে। কি? কিছু যেন ঘটছে এখানেই কোথাও, কিন্তু ধরতে পারছে না সে। তার সাথে সম্পর্ক আছে ব্যাপারটার···তার নামের সাথে? ভুরু কুঁচকে ভাবছে বরাত খান। এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছে। কি? ঘোড়ার ডিম ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না কেন? 'বরাত খান' নামটা নিয়ে কেউ যেন কি করছে। রোদের টুকরোটা বেঞ্চের উপর পড়ল আবার। পেশীগুলো শক্ত হয়ে গেল বরাত খানের। ধরতে পেরেছে। আলোটা, রোদের টুকরোটা ওর নাম বানান করছে। বারবার।

স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়াল বরাত খান। সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে আছে আলী, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'এই ব্যাটা, খোজা! যা, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয়,' আলী বুঝতে পারছে না লক্ষ করে সিগারেট ফোঁকার ভঙ্গি করে ধোঁয়া ছাড়ল বরাত খান। 'সিগারেট, জলদি!'

'সিগারেট আমার কাছে আছে, মামা,' বলল পাশা।

তাকাল না বরাত খান, সংক্ষেপে জানাল, 'তোমার ব্র্যান্ড আমি খাই না!'

চোখ রাঙাল আলীকে। 'এই হারামজাদা, এখনও গেলি না!'

অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল আলী। আড়মোড়া ভাঙল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে ধাপ টপকে উঠতে শুরু করল উপর দিকে। শেড থেকে সে বেরিয়ে যেতেই দ্রুত আধপাক ঘুরল বরাত খান। 'ওর পিছু পিছু তুমিও যাও, ভাগ্নে। যেভাবে হোক ওখানে আটকে রাখো ওকে, যেন ফিরে না আসতে পারে—যতক্ষণ সম্ভব। কুইক!'

কোন প্রশ্ন না করে সিঁড়ি বেয়ে ছুটল পাশা। বরাত খানের উত্তেজনা দেখেই বুঝতে পেরেছে ও, অত্যন্ত জরুরী কোন ব্যাপার, প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

বেঞ্চের কাছে ফিরে এসে কয়েক সেকেন্ড ধরে আলোটাকে দেখল বরাত খান তারপর কাল্পনিক একটা রেখা অনুমান করে নিয়ে তাকাল জানালার দিকে। বুঝল, জানালা পথেই আসছে সঙ্কেতটা। ঝুঁকে পড়ে নিচু হলো সে, মুখে পড়ল প্রতিবিম্বিত রোদ। দ্রুত সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

একপাশে সরে দাঁড়াল বরাত খান। আরও কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে রইল আলোটা। তারপর জ্বলতে নিবতে শুরু করল আবার। খুব ধীর ভঙ্গিতে, মোর্স কোডের মাধ্যমে সঙ্কেত দিচ্ছে।

…রানা বলছি…প্রশ্ন আসছে…উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, একবার আলো জ্বালো…না হলে দু'বার জ্বালো…বুঝেছ…

চট করে লম্বা তার লাগানো ইলেকট্রিক হ্যান্ডল্যাম্পটা নিয়ে এল বরাত খান। সুইচ টিপে একবার জ্বেলেই নিবিয়ে দিল বাতি।

বাইরে থেকে আসা আলোটা বেঞ্চের উপর জ্বলতে নিবতে শুরু করল আবার…টর্পেডো প্ল্যান কাজ করছে…

একটু বিরতি নিল বরাত খান। অর্থটা বুঝতে চেষ্টা করছে। অর্থ করল: টর্পেডোর মাধ্যমেই কি পাচার হতে যাচ্ছে? একবার আলো জ্বালল সে।

…ক'টা…একটা…

দু'বার আলো জ্বালল বরাত খান।

…চারটে…

একবার আলো জ্বালল।

…কখন…আগামী হপ্তায়…

দু'বার জ্বালল আলো।

…আগামীকাল…

একবার আলো জ্বালল।

চিলেকোঠায় দাঁড়িয়ে আছে রানা। আগে থেকে তৈরি করা প্রশ্নের তালিকাটা দ্রুত আরেকবার পরীক্ষা করে নিল। পরবর্তী প্রশ্ন করল ও।

…সবটুকু হেরোইন পাঠানো হচ্ছে… রিপিট…সব…

একবার জ্বালল আলো।

…তুমি এবং পাশাও কি যাচ্ছ…

একবার আলো জ্বালল!

…উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় বের করতে পেরেছ…

হ্যান্ডল্যাম্পের আলোটা এত অস্পষ্ট, প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। চোখে রোদ লাগছে রানার, সেজন্যেই আলোটা দেখতে পাচ্ছে না ভাল করে। মনে হলো দু'বার জ্বালল হ্যান্ডল্যাম্পের আলোটা। আরেকটা প্রশ্ন করতে গিয়ে হঠাৎ আলোটা স্থির করে ফেলল রানা। দেখতে পাচ্ছে আরবটাকে, অফিস থেকে নেমে আসছে সে সিঁড়ি বেয়ে। পাশা তাকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এল। পথ রোধ করে দাঁড়াল আরবটা। হাত নেড়ে কিছু বলল। আবার উঠতে শুরু করল লোকটা। তাকে অনুসরণ করে শেড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আবার পাশাও।

আলোটা আবার নাড়তে শুরু করল রানা…আমার পজিশন বুঝে নাও…রাতের বেলা সঙ্কেত পাঠাতে পারবে এখানে…

একবার আলো জ্বালল বরাত খান।

…সারারাত এখানে লোক থাকবে…গুড লাক…

আর একবার বেঙ্কে স্থির হলো আলোটা, তারপর অকস্মাৎ গায়েব হয়ে গেল। জানালা দিয়ে গলা বের করে দিয়ে দূরবর্তী বিল্ডিংটার দিকে তাকাল বরাত খান। শূন্য ছাদ খাঁ খাঁ করছে। একটু আগে ওই চিলেকোঠার জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল স্যার মাসুদ। সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত এখন সে। ওরা এখন আর অসহায় বা একা নয়।

সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে দরজার কাছে গেল বরাত খান, 'আমার সিগারেটের কি হলো?' বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল সে।

ইয়ট হারবার। রানার চার্টার করা ক্রুজারটা নোঙর ফেলে ভাসছে। ভারী একটা সুটকেস নিয়ে ক্রুজারে উঠছে গগল, তাকে সাহায্য করছে রানা। মাত্র সকাল। এরই মধ্যে একটা কেবিনে জমায়েত হয়েছে সবাই। রানা এবং গগল ঢুকল। 'ন'টার সময় রওনা হবে ভয়েজার তুমি শিওর, রানা?' জানতে চাইলেন স্যার হ্যামিলটন।

'বরাত খান শিওর।'

'গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে তার বক্তব্য কি?'

সুটকেসটা টেবিলের উপর রেখে বসল গগল। তার পাশেই স্যার হ্যামিলটনের দিক মুখ করে বসল রানা। 'শেড থেকে ওদেরকে উদ্ধার করব কিনা জিজ্ঞেস করলাম, বলল, না। ওদেরকে পালাতে দেখলে মাদাম দালিয়া সন্দেহ করবে।'

রিস্টওয়াচ দেখলেন স্যার হ্যামিলটন। 'সাতটা। খুব বেশি সময় নেই। কি করব আমরা? রওনা হবার আগেই আক্রমণ করব—শিপইয়ার্ডে? নাকি রওনা হবার পর—সাগরে?'

'রওনা হবার আগেই,' জানাল রানা। 'সাগরে একবার পৌঁছে গেলে ওটার ওপর চড়া অসম্ভব। ওয়েস্টম্যান অত্যন্ত সাবধানী লোক।'

'ব্যাপারটা পরিষ্কার জানতে চাই,' বললেন স্যার হ্যামিলটন। 'গোলাম

পাশা আর বরাত খানের সাথে ভয়েজারে ওয়েস্টম্যান থাকছে। দালিয়া? সে কি তাহলে বৈরুতেই থেকে যাচ্ছে?'

'যাচ্ছে, তবে খুব বেশিক্ষণের জন্যে নয়,' বলল রানা। 'বরাত খানের ধারণা দূর থেকে কুয়ান ডি শান্তিয়ানা ফলো করবে ভয়েজারকে। টর্পেডো ছোঁড়া হয়ে গেলে ভয়েজারকে ডুবিয়ে দেয়া হবে।'

'কেন?'

'টিউবগুলো কারও চোখে পড়ুক তা ওরা চাইবে না,' বলল রানা। 'ওই সময় কুয়ান ডি শান্তিয়ানা ভয়েজারের কাছেপিঠেই কোথাও থাকবে, আশা করছে বরাত খান। ক্রুদের তুলে নেবার জন্যে।'

মাথা ঝাঁকালেন স্যার হ্যামিলটন।

'চমকে দিতে হবে ওদেরকে,' বলল রানা। 'সাগরের দিক থেকে চড়াও হব আমরা। ওদিকে কোন গার্ড রাখেনি ওরা। কাজটা সারতে হবে দ্রুত।' গগলের দিকে ফিরল ও। 'তোমার সুটকেসটা খোলো, গগল।'

উঠে দাঁড়াল গগল। সুটকেস খুলে ভিতর থেকে নিরীহ চেহারার জিনিসগুলো টেবিলের উপর এক এক করে নামিয়ে রাখতে শুরু করল।

চোখ কপালে উঠে গেল স্যার হ্যামিলটনের।

'যার যেটা পচোন্দ বেচে নিন,' একটা সাব-মেশিনগান তুলে নিয়ে বলল গিলটি মিয়া।

'অনেক টাকা দিয়ে কিনেছি, বিলটা আপনি পরে পাবেন,' স্যার হ্যামিলটনকে বলল গগল।

সম্মোহিতের মত টেবিল ভর্তি অস্ত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন স্যার হ্যামিলটন। হঠাৎ নড়েচড়ে বসলেন তিনি। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন একটা পিস্তল। 'আমি এটা নেব।'

চোখ তুলে তাকাল রানা। অবাক হয়েছে ও। 'আপনিও যাচ্ছেন নাকি?'

'যাচ্ছি,' শান্তভাবে বললেন স্যার হ্যামিলটন, 'আমি যাব না তো যাবে কে? পাশা আর বরাত যে আটকা পড়েছে, এর জন্যে দায়ী কে? আমি নই? তোমাকে বলেছিলাম, আমার তেরেসাকে যারা খুন করেছে আমি তাদের রক্ত চাই। প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এসেছে। তোমরা প্রস্তুত হয়ে গেছ আক্রমণের জন্যে, আর আমি ঘরে বসে থেকে নিজের চামড়া বাঁচাব? আমি প্রমাণ করতে চাই, ওদের রক্ত পাবার জন্যে নিজের রক্ত ঝরাতেও আমি প্রস্তুত। কিন্তু...' একটু ইতস্তত করলেন তিনি। 'এসব কিভাবে ছুঁড়তে হয় জানি না...'

'আমি আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি,' বলল রানা। চট করে রিস্টওয়াচটা দেখে নিল একবার। 'এখনও একটু সময় আছে হাতে।'

দশ

কয়েকটা রিপোর্ট নিয়ে মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি হলো মধ্যপ্রাচ্যের ক'টা দেশে। এই রিপোর্টগুলোরই একটা পরীক্ষা করলেন তেহরানের কর্নেল হাসান জামিল। ইরাকী বর্ডারের খুব কাছাকাছি কুর্দিস্তান প্রদেশে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। এলাকাটা এমনিতেই ভীষণ গোলমেলে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তাই তাৎপর্যপূর্ণ না হয়ে পারে না। তাছাড়া শেখ ফারাজী জড়িত রয়েছে এর সাথে। কিন্তু ব্যাপারটার তাৎপর্য ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্সের চীফ ইন্টেলিজেন্স অফিসার কর্নেল হাসান জামিল।

দরজায় টোকা দিয়ে তাঁর সেক্রেটারি জানাল, 'ক্যাপ্টেন আনসারী আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী, স্যার।'

'এক্ষুণি নিয়ে এসো তাকে।'

কামরায় সুদর্শন এক যুবক ঢুকল। ক্যাপ্টেন আনসারী। পরিশ্রান্ত চেহারা, রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে দুনিয়াটাকে এক চক্কর ঘুরে এইমাত্র পৌঁছেছে যেন। কর্নেল তার আপাদমস্তক দেখলেন। 'তারপর, ক্যাপ্টেন?' বললেন তিনি। 'কি খবর নিয়ে এসেছ?'

'বিস্ফোরণটা প্রচণ্ড, স্যার। গোটা একটা কানাত ধ্বংস হয়ে গেছে।'

হেলান দিলেন কর্নেল চেয়ারে। 'হুঁ, বুঝেছি, পানি সরবরাহ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ,' বললেন তিনি। সমস্যাটা ছোট, তাঁর এলাকারও নয়। এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবে সিভিল পুলিস।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম, স্যার,' বলল আনসারী। 'কিন্তু এটা পাবার পর আমার ধারণা পাল্টে গেছে।' ছোট, চারকোনা একটা জিনিস রাখল সে ডেস্কে।

জিনিসটা তুলে নিলেন কর্নেল, নখ দিয়ে খোঁচালেন, তারপর নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুঁকলেন। এখনও সমস্যাটা তাঁর মনোযোগের দাবিদার না হলেও, আগের চেয়ে একটু বেশি গম্ভীর দেখাল তাঁকে। 'ফারাজীর গ্রামে এটা পাওয়া গেছে, বলতে চাইছ?'

'ইয়েস, স্যার। ধ্বংসস্তূপের মাঝখান থেকে পাওয়া গেছে। ফারাজীকে পাইনি ওখানে, তার ছেলেকেও পাইনি। গ্রামবাসীরা নাকি কিছুই জানে না।'

'তা জানবে কেন!' চটে উঠে বললেন কর্নেল। 'সে যাই হোক, এটা নারকোটিক সেকশনের সমস্যা।' টেলিফোনটা নিজের দিকে টেনে নিলেন তিনি।

বাগদাদ। আরেক কর্নেল আরেকটা রিপোর্ট দেখছিলেন। তুর্কী বর্ডারের কাছাকাছি বিদঘুটে কিছু একটা ঘটছে। ছোটখাট একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে

ওখানে, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোঁজ নেবার পর তিনি জেনেছেন, এর সাথে ইরাকী ট্রুপস কোনভাবেই জড়িত ছিল না। ব্যাপারটা বেশ অবাক হওয়ার মতই। দেখেশুনে তাঁর মনে হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে কোন্দল শুরু করে দিয়েছে কুর্দিরা।

মাইক্রোফোনের রিসিভার টেনে নিয়ে তিনি তাঁর মন্তব্যের শেষাংশ টেপ করার জন্যে ডিক্টেশন দিতে শুরু করলেন: একথা সবাই জানে যে বিদ্রোহীদের নেতা, শেখ ফারাজী, যে বর্ডার এলাকাতেই আস্তানা গেড়েছে বেশ কিছুদিন থেকে, এই এলাকায় তার শক্ত ঘাঁটি আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ইরাকী সরকারের সাথে আপোস আলোচনায় বসার আগে মোল্লা মোস্তাফা বারজানী ফারাজী সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছিল। এক অসমর্থিত খবরে প্রকাশ, যুদ্ধে শেখ ফারাজী নিহত হয়েছে। পরবর্তী খবর পাওয়ামাত্র পাঠানো হবে।

ওখান থেকে দুশো গজ দূরে নারকোটিক ডিপার্টমেন্ট। একজন সিনিয়র পুলিস অফিসার আল খতিব ম্যাপ সামনে নিয়ে একটা রিপোর্ট চেক করছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইরানে এক বিস্ফোরণে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ল্যাবরেটরি ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রচুর আফিম, কেমিক্যালস সহ প্রচুর ভাঙা কাঁচ পাওয়া গেছে। এসবের অর্থ বুঝতে তাঁর অসুবিধে হলো না।

ম্যাপে আঙুল রাখলেন তিনি। ইরান থেকে নর্দার্ন ইরাক, সেখান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত একটা রেখা টানলেন। তারপর নিজের ডেস্কে ফিরে এসে তাঁর সহকারীকে বললেন, 'জিনিসটা যে বর্ডার ক্রস করেছে সে ব্যাপারে ইরানীদের কোন সন্দেহই নেই,' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, 'কিছুই করার নেই আমাদের। কুর্দিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা এখন বারুদের মত। একটা রিপোর্ট তৈরি করে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলি। সিরিয়া, জর্দান আর লেবাননে এক কপি করে পাঠিয়ে দিলেই হবে।'

বৈরুত। নারকোটিক ব্যুরোর ইন্টেলিজেন্স অফিসার মুরতজা গালিবের হাতেও পড়ল একটা রিপোর্ট। রিপোর্টটা পড়েই তিনি অ্যাকশন নিলেন। লেবানীজ আন্ডারগ্রাউন্ডের অধিবাসীরা তটস্থ হয়ে উঠল। যারা গ্রেফতার হলো তাদের মধ্যে বিগটও ছিল। নারকোটিক স্মাগলিংয়ের সাথে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা জেরা করা হলেও, তার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারা গেল না বলে শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিতে হলো তাকে।

দশ মিনিট বাকি ন'টা বাজতে। ভূমধ্যসাগরের নীল পানিতে নিরীহ একটা ফড়িংয়ের মত বসে আছে ক্রুজারটা। মৃদু, গম্ভীর একটা আওয়াজ করছে ইঞ্জিন। উন্মুক্ত ককপিটে বসে আছেন স্যার হ্যামিলটন। হাতে লম্বা এক ছিপ। ধ্যানমগ্ন বকের মত, মাছ ধরছেন তিনি, দুনিয়ার আর কোন ব্যাপারে তাঁর যেন কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু সেলুনে বসে চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে রানা ভয়েজারের উপর। ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী চোঙ থেকে বেরিয়ে পাক খাচ্ছে মৃদুমন্দ বাতাসে। আগুন জ্বালা হয়েছে বয়লারে, রওনা হবার জন্যে

তৈরি হচ্ছে।

দরজার কাছে বসে আছে রানা, গগলকে দেখতে পাচ্ছে, হুইল ধরে বসে আছে সে। নিচের দিকে ঝুঁকল একটু, সেলুনের দিকে তাকাল। 'কোনরকম পরিবর্তন টের পাচ্ছ?'

'না,' বিনকিউলার থেকে চোখ সরাচ্ছে না রানা। 'দশ মিনিটের মাথায় চড়ব আমরা।'

সিধে হলো গগল। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'স্যার হ্যামিলটন, আপনার এই ভাড়া করা জাহাজকে খরচের খাতায় লিখে রাখেন।'

সকৌতুকে বললেন তিনি, 'মালিককে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে মরার বা পালাবার ইচ্ছা আমার নেই।'

সেলুনের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল গিলটি মিয়া। 'স্যার হ্যামিল্টনকে বলে দিন, স্যার—লোক দেকলেই যেন গুলি করে না বসে। ও জাহাজে আমাদের ছেলেপুলেরাও আচে।'

'সবার হাতে অস্ত্র থাকবে,' বলল রানা। 'কিন্তু ওরা না ছুঁড়লে আমরাও কেউ গুলি ছুঁড়ব না। আমার বিশ্বাস, খুব বেশি লোক নেই ওতে। যাদেরকে না নিলে কাজ হবে না শুধু তাদেরকেই নেবে মাদাম দালিয়া।'

'একুনি চড়াও হলে ক্ষতি কি?' জানতে চাইল গিলটি মিয়া।

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'গগল, বিসমিল্লা বলে ছেড়ে দাও হে।'

'দিলাম,' ধীরে ধীরে হুইল ঘোরাতে শুরু করল গগল। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ওস্তাদ অ্যাঙলারের অভিনয় করে যান, স্যার হ্যামিলটন।' সামান্য একটু খুলে দিল সে থ্রটল। শামুক গতিতে এগোচ্ছে ক্রুজার।

'কেউ কোনরকম ব্যস্ততা দেখিয়ো না,' বলল রানা। 'জনাকয়েক নিরীহ লোক আমরা, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না—এই রকম ভাব।' বিনকিউলার নামিয়ে রেখে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। সাব-মেশিনগানটা তুলে নিল কাঁধে। দড়ির একটা কুণ্ডলী পরীক্ষা করল, কোথাও কোন গিঁট বা প্যাঁচ খেয়ে গেছে কিনা। দড়ির এক প্রান্তের সাথে আটকানো রয়েছে তিন কাঁটাওয়ালা একটা হুক। কাঁটাগুলোয় তুলো জড়ানো, যাতে শব্দ না করে। টেনে দেখল রানা। মজবুত। দরজা টপকে গগলের পিছনে দাঁড়াল ও, টোকা মারল তার কাঁধে। 'পিছিয়ে এসে খেলা দেখাবার সুযোগ দাও অ্যাঙলার সাহেবকে।'

ক্রুজারটা ঠিক নিজে থেকে নয়, স্রোতের টানে যেন এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই ভয়েজারের কাছে পৌঁছে গেছে, একেই বলে বিপজ্জনক নৈকট্য, ভাবল রানা। ভয়েজার এখন যদি মুখ ঘোরাতে শুরু করে, সংঘর্ষ অনিবার্য।

সাগর থেকে একটা নাম-না-জানা বিশাল মাছ বাধিয়েছেন বড়শিতে স্যার হ্যামিলটন। ছায়াছবির জন্মদাতা, অভিনয় কাকে বলে ভালই জানা আছে তাঁর। মরা মাছ, বাজার থেকে কেনা, কিন্তু এমন কায়দায় খেলাচ্ছেন ওটাকে, যেন কতই না ছুটোছুটি করে, ঘোলাপানি খাইয়ে তবে হার মানছে।

মাছটাকে নেট করতে যেটুকু সময় লাগল, তার মধ্যে আরও দশ গজ

এগোল ক্রুজারটা ভয়েজারের দিকে।

পিছন থেকে গগল বলল, 'এইবার!'

সাঁত করে সরে গেল রানা। থ্রটল খুলে দিয়ে হুইল ঘোরাচ্ছে গগল বনবন করে। ভয়েজারের স্টার্নের দিকে ঘুরে যাচ্ছে ক্রুজার।

দম বন্ধ করে লাফ দিল রানা। ককপিটে চড়ল। তিন কাঁটাওয়ালা হুকটা দুই পাক ঘোরাল মাথার উপর। তারপর ছেড়ে দিল। বাতাসে শিস কেটে দড়ি নিয়ে ছুটে গেল হুকটা। ভয়েজারের স্টার্ন রেলিংয়ে এসে নিঃশব্দে আটকে গেল সেটা। মাছ, রড ইত্যাদি ফেলে ঠিক সেই মুহূর্তে খপ করে দড়িটা ধরলেন স্যার হ্যামিলটন। প্রাণপণে টানছেন । একই সময়ে গিয়ার নিউট্রাল করে দিল গগল।

দ্রুত ঘটে যাচ্ছে ঘটনা। দড়ি ধরে ঝুলছে রানা। ঝুলতে ঝুলতে এগোচ্ছে, নিচে পানি। সামনে ভয়েজার। ব্যবধান কমছে। কাঠের উপর একটা শব্দ হলো পতনের। ভয়েজারের ডেকে নামল রানা। কাঁধ থেকে নামিয়ে দু'হাতে বাগিয়ে ধরল সাব-মেশিনগানটা। দু'চোখে শ্যেন দৃষ্টি। মুখে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ একটা ভাব। কেউ বাধা দিলে রক্ষে নেই তার।

এরপর গগলের পালা। ঠোঁটের ফাঁকে ঝিলিক মারছে কয়েকটা সাদা দাঁত। এ-ধরনের সাংঘাতিক বিপজ্জনক মুহূর্তগুলোকে দারুণ উপভোগ করে সে। ভয়কে ভালবাসে বলেই ভয়ঙ্কর পথে তার যাতায়াত। হুইল ছেড়ে দিয়ে দড়ি ধরল সে। ঝুলে পড়ল। ডেক থেকে দেখল রানা। মৃদু হাসল।

ভয়েজারের বিশাল প্রপেলারের তিন ভাগের মাত্র দু'ভাগ জলমগ্ন। স্কিপার এখন যদি টারবুল্যান্স মুভ করার অর্ডার দেয়, ছোট ক্রুজারটা চোখের পলকে চুরমার হয়ে যাবে। পিছন থেকে ধাক্কা দিলেন স্যার হ্যামিলটন গিলটি মিয়াকে। নিচু কণ্ঠস্বর হিসহিস করে উঠল, 'আগে বাড়ো!'

দড়ি ধরে চোখ বুজল গিলটি মিয়া, উচ্চারণ করল, 'সাঁতার জানি না, আল্লা! কতাটা খেয়াল রেকো!' তারপর ঝুলে পড়ল।

আশ্চর্য দ্রুতবেগে দড়ি ঝুলে এগোল গিলটি মিয়া। যখন চোখ মেলল সে, দেখল এক হাত সামনেই গগল। লাফ দিয়ে দু'জন প্রায় একই সাথে পড়ল ডেকে।

রানাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

দড়ি ধরে দুই জলযানের মাঝখানে ঝুলছেন স্যার হ্যামিলটন। এগোতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। নিচের পানির দিকে সম্মোহিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। গগল ও গিলটি মিয়ার পেশীগুলো টান টান হয়ে উঠেছে। একচুল নড়ছে না কেউ। দুইজোড়া চোখে আতঙ্ক।

মুখ তুলে ওদেরকে দেখতে পেলেন স্যার হ্যামিলটন। ওদেরকে অভয় দেবার জন্যে জোর করে হাসলেন একটু। ওই হাসিটাই কাজ দিল। এক সেকেন্ডের জন্যে বিপদের কথা মন থেকে উবে যেতেই হাত দুটোর অসাড় ভাব দূর হয়ে গেল। এক হাতের দড়ি ছেড়ে দিলেন তিনি। একদিকে কাত হয়ে গেলেন। মুক্ত হাতটা দিয়ে একহাত সামনের দড়ি ধরলেন, তারপর অন্য হাতের দড়ি ছেড়ে দিলেন। কপালে ঘামের বড় বড় ফোঁটা দেখা দিয়েছে।

বাতাসে উড়ছে টাইটা। দড়ি ছেড়ে ডেকের উপর পড়লেন। হাত রাখলেন দু'কোমরে। 'জীবনে এই প্রথম কিনা,' একটু লজ্জিতভাবে একটা অজুহাত খাড়া করার ভঙ্গিতে বললেন। তারপর তাড়াহুড়ো করে পকেটে হাত ভরে বের করে আনলেন পিস্তলটা। এদিক-ওদিক তাকালেন কঠিন চোখে। বললেন, 'কোথায় ওরা?'

অকস্মাৎ কেঁপে উঠল পায়ের নিচে ডেক। সাবধান করার ভঙ্গিতে একটা হাত উপরে তুলল গগল। 'ঠিক সময়ে পৌঁছেছি আমরা। জাহাজ ছাড়ছে।' আঙুল দিয়ে দেখাল সে, 'ওই যে, ব্রিজে ওঠার মই—চলো!'

দুলকি চালে ছুটল গগল, মই বেয়ে উঠে গেল ব্রিজে। তার পিছু নিয়েছে গিলটি মিয়া। ভাবছে, গেলো কোতায় ওরা, কাউকেই তো দেকা যাচ্ছে না।

ব্রিজে সবার আগে গগলই পৌঁছুল। প্রায় একই সময়ে, যেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। অন্য প্রান্ত থেকে উদয় হলো রানা। চারজন ছিল ওরা ব্রিজে। স্কিপার, দু'জন অফিসার এবং হেলম্‌স্‌ম্যান। রানাকে নয়, ওর হাতের সাব-মেশিনগানটার দিকে অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকাল স্কিপার, ঝট্ করে পিছন ফিরতেই গগল ও তার হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটাকে দেখতে পেল সে। মুখ খুলতে যাবে, শব্দ বেরুবার আগেই, গগলের কড়া ধমক শুনতে পেল, 'হ্যান্ডস্ আপ!'

চট করে ঠোঁট বন্ধ করে ঢোক গিলে শব্দটাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিল স্কিপার। রানার সাব-মেশিনগানের নল ঠেলে নিয়ে গেল সবাইকে একপাশে। মইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে খিকখিক করে হাসছে গিলটি মিয়া। কাঁধে সাব-মেশিনগান থাকায় একদিকে কাত হয়ে আছে একটু। হাতে পিস্তল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে, নিচে তাকাল সে। মইয়ের শেষ ধাপের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার হ্যামিলটন। এক গাল হাসল তাঁর দিকে তাকিয়ে গিলটি মিয়া। 'আমাদের জিত হয়েচে, স্যার।'

জাহাজ চলছে। ভয়েজার ও ক্রুজারের ব্যবধান বাড়ছে ক্রমশ। ইঞ্জিনরুমে টেলিগ্রাফের চকচকে পিতলের হাতলটা খপ করে ধরল গগল। ঘণ্টা বাজিয়ে হাফ স্পীডের অর্ডার দিল। ইঞ্জিনিয়ার নিচে থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দিল, অর্ডার পালন করা হয়েছে।

অকস্মাৎ ছন্দপতন ঘটল। হুইল হাউজ থেকে বেরিয়ে কি ঘটছে দেখে কাঠের মূর্তি হয়ে গেল ওয়েস্টম্যান। চট করে একটা হাত ওর ঢুকে গেল কোটের ভিতর, মুহূর্তে বেরিয়ে এল সেটা পিস্তল নিয়ে। গিলটি মিয়া সাব-মেশিনগানের ওজন অগ্রাহ্য করে সিধে হয়ে পিস্তল তুলছে। পলকের জন্যে মনে হলো ওয়েস্টম্যানের তুলনায় দেরি করে ফেলেছে সে। কি হতে যাচ্ছে কেউ বুঝল না। একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতি। সময়ও যেন অনড়, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

একটাই শব্দ হলো গুলির। দু'জন একযোগে গুলি করেছে। লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে গিলটি মিয়া। ওয়েস্টম্যানের মাথার চুলে সিঁথি কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করে উঠল গিলটি মিয়া। পরমুহূর্তে শোনা গেল

ওয়েস্টম্যানের গোঙানি। হুইল হাউজ থেকে বেরিয়ে এসে পিছন থেকে রডের বাড়ি মেরেছে তার মাথায় গোলাম পাশা।

তখনও এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে গিলটি মিয়া। আপসোসে মরে যাচ্ছে যেন সে। তার দুঃখ, এতো কাছ দিয়েই যখন গেলো, গুলিটা ওয়েস্টম্যানকে লাগলেই তো পারতো। জীবনেও কি তার হাতের টিপ ঠিক হবে না?

হাত কেঁপে গিয়েছিল ওয়েস্টম্যানের। গিলটি মিয়ার বগলের নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেছে তার বুলেট।

মাথায় বাড়ি খেয়ে টলে পড়ে যাচ্ছে ওয়েস্টম্যান। হাত থেকে খসে পড়ছে পিস্তলটা। অকস্মাৎ চরকির মত আধপাক ঘুরল সে, প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দিল পাশার ডান চোখের উপরে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল পাশা। হাত থেকে পড়ে গেল রডটা। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেছে ওয়েস্টম্যান পিস্তল হাতে। ছয় সেকেন্ড পর দড়াম করে একটা শব্দ হলো দরজা বন্ধ করার।

একছুটে ব্রিজের কিনারায় গিয়ে থামল গগল, তাকাল তীরের দিকে। ছোট ছোট মাথা দেখা যাচ্ছে, তাকিয়ে আছে চলমান জাহাজের দিকে। 'গুলির শব্দ শুনেছে ওরা,' ঘাড় ফেরাল পিছন দিকে, রানাকে বলল, 'গিলটি মিয়াকে নিয়ে ওয়েস্টম্যানকে কোণঠাসা করতে যাচ্ছি আমি।'

মাথা কাত করে সম্মতি দিল রানা। 'স্যার হ্যামিলটন, ব্রিজে উঠে আসুন,' অফিসারদের দিকে তাকাল ও। 'ইংরেজি কে জানে?'

'আমি,' স্কিপার বলল।

স্যার হ্যামিলটন উপরে উঠে এলেন। রানার ইঙ্গিত পেয়ে পাশাকে সাহায্য করার জন্যে এগোলেন তিনি।

'লাউডস্পীকার অন করো,' স্কিপারকে বলল রানা। 'ক্রুদের সবাইকে ওখানে ফোরহ্যাচে জড় হতে বলো। রেডিও কোথায়?'

ইতস্তত করছে স্কিপার। তার বুকের দিক থেকে সাব-মেশিনগানের নল কপালের দিকে তুলল রানা, তাতেই কাজ হলো। হুইল হাউজের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওদিক দিয়ে যেতে হবে।'

স্যার হ্যামিলটনকে ধরে সিধে হয়ে দাঁড়াল পাশা। চোখের উপরটা আলুর মত ফুলে উঠেছে ওর। তার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা সাব-মেশিনগানটা। 'এদের ওপর নজর রাখো,' বলে চলে গেল সে হুইল হাউজের দিকে। ফিরে এসে দেখল স্কিপারের নির্দেশ পেয়ে ক্রুরা ইতোমধ্যেই জমায়েত হয়েছে।

'ইঞ্জিনরুমের লোকজনদের ব্যাপারে কি করবেন, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল পাশা। 'ওরা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে...'

'গুলির শব্দ পাবার কথা নয় ওদের,' বলল রানা। 'এখুনি জানা যায় ব্যাপারটা।' টেলিগ্রাফের ঘণ্টা বাজিয়ে ফুল স্পীডের নির্দেশ পাঠাল ও। সাথে সাথে নির্দেশ মান্য করার অর্থসূচক পাল্টা ঘণ্টাধ্বনি হলো। 'এখনও কেউ বলেনি ওদেরকে।'

'ইঞ্জিনের দায়িত্ব আমি নিতে পারি,' বলল পাশা। 'কিন্তু ওদেরকে বের করে আনা সম্ভব হবে কি?' এদিক-ওদিক তাকাল ও। 'মামা কোথায়?'

'দেখিনি এখনও।'

'কেবিনে আছে বোধহয়।'

'পরে খোঁজ করলেও চলবে। সবচেয়ে আগে জাহাজটাকে ঝামেলামুক্ত করা দরকার। ক্রুদেরকে কোথায় পাঠানো যেতে পারে, বলো।'

'খালি একটা হোল্ড আছে।'

'স্যার হ্যামিলটনকে নিয়ে যাও তুমি,' অফিসারদের দিকে ফিরল রানা। 'কেউ বেশি বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে মারা পড়ুন, তা আমি চাই না।' এত দেরি করছে কেন গগল? ভাবছে রানা।

ক্রুদেরকে হোল্ডে আটকে রেখে ইঞ্জিনরুমে ঢুকল ওরা। তিনজন ইঞ্জিনিয়ারকে সাথে নিয়ে আবার হোল্ডে ফিরে এল পাশা। ওখান থেকে বেরিয়ে মুখ তুলে তাকাল ব্রিজের দিকে।

রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে রানা। 'সমস্যা দেখা দিয়েছে, ওপরে এসো,' বলল ও।

'ইঞ্জিনরুমে...'

'বরাত খানকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—পাওয়া গেছে ওকে। তোমার গানটা ওকে দিয়ে এসো।'

নিচে নেমে পাশার কাছ থেকে সাব-মেশিনগানটা নিল বরাত খান। 'কি ভাগ্যে, বলিনি, শেষ কেরামতিটা স্যার মাসুদই দেখাবেন?'

ঠোঁটের হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল পাশার। পরমুহূর্তে শঙ্কা ফুটল চেহারায়। 'সমস্যাটা কি?'

'ছোট, কিন্তু বিদঘুটে,' বলল বরাত খান। 'স্যার মাসুদ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

ব্রিজে উঠে পাশা দেখল জাহাজের হুইল ধরে বসে আছে গগল। পাশে দাঁড়িয়ে রানা। বলল, 'ওয়েস্টম্যানকে কোণঠাসা করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের নাগালের বাইরে সে এখন। দরজা বন্ধ করে রেখেছে, ভিতরে ঢোকার কোন উপায় নেই। মুশকিল হলো. টর্পেডোগুলো ওখানেই। গিলটি মিয়া দরজার বাইরে পাহারায় আছে।

'তার মানে ওকে বের করে আনতে না পারলে হেরোইনের কোন ব্যবস্থা আমরা করতে পারছি না।'

'ওগুলো রক্ষা করার জন্যেই ওখানে ঢুকেছে ও,' বলল রানা। 'আমার ধারণা, ও ভাবছে, ওকে উদ্ধার করার একটা চেষ্টা হবে। ক্রুদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মাদাম দালিয়া তো রয়েছে। ইয়ট নিয়ে সে আমাদেরকে তাড়া করতে পারে। টর্পেডোগুলো ছোঁড়ার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

আঙুল তুলে দেখাল পাশা। 'ওই যে, হেলমের পাশে দুটো বোতাম। ওগুলো চাপ দিলেই দুটো টর্পেডো ছুটবে।'

এই মুহূর্তে অর্ধেক হেরোইন ধ্বংস করা যায়, ভাবল রানা। কিন্তু এগোতে গিয়ে বাধা পেল পাশার কাছ থেকে।

'কোথায় যাচ্ছেন, মাসুদ ভাই?'

'অন্তত অর্ধেকটা হেরোইন ধ্বংস করি।'

আঁতকে উঠল পাশা। 'সাবধান, মাসুদ ভাই, বোতাম ছোঁবেন না। বরাত মামা তার দায়িত্ব একটু বেশি পালন করে ফেলেছে। প্রতিটা টর্পেডো এখানে জ্যান্ত। কয়েকশো পাউন্ড বিস্ফোরক পেয়ে গিয়েছিল, কাজে লাগিয়ে ফেলেছে। একশো আশি পাউন্ড টি-এন-টি রয়েছে প্রত্যেকটি টর্পেডো ওয়ারহেডে।'

তিন সেকেন্ড কথা সরল না রানার মুখে। টর্পেডোয় টি-এন-টি থাকার তাৎপর্য কি, মুহূর্তে বুঝে নিল ও। আঠারো মাইল রেঞ্জ ওগুলোর। দিগন্তরেখার দিকে তাকাল রানা। আঠারো মাইল দূরে কি আছে কে জানে? শেষ খবর পেয়েছে রানা, মাত্র দু'হপ্তা আগে, মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর এই এলাকাতেই আছে। ওদের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে গিয়ে যদি একটা টর্পেডো ঠোক্কর খায়, তৃতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যেতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। 'আশপাশে কোথাও নির্জন দ্বীপ নেই? কিংবা পাথরের পাহাড়?' বলেই বুঝল রানা, থাকলেই বা কি! বিস্ফোরণের শব্দ যা হবে তাতে আরব বিশ্ব এবং ইসরায়েল নিজেদের উপর হামলা হচ্ছে মনে করে আঁতকে উঠবে, ঘাবড়ে দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে বসাও তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। এমনিতেই মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা বিস্ফোরণের মুখে।

'ম্যাপে তেমন কোন জিনিসের চিহ্ন দেখিনি,' বলল পাশা। 'এ-দুটোর ব্যবস্থা যদি করা যায়ও, আমাদের হাতে আরও দুটো টর্পেডো থেকে যাচ্ছে। এখন ওয়েস্টম্যানের বুদ্ধি যদি গুলিয়ে না যায়, নিশ্চয়ই সে ফায়ারিং কানেকশন ছিঁড়ে ফেলবে।'

'ওয়েস্টম্যানকে বের করার দায়িত্ব বরাত খানের ওপর ছেড়ে দেয়া যাক,' বলল গগল। 'ওয়েস্টম্যান এবং জাহাজ দুটোকেই ভাল চেনে ও।'

'আমরা যাচ্ছি কোন্‌দিকে?' প্রশ্ন করল রানা।

'জানি না। কিছু এসে যায়?'

'যায়। মাদাম দালিয়া আমাদেরকে অনুসরণ করবে, কোন ভুল নেই। কোন্‌দিকে যাব আমরা ভেবেছ কিছু? তীরের দিকে, নাকি গভীর সাগরের দিকে?'

'তীরের দিকে?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল গগল। 'না।'

ব্রিজ থেকে নেমে এসেছে গগল, গিলটি মিয়াকে পাঠিয়ে দিয়েছে হুইলের কাছে থাকার জন্যে। ইঞ্জিনরুম থেকে বরাত খানকে সাথে নিয়ে করিডরে পৌঁছুল রানা। অপ্রশস্ত ইস্পাতের করিডরটা। অন্য প্রান্তে পুরু একটা ইস্পাতের দরজা, শক্ত করে বন্ধ করা। পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে গগল। দরজাটা দেখিয়ে বলল, 'এটার পিছনে রয়েছে ও। এদিক থেকে হয়তো খোলার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু বুলেট খেতে রাজি থাকতে হবে। ওয়েস্টম্যানের লক্ষ্য ব্যর্থ হবার কোন উপায়ই নেই।'

করিডরের আরেক মাথার দিকে তাকাল রানা। 'রাজি নই, ধন্যবাদ। গা বাঁচাবার কোন উপায় নেই।'

'দরজাটা বুলেটপ্রুফ। দু'বার গুলি ছুঁড়ে দেখেছি, ধাক্কা খেয়ে ছিটকে এসে দু'বারই আর একটু হলে ঢুকে পড়েছিল আমারই শরীরে।'

'বুঝিয়ে শুনিয়ে চেষ্টা করে দেখেছ?'

'কিভাবে?' হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল গগল। 'হয়তো শুনতেই পাচ্ছে না আমার কথা। অথবা উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করছে না।'

'বরাত খান?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল রানা।

'ওখানে একটা ওয়াটারটাইট বাল্কহেড রেখেছি আমি,' গম্ভীরভাবে বলল বরাত খান। 'যাতে টিউবগুলোয় গোলমাল দেখা দিলেও টর্পেডোগুলোর কোন ক্ষতি না হয়। সেটার পেছনে যদি লুকিয়ে থাকে, তাকে বের করে আনা নেহাত কঠিন কাজ, প্রায় অসম্ভবই বলা যায়।'

'একটা বুদ্ধি বের করো,' বলল রানা। 'ওখানে ও থাকলে হেরোইনগুলোর কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না আমরা।'

'একটাই পথ ওখানে ঢোকার বা বেরুবার, সেটা এই দরজাটা।'

রানা বলল, 'আমাদেরকে অসহায় করে রেখেছে ওর ব্যাপারটা। বেশিক্ষণ এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। ও চাইছে আমাদের সময় নষ্ট করতে। ইতিমধ্যে আমাদের হাত থেকে এই জাহাজ বেদখল হয়ে যাবে, আশা করছে ও।'

'তার মানে,' বলল গগল। 'আমাদেরকে যদি যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করিয়ে রাখতে পারে, ওদেরই জিত হবে। হেরে যাব আমরা।'

'ঠিক তাই।'

হঠাৎ আপন মনে চমকে উঠল গগল। ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়াল না কারও।

'কি ব্যাপার, গগল?' জানতে চাইল রানা। ভুরু কুঁচকে উঠেছে ওর।

'ইস্! রানা, সাংঘাতিক একটা কথা মনে পড়ে গেছে,' উত্তেজিতভাবে বলল গগল। 'শেখ ফারাজীর কাছে অস্ত্রশস্ত্রের চালান যখন নিয়ে যাই আমি, কিছু জিনিস রয়ে গিয়েছিল পিছনে—দুটো হেভি মেশিনগান আর...'

'চিন্তার কথা,' নরম গলায় বলল রানা।

'শুধু তাই নয়,' বলল গগল। চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে তার। 'দালিয়া ফারাজীকে ফরটি মিলিমিটারের কয়েকটা কামান গছাবার কম চেষ্টা করেনি, কিন্তু ফারাজী নাকি রাজি হয়নি নিতে—কারণ, ওগুলো নাকি ভীষণ বেশি বেশি অ্যামুনিশন খেয়ে ফেলে। এখন ভাবছি, ওগুলো যদি দালিয়া তার ইয়টে বসিয়ে থাকে, কম্মো সাবাড়।'

বিচলিত বোধ করলেও, রানার চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। 'এতটা সাবধান দালিয়া?'

'ওর সম্পর্কে তুমি প্রায় কিছুই জানো না।'

'হুঁ,' বলল রানা।

'একটা বুদ্ধি পেয়েছি,' হঠাৎ বলল বরাত খান। সিগারেট ধরাচ্ছে সে,

হাতদুটো কাঁপছে একটু একটু। 'বেরিয়ে আসতে বাধ্য করা যেতে পারে ওকে।'

'কম্পার্টমেন্টটা পানিতে ভরে দিয়ে?' জানতে চাইল গগল।

'পানি দিয়ে নয়,' মাথা তুলে উপর দিকে তাকাল বরাত খান। 'ফোরডেকে, আমাদের ঠিক ওপরে, অ্যাঙ্কর উয়িঞ্চ আছে। বয়লার থেকে স্টীম নিয়ে চালানো হয় ওটাকে। লাইনে পাইপ বসিয়ে স্টীম নিতে পারি আমি, সেই স্টীম ছাড়তে পারি ওখানে।'

'কিভাবে?'

'ইঁদুর মারার জন্যে এই জাহাজে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে গ্যাস পাইপ আছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কাজ হবে,' বলল। 'কতক্ষণে সারতে পারবে বলে মনে করো?'

'বলতে পারি না—দু'ঘণ্টাও লাগতে পারে,' বলল বরাত খান। 'ওপরে গিয়ে পাইপের কি অবস্থা, মুখ খোলা যায় কিনা দেখতে হবে আগে।'

'এখনও দেরি করছ কেন তাহলে?' বলল গগল।

অমনি ছুটল বরাত খান।

খবরটা ইন্টেলিজেন্সের মুরতজা গালিব পেলেন বটে, কিন্তু বেশ একটু দেরিতে। চা খেতে বাইরে যাচ্ছিলেন, ডেস্কে ডিউটি ক্লার্ককে দেখে অভ্যাসবশত জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন খবর আছে নাকি হে?'

'তেমন কিছু না, স্যার। খবরের মধ্যে, আল-জামহুরিয়া শিপইয়ার্ড ত্যাগ করার সময় একটা জাহাজে গুলির আওয়াজ হয়েছে। আশ্চর্য ঘটনা।'

কাছাকাছি বসে রিপোর্ট লিখছিল একজন যুবক, নতুন রিক্রুট, কান খাড়া হয়ে উঠল তার। গালিব জানতে চাইলেন, 'আশ্চর্য কেন?'

'খবরটা পাবার পর একজন লোককে পাঠিয়েছিলাম,' ক্লার্ক বলল। 'কিন্তু সে গিয়ে দেখে জাহাজটা এরই মধ্যে আঞ্চলিক সমুদ্র-সীমার বাইরে চলে গেছে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'করার আমাদের কিছুই ছিল না।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল যুবক। 'স্যার!'

গালিব তার দিকে চোখ রাখলেন। 'বলো।'

'গত রাতে বিগট নামে একজন লোককে জেরা করার জন্যে ধরে এনেছিলাম। আপনার নির্দেশে।'

'তাতে কি?'

ইতস্তত করছে যুবক। 'মানে··· লোকটাকে আমি তিনদিন আগে আল-জামহুরিয়া শিপইয়ার্ড থেকে বেরুতে দেখেছিলাম। হয়তো এর সাথে···'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন গালিব। মাথায় দ্রুত ঘটনা বাছাই করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। হেরোইন, অস্বাভাবিক পরিমাণ হেরোইন, ইরান ত্যাগ করে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। বিগট, যাকে স্মাগলার হিসেবে সন্দেহ করা হয়, তাকে জেরা করা হয়েছে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি, সেই বিগটকেই দেখা গেছে

আল-জামহুরিয়া শিপইয়ার্ডে, শিপইয়ার্ডের একটা জাহাজে এক বা একাধিক গুলির আওয়াজ হয়েছে, জাহাজটা দ্রুত ত্যাগ করেছে লেবাননের সমুদ্রসীমা।

দু'য়ে দু'য়ে চার মেলাতে অসুবিধে হলো না গালিবের। ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। বললেন, 'বিগটকে জেরা করতে চাই, নিয়ে এসো তাকে। আর, একটা গাড়ি দরকার আমার।'

ত্রিশ মিনিট পর আল-জামহুরিয়া শিপইয়ার্ডের একটা জেটিতে দেখা গেল মুরতজা গালিবকে। তদন্তকারী অফিসারকে প্রশ্ন করেছেন তিনি। 'গুলির পরপরই চলে গেল জাহাজটা?'

'ইয়েস, স্যার।'

'নাম?'

'ভয়েজার।'

নির্জন বোটগুলোর দিকে তাকালেন একবার গালিব। 'ওই একটাই জাহাজ ছিল এখানে? আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

'না, স্যার, একটা ইয়টও ছিল। এই তো, মাত্র পাঁচ মিনিট আগে নোঙর তুলে রওনা হয়েছে।' আঙুল তুলে দেখাল সে, 'ওই যে!'

কপালে হাত রেখে রোদ ঠেকালেন গালিব। 'যেতে দিলে তুমি? ইয়টের মালিক ছিল, ঘটনাটা যখন ঘটে?'

'ছিলেন, স্যার,' বলল অফিসার। ঘাবড়ে গেছে সে। ঢোক গিলল। 'কিন্তু তার সাথে আমার দেখা হয়নি। কথা বললেন এক সুন্দরী মহিলা।'

'নাম?'

'জিজ্ঞেস করিনি, স্যার।'

'এতই সুন্দরী?' ব্যঙ্গের সুরে বললেন গালিব। তাকালেন কুয়ান ডি শান্তিয়ানার দিকে, 'স্টার্নে ওটা কি?'

চোখ কুঁচকে তাকাল অফিসার। 'ক্যানভাসের স্তূপ নাকি?'

'ক্যানভাস, তবে স্তূপ নয়,' বললেন গালিব। 'স্তূপ বলে মনে হচ্ছে, কারণ ক্যানভাসের নিচে কিছু লুকিয়ে রেখেছে ওরা।'

দু'মিনিট পর নির্বোধ এক ন্যাভাল অফিসারের সাথে তর্ক জুড়তে হলো গালিবকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে গলদঘর্ম হতে হলো তাঁকে। সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিল তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে বুঝতে পেরে।

এগারো

নতুন কোর্স। বহু দূরের তীর পিছনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একখণ্ড মেঘের মত মাউন্ট লেবাননকে দেখা যাচ্ছে শুধু।

কিচেনে একঘণ্টা কাটাবার পর খাবারের ট্রে নিয়ে ব্রিজে উঠল গিলটি মিয়া। জাহাজের কমান্ড এখন রানার হাতে। ওয়েস্টম্যানের দরজার উপর

এখনও নজর রাখছে গগল। খাবারের ট্রে রেখে ইঞ্জিনরুমে নেমে গেল গিলটি মিয়া। রানার নির্দেশে বন্দী দু'জন ইঞ্জিনিয়ারকে কাজে লাগানো হয়েছে। স্যার হ্যামিলটনকে মুক্তি দিয়ে তার জায়গায় বসল গিলটি মিয়া। হাতে সাব-মেশিনগান। পাইপ টানতে টানতে ব্রিজে উঠে এলেন স্যার হ্যামিলটন। বরাত খান আর পাশা ফোরডেকে অ্যাঙ্কর উয়িঞ্চ নিয়ে ব্যস্ত।

পাশাকে ডেকে পাঠাল রানা ব্রিজে। স্যার হ্যামিলটনকে প্রশ্ন করল, 'সব ঠিক আছে?'

'সব।'

এক জোড়া স্যান্ডউইচ দিল তাঁকে রানা। পাইপটা নামিয়ে রেখে তাতে কামড় বসালেন তিনি। রানা বলল, 'আপনার অপরাধের তালিকায় আরেকটা অপরাধ যোগ হয়েছে। জানেন ইংল্যান্ডে জলদস্যুদের শাস্তি কি?'

'মৃত্যুদণ্ড,' স্যান্ডউইচে মস্ত এক কামড় দিয়ে বললেন স্যার হ্যামিলটন। 'কিন্তু দালিয়া অভিযোগ তুলবে বলে মনে করি না। আচ্ছা, রানা, সে এখন কি ভাবছে, বলো তো?'

'সে আপনার শুনে কাজ নেই,' বলল রানা। 'আমাদের সম্পর্কে দুনিয়ার সব অশ্লীল কথা ভাবছে, এটুকুই শুধু জেনে রাখুন। আমার চিন্তা, ঠিক এই মুহূর্তে কি করছে সে!' কপালে চিন্তার রেখা।

ব্রিজে উঠে এল পাশা। কপালে ঘাম। তাকে দেখেই জানতে চাইল রানা, 'কত দেরি বরাত খানের?'

'এখনও এক ঘণ্টা।'

এক হাত দিয়ে হুইল ধরে আছে রানা, অন্য হাতে স্যান্ডউইচ। উপর দিকে তাকাল ও। 'ডেরিকে ওটা কি, পাশা?'

'বরাত খানের একটা কৌশল।' তীরের আলো এবং তার সাথে ডেরিকের উপর কাকের বাসায় যে লোকটা বসবে, এই দুইয়ের সম্পর্কটা ব্যাখ্যাও করল পাশা।

'প্রতিভা,' বরাত খানের প্রশংসা করল রানা। 'ওঠো, কিছু দেখতে পেলে বলবে।'

তরতর করে ডেরিকের উপর উঠে গেল পাশা। টেলিস্কোপটা শক্তভাবে বাঁধা হয়েছে, সেটা ধরে বসল। পঞ্চাশ ফিট উপর থেকে পানির দিকে তাকাতে কেমন যেন অসুস্থ বোধ করল সে। বাতাসে পতপত শব্দ করছে শার্টটা। 'আরও দুটো বোতাম রয়েছে ওখানে,' চেঁচিয়ে বলল। 'ওয়েস্টম্যান দুটো সেট চেয়েছিল কিনা।'

'ছুঁয়ো না ওগুলো। কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

বো-এর উপর দিয়ে দূরে দৃষ্টি ফেলল পাশা। 'আমাদের সামনে একটু ডাইনে একটা জাহাজ রয়েছে। ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি।' ধীরে ধীরে দিগন্তরেখা ধরে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে সে। 'পিছনেও একটা জাহাজ।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে যাচ্ছিলেন স্যার হ্যামিলটন, হাতদুটো স্থির হয়ে গেল।

'আমাদের দিকে আসছে? দূরত্ব কমছে?'

'বলা মুশকিল,' রানার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে পাশা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। 'হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে—বো-ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি আমি।'

স্যার হ্যামিলটনকে হুইল ধরতে বলে উঠে দাঁড়াল রানা। এগোল ডেরিকের দিকে। না থেমেই র‍্যাক থেকে বিনকিউলারটা তুলে নিল, তারপর বানরের গাছে চড়ার কায়দায় তরতর করে উঠে গেল কাকের বাসায়।

জাহাজ দুলছে। পাশার পিঠে ঠেস দিয়ে নিজেকে স্থির করল। বিনকিউলার চোখে তুলে তাকাল পিছন দিকে। 'ওটা কুয়ান ডি শান্তিয়ানা। রক্তচোষা বাদুড়ের মত উড়ে আসছে।'

'কতটা দূরে, মাসুদ ভাই?'

মনে মনে একটা আনুমানিক হিসাব কষল রানা। 'হয়তো ছয় মাইল। রাডার আছে ইয়টে, আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে।' বিনকিউলারটা পাশার হাতে দিল ও। 'নজর রাখো ওর ওপর।'

ব্রিজে নেমে এসে টেলিফোন তুলে ইঞ্জিনরুমের সাথে যোগাযোগ করল ও। 'গিলটি মিয়া, ইঞ্জিনিয়ারদের বলো, আরও স্পীড চাই আমি।'

আড়চোখে দেখছেন রানাকে স্যার হ্যামিলটন। রিসিভারটা নামিয়ে রাখছে ও। 'কতটা সময় আছে হাতে, রানা?'

'বড়জোর এইট নটের কিছু বেশি স্পীড এর কাছ থেকে আদায় করতে পারব আমরা। ইয়টের স্পীড তেরো কি চোদ্দ ছাড়িয়ে যেতে পারে। ধরুন, এক ঘণ্টা।' ব্রিজের উইংয়ের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে শেষ প্রান্তে থামল ও। তাকাল পিছন দিকে। 'এখান থেকে ওটাকে দেখা যাচ্ছে না, এখনও দিগন্তরেখার নিচে রয়েছে।' ঘুরে দাঁড়াল ও। স্যার হ্যামিলটন ওর মুখে গাম্ভীর্য দেখতে পাচ্ছেন। রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন তিনি।

'নাগালের মধ্যে পেয়ে কি করতে পারে ও আমাদের?' জানতে চাইলেন তিনি।

'গুলি করে ডুবিয়ে দিতে পারে,' রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'এখন থেকে একঘণ্টা পর এই জাহাজের অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ।'

'গা ঢাকা দেবার মত প্রচুর স্টীল প্লেট আছে।'

'স্টীল প্লেট!' ব্রিজের একটা দেয়ালে বুট দিয়ে লাথি মারল রানা। মরচে ধরা স্টীল প্লেটের গা থেকে বড় বড় ছাল খসে পড়ল কয়েকটা। 'আপনার এই স্টীল প্লেট ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে নিকেলের জ্যাকেটপরা বুলেটগুলো। ফরটি মিলিমিটারের কামানের গোলা এই ব্রিজকে চিনির দানার মত গুঁড়িয়ে দিতে পারে।'

ফোরডেকে এল রানা। 'আর কতক্ষণ?' অধৈর্যের সাথে, প্রায় ধমকের সুরে জানতে চাইল।

পাইপে স্ক্রু লাগাচ্ছে বরাত খান। থামল না, মুখ তুলে তাকালও না। 'একঘণ্টা সময় তো চেয়েই নিয়েছি, স্যার মাসুদ।'

'একঘণ্টা পর মাথা নিচু করে রেখো,' বলল রানা। 'কোন্দিক থেকে শেল

আসবে তার ঠিক নেই।'

কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল না বরাত খানের মধ্যে। কাজ পাগল লোক, তাই নিয়েই ব্যস্ত। বিপদের কথা বলে তাকে টলানো সম্ভব নয়। তবে, বুঝতে পারছে, জরুরী কোন প্রসঙ্গে কিছু বলার জন্যেই এসেছে স্যার মাসুদ।

'বরাত খান?'

'শুনছি।'

'টর্পেডোগুলোর কথা বলছি,' বলল রানা। 'ওগুলো কাজে লাগানো যায়।'

ঝট করে মুখ তুলল বরাত খান। রানার ঠোঁটে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা দেখতে পেল সে। 'কি বলছেন, স্যার মাসুদ?'

'কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ না?' রানা গম্ভীর। 'আমি চাই টর্পেডোগুলো তাদের উপযুক্ত কাজ করুক।'

'ধ্বংস করা, লক্ষ্যে আঘাত হানাই ওদের কাজ,' অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল বরাত খান। রানার মুখের দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। চোখদুটো বিস্ফারিত। 'বুঝতে পারছি, স্যার মাসুদ! ইস্, কথাটা তো আমারই মাথায় খেলার কথা!'

'সম্ভব তো?'

'চেষ্টা করে দেখব, স্যার মাসুদ। অবশ্যই সম্ভব হবে।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। চলে যাচ্ছে। হাতের কাজ ফেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বরাত খান ওর গমন পথের দিকে।

ইঞ্জিনরুম হয়ে উপরে উঠে রানা দেখল ডেক থেকেই এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কুয়ান ডি শান্তিয়ানাকে। দিগন্তরেখায় ছোট্ট একটা কালো বিন্দুর মত। সোজা স্টার্নে গিয়ে থামল ও। জায়গাটা দেখল মনোযোগ দিয়ে। তারপর ব্রিজে উঠে এসে স্যার হ্যামিলটনকে বলল, 'এটাই হবে মাদাম দালিয়ার প্রধান লক্ষ্যস্থল। যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ওই জায়গাতেই পড়বে গোলা আর বুলেটের বৃষ্টি।'

'কিন্তু হুইলে একজনকে তো থাকতেই হবে,' শান্তভাবে বললেন স্যার হ্যামিলটন। ঘন ঘন পাইপে টান দিয়ে বাতাসে এক রাশ ধোঁয়া ছাড়লেন।

'তা ঠিক। কিন্তু পিছনের দিকে আরেকটা ইমার্জেন্সি স্টিয়ারিং পজিশন আছে।' মুখ তুলে ডেরিকের দিকে তাকাল রানা। 'পাশা, নিচে নেমে হুইলটা ধরো।'

স্যার হ্যামিলটনকে নিয়ে জাহাজের পিছন দিকে চলে এল রানা। লকার খুলে ইমার্জেন্সির স্টিয়ারিং হুইলটা বের করল। রাডারের সরাসরি উপরে ফিট করল সেটাকে। পিছিয়ে গিয়ে একটু দূর থেকে দেখল। 'খানিকটা দেখা যাচ্ছে,' বলল ও। 'ক্যানভাসের পর্দা দিয়ে আড়াল করতে হবে। বুলেট আটকাবে না, কিন্তু পিছন দিকে কাউকে দেখতে না পেলে এদিকে গুলি করবে না ওরা।'

হুইলের চারদিকে ক্যানভাস ঝুলিয়ে দিল ওরা। 'এখানে থাকুন,' স্যার হ্যামিলটনকে বলল রানা। 'ছুটি না দেয়া পর্যন্ত জাহাজ আপনার হাতেই রইল।'

ব্রিজে ফিরে এসে পাশাকে দ্রুত নির্দেশ দিল রানা, 'অফিসারদের কোয়ার্টার থেকে বালিশ, চাদর, জ্যাকেট, হ্যাট—এগুলো নিয়ে এসো। কয়েকটা ডামি তৈরি করতে হবে।'

কোন প্রশ্ন নয়, নির্দেশ পেয়ে ছুটল পাশা।

কয়েকটা বালিশের গায়ে কোট পরাল ওরা। মাথায় হ্যাট চড়াল। হুইল হাউজের সিলিংয়ের সাথে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হলো ডামি তিনটে। ফাঁসিতে তিনজন লোক ঝুলছে যেন। কিন্তু দূর থেকে তা মনে হবে না, ভাবল রানা। একটু একটু সামনে পিছনে দুলছে, দূর থেকে স্বাভাবিক নড়াচড়া বলে মনে হবে।

ব্রিজের উইংয়ে বেরিয়ে এসে পিছন দিকে তাকাল রানা। 'দ্রুত কাছে চলে আসছে ইয়ট। আর এক মাইল—ধরো, দশ মিনিট সময় পাব আমরা। এখান থেকে কেটে পড়লেই ভাল করবে, পাশা। বরাত খান কি করছে দেখতে যাচ্ছি আমি।'

'ওখানে একটা জাহাজ,' স্টারবোর্ডের দিকে হাত তুলে দেখাল পাশা। অন্য দিকে যাচ্ছে জাহাজটা। স্টারবোর্ড বিমের দিকে, মাইল দুয়েক দূরে। 'সাহায্য পাবার কোন আশা আছে বলে মনে করেন, মাসুদ ভাই?'

'ম্যাসাকার জাতীয় একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে,' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল রানা। 'এতে কোন ভুল নেই। নিহতদের সংখ্যা বাড়াতে চাইলে সাহায্যের জন্যে জাহাজটার দিকে যেতে পারি।'

'আপনি বলতে চাইছেন দালিয়া ও জাহাজটাকেও…?'

'কোটি কোটি ডলারের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা প্রচুর,' বলল রানা। 'আশপাশের পোর্টগুলোয় পাঁচ হাজার ডলারের বিনিময়ে খুন করতে পারে এমন লোক গুণে শেষ করা যাবে না। আমার বিশ্বাস, ইয়ট ভর্তি করে এই ধরনের লোকই নিয়ে আসছে মাদাম দালিয়া। চলো!'

'আর পাঁচ মিনিট,' রানাকে দেখেই বলল বরাত খান। 'এটাই শেষ পাইপ।'

'স্টীম কোত্থেকে ছাড়বে তুমি?'

'ডেকে উইঞ্চের কাছে ভালব আছে একটা,' বলল বরাত খান। 'গেলেই দেখতে পাবেন।'

'থাকব ওখানে,' বলল রানা। 'সময় হলে চিৎকার কোরো।'

ডেকে উঠল রানা। পোর্ট বিমের দিকে মুখ করে এগিয়ে আসছে কুয়ান ডি শান্তিয়ানা। স্পীড কমিয়ে দিয়েছে ভয়েজারের পাশে থাকার জন্যে। দূরত্ব দুশো গজ মাত্র। উইঞ্চের আড়ালে বসে গা ঢাকা দিয়ে দেখছে রানা। পিছন থেকে বলল পাশা, 'ওর স্টার্নের দিকে দেখুন, মাসুদ ভাই। কি ওটা?'

'লুকিয়ে থাকো!' দ্রুত বলল রানা। স্টার্নের দিকে তাকিয়ে ক্যানভাসে ঢাকা জিনিসটার কোণগুলো লক্ষ করল ও, বুঝতে কিছুই বাকি থাকল না। 'কামান। আর বো-এর সামনের দিকে দেখছ? ওখানে ওটা একটা মেশিনগান। ইয়টের মাঝখানে, বোট-ডেকের মাথায় আরেকটা।'

'কিছু করছে না কেন এখনও?'

'তৃতীয় আরেকটা জাহাজ কাছাকাছিই রয়েছে যে,' বলল রানা। 'মাদাম দালিয়া কোন সাক্ষী রাখতে চায় না। ওটা অদৃশ্য হয়ে গেলেই…' ভালবটা খোলা জায়গায়, দূরত্বটা অনুমান করার চেষ্টা করছে রানা।

উইঞ্চের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা বরাত খানের চিৎকার কানে যেতেই। ভালবটা ধরে মোচড় দিল একটা। কুয়ান ডি শান্তিয়ানা থেকে দেখা যাচ্ছে ওকে, এ-ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন রানা। অস্বস্তিকর একটা শিরশিরে ভাব হলো তার দুই শোল্ডার-ব্লেডের মাঝখানে। পাইপের জয়েন্ট পরস্পরের সাথে ভালভাবে যুক্ত নয়, প্রচণ্ড শব্দে হিসহিস করে বেরোচ্ছে স্টীম।

নিচে হাতে সাব-মেশিনগান নিয়ে অপেক্ষা করছে গগল। তার পিছনে দেয়ালে হেলান দিয়ে উত্তেজিতভাবে অপেক্ষা করছে বরাত খান, কিছু একটা ঘটবে এই আশায়। কিছু যে একটা ঘটবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তার মনে। বয়লারের প্রচণ্ড চাপ খেয়ে উত্তপ্ত বাষ্প ঢুকছে ইস্পাতের বাক্সে, কোন মানুষের পক্ষে ওখানে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। একমিনিট, তারপর আরও দুই মিনিট।

'ক্ল্যাম্প নড়ছে,' ফিসফিস করে বলল গগল।

অকস্মাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না ওয়েস্টম্যান। এক হাত দিয়ে অন্ধের মত সামনেটা হাতড়াচ্ছে, অন্য হাতে রিভলভার। দিশেহারার মত গুলি করছে এদিক-ওদিক।

সাব-মেশিনগান গর্জে উঠল গগলের হাতে। দড়াম করে করিডরের উপর পড়ল ওয়েস্টম্যান। চিৎকার করছে যন্ত্রণায়। হাত ফসকে ছিটকে চলে গেছে রিভলভারটা অনেক দূরে। কুয়াশার মত বাষ্প ঢেকে ফেলছে চারদিক। এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল গগল ওয়েস্টম্যানের তলপেটে। হাত-পা ছোঁড়া এবং নেড়ি কুত্তার মত কেঁউ কেঁউ আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল। জ্ঞান হারিয়েছে সে।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা নামল। বাষ্পের আওয়াজ থেমেছে।

'টর্পেডোগুলোর কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা দেখা দরকার,' বলল গগল বরাত খানকে। 'রানার ধারণা এগুলো ব্যবহার করতে হতে পারে আমাদের।' করিডর ধরে ছুটল সে। কোনাকুনিভাবে দাঁড় করানো মই বেয়ে উঠে গেল ফোক্যাসলে। ডেকে পা ফেলতে যাবে, কে যেন পিছন থেকে তার কলার চেপে ধরল।

'ওদিকে যেয়ো না,' বলল রানা। 'গুলি খেতে চাও নাকি? তাকাও ওদিকে।'

সাবধানে দরজা দিয়ে উঁকি দিল গগল। 'খেয়েছে রে…। এক্কেবারে পাশে চলে এসেছে।'

'আরও একটা জাহাজ আছে,' বলল রানা, 'কিন্তু প্রতি মুহূর্তে দূরে সরে যাচ্ছে সেটা। দিগন্তরেখা পরিষ্কার হয়ে যাবার অপেক্ষায় রয়েছে দালিয়া।'

ছুটে নিচে নেমে এল রানা। টেলিগ্রাফের পাশে বসে আছে গিলটি মিয়া।

একজন ইঞ্জিনিয়ার একটা ডায়াল পরীক্ষা করছে। তার শিরদাঁড়া লক্ষ্য করে সাব-মেশিনগান ধরে আছে সে। অভয় দান করতে এসেছিল রানা, কিন্তু গিলটি মিয়াকে দিব্যি ফিলমি গানের সুর ভাঁজতে দেখে নিশ্চিন্ত হলো। ওখান থেকে বেরিয়ে টর্পেডো কম্পার্টমেন্টে ঢুকল। ওয়েস্টম্যানের অজ্ঞান দেহটা করিডর থেকে ভিতরে টেনে এনে একপাশে রাখা হয়েছে। দ্রুত একবার পরীক্ষা করল তাকে। জ্ঞান ফিরতে দেরি আছে, অনুমান করল ও।

'সব ঠিকঠাক আছে,' বলল বরাত খান। 'ওয়েস্টম্যান কোনই ক্ষতি করেনি কিছুর।' একটা টর্পেডোর গায়ে চাপড় মারল সে। 'এটাকে এর জায়গায় বসাতে সাহায্য দরকার হবে আমার। ইতিমধ্যেই দুটোকে টিউবে ভরা হয়েছে। কিন্তু এটাকে আমি একা...'

'স্যার হ্যামিলটন নিচে আসছেন,' বলল রানা। পায়ের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল সে। 'এই যে, এসে গেছেন। বরাত খান, পরিষ্কার জানতে চাই ব্যাপারটা আমি। বোতামগুলোয় চাপ দিলেই হবে? আর কিছু করতে হবে না?'

মাথা নাড়ল বরাত খান। 'আর কিছু করতে হবে না। ব্রিজে এক সেট, আর ডেরিকের ওপর কাকের বাসায় এক সেট, যে-কোন একটা ব্যবহার করতে পারেন। তবে কাকের বাসায় সেটটা ব্যবহার করতে সুবিধে হবে—ওখানে একটা সাইটিং টেলিস্কোপও আছে।'

'গুড,' বলল রানা। ছুটে বেরিয়ে গেল করিডরে।

রানার ছুটন্ত পদশব্দ কান পেতে শুনলেন স্যার হ্যামিলটন। তারপর বরাত খানের দিকে তাকালেন। 'কি করব আমি?'

'এক্ষুণি কিছু করার নেই আপনার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বরাত খান। মুখ তুলে স্যার হ্যামিলটনের দিকে তাকাল। 'ধর্মে যদি বিশ্বাস থাকে, প্রার্থনা করতে পারেন।'

গগল আর পাশাকে স্টার্নে পেল রানা। ডেকে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে গগল, ডেক-হাউজের কোণার কাছে মাথা, অত্যন্ত সাবধানে মুখটা একটু বের করে কুয়ান ডি শান্তিয়ানার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। কাঁধে রানার টোকা খেয়ে পিছিয়ে এল সে, বলল, 'স্টার্নের ওই জিনিসটা নিয়ে কি যেন ভাবছে ওরা।'

গগলের জায়গা দখল করল রানা। ইয়টের আফটার ডেকে তিন-চারজন লোক খুব ব্যস্ত। ক্যানভাসটা সরাচ্ছে ওরা। সরানো হতেই কামানের লম্বা ব্যারেলটা দেখা গেল। ওদের একজন একটা সীটে বসল, একটা হাতল ঘোরাল, সাথে সাথে ব্যারেলটা ওঠা-নামা করতে শুরু করল। আরেকজন আরেকটা সীটে বসে একটা হাতল ঘোরাতেই একদিক থেকে আরেকদিকে ঘুরে যেতে শুরু করল ব্যারেলটা।

রানার পাশে শুয়ে পড়ল গগল। বলল, 'হাতের কাছে একটা রাইফেল থাকলে হত এখন, সব ক'টাকে শুইয়ে দিতে পারতাম।'

ইয়টের আরও সামনে কয়েকজন লোক মেশিনগান ফিট করছে। এক ড্রাম

অ্যামুনিশন রাখা হলো জায়গামত, পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। দৃষ্টি সরিয়ে দূরে তাকাল ও। সামনের জাহাজটাকে এখন আর প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। শুধু ক্ষীণ ধোঁয়া চোখে পড়ছে। পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়ল ও। গগল তার জায়গায় গিয়ে বসেছে।

'গগল—অ্যাকশন স্টেশন!'

ক্যানভাসের ভিতর থেকে জবাব এল, 'ইয়েস, স্যার।'

পাশাকে একপাশে সরিয়ে আনল রানা। 'পোর্ট সাইডটা এখন আর নিরাপদ নয়। স্টারবোর্ডের দিকে, ব্রিজের নিচে কোথাও, ডেকে শুয়ে থাকা ভাল। ইয়টটাকে টর্পেডো মারতে যাচ্ছি আমরা। কমান্ডে আছে গগল।'

'কিন্তু ফায়ারিং বাটনগুলো তো ব্রিজে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'গগল সাব-মেশিনগানও চালাবে, আবার জাহাজের মুখ ইয়টের দিকে ঘুরিয়ে টর্পেডো ছোঁড়ারও সুযোগ করে দেবে। তুমি বোতামে চাপ দেবার দায়িত্ব নিচ্ছ।'

মাথা কাত করে সম্মতি জানাল পাশা। মনে মনে ভাবছে, মাসুদ ভাইয়ের কাজটা কি হবে? উত্তর পেতে দেরি হলো না তার।

ডেরিকের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'ওটার ওপর আরেক সেট বোতাম আছে। ব্রিজে তুমি কোন কারণে যদি ব্যর্থ হও, তখন আমি উঠব ওখানে।'

মনে মনে আঁতকে উঠল পাশা। খোলা ডেকের উপর দিয়ে ডেরিকের কাছে যেতে হবে। ডেরিকের উপরটাও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত জায়গায়। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল পাশা। 'ব্যাপারটা আত্মহত্যার শামিল, মাসুদ ভাই। হয়তো ওখানে পৌঁছুতেই পারবেন না আপনি।'

'ঝুঁকি আছে, নেহাত বাধ্য না হলে উঠছি না,' বলল রানা মাথা ঝাঁকিয়ে।

'যদি আপনি ব্যর্থ হন...?'

'তোমার ওপর আস্থা আছে আমার, পাশা,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'লেট্স্ গেট সেট।'

ক্রল করে এগোল ওরা, স্টারবোর্ড সাইডের আড়ালে পৌঁছে থামল। অপেক্ষা করছে। আড়াল থেকে ব্রিজের পিছন দিকটা দেখতে পাচ্ছে রানা।

হঠাৎ লাউড হেইলারের মাধ্যমে ভেসে এল মাদাম দালিয়ার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

'গগল! ধরে নাও, হেরে গেছ। থামাও জাহাজ। গুলি করতে বাধ্য কোরো না আমাকে।'

কোন জবাব নেই। যেদিকে যেমন চলছিল, তেমনি চলছে জাহাজ। দু'মিনিট অপেক্ষা করল মাদাম দালিয়া। তারপর জানিয়ে দিল শেষ কথা।

'এক মিনিট অপেক্ষা করব আমি, গগল। জাহাজ না থামলে শুরু হবে গোলাগুলি। কেউ বাঁচবে না তোমরা।'

রিস্টওয়াচের দিকে চাইল রানা। আর এক মিনিট। জাহাজের গতি অপরিবর্তিত। মুখে কোন জবাব দিল না গগল। দেখছে ওদের কামান দাগার প্রস্তুতি। ঠিক ঊনষাট সেকেন্ডের মাথায় ইয়টের দিকে সাব-মেশিনগান তাক

করে এক পশলা গুলি বর্ষণ করে জবাব দিল—রাজি নই।

ব্যস, শুরু হয়ে গেল আক্রমণ!

প্রচণ্ড আক্রোশে ফাটছে কামানের শেলগুলো, একের পর এক, অবিশ্রাম। চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে উজ্জ্বল আলোর বিন্দুগুলো। হুইল হাউজটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভেঙেচুরে ধ্বংসের ছোট্ট একটা স্তূপে পরিণত হলো।

মাথার উপর ঠং করে তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ শুনে মুখ তুলল রানা। এক খণ্ড কাঁচ বিঁধে গেছে কাঠের গায়ে। হুইল হাউজ থেকে উড়ে এসে ওটার ক্ষুরের মত ধারাল কিনারা এক ইঞ্চি ঢুকে গেছে শক্ত কাঠের ভিতর। মাথাটা আর তিন ইঞ্চি উপরে থাকলে কাঁচটা ওর মগজের নাগাল পেয়ে যেত।

কামানের শেল ধাপে ধাপে পিছন দিকে এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে কিছুটা পিছিয়ে এল রানা। ডেকের উপর ফাটছে শেলগুলো, ছিন্নভিন্ন তক্তার টুকরো শিলাবৃষ্টির মত পড়ছে ওর চারদিকে। জ্যাকেটের হেম কেটে, তির্যক গর্ত কেটে বেরিয়ে গেল একটা। কড়াৎ কড়াৎ কামানের শেল ফাটার মাঝখানের ফাঁক ভরিয়ে রেখেছে মেশিনগানের একটানা কর্কশ আওয়াজ। ডেক-হাউজটা যেন কাগজের তৈরি, দেয়াল ফুঁড়ে ঢুকছে বুলেটগুলো। ডেকের সাথে শরীরটা সেঁটে রেখেছে রানা, গর্ত করে ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইছে যেন।

চার মাইল দূরে লেবানীজ পেট্রল বোট থেকে শোনা গেল গোলাগুলির শব্দ। ইন্টেলিজেন্স অফিসার গালিবের দিকে ঝট করে তাকাল যুবক স্কিপার। 'গানফায়ার!'

ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন গালিব। সজোরে মেঝেতে পা ঠুকলেন তিনি। 'জোরে, আরও জোরে চালাও!'

অকস্মাৎ আর কোন শব্দ নেই। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে মাথা তুলল রানা। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য লাগছে নিস্তব্ধ পরিবেশটা। একঘেয়ে ইঞ্জিনের আওয়াজ আর বো-ওয়েভের লাফ ঝাঁপের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ব্রিজের দিকে তাকাল রানা, ধ্বংসের রূপ দেখে বুক শুকিয়ে গেল ওর।

ধীরে ধীরে ঘুরছে ভয়েজার পোর্টের দিকে, যেন হাল থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে কেউ। গগল চিৎকার করে বলল, 'আনাড়ির মত জাহাজের নাক এদিক-ওদিক ঘোরাতে যাচ্ছি। এইভাবেই পজিশন নেয়ার চেষ্টা করব আমি। বরাত খানকে তৈরি থাকতে বলো।'

ক্রল করে এগিয়ে গিয়ে মেসেজটা জানাল পাশা, ফিরে এল সাথে সাথে।

'এবার যাও, পাশা,' বলল রানা। 'লক্ষ্যের মধ্যে না আসা পর্যন্ত বোতামে চাপ দেবে না। কোন কারণে ব্যর্থ হলে চিৎকার করে জানিয়ে দিয়ো আমাকে।'

একবার কেঁপে উঠেই ছুটল পাশা। পাঁচ সেকেন্ডে পৌঁছে গেল ব্রিজে ওঠার মইয়ের নিচে। দ্রুত মই বেয়ে উঠছে, উঠেই শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে।

ধীরে ধীরে মাথা তুলল। হুইল হাউজের দিকে চোখ। সামনেটা নিশ্চিহ্ন

হয়ে গেছে, অস্তিত্বই নেই, পিছনের দিকটা নামমাত্র অবশিষ্ট আছে. ভিতরে দৃষ্টি ফেলল সে। হুইল নেই, বিন্যাকল নেই, নেই কোন ইঞ্জিন টেলিগ্রাফ,—এবং নেই সেই ছোট্ট বাক্সটা, যেটার উপর দুটো বোতাম বসানো ছিল। এক ফুঁতে সব উড়িয়ে নিয়ে গেছে কামানের শেল।

চেঁচিয়ে বলল পাশা, 'হলো না, মাসুদ ভাই!' শুয়ে থেকেই ঘুরল সে। ওর মনে হলো, এখুনি শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের গোলাবর্ষণ। মই বেয়ে নামার সাহস হলো না, লাফ দিয়ে পড়ল সে।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেল শরীরটা ডেকের সাথে। ব্রিজের ধ্বংসস্তূপের আড়ালে পড়েছে ও, এদিকের এই দু'হাত জায়গাই একমাত্র মূল্যবান আড়াল। পাশ ঘেঁষে ঝড়ের মত ছুটে যেতে দেখল ও রানাকে।

ডেক থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত জায়গাটায় পৌঁছে গেছে রানা। এঁকেবেঁকে ছুটছে, যাতে একই দিকে তিনের বেশি পদক্ষেপ না পড়ে। ডেরিকের নিচে, ডাংকি-ইঞ্জিন কেসিংয়ের পিছনে থামল, মুখ তুলে তাকাল উপরে। মুহূর্ত কয়েক আগে যা ঘটে গেছে তারপর কারও সাহস করা উচিত নয় উপরে ওঠার।

একটা চোখ ডেরিকের দিকে, আরেকটা চোখ কুয়ান ডি শান্তিয়ানার দিকে রেখেছে গগল। রানা উঠছে, দেখতে পেয়েই হুইল ঘোরাল সে, যেন ভয়েজারকে তার কোর্সে সিধে করছে। কাকের বাসায় পৌঁছে ঝুঁকে পড়ল রানা সাইটে চোখ রাখার জন্যে। কিন্তু ইয়ট মুখ ফিরিয়ে সরে যাচ্ছে দ্রুত। গগল তার সাধ্যমত চেষ্টা করছে ইয়টের সাথে ভয়েজারের বো একই লাইনে নিয়ে আসতে।

দুই জাহাজের অকস্মাৎ দিক পরিবর্তন ইয়টের গানারদেরকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছে। সামনের মেশিনগান মুখ ঘুরিয়ে কোনভাবেই ভয়েজারের দিকে লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না। মাঝখানের মেশিনগানটা বুলেট বর্ষণ শুরু করল, কিন্তু ইয়ট অসম্ভব দ্রুত গতিতে ঘুরে যাচ্ছে।

কামানের পজিশন ঠিকই আছে। সাবলীল ভঙ্গিতে মুখ ঘোরাচ্ছে সেটা। ফায়ার ওপেন করল। শেলের একটা মিছিল দেখতে পেল গগল, রানার দিকে যাচ্ছে। নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল মিছিলটা। রানা আহত হয়নি দেখে সে আনন্দের চেয়ে বিস্ময় বোধ করল বেশি। ভয়েজারকে নিচে রেখে মিসাইলটা উড়ে গিয়ে ফাটল সাগরে, অনেক উঁচু পর্যন্ত বিশাল ঝর্ণার মত উপরে উঠল পানি।

ঘামে ভিজে গেছে বোতাম দুটো। কোটি কোটি ডলার মাথায় নিয়ে ছুটল দুটো টর্পেডো। মাথা নেড়ে ভুরুর উপর নেমে আসা ঘাম ঝরাল রানা। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে কিনারায় পৌঁছে নামতে শুরু করল ডেরিক থেকে। ত্রিশ ফিটের মত নামল ঝুলতে ঝুলতে, তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে শূন্য থেকে নিচে পড়ল। কামান থেমে গেছে। গগল চেঁচাচ্ছে। কিসের এত আনন্দ ওর, ভাবল রানা। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, টর্পেডোগুলো লক্ষ্য ভেদ করতে পারেনি। বিস্ফোরণের কোন লক্ষণই নেই। মেশিনগানটা এখনও একনাগাড়ে কাপড় ছেঁড়ার মত একটানা ফড়ফড় আওয়াজ করে যাচ্ছে।

আবার গর্জে উঠল কামান। গগলের মাথার উপর দিয়ে প্যারেড করে এগিয়ে যাচ্ছে শেলগুলো। দুই কাঁধের মাঝখানে ঢুকিয়ে নিল সে মাথাটা, যেন এভাবে শেল থেকে বাঁচাতে পারবে ওটাকে। কামানের মুখ সামান্য একটু নিচু হয়ে থাকলে ভয়েজারের স্টার্ন মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, সেই সাথে ভিনসেন্ট গগলও। কামানের গর্জন থামল। ক্যানভাসের গায়ের একটা গর্তে চোখ রেখে তাকাল গগল। উল্লাসে চিৎকার ছাড়ল একটা।

কুয়ান ডি শান্তিয়ানায় গোলযোগ দেখা দিয়েছে। পিছনের সবচেয়ে উঁচু পাটাতনে দাঁড়ানো লোকগুলো হঠাৎ কেন যেন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। কামানের লম্বা ব্যারেলটা বিদঘুটে ভঙ্গিতে উপর দিকে মুখ তুলে আছে। তাড়াহুড়ো করে দাঁড় করানো কামানের মাউন্টিং উপর্যুপরি আঘাত সহ্য করতে পারেনি। ওটা এখন অচল হয়ে গেছে।

স্যার হ্যামিলটন ও বরাত খানের কানে তালা লেগে গেছে টিউব থেকে টর্পেডোগুলো বেরুবার সময় কমপ্রেসড এয়ারের হিসহিস শব্দে। আঘাত হানছে কিনা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছেন স্যার হ্যামিলটন, কিন্তু বরাত খান ইতোমধ্যেই রি-লোডিংয়ের জন্যে টিউবের বাইরের দরজা বন্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে। হেঁচকা টান মেরে ভিতরের দরজা খুলে ফেলল সে। সরে গেল দ্রুত একপাশে। হুড়হুড় করে নেমে এল পানি। 'স্যার, এদিকে আসুন!'

গড়ানো রোলারে শোয়ানো টর্পেডোটাকে ঠেলতে শুরু করল ওরা। শেষ প্রান্তে মুখ খোলা টিউব। অসম্ভব ভারী জিনিস, একবারে আধ ইঞ্চির বেশি নড়ে না। তবে খানিকক্ষণ পরই গতি বাড়ল তার, টিউবের ভিতর নিখুঁতভাবে ঢুকে গেল। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল বরাত খান। হুইল ঘুরিয়ে তালা মেরে দিল। বলল, 'এবার চার নম্বরটা।'

'প্রথম দুটো কি লেগেছে?' অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতা লক্ষ করল বরাত খান স্যার হ্যামিলটনের চেহারায়।

'মনে হয় না,' বলল বরাত খান। হাত দুটো কাজে ব্যস্ত।

রানাকে দেখতে পাবার জন্যে তাকাল পাশা। কিন্তু কোথায় ও। ব্রিজের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে উঁকি দিয়ে কুয়ান ডি শান্তিয়ানার দিকে তাকাল সে। ভয়েজারের সাথে সাথে ইয়টটাও ঘুরে গেছে, এখনও রয়েছে ভয়েজারের পোর্ট সাইডের দিকে, সমান্তরাল কোর্স ধরে ছুটছে। মাঝখানের মেশিনগান থেকে এখনও গুলি ছুটছে থেমে থেমে। বো-এর মেশিনগানটা এখন আবার লক্ষ্য স্থির করতে পারছে। সেটাও গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। দুটো মেশিনগানেরই লক্ষ্য অভিন্ন: ফরওয়ার্ড ডেক।

মেশিনগানের গুলি ডেকের তক্তা ঝাঁঝরা করছে। আওয়াজ শুনে তাকাতেই পাশাকে দেখতে পেল রানা। ছুটে আসছে সে। পাগল হয়ে গেছে নাকি? ভাবল রানা। ভুল বুঝেছে পাশা। পরমুহূর্তে অনুমান করল ও, ওকে দেখতে না পেয়ে ডেরিকে চড়ার জন্যে এগিয়ে আসছে সে। চিৎকার করে উঠল রানা, 'গো ব্যাক! পাশা, ফর গডস সেক, গো ব্যাক?'

থমকে গেল পাশা। রানার চিৎকার শুনে নয়, ঝাঁকের একটা বুলেটের

সাথে ধাক্কা খেয়ে।

ছ্যাঁত করে উঠল রানার বুক। ফোক্যাসলের ফাটলে আশ্রয় নিয়েছিল ও, বেরিয়ে এল ক্রল করে। টলছে পাশা।

'পড়ে যাও! শুয়ে পড়ো!' চিৎকার করে উঠল রানা।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়েই আছে পাশা।

নার্ভাস হয়ে গেছে পাশা। বুঝতে পেরে হাহাকার করে উঠল রানার বুক। এক সেকেন্ডের মধ্যে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে মেশিনগানের গুলিতে। সময় নেই। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। ডাইভ দিয়ে পড়ল পাঁচ হাত দূরে।

ঠিক তখুনি সংবিৎ ফিরে পেয়েছে পাশা। রানার ধাক্কা খেয়ে পড়ল ডেকের উপর, পড়েই স্প্রিংয়ের মত সটান খাড়া হয়ে ছুটল, চলে গেল নিরাপদ আশ্রয়ে।

হাঁটুর কিছুটা উপরে ব্যথা পেয়েছে রানা। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করেছিল ডাইভ দেবার সময়, কিন্তু তখন বোঝেনি ব্যাপারটা কি। ধীরে ধীরে মাথা তুলল ও। তাকাল। ট্রাউজার ফুটো হয়ে গেছে। রক্ত দেখে অবাক হয়ে গেল রানা। পা-টা টেনে ভাঁজ করতে গিয়ে অনুভব করল তীব্র ব্যথাটা। গুলি লেগেছে উরুতে।

মুখ তুলে চারদিকে তাকাল রানা। সবাই টের পেয়ে গেছে জখম হয়েছে ও।

ফোক্যাসল থেকে ছুটে আসছে বরাত খান। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে পাশা। কাঁধ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে তার। ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে মাথা বের করছে গগল।

ব্যথায় কুঁচকে উঠল রানার মুখ। 'গো ব্যাক!' শূন্যে মুঠো করা হাত তুলে চিৎকার করে বলল রানা। হাতটা থরথর করে কাঁপছে। ফুলে উঠেছে গলার সবগুলো রগ। 'গো ব্যাক!'

'স্যার মাসুদ…গুলি খেয়েছেন আপনি…' দু'গজ মাত্র এগোল বরাত খান, এক ঝাঁক বুলেট ল্যাং মেরে ফেলে দিল তাকে। উঠে দাঁড়াল আবার। এগিয়ে আসছে।

শরীরের চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছে মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি। উন্মুক্ত ডেক, কোথাও শেলটার নেই। নড়তে ভয় পাচ্ছে রানা।

পাশার দিকে তাকিয়ে দু'হাত এক করে সাব-মেশিনগান চালাবার ইঙ্গিত করল সে। 'ওদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরাও।'

গগলকে হঠাৎ মাত্র ছয় হাত সামনে দেখে আঁতকে উঠল রানা। হুইল ছেড়ে বের হয়ে এসেছে সে। 'ঘুরে ওপাশে যেতে চাইছে ইয়ট, স্টারবোর্ডের দিকে থেকে আক্রমণ করবে। আমাদের বো-এর সামনে দিয়ে যেতে হবে ওকে, গর্দভ! গো ব্যাক টু ইওর পজিশন, ইউ বাস্টার্ড! আমি এখনও অচল হয়ে যাইনি।'

মেশিনগানের কট্-কট্ কট্ কট্ শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছে না রানা। দুটোই এখন ওর দিকে তাক করা। দ্রুত বাঁক নিচ্ছে ইয়ট লক্ষ্য স্থির করতে

হিমশিম খেতে হচ্ছে গানারদেরকে।

ফায়ার ওপেন করল পাশা। তার পাশেই লম্বা হয়ে শুয়ে আছে বরাত খান। দেড় হাত দূরে পড়ে রয়েছে তিনটে আঙুলসহ পায়ের ইঞ্চি চারেক অংশ, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

পাল্টা জবাব পেয়ে তিন সেকেন্ডের জন্যে ইয়টের একটা মেশিনগান থামল। তারপর আবার শুরু করল গুলি। ভয়েজারের দুটো সাব-মেশিনগান ওদের লক্ষ্যস্থল।

ঝাড়ু দিয়ে ডেক সাফ করছে মেশিনগানের গুলি, বিদ্ধ করতে চাইছে শত্রুকে। এক প্রান্ত থেকে ঝাঁট দিতে দিতে এগিয়ে আসছে বুলেটগুলো। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল রানা, ছুটল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ডাংকি-ইঞ্জিনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সবচেয়ে উঁচু পাটাতনে রয়েছে গগল, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সব। আবার দেখতে পেল রানাকে ও। ডেরিক বেয়ে উঠে গেছে অর্ধেক। বাকি অর্ধেকটা উঠছে এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। আজরাইল যেন পিছু নিয়েছে ওর।

কুয়ান ডি শান্তিয়ানা ভয়েজারের তিনশো গজ সামনে। বো অতিক্রম করছে সে। রানাকে ডেরিকের অর্ধেক উঁচুতে দেখতে পেয়েই মেশিনগান মুখ ঘোরাতে শুরু করল। রানার পিছু পিছু উঠছে বুলেটের লাইন।

লাইটে চোখ রেখে সময় নষ্ট করল না রানা। পৌঁছেই থাবা বসিয়ে দিল ও বোতাম দুটোর গায়ে। ডেরিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে বুলেটগুলো। রানাকে ধরতে চাইছে। মাত্র তিন হাত উপরে তাদের শিকার।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে অকস্মাৎ থমকে থেমে দাঁড়াল ইয়টটা। টর্পেডোর ধাক্কা খেয়েছে। তিনশো পঞ্চাশ পাউন্ড টি-এন-টি-র প্রচণ্ড দ্বৈত বিস্ফোরণে শূন্যে উঠে গেল ইয়টের শত-সহস্র টুকরো। মাঝখান থেকে দুটো ভাগ হয়ে গেল কুয়ান ডি শান্তিয়ানা। বো-এর দিকটা মাত্র কয়েক সেকেন্ড পানির উপর ভেসে থাকল। তীব্র বেগে পানি ঢুকছে স্টার্নে।

ফেনিল সাগরের পানিতে স্টার্ন থেকে লাফ দিয়ে পড়ল কয়েকজন। নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটল গগলের ঠোঁটে। সাদা ফুলের মত একটা কি যেন দেখতে পেয়েছে সে। পরিষ্কার চিনতে পারছে না, তবে অনুমান করতে পারছে। জাহাজকে সেদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে সে।

কাছ থেকে দেখে নিজের অনুমানের সত্যতা যাচাই করার সুযোগ পেল গগল। যা ভেবেছিল! একটা হাত মরিয়াভাবে পানির উপর নড়ছে। সাদা হয়ে গেছে মাদাম দালিয়ার রক্তশূন্য মুখ।

ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হুইল ঘোরাচ্ছে গগল, ঘুরে যাচ্ছে জাহাজটা সরাসরি দালিয়ার দিকে।

কিছুক্ষণ পর ভয়েজারের মুখ আবার তার আগের কোর্সে সেট করল গগল।

পিছনে ধ্বংসের চিহ্ন, লাল হয়ে গেছে সাগরের কিছুটা অংশ তাজা রক্তে,

কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না গগল।

রেলিংয়ে হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে গগল। কামানের হাঁ করা মাজলের দিকে চেয়ে আছে। এইটা নিয়ে আজ দুটো কামান দেখছে সে। ভয়েজারের দিকে মুখ করে আছে কামানটা। পোর্ট সাইডে একশো গজ দূরে ঠিক যেখানে কুয়ান ডি শান্তিয়ানা ছিল, সেখানেই রয়েছে লেবানীজ পেট্রল বোটটা। সবই আগের মত আছে, শুধু গুম মেরে গেছে ভয়েজারের ইঞ্জিন। ছোট্ট একটা বোট ভয়েজারের গায়ের কাছে ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে।

'আমাকে একটু সাহায্য করো, গগল,' বলল রানা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পাশাকে দেখল গগল। শরীরের তিন জায়গায় ইতোমধ্যেই ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে রানা। হাঁটুর কাছে আরেকটা দরকার। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে, ঝুঁকল, টেনে ধরে রাখল ড্রেসিংটা, শক্ত করে যাতে বাঁধতে পারে রানা।

'কেমন লাগছে এখন?'

'আমি খুশি,' বলল পাশা। 'এর চেয়ে খারাপ কিছুই ঘটেনি বলে। বেঁচে আছি এটাই তো আশ্চর্য।'

সিধে হলো গগল। 'পেট্রল বোট থেকে যে লোকটা এল তাকে তো নেভীর লোক বলে মনে হলো না, রানা?'

'লেবাননের নেভী নামকাওয়াস্তে,' বলল রানা। 'দু'একটা কোস্টাল ডিফেন্স ভেসেল আছে ওদের। লোকটা নেভীম্যান নয়, ইন্টেলিজেন্স অফিসার।'

'স্যার হ্যামিলটন কি এত কথা বলছেন ওর সাথে? দশ মিনিটের ওপর তো হয়ে গেল!' অনেকটা আপন মনেই বলল গগল।

বরাত খানকে শেষবার জীবিত অবস্থায় যেখানে দেখেছিল রানা, এখনও সে সেখানে সেই অবস্থায় শুয়ে আছে সাব-মেশিনগান নিয়ে। তর্জনীটা এখনও ট্রিগারে। গুলি লেগে ওর পায়ের ইঞ্চি চারেক উড়ে যেতে দেখেছিল রানা। কিন্তু একটা গুলি ওর বুকও ভেদ করে গিয়েছে বোঝা যায়নি আগে। একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে লাশটা। আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ ফিরিয়ে নিল রানা।

সিগার ধরাল গগল। একটা ছুঁড়ে দিল রানার দিকে।

'তোমার পায়ের অবস্থা কি রকম? সিরিয়াস? হাড়…'

'উঁহুঁ,' চুরুটে আগুন ধরিয়ে নিয়ে বলল রানা, 'মনে হচ্ছে বিশ দিনেই সেরে উঠতে পারব। ওই যে আসছেন স্যার হ্যামিলটন।'

ডেক ধরে এগিয়ে আসছেন তিনি। খানিকটা পিছনে মুরতজা গালিব।

'কি বললেন ওকে?' নিচু গলায় জানতে চাইল রানা।

'সব!'

'তার মানে,' ভুরু কুঁচকে উঠল গগলের, 'ফাঁসি যদি না-ও হয়, বিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। স্যার হ্যামিলটন, মধ্যপ্রাচ্যের জেলে কখনও…মানে,

অভিজ্ঞতা আছে?'

স্যার হ্যামিলটন হাসলেন। 'চিন্তার কিছু নেই। আমাদের মধ্যে একমাত্র রানা সম্পর্কেই যতটা জানি বলেছি ওকে।'

রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল গগল. 'আমার সম্পর্কে কিছু বলেননি তাহলে?'

'মাথা খারাপ?'

একটা হাঁফ ছাড়ল গগল।

'অফিসার তোমার সাথে কথা বলতে চায়, রানা,' স্যার হ্যামিলটন বললেন। 'আমাকে তেমন গ্রাহ্য করছে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে এক-পা এগোল রানা। হাতটা বাড়িয়ে দিল। একটু ইতস্তত করে সেটা ধরল গালিব। 'গালিব, ইন্টেলিজেন্স অফিসার,' অসম্ভব ভারী গলায় বলল গালিব। 'আপনার পরিচয় জানতে পেরে আমি আশ্চর্য হয়েছি, মেজর রানা। কিন্তু বিনা অনুমতিতে লেবানীজ টেরিটোরিতে ব্যক্তিগত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে ব্যাপারটাকে আমি খারাপ চোখে না দেখে পারি না।'

'অনুমতি নিইনি, একথা সত্য নয়,' বলল রানা। পকেট থেকে নোটবুক বের করে তার ভিতরে ভাঁজ করে রাখা একটা কাগজ তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল গালিবের দিকে। 'আপনাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের একটুকরো লেখা। পড়লেই সব বুঝতে পারবেন!'

ভাবান্তর ঘটল না চেহারায়, হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে গম্ভীরভাবে ভাঁজ খুলল গালিব। পড়তে শুরু করল। ধীরে ধীরে গাম্ভীর্যের ছাপ মুছে যাচ্ছে মুখের চেহারা থেকে বিস্মিত দেখাচ্ছে তাকে। চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল একবার। দৃষ্টিতে সমীহের ভাব। আবার পড়তে শুরু করল চিঠিটা।

পড়া শেষ করে বিদ্যুদ্বেগে স্যালুট ঠুকল গালিব রানাকে। 'মাই গড! স্যার, আপনাকে দেখছি লেবাননে শুধু ঢোকার অনুমতিই দেয়া হয়নি, আরও অনেক ব্যাপারেই অবাধ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।'

'এক সময়ে নাবাতিয়া ফাইটার স্টেশনে সামান্য একটা উপকার করেছিলাম কিনা...'

নাবাতিয়ার উল্লেখ করতেই প্রথমে হাঁ হয়ে গেল গালিবের মুখটা। পরমুহূর্তে ঝটাং করে দ্বিতীয় স্যালুট ঠুকল সে। 'মাই গড! আপনিই সেই মাসুদ রানা! সেই বাংলাদেশী বীর, যার ঋণ কোনদিন...'

'লোকজনের সামনে দয়া করে লজ্জা দেবেন না।' মৃদু হাসল রানা।

স্যার হ্যামিলটন, পাশা, গগল দাঁড়িয়ে আছে কয়েক গজ দূরে। একটা ট্রেতে গরম কফির কাপ সাজিয়ে নিয়ে এইমাত্র ডেকে উঠে এসেছে গিলটি মিয়া। সবাই অবাক চোখে তাকিয়ে আছে রানা আর গালিবের দিকে। আমূল বদলে গেছে গালিবের হাবভাব।

'মি. গালিব, আপনার পেট্রল বোটে আমাদের জায়গা হবে তো?' জানতে চাইল সে। 'কয়েকজন আহত হয়েছে, ওদেরকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো দরকার।'

'এক্ষুণি নির্দেশ দিচ্ছি আমি,' বলল গালিব। 'আহতদের স্থানান্তরের ব্যবস্থা করছি। আর কোন নির্দেশ, স্যার?'

'নির্দেশ? না।'

হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল রানার চেহারা। ঢোক গিলল ও। বলল, 'তীরে পৌঁছেই আপনি কিছু কেমিক্যাল যোগাড় করে দেবেন। একটা কফিনও দরকার। আমার একজন লোক মারা গেছে, লাশটা দেশে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে, স্যার,' চলে গেল গালিব।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। সোজা তাকাল স্যার হ্যামিলটনের দিকে। ভাবছে এই ভদ্রলোকই তাঁর মেয়ের খুনের বদলা চেয়েছিলেন, খুনের বদলে খুন চেয়েছিলেন—যথেষ্ট রক্তপাত ঘটে গেছে, নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি।

কিন্তু এই মৃত্যুগুলো কি লাভ বয়ে আনল? অজ্ঞাতসংখ্যক লোক, সারা পৃথিবীতে, আরও বেশিদিন এবং সুস্থভাবে বাঁচবে। কিন্তু তারা কেউ জানবে না যে তাদের এই অতিরিক্ত আয়ু কেনা হয়েছে রক্তের মূল্যে। এবং আগামী বছর, অথবা তার পরের বছর আরেকজন ওয়েস্টম্যান কিংবা আরেকজন মাদাম দালিয়া মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, তারপর আবার জঘন্য ব্যবসাটা চালু হয়ে যাবে পুরোদমে।

চোখ বুজল রানা। ভারি ক্লান্ত বোধ করছে। রোদের আঁচ লাগছে বন্ধ চোখের পাতায়। ভাবছে ও··· কিন্তু, আরেকজন রানা, আরেকজন পাশাও এগিয়ে আসবে; আরেকজন স্যার হ্যামিলটন, গগল, গিলটি মিয়াকে নিয়ে নতুন দলটাকে ধ্বংস করার জন্যে। হয়তো মারা যাবে আরেকজন বরাত খান।

বুমেরাং

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৯

এক

কালো নতুন গোঁফ বেশ ভালই গজাতে শুরু করেছে। পুরো এক হপ্তার সবটুকু আগুনে রোদ দিয়ে পুড়িয়ে নিয়েছে চামড়া, বিশ্রামহীন পথচলা আর বিরতিহীন সতর্কতা চেহারায় এনে দিয়েছে রুক্ষ-কঠোর একটা চণ্ডাল ভাব। শুধু চোখ জোড়া শ্বাপদের মত ঠাণ্ডা, যেন ওগুলোর পিছনে মগজ কোন কাজ করছে না।

টেক্সাসের ওপর দিয়ে আসার সময় সাদা কনভার্টিবল-এর ছাত নামিয়ে দিয়েছিল সে। ভেবেছিল বাতাস পেলে রোদ একটু সহনীয় হবে। আরও একটা কারণ ছিল। যে লোক উন্মুক্ত গাড়িতে থাকে তার ওপর হঠাৎ কারও নজর পড়ে না। টেক্সাসে ভয়ে ভয়ে ছিল সে। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে আসার পর বিপদের ভয়টা কমে আসে, তবে রোদ হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গের জ্বলন, কাজেই এবার সে রাস্তার পাশে ধুলোর মধ্যে গাড়ি থামিয়ে ছাত তুলে মাথা ঢাকে। তোবড়ানো পানামা হ্যাটটা খুলে নামিয়ে রাখে সীটের পাশে, কিনারার ঘামটুকু শুকিয়ে যাক। ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দিল সে নিজেকে, স্ট্র হ্যাটের বদলে মনে করে পানামাটা এনেছিল বলে। শত্রুপক্ষ কোন আমেরিকানকে খুঁজছে না, যদিও জানে একজন আমেরিকানের ছদ্মবেশ নিয়েই পালাচ্ছে সে।

আঙুলের ডগা দিয়ে নতুন গোঁফ জোড়ার স্পর্শ নিল সে। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ। মুচকি হাসল একটু।

শহরের অনেক ওপরে পাহাড়শ্রেণীর চূড়াগুলো আঁকাবাঁকা রেখা টেনেছে আকাশের গায়ে, রোদ লেগে লালচে কুয়াশার মত লাগছে দেখতে। মনে আশা, শীতল আশ্রয় মিলবে ওখানে, ভদ্র একটা হোটেল খুঁজে নিতে পারবে সে, যদি থাকে।

গির্জাটা প্লাজা সিভিকার মাথায়। রাস্তা পেরিয়ে খানিক দূর এগোতেই পাওয়া গেল—হোটেল ডিসেম্বর। লাল ইঁটের বিল্ডিং, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য দিচ্ছে সর্বাঙ্গে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে।

হোটেলের সামনে শেভ্রোলে কনভার্টিবল থামাল সে, আগেই দেখেছে পার্ক থেকে কয়েক জোড়া চোখ লক্ষ করছে তাকে। কে জানে, হয়তো ওপরের জানালাগুলো থেকেও। তবে কি এদিককার বেশিরভাগ লোকের মত তারও সাদার বদলে কালো গাড়ি ব্যবহার করা উচিত ছিল? গাড়িটা পুরানো মডেলের, কিন্তু এরইমধ্যে তার মন জয় করে নিয়েছে। ধুলোয় ঢাকা পড়ে আছে ওটার চকচকে ভাব, কিন্তু জানে একবার হাত পড়লেই ঝলমলে হাসি উপহার দেবে তাকে। শুনলে লোকে পাগল ভাববে, কিন্তু কথাটা সত্যি, এই

কয়দিনেই গাড়িটার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে তার।

জ্যাকেটটা পরে নিল আগন্তুক, হাতে নিল একটা মাত্র সুটকেস। বাকি সব গাড়ির ট্রাঙ্কের মধ্যে নিরাপদে আছে।

হোটেলের সামনে বেঞ্চে বসা বুড়ো লোকটাকে দেখল, কিন্তু পাত্তা দিল না। তিন আঙুলের ভেতর আড়াল করে ধরা সিগারেট টানছে, সম্ভবত এইমাত্র কারও ফেলে যাওয়াটা কুড়িয়ে নিয়েছে।

তাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, বুড়ো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হাই!' যেন কতকালের পরিচিত।

দাঁড়াল সে। নোংরা, ভাঁজহীন স্যুট পরা বুড়োকে আগে কখনও দেখেনি, নাকি দেখেছে কিন্তু চিনতে পারছে না? তীক্ষ্ণ, কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুক। বুড়োর চেহারায় কঠিন পরিশ্রমের ছাপ। চোখ দুটো দীন পোশাক আর কর্কশ অবয়বের সাথে একেবারেই বেমানান। দৃষ্টিতে কৌতুক আর সারল্য মিলেমিশে আছে। মুখটা চওড়া, তবে হাড় বেরুনো, নাক আর চোখ বাদে গোটা মুখই ঢাকা পড়ে আছে আধ ইঞ্চি লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়িতে।

স্প্যানিশ ভাষা জানে সে, কিন্তু এদিকে আঞ্চলিক ভাষারই একচেটিয়া চল। হাই বলেই বুড়ো থামেনি, তাকে দাঁড়াতে দেখে যোগ করল; 'এক-আধটা ডলার হবে নাকি, সিনর?'

সুটকেসটা নামাল সে। 'তুমি জানলে কিভাবে আমি ইংরেজী বুঝব?'

'আপনার হাঁটা, সিনর। মাটিতে পা আমরা সবাই ফেলি, কিন্তু সুন্দর আর মার্জিত হয় ক'জনের? তাছাড়া, ও-ধরনের ফ্যান্সি জিনিস এখানে কেউ চালায় না।' সাদা কনভার্টিবলের দিকে ইঙ্গিত করল বুড়ো। 'একটা ডলার যদি হাতছাড়া করেন, ওটার ওপর নজর রাখব আমি।'

'নজর রাখার দরকার হবে কেন?'

'আপনি হোটেলে ঢোকার তিন সেকেন্ডের মধ্যে ছোকরারা ওটাকে ছেঁকে ধরবে। আমার পকেট খালি, একটা ডলার পেলে কাউকে ধারেকাছে ঘেঁষতে দেব না।' হাসল বুড়ো।

মানিব্যাগ বের করে বুড়োর হাতে পাঁচ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিল আগন্তুক। 'ধরে নেব কাজটা ঠিকমত করবে, ঠিক তো?'

নোটটা ভাল করে দেখল বুড়ো, জাল কিনা পরীক্ষা করছে। হঠাৎ আনন্দে আটখানা হলো তার চেহারা, যেন এইমাত্র বড় অঙ্কের একটা লটারী জিতেছে। 'থ্যাঙ্ক ইউ,' বলল সে, শেষ শব্দটা টেনে লম্বা করল।

আবার সুটকেসটা তুলছে আগন্তুক, শুনতে পেল বুড়ো বলছে, 'আপনাকে আমি আগে কখনও দেখেছি নাকি, সিনর? লারেডোতে ছিলেন কখনও?'

'না।' আগন্তুকের পেশীতে টান পড়ল।

'সান আন্তনয়ে?'

'না,' বলল সে, ধাপ বেয়ে উঠে যাচ্ছে হোটেলের দিকে।

'সিনর, আমি জানি আপনি কার মত দেখতে...,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল বুড়ো।

সিঁড়ির দুই ধাপে দুই পা, পাথর হয়ে গেল আগন্তুক। ধীরেধীরে ঘুরল সে, নেমে এল। দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে এরইমধ্যে দেখে নিয়েছে আশপাশে কেউ আছে কিনা। রাস্তার ওপারে আপনমনে হেঁটে যাচ্ছে মোটা এক মেক্সিকান মহিলা, তাছাড়া শুনতে পাবার মত কাছাকাছি আর কেউ নেই। তবু বুড়োর কাছে ফিরে এল সে, কিন্তু কথা না বলে অপেক্ষা করতে লাগল।

বুড়োর চেহারায় ঠিক ভয় নয়, কেমন যেন ইতস্তত ভাব আর সংশয়। আগন্তুকের শীতল দৃষ্টির সামনে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল সে। আমতা আমতা করে বলল, 'না, মানে, ফটো দেখেছি কিনা···এদিকে এক লোক এসে কয়েকজনকে দেখিয়ে গেছে! আপনি ঠিক সেই ফটোর লোকটার মত দেখতে, সিনর। মাসুদ রানা···হ্যাঁ, ঠিক তার মত। আপনি সে-ই লোকই নন তো, সিনর?'

চক্কর দিয়ে উঠল রানার মাথা। এখানে, এতদূরেও ওর ফটো পাঠিয়েছে হার্মিস? 'তুমি ভুল করছ, ফ্রেন্ড। আমার নাম রড—পিটার রড।' জ্যাকেট একটু ফাঁক করল ও, বুড়ো যাতে কোল্ট পিস্তলের বাঁটটা দেখতে পায়—ওর বাম বগলের নিচে হোলস্টারে রয়েছে। 'তবু বলি, তোমার সাবধান হওয়া উচিত, ওল্ড-টাইমার। জায়গা বুঝে জোট বাঁধতে হয়, তাই না? তুমিও বিদেশী, আমিও বিদেশী, অন্যান্য মিল থাক বা না থাক, কি বলো?'

'জ্বী, সিনর, ঠিক বলেছেন—আমার বোধহয় ভুলই হয়েছে। সত্যি দুঃখিত।'

'অমন দু'একটা ভুল আমি নিজেও রোজ করছি,' বলে হোটেলে ঢুকে পড়ল রানা। জানতে হবে এদিকে কে কে তার ফটো দেখেছে, তবে এখুনি কৌতূহলী হলে বুড়োর মনে যে-টুকু সংশয় আছে তাও আর থাকবে না, নিশ্চিতভাবে ধরে নেবে সে-ই মাসুদ রানা।

ডিসেম্বরের সামনের একটা ঝুল-বারান্দায় বসে ওদের কথাবার্তা শুনল লোকটা। সবটুকু না হলেও, যতটুকু শুনেছে, তার মত লোকের মাথায় কুবুদ্ধি গজানোর জন্যে তা যথেষ্ট। ঝুল-বারান্দার কিনারায় নয়, রোদ এড়াবার জন্যে দেয়াল ঘেঁষে বসেছে সে। বারান্দা সহ তিন কামরার সুইট, প্রায় সারা বছর রিজার্ভ থাকে তার জন্যে। আগন্তুকের শুধু হাঁটা নয়, হাবভাব আর কথাবার্তাও আকৃষ্ট করেছে তাকে, সব মিলিয়ে যেন ব্যক্তিত্ব আর কর্তৃত্বের উৎকৃষ্ট নমুনা প্রত্যক্ষ করল সে। মালাক্কা ছড়িটা নিয়ে চেয়ার ছাড়ল, সিধে হয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল, নিচের লবিতে নামবে। চেহারায় আত্মবিশ্বাস, বড়বড় চোখে ধূর্ত দৃষ্টি, জানে লোক চিনতে তার ভুল হয় না।

ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে চাবির জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, আয়নায় চোখ পড়তেই দেখতে পেল লোকটাকে। দীর্ঘদেহী, চওড়া নিরেট কাঁধ, শুধু কপালের ওপর ইঞ্চিখানেক সোনালি চুল, ফিতের মত ঘিরে আছে মাথাটাকে, লম্বাটে ভরাট মুখে ভাঙা নাকটা ভারি বেমানান। স্বচ্ছন্দভঙ্গিতে হেঁটে আসছে সে,

মনেই হয় না কোন বোঝা বহন করছে, অথচ ওজন হবে আড়াই কি পৌনে তিন মণ। হাতের ছড়িটা মেঝেতে ঠোকার মধ্যে নৃত্যের একটা ছন্দ আছে, আভিজাত্যের পরিচয়বাহী। মাথা উঁচু করে আসছে সে, গর্বে যেন মাটিতে পা পড়ে না। ডেস্ক ক্লার্ক রানাকে তেমন গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু লবিতে লোকটাকে দেখেই সটান দাঁড়িয়ে পড়ল, হাত কচলাচ্ছে।

লম্বা চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে রানার দিকে পিস্তলের মত তাক করল লোকটা। 'সিনর রড?' সবিনয় ভদ্রতার সাথে, নির্ভুল উচ্চারণে, ইংরেজীতে প্রশ্ন করল সে।

স্থির হয়ে গেল রানা। ওর পাসপোর্টের নাম জানল কিভাবে লোকটা? অস্বীকার করে লাভ নেই। ডেস্ক ক্লার্ক জানে, জানে বাইরে বসা বুড়োটা। 'হ্যাঁ।'

'পরিচয় ঘোষণার সুযোগ দিন আমাকে, প্লীজ, সিনর। ডন হোসে স্যামুয়েল দ্য হোমায়রা।'

দু'জন ওয়েটারকে পিছনে নিয়ে লবিতে ঢুকল হোটেল ম্যানেজার, হোমায়রাকে দেখে তিনজনই তারা কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল। দয়া করে মুচকি একটু হাসল হোমায়রা, হাত নেড়ে তফাতে থাকার নির্দেশ দিল সে। সন্দেহ নেই, ভাবল রানা, এদিকের চাকাগুলো এই লোকই ঘোরায়।

'আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল, সিনর,' রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল হোমায়রা, ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে। 'কথা দিচ্ছি আপনার কোন ক্ষতি হবে না।'

'ক্ষতি?' ঘাড় ফিরিয়ে লোকটার দিকে সরাসরি তাকাল রানা।

'সম্ভবত আপনার সাথে আপনার কামরায় যেতে পারি আমি, সিনর?' পাল্টা প্রশ্ন করল হোমায়রা, তারপর জবাব দিল, 'লাভ না হওয়ার মানেই ক্ষতি, আমার একটা প্রিয় দর্শন, সিনর। আপনি কাপড় ছাড়বেন, সুটকেস খুলবেন, সেই ফাঁকে আমরা কথা বলব, সিনর?'

'কি কথা? এখানে, এই লবিতে বললেই তো পারেন,' অদূরে সাজানো বেতের চেয়ার আর টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল রানা।

'ওহ্ নো! আমি ডন হোসে স্যামুয়েল দ্য হোমায়রা, সিনর—একজন অভিজাত ভদ্রলোক। প্রকাশ্য জায়গায় আমি তো কারও সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে পারি না। হয় আপনার কামরায়, নাহয় আমার সুইটে, প্লীজ, সিনর।'

'দুঃখিত,' ডেস্ক ক্লার্কের দিকে ফিরে হাত পাতল রানা। 'আমার সময় হবে না।'

চাবি দেবে কি, ডেস্ক ক্লার্কের চেহারায় অবিশ্বাস ফুটে উঠল, রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে। পিছন থেকে কথা বলে উঠল হোটেল ম্যানেজার, ওয়েটার দু'জনকে নিয়ে একটু তফাতে এতক্ষণ মূর্তি হয়ে ছিল সে। 'সিনর, এক্সকিউজ মি, আপনার নিদারুণ ভুল হচ্ছে। উনি ডন হোমায়রা—এই এলাকার গর্ব।'

'নিদারুণ ভুল হচ্ছে?' ডেস্ক ক্লার্কের হাত থেকে চাবিটা ছোঁ দিয়ে নিজেই নিয়ে নিল রানা। 'হলে আর কি করা যাবে, হোক। আমি এই মুহূর্তে নিদারুণ ক্লান্ত, কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছে নেই।' সিঁড়ির দিকে এগোল ও, পিঠটা শক্ত হয়ে আছে।

ঠিক তখুনি চিৎকারটা হলো। 'বেজম্মা কুত্তারা! হারামীর বাচ্চারা! ভাগ! গেলি!'

থামল রানা, ঘুরল, হন হন করে এগোল হোটেলের দরজা লক্ষ্য করে। যা ধারণা করেছিল তাই, হোঁৎকা চেহারার তিনজন যুবক, গায়ে শার্ট নেই, সাদা শেভ্রোলে-র ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আমেরিকান বুড়োটা অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করছে শুধু, সাহস করে যুবকদের কাছে ঘেঁষতে পারছে না। অবশ্য রানাকে দোরগোড়ায় দেখে তার সাহস বেড়ে গেল। এক যুবকের পিছনে চলে এল সে, কাঁধ ধরে টান দিল। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছিল যুবক, মাথা বের করে সিধে হলো সে, দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল বুড়োর চোয়ালে। 'মাগো, মেরে ফেল্লো!' বলে আর্তনাদ করে উঠল বুড়ো, চিৎ হয়ে পড়ল রাস্তার ওপর।

ধীরেসুস্থে সিঁড়ি বেয়ে নামল রানা। 'এই যে, শোনো তোমরা!' মৃদু কণ্ঠে ডাকল ও।

স্থির হয়ে গেল ছোকরার দলটা। ধীরে ধীরে ঘুরল তারা, দেখল রানাকে। প্রথমে একজন, তারপর বাকি দু'জন কেঁপে কেঁপে হাসতে শুরু করল।

'জানি তোমরা পালাবে,' বলল রানা, আগের মতই মৃদুকণ্ঠে। 'কিন্তু তার আগে লোকটার কাছে মাফ চেয়ে নাও।' যেন গুরুজন হিসেবে কোমল সুরে উপদেশ দিচ্ছে ও। 'তা না হলে মারব আমি।'

ছোকরার দল হাসতে ভুলে গেল। কাঁদতে ভুলে গেল ব্যথায় কাতর বুড়োটাও। ওদের সবার কাছে আগন্তুকের আচরণ হাস্যকর আর অবাস্তব লাগছে।

মাত্র দুই কি তিন সেকেন্ড, তারপর তিনজন আবার এক সাথে হেসে উঠল ওরা। শান্ত ভাব, নরম সুর দুর্বলের মিনতি বলে ধরে নিয়েছে তারা। একজন তো রানার দিকে খেয়াল রাখারও প্রয়োজন বোধ করল না, আবার জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল গাড়ির ভেতর। বাকি দু'জন এগিয়ে এল। বোকা হাবা অজ্ঞাত পরিচয় কালেভদ্রে কপালে জোটে, হাতের সুখ মেটাবার এই সুযোগ ছাড়া যায় না। হোটেলের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডন হোমায়রা, দেখতে পাচ্ছে তারা, ঠোঁটে প্রশ্রয়ের হাসি।

বুড়োর দিকে হাত তুলল রানা, বলল, 'আমার দিকে নয়, ওদিকে যাও—মাফ চাও।'

'তুই মাফ চা,' প্রথম যুবক বলল, সে-ই সামনে। 'প্রথমে দু'পা ধরে, তারপর মাঝখানের ঠ্যাংটা ধরে।' রানার সামনে দাঁড়াল সে, ডান হাতের পেশী ফুলিয়ে দেখাচ্ছে। হঠাৎ তর্জনী দিয়ে রানার তলপেটে খোঁচা মারার ভঙ্গি করল সে, ভেবেছিল আত্মরক্ষার জন্যে আঁতকে উঠে পিছিয়ে যাবে রানা।

কিন্তু তার প্রতিপক্ষ নড়ল না, চেহারাতেও কোন ভাবান্তর ঘটল না। মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত বোধ করল যুবক, আর তখুনি তৎপর হলো রানা।

তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল ও। খুব জোরের সাথে নয়, ভিড় ঠেলে এগোবার ভঙ্গিতে। এগোলও এক পা, হাত লম্বা করে দ্বিতীয় যুবকের চুল ধরল মুঠোর ভেতর, টান দিল হ্যাঁচকা—ঠিক নিজের দিকে নয়, একপাশে। মাথা নিচু করে দ্বিতীয় যুবক তীরবেগে ছুটে এসে গুঁতো দিল প্রথম যুবকের বুকে। দু'জন ভারসাম্য ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, এক লাফে ওদের সামনে ফিরে এল রানা। শুরু হলো যন্ত্রণাদায়ক, প্রাণ-সংহারী, নিরেট ঘুসির তুমুল বর্ষণ।

সব কিছু ভুলে গেল ওরা। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে মানুষ এতটা ব্যস্ত হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যুবক দু'জনের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে, চোখ-কান-নাক সহ মুখটাকে রক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওরা, কিন্তু পারছে না। কে মারছে ভুলে গেছে ওরা, কিভাবে বা কোত্থেকে আসছে আঘাতগুলো তা-ও এখন আর কোন গুরুত্ব বহন করে না, শুধু ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঠেকাবার। ব্যথায় বিষিয়ে উঠল পেট, কাঁধ থেকে নেমে যাওয়া হাতে কোন সাড় নেই, দু'জনেরই ফুলে উঠে বন্ধ হয়ে গেছে একটা করে চোখ, নাকের ফুটো যেন রক্ত নিষ্কাশনের নর্দমা। দু'একটা মার চিনতে পারল বোধহয়, ঘুসি নয়, ভাঁজ করা কনুই থেকে এল। মাথায় লোহার আঙটা আটকানোর মত একটা অনুভূতি হলো, আগন্তুক এক হাত দিয়ে একজনের চুল ধরে রেখেছে, একই সাথে ভাঁজ করা হাঁটু দেবে গেল পেটের ভেতর।

ফোঁপাতে শুরু করল, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। মাফ চাইবে সে অবকাশও পাচ্ছে না। তৃতীয় যুবক আওয়াজ শুনে মাথা বের করেছে গাড়ির ভেতর থেকে, সিধে হয়েছে। ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে সে, ভুলে গেছে পালানোর কথা। আগন্তুকের হাত আর পা বিশ্রাম বা বিরতি কাকে বলে জানে না, দৃষ্টি দিয়ে ওগুলোর বিদ্যুৎগতি অনুসরণ করাও সম্ভব নয়। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে চম্পট দিল সে।

অবশেষে দয়া হলো রানার। মনে হলো একটু বোধহয় বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। কিন্তু রাগটা তখনও আছে। দু'জনকে ঠেলে বুড়োর দিকে পাঠাল। 'মাফ চাও।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মাফ চাইল রক্তাক্ত ছোকরা দু'জন। বিদায় হচ্ছে তারা, বুড়ো উঠে দাঁড়াল, ছুটে গেল ওদের দিকে, চিৎকার করছে, 'লাদরন! লাদরন!'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চোর!'

হেসে ফেলল রানা, আর তখনই প্রথমবারের মত লক্ষ করল দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ডন হোমায়রা।

'ব্রাভো, সিনর রড,' বলল সে, নিঃশব্দে হাততালি দিল।

কোন মন্তব্য না করে ধাপ ক'টা বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। ভেবেছিল

পথ করে নিতে হবে, কিন্তু না, নিজেই দোরগোড়া থেকে সরে গেল ডন হোমায়রা।

রানার পিছু নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছুল বুড়ো আমেরিকান, হাতে পাঁচ ডলারের নোটটা। 'সিনর, এটা রাখুন, প্লীজ।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

'জানি ফেরত চাইবেন, মারের যা নমুনা দেখলাম···তার আগেই দিয়ে দিচ্ছি, সিনর,' করুণ মুখে বলল বুড়ো। 'যে দায়িত্ব নিয়েছিলাম সেটা আমি পালন করতে পারিনি।'

'ঠিক যা চেয়েছিলাম তাই করেছ তুমি। চিৎকার।' হাসল রানা। 'গাড়িতে ন্যাকড়া আছে, মুছে পরিষ্কার করে দেবে?'

'অবশ্যই, একশোবার,' এক গাল হেসে গাড়ির দিকে হাঁটা দিল বুড়ো, নোটটা তাড়াহুড়ো করে চালান করে দিল পকেটে।

রানার পিছু পিছু লবিতে ঢুকল ডন হোমায়রা। 'দৃশ্যটা দেখে আমি আপনার ভক্ত হয়ে গেছি, সিনর। আমরা বন্ধু হতে পারি, তাই না? চলুন না, প্লীজ আমার সাথে বসে দু'ঢোক খাবেন?'

'আপনি দেখছি ভারি নাছোড়বান্দা,' দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছ থেকে সুটকেসটা হাতে নিয়ে বলল রানা। কৌতূহল বোধ করছে ও। কি বলতে চায় লোকটা? 'বেশ, চলুন। তবে দু'মিনিটের মধ্যে সারতে হবে আপনাকে। আমার কামরায়।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলে পথ দেখিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ডন হোমায়রা। 'দু'মিনিটই যথেষ্ট, সিনর।'

কাঠের দোতলা। করিডরের শেষ মাথার দরজাটা খুলে নিজের কামরায় ঢুকল রানা, পিছু পিছু ডন হোমায়রা। কামরাটা তন্দুরের মত গরম, যদিও সিলিঙে একটা ফ্যান ঘুরছে ফুলস্পীডে।

'মেক্সিকোর এদিকটায় ভদ্রলোকেরা খুব কমই আসে, সিনর,' দুটো চেয়ারের একটায় বসল ডন হোমায়রা। 'এয়ারকন্ডিশনিঙের তেমন কদর নেই। তবে আমার স্যুইটে এয়ারকুলার আছে।'

বসল না রানা, একটা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিচু টেবিল থেকে গ্লাস আর বরফের পাত্রটা নিজের দিকে টেনে নিল ডন হোমায়রা। দুটো গ্লাসে বরফ আর পানি ঢালল সে।

'প্লীজ, সিনর রড!' টেবিলের দিকে চলে আসার ইঙ্গিত করল রানাকে।

'আপনি যদি বসতে চান তো বসুন, মি. হোমায়রা,' বলল রানা। 'আমি শাওয়ারটা সেরে নিই।'

সানন্দে মাথা ঝাঁকাল ডন হোমায়রা। 'অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই।'

জ্যাকেটটা খুলল রানা, আগ্রহের সাথে হোলস্টার আর পিস্তলটা দেখল ডন হোমায়রা। ভাবল, বোঝা গেল কর্তৃত্বের উৎসটা কি। সবই তার প্ল্যানের অনুকূলে।

নাগালের কাছাকাছি পিস্তলটা রাখল রানা। ডন হোমায়রা লোকটাকে

প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়নি বটে, কিন্তু লোকটা যে ধনী তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর ধনীরা গরীবদের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা ও বিবেচক হয়, অন্তত নিজের ভাল বোঝার ক্ষেত্রে। হুট করে কিছু একটা করে বসবে, তেমন লোক না হবারই কথা।

বাথরুমে ঢুকে দিগম্বর হলো রানা, শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল, দরজাটা বন্ধ করেনি। আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে ও, ডন হোমায়রার মাথা আর গলা দেখতে পাচ্ছে। লোকটা বাথরুমের দিকে তাকিয়ে আছে, টেবিলে রাখা পিস্তলের দিকে নয়। দু'জন যদি একই সময়ে লাফ দেয়, রানাই আগে ওটার নাগাল পাবে।

'আপনাকে একটা পরামর্শ দিই, সিনর,' চেয়ার থেকে বলল ডন হোমায়রা। 'এদিকে যতদিন থাকবেন, পানির বদলে বিয়ার বা হুইস্কি খাবেন। তা না হলে জীবাণু আপনার বারোটা বাজিয়ে দেবে। বোতলের পানি খেতে পারেন, কিন্তু সব সময় পাবেন না।'

শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা, একটা তোয়ালে কোমরে, আরেকটা দিয়ে মাথার চুল মুছছে। ডন হোমায়রার দিকে পিছন ফিরে ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে দাঁড়াল ও। মান্ধাতা আমলের একটা ট্রেন হুইসেলের ভোঁতা আওয়াজ তুলে কাছ থেকে দূরে চলে গেল, পাহাড় থেকে ফিরে আসতে লাগল প্রতিধ্বনিগুলো। স্টেশনের দিকে কালো ধোঁয়া দেখা গেল, অলসভঙ্গিতে আকাশ পাড়ি দিচ্ছে।

পানির গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ডন হোমায়রা বলল, 'আপনার জন্যে একটা কাজের প্রস্তাব আছে, সিনর রড।'

'কি ধরনের কাজ?' কৌতুক বোধ করল রানা। লোকটা তাহলে ওর পরিচয় জানে না।

'হারমোজার কাছে আমার পুরানো খনিটা আবার খুলেছি,' বলল ডন হোমায়রা। 'উত্তরের পাহাড়ী শহর হারমোজা, সিয়েরা মাদ্রের নিচে, আমেরিকান সীমান্তের কাছাকাছি। হারমোজা আর আশপাশের এলাকা ভারি দুর্গম। চাষাগুলোকে পশুই বলতে পারেন আপনি, আর খনিতে যারা কাজ করে, ইন্ডিয়ানরা...' বিরক্তিসূচক ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ডন হোমায়রা। 'পরের মুখে শুনে কাজ কি, নিজের চোখেই তো সব দেখতে পাবেন। আমার আসলে রাশভারি একজন লোক দরকার, সিনর। দেখলেই শ্রদ্ধা জাগে মনে, ভয় লাগে, নত হয়ে আসে মাথা, এমন একজন লোক। কাজ? তেমন কিছুই নয়, শুধু দেখতে হবে শৃঙ্খলা বজায় থাকছে কিনা। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো, সিনর?'

অদ্ভুত লোক তো, ভাবল রানা। 'তা এই মুহূর্তে কে আপনার শৃঙ্খলা বজায় রাখছে, মি. হোমায়রা?'

'আহ্, সে-কথা আর বলবেন না! ভাল এক লোক ছিল, সে-ও আমেরিকান, অত্যন্ত শক্তিশালী, অত্যন্ত লম্বা। আমেরিকায় ফেরার কোন ইচ্ছেও তার ছিল না, পুলিসের সাথে ঝামেলা বাধিয়ে পালিয়ে এসেছিল কিনা।

কিন্তু মন্দ ভাগ্য আমার, দুঃখজনক একটা দুর্ঘটনায় তাকে আমি হারালাম। আবার মন্দ ভাগ্যই বা বলি কি ভাবে, তাকে হারিয়েছি ঠিক, কিন্তু আপনাকে তো পেলাম!'

'এককথায়,' বলল রানা, 'আমাকে আপনি পাননি।'

হাসল ডন হোমায়রা। 'আপনার এই জিনিসটা, সিনর, আমার ভাল লাগল—এরইমধ্যে আপনি আমার বাচনভঙ্গি রপ্ত করে নিয়েছেন। দাঁড়ান, এখনও আপনি আমার টার্মস সম্পর্কে শোনেননি। ছ'মাস পাবেন পাঁচ-ছয়ে ত্রিশ হাজার ডলার, নিখাদ সোনায়। বছরের বাকি সময়টা প্রতি মাসে দশ হাজার ডলার, সে-ও ওই নিখাদ সোনায়। কি, লোভনীয় নয়, সিনর?'

কথাগুলো শোনার ধৈর্য হওয়ায় নিজের প্রশংসা করল রানা। খুব আগ্রহের সাথে পাল্টা একটা প্রস্তাব দিল ও, 'মেক্সিকোর এদিকটায় আগে কখনও আমি আসিনি, মি. হোমায়রা। যে ক'টা দিন থাকব আমার একটা চাকরি করবেন, প্লীজ? কাজ? তেমন কিছুই নয়, চারদিকটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবেন আমাকে, ছোটখাট দু'একটা ফাই-ফরমাশ খাটবেন। বেতন?' অমায়িক হাসল রানা। 'আপনি যা চান, যুক্তিসঙ্গত যে-কোন একটা অঙ্ক। কি, লোভনীয় নয়, সিনর?'

ডন হোমায়রার কালো চোখে লালচে আগুন জ্বলে উঠল। এবড়োখেবড়ো কাটা দাগটা, এতক্ষণ লক্ষ করেনি রানা, হঠাৎ যেন ডান চোখের নিচে থেকে চিবুক পর্যন্ত চামড়া ফুঁড়ে জেগে উঠল। বুক পকেট থেকে লম্বা একটা চুরুট বের করল ডন হোমায়রা, ধরাল সেটা। তার হাত কাঁপছে। আবার যখন মুখ তুলে তাকাল সে, সম্পূর্ণ শান্ত দেখাল তাকে। 'আমি জানি, আপনি আমাকে অপমান করতে চাননি, সিনর। আমি আরও বুঝতে পারছি, মেক্সিকোর ধরন-ধারণ, বিশেষ করে মেক্সিকোর এই এলাকার ধরন-ধারণ সম্পর্কে জানা নেই আপনার।' আলতোভাবে চুরুটে টান দিল সে, যেন আদর করে সস্নেহে চুমো খাচ্ছে। 'যদি কিছু চাই, সিনর রড, সাধারণত সেটা পাই আমি। আমাদের এখানে একটা প্রবচন চালু রয়েছে—অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে অবশ্যই তৈরি থাকতে হবে তোমাকে। বেশ, আপনার বেতন আমি দ্বিগুণ করে দিলাম। তাহলে সে-কথাই রইল, কেমন? আমার সাথে হারমোজায় যাচ্ছেন আপনি। এটাই আমার ফাইনাল অফার।'

'থ্যাঙ্কস, বাট, নো থ্যাঙ্কস,' নরম সুরে বলল রানা। 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন আমি বলেছিলাম দু'মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না।'

ছড়ি হাতে চেয়ার ছাড়ল ডন হোমায়রা। 'এটাই কি আপনার শেষ কথা, সিনর?'

'হ্যাঁ, প্রথম কথাও তাই ছিল।' মৃদু হাসল রানা। 'দুঃখিত, কেউই আমরা পরস্পরের চাকরি করতে পারলাম না।'

দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেল ডন হোমায়রা। 'দুঃখিত আমিও, সিনর রড, দুঃখিত আমিও।'

করিডর পেরিয়ে এসে পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল ডন হোমায়রা,

চওড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল লবিতে, সেখান থেকে বেরিয়ে গেল হোটেলের বাইরে, গভীর চিন্তায় মাথাটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। দেখল বেঞ্চে বসে আগন্তুকের সাদা গাড়িটা পাহারা দিচ্ছে বুড়ো আমেরিকান, হাতে মদের একটা ছোট বোতল। তার মানে পাঁচ ডলার থেকে এরইমধ্যে কিছু খরচ করে ফেলেছে।

'ওহে, ট্যালবট, যদি ভেবে থাকো তোমাকে আমি চিনতে পারিনি তাহলে ভুল করবে। তোমার বোধহয় দুঃসময় যাচ্ছে, তাই না?'

চেহারায় তিক্ততা নিয়ে মুখ তুলল বুড়ো ট্যালবট। 'তাতে আপনার কি?'

'দেখো বন্ধু, বেয়াড়াকে শিক্ষা দেয়া, অশিষ্টকে ভদ্রতা শেখানোই আমার কাজ।' হাসছে ডন হোমায়রা। 'তবে কি জানো, অতীতের কথা আমি মনে রাখতে চাই না। যা হবার হয়েছে, ইচ্ছে করলে আবার তুমি খনিতে কাজ করার জন্যে আমার সাথে হারমোজায় যেতে পারো।'

'ওটাকে কাজ বলে না, মি. হোমায়রা। বলে ক্রীতদাসত্ব।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডন হোমায়রা। 'উপকার করতে চাইলাম, এখন তোমার ইচ্ছে। ভাল কথা, সিনর রড লোকটা আসলে কে বলো তো?'

'রড?' ভাবশূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ট্যালবট। 'আমি কোন রডকে চিনি না।'

'খানিক আগে যার সাথে কথা বলছিলে তুমি। গাড়িটার মালিক। কে ও? ওর খেলাটা কি?'

'আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাস্তা পেরোল ডন হোমায়রা, পার্কের কিনারায় একটা বেঞ্চে দু'জন লোককে বসে থাকতে দেখে সেদিকেই এগোল সে। লোক দু'জন একটা বোতল থেকে পালা করে মদ খাচ্ছে, দু'জনের হাতেই সস্তা সিগারেট। একজন বিশালদেহী ইন্ডিয়ান, কদাকার চেহারা, জ্যাকেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে থলথলে চর্বি। দ্বিতীয় লোকটা ছোটখাট মেক্সিকান, চেহারায় ক্লান্তির স্থায়ী ছাপ, বাদামী রঙের গ্যাবার্ডিন স্যুট পরে আছে, সারা মুখে বসন্তের দাগ। কে আসছে চিনতে পেরে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে দাঁড়াল সে, মদের বোতল আর সিগারেট লুকিয়ে ফেলল পিছনে, স্যুটের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছল দ্রুত। 'ডন হোমায়রা!'

'আহ্, আমার প্রিয় বন্ধু, সার্জেন্ট মানটু!' তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে, বুড়ো ট্যালবটের দিকে তাকাল ডন হোমায়রা। 'ভাবছি আমার একটা উপকার করার সুযোগ তুমি নেবে কিনা।'

সাগ্রহে মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট মানটু। 'শুধু বলে দিন কি করতে হবে, সিনর। বলেন তো নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে দিতে পারি।'

মানটুর পিঠ চাপড়ে দিল ডন হোমায়রা। 'আমি জানতাম! আমি জানতাম!'

বিশ মিনিট পর, মাথায় তিন বালতি পানি ঢালা শেষ হতে, জ্ঞান ফিরে পেতে শুরু করল ট্যালবট। মুখের একটা দিক, চোখ থেকে চোয়াল পর্যন্ত ব্যথা

করছে। থানার একটা সেলে, মেঝেতে পড়ে রয়েছে সে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ডদেহী ইন্ডিয়ান লোকটা। ট্যালবটের মনে পড়ল, সার্জেন্ট মানটু কথা দিয়েছিল তার গায়ে সে হাত তুলবে না। কারণ, কাউকে মারতে গেলে হাত নয়, পা চলে তার।

দ্বিতীয়বার চোখ মেলে সার্জেন্ট মানটুকে সেলের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার। 'কেন, আমাকে সেলে আনা হয়েছে কেন?' ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠল বুড়ো। 'আমার অপরাধ কি?'

'অপরাধ, তুমি একটা বোকা,' সহাস্যে বলল সার্জেন্ট মানটু।

'আমি একজন আমেরিকান। আমাকে সেলে আটকে রাখার কোন অধিকার নেই আপনার।'

'আমাদের চাল-চলন যদি তোমার এতই অপছন্দ, আমেরিকায় চলে যাচ্ছ না কেন? তুমি বললে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি, তুলে দিতে পারি মার্কিন পুলিসের হাতে।'

চুপ করে থাকল ট্যালবট। শুধু মুখ নয়, শরীরের একটা পাশও ব্যথা করছে তার।

'তুমি এখানে, তার কারণ ওখানে ফিরে গেলে পনেরো বছর জেল খাটতে হবে, তাই না?' খ্যাক খ্যাক করে হাসল সার্জেন্ট মানটু।

ট্যালবটের দিকে সামান্য এগিয়ে এল বিশালদেহী ইন্ডিয়ান, পা দিয়ে নাগাল পাবার জন্যে।

'একটা ব্যাপারে সত্যি আমি দুঃখিত,' গোঁফে তা দিয়ে বলল সার্জেন্ট মানটু। 'আমি তোমার গায়ে হাত তুলিনি, কারণ আমার হাত নয়, পা চলে। দুঃখের বিষয় হলো, আমার ইন্ডিয়ান সহকারীরও ওই একই অভ্যেস। শুধু লাথি মারতে জানে।'

গড়িয়ে ইন্ডিয়ান লোকটার কাছ থেকে সরে গেল ট্যালবট, ফলে সার্জেন্টের কাছাকাছি চলে এল সে।

তার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে মানটু বলল, 'আমি চাই এবার তুমি চালাক হবে। বুদ্ধিমান হওয়া তোমার জন্যে লাভজনক, বুঝতে পারছ না?'

'আমাকে যেতে দিন, প্লীজ! আমি তো কারও সাতে-পাঁচে থাকি না, সার্জেন্ট।'

'সেটাই তোমার অপরাধ। এই এলাকায় থাকতে হলে সাতে-পাঁচে জড়াবে না, তা কি হয়! এবার বলো...তুমি জানো কি জানতে চাই আমি।'

মাথা নাড়ল বুড়ো। 'ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

'জানো না, নাকি জানলেও বলবে না?' জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট মানটু।

চুপ করে থাকল ট্যালবট। আড়ষ্টভঙ্গিতে মাথা নাড়ল শুধু।

কিছু বুঝতে না দিয়ে ঝেড়ে একটা লাথি মারল মানটু, ছিটকে ইন্ডিয়ানের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল ট্যালবট। ইন্ডিয়ানের লাথি খেয়ে আবার সে ফিরে এল সার্জেন্টের কাছে। একটা করে লাথি খায় বুড়ো, ফোঁস করে সব বাতাস বেরিয়ে যায় ফুসফুস থেকে। গলা থেকে আওয়াজ বেরোয় না, শুধু গোঙায়।

'আহ্, করো কি তোমরা!' দরজা খুলে সেলে ঢুকল ডন হোমায়রা। 'এভাবে কেউ কাউকে মারে? ও আমার পুরানো লোক, খনিতে এক সময় কাজ করত—সরো, দেখি আমি ওর কোন উপকারে আসি কিনা। ট্যালবট, মাই ফ্রেন্ড?'

বুড়োর শরীর মোচড় খাচ্ছে, জবাব দেয়ার শক্তি নেই তার।

'লোকটা যদি মারা যায়,' সার্জেন্ট মানটুকে চোখ রাঙাল ডন হোমায়রা, 'আগামী উৎসবে তোমার কপালে নতুন কাপড় নেই।'

একগাল হাসল মানটু। 'আপনি বললে এখুনি ওকে আমি বাঁচিয়ে তুলতে পারি, সিনর।' ট্যালবটের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। 'ওহে, শুনতে পাচ্ছ? এখনও কি তুমি বোকা থাকতে চাও?'

অসহায় বুড়ো মাথা নাড়ল।

'ধরে নিতে পারি, তোমার সুমতি হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল ট্যালবট। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রক্তাক্ত মুখটা মুছল সে।

'শোনো তাহলে। সিনর হোমায়রা তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। উনি তোমার উপকার করতে এসেছেন, বুঝলে। এ এক ধরনের বিনিময় ব্যবসা। তুমি ঠিক ঠিক জবাব দেবে, আমরা তোমাকে রেহাই দেব। ঠিক আছে তো?'

আবার মাথা ঝাঁকাল ট্যালবট। সহ্যের শেষ সীমায় অনেক আগেই পৌঁছে গেছে সে।

'চমৎকার,' বলে সেলের একমাত্র চেয়ারে ধীরে ধীরে বসল ডন হোমায়রা। 'তাহলে শুরু করা যাক আবার। এই লোকটা, যার নাম পিটার রড। কে সে?'

জানালার পর্দা উড়ছে, গরম বাতাসের সাথে ভেতরে ঢুকছে মিহি ধুলো। ঘরের ভেতর গুমোট একটা ভাব, দুনিয়া জুড়ে সস্তা হোটেল কামরায় যেমন থাকে, যেন কেউ কোন কালে এখানে বাস করেনি। মাথার পিছনে হাত দিয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছে রানা, ঢং ঢং করে বাজছে গির্জার ঘণ্টা। চোখ বুজল রানা, মনে মনে জিজ্ঞেস করল, এখানে কি করছি আমি?

সও মং বান্না বেলাডোনা, মলিয়ের ঝান, পিয়েরে ল্যাচাসি, রিটা হ্যামিলটন এবং রাহাত খান, এক এক করে সবার কথা মনে পড়ে গেল ওর। উ সেনের মেয়ে বান্না সও মং মারা যাবার পর স্বভাবতই ও ধরে নিয়েছিল হার্মিস ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন সাবধান করে দিলেও তেমন গায়ে মাখেনি। তারপর ঢাকা থেকে টেলিফোন করলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পরামর্শ দিলেন তিনি। রানার প্ল্যান ছিল রিটা হ্যামিলটনকে নিয়ে কোথাও ছুটি কাটাতে যাবে, গা ঢাকা দেয়ার পরামর্শ ভাল লাগেনি ওর। কিন্তু অফিশিয়াল নির্দেশ, অমান্যও করতে পারেনি। চেহারা যতটা সম্ভব বদলে আমেরিকাতেই থেকে যায় ও। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে টের পেয়ে যায়, বান্না সও মং সহ নেতৃস্থানীয় কয়েকজন মারা গেলেও, আমেরিকার প্রতিটি রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা হার্মিসের

শাখাগুলো ওর খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে। সি.আই.এ.-র কথা জানা না গেলেও, প্রমাণ পাওয়া গেল এফ.বি.আই. আর ফেডারেল পুলিস বাহিনীতে হার্মিসের নিজস্ব লোক আছে। একটু দেরিতে হলেও, রানা উপলব্ধি করল কেন তাকে গা ঢাকা দিতে বলেছেন বস্।

পালানো ছাড়া পথ দেখল না রানা। নিউ অর্লিয়ান্সে একটুর জন্যে, বলতে গেলে ভাগ্যের জোরে, ধরা পড়েনি ও। প্ল্যান করার সময় পায়নি, টেক্সাস হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছে মেক্সিকোয়। এখানে পৌঁছুনোর পর দেখা যাচ্ছে এদিকেও ওর খোঁজ করেছে হার্মিস।

পালিয়ে বেড়ানো স্বভাব নয় রানার। বসের কথায় গা ঢাকা দিতে রাজি হয়েছিল, ব্যাপারটাকে সাময়িক ও রণকৌশল হিসেবে ধরে নিয়ে। কিন্তু এখন দেখছে, পালানো কোন সমাধান নয়। বিপদের স্বভাব পিছু ধাওয়া করা, বাঁচার একমাত্র উপায় রুখে দাঁড়ানো।

কাজেই আর কোথাও যাচ্ছে না রানা। নিজের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে, সে ভয়ে অস্থির হতেও রাজি নয় সে এখন। যা থাকে কপালে, মেক্সিকোর এই অনুন্নত এলাকাতেই হার্মিসের জন্যে অপেক্ষা করবে। আসে যদি তো আসুক ওরা, সে-ও তৈরি। আর যদি না আসে, সময় কাটানো কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। এরই মধ্যে রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা, গোলযোগ আর অন্যায়-অত্যাচার ওর চোখের কোণে ধরা পড়েছে। চিকিৎসার প্রয়োজন এমন কিছু রোগ সব সমাজেই থাকে, ডন হোমায়রা সম্ভবত সে-ধরনেরই একটা দুষ্ট ক্ষত। দেখা যাক। ওর ধারণা যদি সত্যি হয়, দাওয়াই দেয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

দরজায় নক হলো। ঘণ্টাখানেক হলো বোতলের পানি চেয়েছিল রানা। সম্ভবত বেলবয় এসেছে। সার্ভিস বটে! 'ঢুকে পড়ো,' বলল ও। 'দরজা খোলাই।'

বেলবয় নয়, মুখে বসন্তের দাগ নিয়ে ক্লান্ত চেহারার এক ছোটখাট লোক ঢুকল ভেতরে। 'পুলিস, সিনর,' বলল সে। 'আমি সার্জেন্ট মানটু। আপনার পাসপোর্টটা দেখতে পারি, প্লীজ?'

টেবিলের ওপর রাখা কোল্ট অটোমেটিকটার দিকে চট্ করে একবার তাকাল রানা, নাগালের বাইরে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সার্জেন্টও তাকাল সেদিকে।

বিছানা থেকে স্যাঁৎ করে পা নামাল রানা, সিধে হয়ে দাঁড়াল মেঝেতে। সরে টেবিল আর ওর মাঝখানে চলে এল সার্জেন্ট। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, খাকি ইউনিফর্ম দেখা গেল আরও কয়েকটা। হ্যাঙ্গারে টাঙানো জ্যাকেটের সামনে এসে দাঁড়াল ও, পকেট থেকে বের করল পাসপোর্টটা।

রানার হাত থেকে সেটা নিয়ে পাতা ওল্টাল সার্জেন্ট মানটু। নির্লিপ্ত চেহারা। মুখ তোলার পর দেখা গেল তার চোখে কঠোর দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে দিয়ে করিয়েছেন, সিনর? পুরো টাকাটাই জলে গেছে। যাকে দিয়েই করিয়ে থাকুন, পাসপোর্ট জাল করা তার নতুন পেশা।'

'বাজে কথা বলবেন না···,' শুরু করল রানা।

বাধা দিল সার্জেন্ট, 'প্লীজ, সিনর। এখানে কোন কথা নয়। আমাদের সাথে আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।'

'ব্যাপারটা কি নিয়ে ব্যাখ্যা করবেন কি?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

বুক টান টান করল মানটু, ফলে ফাঁক হয়ে গেল জ্যাকেট, হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে হাতে নিল সে। 'কোন রকম চালাকি নয়, কেমন, সিনর? হোটেলটার সুখ্যাতির কথা ভাবতে হবে, তাই না?' টেবিলের দিকে পিছিয়ে গেল সে, হোলস্টার থেকে বের করে রানার কোল্টটা নিজের পকেটে ভরল। 'আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। ইচ্ছে করলে আপনারটায় চড়েও থানায় যেতে পারেন আপনি, আপনাকে অনুসরণ করবে আমার ড্রাইভার। কথাটা বলছি, কারণ, আপনার গাড়িটা হোটেলের সামনে অযত্নে পড়ে আছে। বুড়ো ট্যালবট ওটার ওপর নজর রাখছিল, তাই না? সে এখন জেলে, সিনর। আপনার মত সে-ও, সিনর, সীমান্ত পেরিয়ে আমেরিকায় যেতে চায় না।'

দুই

থানার সামনে খোলা উঠান, একদল অশ্বারোহী পুলিস ব্যায়ামে ব্যস্ত। সাদা শেভ্রোলে নিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, পাশে সার্জেন্ট মানটু। কোন প্রশ্ন করা হয়নি, সম্ভবত রানার চোখে বিস্ময় লক্ষ করে কথাটা বলল সার্জেন্ট, 'দুর্গম এলাকা, সিনর। অনেক দেন-দরবার করে অশ্বারোহী পুলিস আনানো হয়েছে। রেললাইনের পাশে রাস্তা আর কতটুকু, ট্রেন-ডাকাতদের পিছু নেয়ার জন্যে গাড়ি তেমন কোন কাজে আসে না।'

উঠানের একধারে গাড়ি থামাল রানা, ওর সামনে একটা হাত পাতল সার্জেন্ট। ট্রাঙ্কের চাবি বাদ দিয়ে রিঙ থেকে শুধু ইগনিশন কী-টা বের করছে রানা, বাধা দিল সে। 'দুটোই নেব আমি, সিনর, ইফ ইউ প্লীজ।'

বাড়াবাড়ি না করাই ভাল, ভাবল রানা। ট্রাঙ্কের ভেতর এমন কিছু আছে, ওদিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত হবে না।

সাদা চুনকাম করা করিডরে কাঠের লম্বা একটা বেঞ্চ, বসতে বলা হলো রানাকে। পাহারায় থাকল বিশালদেহী এক ইন্ডিয়ান। খোলা জানালা দিয়ে অশ্বারোহীদের দেখতে পেল রানা, কমান্ডারের হেঁড়ে গলার হাঁক-ডাক ভেসে আসছে। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, বসে থাকতে থাকতে রানাও পালানোর কৌশল নিয়ে ভাবছে। এখনও বোঝা যাচ্ছে না পুলিস কতটুকু ঝামেলা বাধাবে, তবে যদি শেষ পর্যন্ত পালাতেই হয় ওকে, গাড়িটা ফেলে যাবে না। প্রথমে দরকার হবে চাবি, সেটা ফেরত না পেলে তার জোড়া দিয়ে এঞ্জিন চালু করবে। পরবর্তী সমস্যা, উঠান থেকে গাড়িটাকে বের করা। এক এক করে বোকামিগুলো ধরা পড়ল। উঠানে না এনে, গাড়িটাকে রাস্তায় রেখে

আসা উচিত ছিল। উচিত ছিল দ্বিতীয় এক সেট চাবি থাকা, বাম্পারের নিচে।

গাড়িটায় কেউ হাত দিচ্ছে কিনা দেখা দরকার, উঠে দাঁড়াল রানা। কাঁধে আধ মণ ওজনের চাপ পড়ল, ভারী হাতের ঠেলায় আবার ওকে বসিয়ে দিল ইন্ডিয়ান লোকটা।

'কোন্ সাহসে তুমি আমার গায়ে হাত দিলে?' বৃথাই বলল রানা, লোকটা ওর কথা বুঝল না। 'জানো, ইচ্ছে করলে তোমার মত দু'চারটেকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিতে পারি?' প্রতিপক্ষের গম্ভীর চেহারায় কোন ভাবান্তর ঘটল না।

করিডরের শেষ মাথা থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এল। কোণ থেকে উঁকি দিল সার্জেন্ট মানটু, হাতছানি দিয়ে ডাকল রানাকে। তার পিছু পিছু অনেকগুলো দরজা পেরোল ও, পিছনে থপ্ থপ্ আওয়াজ তুলে ইন্ডিয়ানটা আসছে। অবশেষে একটা দরজার ভেতর ঢুকে থামল ওরা। একপাশে সরে দাঁড়াল সার্জেন্ট মানটু।

অফিসটায় দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল, মেঝেতে বেতের তৈরি মাদুর। বিলাস উপকরণ বলতে মান্ধাতা আমলের একটা সিলিং ফ্যান ঘুরছে মাথার ওপর।

টেবিলের পিছনে বসা লোকটা তরমুজ খাচ্ছিল, তার ঘন কালো চওড়া গোঁফে এখনও তরমুজের লাল বিচি আটকে রয়েছে। টেবিলের ওপর আধ খাওয়া ফলটায় ভন্ ভন করছে মাছি। লোকটার পরনে খাকি ইউনিফর্ম, বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি হবে না, মাথাভর্তি টাক। রানাকে দেখে হাসল লোকটা, সবগুলো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

'আমি দুবালিয়র পেরন, চীফ অভ পুলিস,' ইংরেজীতে বলল সে। 'প্লীজ সীট ডাউন, সিনর রড।' তার সামনে টেবিলের ওপর রানার মানিব্যাগ আর পাসপোর্ট রয়েছে।

'জানতে পারি আসলে কি ঘটছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। ধীরে ধীরে খালি চেয়ারটায় বসল, শিরদাঁড়া খাড়া।

মার্জিত ভঙ্গিতে মৃদু মাথা ঝাঁকাল চীফ অভ পুলিস দুবালিয়র পেরন। 'আমাদের বেশিরভাগ সমস্যাই টাকা নিয়ে,' বলল সে। 'এখানেও তাই দেখতে পাচ্ছি।' আবার মাথা ঝাঁকাল সে, এবার সার্জেন্ট মানটুর উদ্দেশে।

সার্জেন্ট মানটু কালো একটা সুটকেস রাখল টেবিলের ওপর, তারপর ঢাকনি খুলল। ভেতরে ডলারের অনেকগুলো বান্ডিল সাজানো রয়েছে।

'বত্রিশ হাজার ডলার, সিনর রড। বলাই বাহুল্য, আমেরিকান ডলার। আপনার গাড়ির ট্রাঙ্কে পাওয়া গেছে।'

'শালা!' বেআইনী কাজ, কাজেই বিড়বিড় করে গালটা নিজেকেই দিল রানা। হোগার্থ প্রিন্ট বিক্রি করে মলিয়ের ঝানের কাছ থেকে মোটা টাকা পেয়েছিল, সবই রিটা হ্যামিলটনের মাধ্যমে সি.আই.এ.-কে ফেরত দিয়েছিল ও। কিন্তু রিটা সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারের সাথে টেলিফোনে কথা বলার পর টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যায় রানাকে, সি.আই.এ. চীফ কলিন ফর্বস নাকি

পুরো দশ লক্ষ ডলারই ওর ফী হিসেবে রাখতে বলেছেন। বসের অনুমতি নিয়ে এক লক্ষ ডলার নিজের খরচের জন্যে রাখে রানা, বাকি টাকা ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়। গাড়ি, পাসপোর্ট, ইত্যাদি খাতে খরচ হবার পর ওই বত্রিশ হাজার ছিল, এখন তাও গেল। শুধু গেলে কথা ছিল না, জটিল এই ঝামেলা থেকে উদ্ধারের পথ কি?

'বলবেন কি, সিনর রড, এই টাকা আপনি কিভাবে আয় করলেন?'

'আমার এক কাকা তিনমাস হলো মারা গেছেন, আমার জন্যে ক্যানসাসে ছোট্ট একটা ফার্ম রেখে গেছেন তিনি। আমি সেটা বিক্রি করে দিয়েছি।' অবলীলায় মিথ্যে বলে গেল রানা।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা ছুরি দিয়ে নখের ময়লা বের করছে সার্জেন্ট মানটু। স্থির হয়ে গেল সে, মুখ তুলে তাকাল। চেয়ারের পিছনে ইন্ডিয়ান লোকটার উপস্থিতি সম্পর্কেও রানা সচেতন। মাথার ওপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছে ফ্যানটা।

দুবালিয়র পেরন বলল, 'এ-দেশে ফরেন কারেন্সি আনতে হলে সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়, জানেন তো, সিনর রড?'

'তাই নাকি!'

'আশ্চর্য! আপনার পাসপোর্ট বলছে, আপনি সোলেরনা সীমান্ত দিয়ে মেক্সিকোয় ঢুকেছেন। যদি ঘোষণা করতেন সাথে টাকা আছে তাহলে ওখানকার কাস্টমস্ অফিসাররা আইনটা জানিয়ে দিত আপনাকে।'

রানা নিরুত্তর। নিস্তব্ধতা নেমে এল কামরার ভেতর। নখ পরিষ্কারের কাজ শেষ করল সার্জেন্ট, ছুরিটা বন্ধ করে পকেটে ভরল। একটা বিউগল বেজে উঠল বাইরে। কাঁকর ছড়ানো উঠান থেকে প্লাজায় বেরিয়ে যাচ্ছে অশ্বারোহীরা।

রানা কিছু বলবে তার অপেক্ষায় রয়েছে পুলিস চীফ। 'ছোট্ট একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার,' বলল ও। 'সত্যি আমি দুঃখিত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রাপ্য ট্যাক্স দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'কিন্তু জরিমানার একটা ব্যাপার আছে,' দুবালিয়র পেরন বলল।

'বেশ তো, অভিজ্ঞতার বিনিময়ে নাহয় কিছু জরিমানাও দিলাম।'

'সত্যি আমি দুঃখিত, সিনর, এখন আর তা সম্ভব নয়,' শান্তভাবে বলল পেরন। 'এ-ধরনের কেসে সাধারণত পুরো টাকাটাই বাজেয়াপ্ত করা হয়, এবং তারপরেও জরিমানার প্রশ্নটা থাকে।'

টাকাটা যদি সরকার বাজেয়াপ্ত করে, বলার কিছু থাকে না রানার। কিন্তু মেক্সিকোর পুলিস অফিসাররা কি পরিমাণ দুর্নীতিপরায়ণ জানা আছে ওর, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। চীফ অভ পুলিস পেরন হয়তো পুরো টাকাটাই নিজে মেরে দেয়ার পাঁয়তারা কষছে। সেক্ষেত্রেও ওর তেমন কিছু করার আছে বলেও মনে হয় না। যাই ঘটুক না কেন, শান্ত থাকতে হবে ওকে। 'জরিমানা কত হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আপনার বেলায় প্রশ্নটা জটিল, সিনর। কারণ, বুঝতেই পারছেন, শুধু

টাকা নয়, একটা ফায়ারআর্মসের অস্তিত্ব সম্পর্কেও জানতে পেরেছি আমরা। আপনার গাড়ির পিছনের সীটের তলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের আইনের আরও একটা গুরুতর লঙ্ঘন। অস্ত্রটা তো বাজেয়াপ্ত হবেই, সেই সাথে গাড়িটাও।'

পেরনের শেষ কথাটা রানার দুই ভুরুর মাঝখানে ঘুসির মত আঘাত করল। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল ও, বলল, 'কেন? গাড়ির বৈধ কাগজ-পত্র রয়েছে আমার কাছে।'

'গাড়ির বৈধ কাগজ-পত্র থাকলে কি হবে, আমাদেরকে জানতে হবে আপনার নিজের কাগজ-পত্র বৈধ কিনা। বেশ বুঝতে পারছি, নিজের বিপদ সম্পর্কে আপনি এখনও পুরোমাত্রায় সচেতন নন, সিনর রড।'

'তারমানে?' পাসপোর্টটা তাড়াহুড়োর মধ্যে সংগ্রহ করতে হয়েছে রানাকে! জাল বটে, কিন্তু প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব

'আপনারই মত একজন আমেরিকান, সিনর। এই মুহূর্তে আমাদের সেলে বন্দী রয়েছে। সে জোর দিয়ে বলছে, আপনার নাম পিটার রড নয়। খুব অবাক হচ্ছেন কি, সিনর?'

অবাক হবার ভান করল রানা। 'কেন, আপনি আমার পাসপোর্ট দেখেননি?'

'পাসপোর্ট, সিনর, কিনতেও পাওয়া যায়। তবে, হ্যাঁ, জানি গোটা ব্যাপারটাই উদ্ভট। বুড়ো লোকটা এক নম্বর মাতাল, পাগল-ছাগলের মত কি বকে না বকে। তার ধারণা আপনার আসল নাম নাকি মাসুদ রানা, সম্প্রতি কয়েকজনকে খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার আরও ধারণা, কিছু লোক আপনাকে গরুখোঁজা করছে।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা। 'খুব মজার লোক তো! পাগলরা কি এত সুন্দর গল্প সাজাতে পারে? জেসাস!'

'বললাম না, বদ্ধ মাতাল।' ম্লান একটু হাসল দুবালিয়র পেরন। 'সমস্যার সমাধানে আমি তো কোন বাধা দেখছি না,—তবে, সিনর, তার আগে আমরা উত্তরের বন্ধুদের সাথে কথা বলব। চেক করার পর যদি দেখি সব ঠিক আছে তাহলে একটা আপোস মীমাংসায় আসা কঠিন হবে না। তার আগে পর্যন্ত আপনাকে আমাদের কাস্টডিতে থাকতে হবে, সিনর রড।'

চুরুট ধরিয়ে ইন্ডিয়ান লোকটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল পুলিস চীফ। রানার কাঁধে আঙুলের টোকা দিল ইন্ডিয়ান, ইঙ্গিতে দরজাটা দেখাল। তার পিছু পিছু করিডরে বেরিয়ে এল রানা, কয়েকটা বাঁক নিয়ে এক প্রস্থ পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল, থামল লোহার একটা দরজার সামনে। পাশেই টুলের ওপর বসে আছে একজন গার্ড, খবরের কাগজ পড়ছে। ওদেরকে দেখে দাঁড়াল সে, তালা খুলল দরজার।

চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বর্গফুট জায়গা নিয়ে কামরাটা। উল্টোদিকের উঁচু দেয়ালে একটাই মাত্র ছোট্ট জানালা। বিশ-বাইশ জন কয়েদী রয়েছে। দরজা খুলতেই দুম করে নাকে বাড়ি মারল পেচ্ছাবের কড়া ঝাঁঝ, তার সাথে মিশে

আছে বদ্ধ বাতাসের গুমোট ভাব আর ঘামের দুর্গন্ধ। পিঠে ধাক্কা দিয়ে কামরার ভেতর রানাকে ঢুকিয়ে দিল ইন্ডিয়ান লোকটা ঘটাং শব্দে বন্ধ হয়ে গেল লোহার দরজা।

বেশিরভাগ কয়েদী মেক্সিকান। রুক্ষ চেহারা, লাল চোখে আহত পশুর দৃষ্টি। পরনে ছেঁড়া-ফাটা ট্রাউজার, কারও জ্যাকেটে বোতাম নেই, অনেকেই খালি গায়ে। এক কোণে দাঁড়িয়ে ট্রাউজারের বোতাম খুলে পেচ্ছাব করছে একজন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে নতুন আগন্তুকের দিকে, লজ্জা-শরমের বালাই নেই। হুড়মুড় করে ছুটে এল কয়েকজন রানাকে কাছ থেকে দেখার জন্যে। একজন ওর জ্যাকেট ধরে টান দিল। আরেকজনের একটা হাত ঢুকে গেল ওর পকেটে। কব্জিটা ধরে অনায়াস ভঙ্গিতে মোচড় দিল রানা, ঘন ঘন হোঁচট খেয়ে কামরার আরেকদিকে ছিটকে পড়ল লোকটা। বাকি সবাই ভদ্রস্থ দূরত্বে সরে গেল। বেঞ্চের ওপর টিনের একটা গামলা, পা দিয়ে সেটা ফেলে দিয়ে সেখানটায় বসল রানা, ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরাল, আশা, ধোঁয়ায় দুর্গন্ধ খানিকটা কমবে।

খালি চোখে ধরা না পড়লেও পুলিস চীফের আচরণে গভীর একটা তাৎপর্য আছে। টাকাগুলো মেরে দেয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তা যদি হত, ওকে আটকে না রেখে ছেড়ে দিত সে।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে সদ্য খালি কোণটায় আরেক লোক হাজির হলো। ট্রাউজার খুলে ওদের দিকে পিছন ফিরল সে, বসে পড়ল টিনের একটা গামলার ওপর। উৎকট দুর্গন্ধ বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়ল কামরার চারদিকে। দু'হাঁটুর মাঝখানে মুখ গুঁজল রানা।

'সিগারেটের শেষ টানটা পাব, সিনর রানা?'

মুখ তুলে রানা দেখল হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে বুড়ো আমেরিকান লোকটা। তার সারা মুখে অনেক কাটাকুটির দাগ, সবই তাজা ক্ষত। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে অনেক কষ্টে বেঞ্চের ওপর নিজেকে তুলল সে। প্যাকেট থেকে বের করে তাকে একটা সিগারেট দিল রানা। 'কি ব্যবহার করেছে ওরা, হাতুড়ি?'

'এই এলাকার অত্যাচারীদের সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই, সিনর রানা,' ব্যথা সহ্য করার জন্যে মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে কথা বলছে বুড়ো। 'সার্জেন্ট মানটু আর তার এক ইন্ডিয়ান সহকারী কাস্ত্রো, ওরা হাত দিয়ে মারতে জানে না। শুধু পা চালাতে পারে।' রানার বাড়ানো লাইটার থেকে সিগারেট ধরাল সে।

'তুমি ওদেরকে বলেছ আমি মাসুদ রানা।' অভিযোগ বা প্রশ্ন নয়, মন্তব্যের সুরে বলল রানা। বুড়োর দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও।

'ওরা আমাকে বাধ্য করেছে, সিনর। চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না, একেবারে শেষ মুহূর্তে বলেছি?'

দূর থেকে কয়েদীরা তাকিয়ে আছে রানার দিকে, ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে।

খুক্ করে কাশল বুড়ো। 'আমার নাম ট্যালবট, সিনর। আপনাকে আমি হোমায়রার সাথে কথা বলতে দেখেছি। আপনি জানেন লোকটা কে?'

হঠাৎ কামরার আরেক প্রান্তে দুই কয়েদীর মধ্যে মারামারি বেধে গেল। বক্সিং, কুস্তি, কারাতে, সব একসাথে চালাচ্ছে ওরা। বিশ-বাইশজন লোক সবাই চিৎকার জুড়ে দিল, হুটোহুটি করে কয়েক দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তারা। সটান দাঁড়াল রানা, মহা শোরগোলের মধ্যে চাবুকের মত সপাং আওয়াজ বেরিয়ে এল কণ্ঠ ফুঁড়ে। 'শাট আপ!'

কেউ বুঝল না কি মানে, কিন্তু কি চাওয়া হচ্ছে বুঝতে অসুবিধেও হলো না, মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল কামরা। যে যার জায়গায় ফিরে এসে বসল সবাই, সবার আগে যারা লড়াই করছিল। রানার দিকে তাকিয়ে আছে কয়েদীরা। অবাক কাণ্ড, পুলিস চীফও তো এমন কর্তৃত্বের সাথে কথা বলে না!

নড়েচড়ে বসল কয়েদীরা, তবে সাবধানে। কথাও বলল, একদম নিচু স্বরে।

'হ্যাঁ, কোন গোলমাল নয়,' বলে বেঞ্চের ওপর আবার বসল রানা।

'সিনর!'

'হ্যাঁ,' বুড়ো ট্যালবটের দিকে তাকিয়ে বলল রানা। 'ডন হোমায়রার সাথে আমার কথা হয়েছে। তার খনিতে আমাকে কাজ করতে বলে সে।'

'ওই লোক দু'পেয়ে বেজন্মাদের চীফ, সিনর। লেজে পুলিস বাধিয়ে আমি যখন প্রথম মেক্সিকোয় ঢুকি, হোমায়রার খনিতে দিনকতক কাজ করতে হয়েছিল আমাকে। ঈশ্বর সাক্ষী, এত খারাপ লোক নরকও নিতে চাইবে না।'

'তাকে তুমি আমার পরিচয় জানিয়ে দিয়েছ।'

'ছোট্ট একটা ভুল থেকে এতদূর গড়াল ব্যাপারটা। হোমায়রা প্রশ্ন করাতে বলেছিলাম, আমি তাকে আপনার সম্পর্কে কিছু জানাতে বাধ্য নই। জানাতে চাই না, এ-কথাটাই সব নষ্টের মূল হয়ে দাঁড়াল। হোমায়রা বুঝে ফেলল, তারমানে জানাবার কিছু আছে।'

'ফটো, ট্যালবট,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'কে এনেছিল? কাদের দেখিয়েছে?'

'লোকটা নিজের পরিচয় দিল এফ.বি.আই. বলে, সিনর। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। পরিচয়-পত্র দেখতে চাইলাম, দেখাল না। ফটোর সাথে আপনার চেহারা খুব যে মেলে তা নয়, তবে বেশ খানিকটা মেলে। লোকটা বলল, শুধু আমেরিকানদেরই দেখানো হচ্ছে, কারণ ফটোর লোকটা আমেরিকান, সাহায্যের দরকার হলে সে একজন আমেরিকানের কাছেই আসবে। এই এলাকায় আমিই একমাত্র আমেরিকান, সিনর।'

'অদ্ভুত, তাই না? শুধু আমেরিকানদের ফটো দেখানো?'

'অদ্ভুত বৈকি। ব্যাখ্যাটা মনে ধরেনি আমার, তাই তাকে পরামর্শ দিলাম সে বরং থানায় গিয়ে অফিসারদের সাথে কথা বলুক। কিন্তু গেল না। আমাকে একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে গেছে, আপনাকে চিনতে পারলে ওয়াশিংটনে ফোন করতে হবে। বিনিময়ে মোটা টাকা পুরস্কার পাব আমি।'

'ফোন করতে হবে কার কাছে?'

'জন হপকিন্স।'

নামটা মনে গেঁথে নিল রানা। সময় আর সুযোগ হলে প্রথমেই হার্মিসের বেতনভুক লোকটার ব্যবস্থা করতে হবে। 'তুমি ঠিক জানো, আর কাউকে ফটোটা দেখানো হয়নি?'

'ঠিক জানি, সিনর। স্টেশনে নেমেই আমার খোঁজ করল লোকটা, আমার সাথে কথা বলে পরবর্তী ট্রেনে চড়ে চলে গেল।'

'ধন্যবাদ, ট্যালবট। এবার তোমার কথা বলো। হোমায়রার সাথে তোমার কথা হবার পর কি ঘটল? পুলিস ধরে নিয়ে এল থানায়?'

'হ্যাঁ। দ্বিতীয় বার মারধর করছে, এই সময় সেলে ঢুকল হোমায়রা। মান্টু বলল, আমাকে মুখ খুলতে হবে, তা না হলে লাথি বন্ধ হবে না। যখন দেখলাম বাঁচব না, বলে ফেললাম। শুধু তাই নয়, হারমোজায় আবার কাজ করতেও রাজি করিয়েছে আমাকে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্যালবট। 'উপায় কি, বলুন!'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' প্যাকেটে আর একটা মাত্র সিগারেট রয়েছে, সেটা ভেঙে দু'টুকরো করল রানা, একটা ট্যালবটকে দিল। ট্যালবট সেটা তার মানিব্যাগে ভরে রাখল। 'কি হলো, রেখে দিলে যে?'

'কখন কি ঘটে, কে কোথায় ছিটকে পড়ি, আর হয়তো আপনার সাথে না-ও দেখা হতে পারে—স্মৃতি হিসেবে থাক এটা।' হাসতে গিয়ে মুখে ব্যথা পেল বুড়ো, পানিতে ভরে গেল চোখ দুটো। ওটা যে কান্না এবং শুধু ব্যথার কান্না নয়, বুঝেও না বোঝার ভান করল রানা।

'ওটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা, ট্যালবটের খোলা মানিব্যাগের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। মানিব্যাগের ভেতরে সুন্দর একটা পিকচার পোস্টকার্ড।

পোস্টকার্ডের ভাঁজ খুলল ট্যালবট। হারমোজার একমাত্র হোটেলের বিজ্ঞাপন ওটা। হোটেলের সামনে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন তাজা আর জ্যান্ত তার চেহারা যেন এখুনি কথা বলে উঠবে। মেয়েটাকে দেখামাত্র ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। ক'বছর হলো? হ্যাঁ, তা সাত কি আট বছর তো হবেই। হংকঙে পরিচয়, অল্পদিনের, কিন্তু অসম্ভব ভাল লেগে গিয়েছিল। বলা যায় না, পরস্পরের জন্যে এমনই পাগলপারা হয়ে উঠেছিল ওরা, শেষ পর্যন্ত হয়তো বিয়েই করে ফেলত। কিন্তু দুর্ভাগ্য রানার, কার অ্যাক্সিডেন্টে মারাত্মকভাবে আহত হলো মেয়েটা, দুটো পা-ই কেটে ফেলে দিতে হলো। খবর পেয়ে রানা যখন হাসপাতালে পৌঁছুল, তখন সব শেষ। ঠিক যেন সেই মেয়েটাই। এমন হুবহু মিল হয়? আশ্চর্য তো!

'কে ও?' গলা বুজে গেছে বুঝতে পেরে নিজেই লজ্জা পেল রানা।

'ও হচ্ছে শীলা। মা-বাবা মারা যাওয়ায় ওই তো এখন হোটেলটা চালাচ্ছে।'

'মেক্সিকান? তাহলে চেহারাটা এরকম কেন?'

'বুঝতে পেরেছি, আপনি চোখ দুটোর কথা বলছেন, সিনর। শীলা হাফ চাইনীজ, হাফ স্প্যানিশ।'

'ফটোতে যেমন দেখছি, মেয়েটা কি সামনে থেকেও সেরকম দেখতে?'

'আরও অনেক, অনেক, অ-নে-ক সুন্দর, সিনর। শুধু সুন্দর নয়, এমন গুণবতী মেয়ে জীবনে আমি আর দেখিনি। বিশ্বাস করা কঠিন, শীলা হোমায়রার ভাইঝি। শীলার বাবা আর হোমায়রা, দু'জনের সাপে-নেউলে সম্পর্ক ছিল—একজন ভালমানুষের গাছ, আরেকজন শয়তানের হাড্ডি। চীনা মহিলাকে বিয়ে করেছিল বলে ভাইকে দু'চোখে দেখতে পারত না হোমায়রা। ভাই বিয়ে করুক, এটাই সে চায়নি। বিয়ে না করলে শীলা আসত না। শীলা না এলে হোটেলটার মালিক বনে যেত সে। গত বছর শীলার বাবা মারা গেল, কিন্তু হোমায়রা কবর দিতে গেল না। কিন্তু শীলাও কম যায় না, কি করলে চাচার অন্তর্জ্বালা বাড়বে ভালই বোঝে সে। নতুন একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে হোটেলে।'

'নতুন সাইনবোর্ড? কি লেখা আছে তাতে?'

'শীলা হংকং।'

হেসে উঠল রানা।

'যতবারই শহরে যায় হোমায়রা, সাইনবোর্ডটা তাকে দেখতে হয়। ওহ্, সিনর, আমাদের শীলা সত্যি একটা মেয়ে বটে!'

'তুমি তার খুব ভক্ত, বোঝা যায়,' মন্তব্য করল রানা।

'শুধু আমি, সিনর? বলতে পারেন, এই তল্লাটে এমন কেউ আছে যে শীলামণির ভক্ত নয়? এক হোমায়রা বাদে? শীলা শীলাই, সিনর, তার তুলনা মেলা সম্ভব নয়। হারমোজায় সে-ই তো রাজকন্যা। কবে রাজপুত্র আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

অনেকটা সময় কেটে গেল। রানা ভাবছে, এখনও ওরা আসছে না কেন! ইতোমধ্যে খানিকটা ঝিমিয়ে নিয়েছে ট্যালবট, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে এখন। রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'হারমোজার খনিতে লোক পেতে এত অসুবিধে হয় কেন?'

'খনি নয়, ওটা একটা মৃত্যুফাঁদ। ক'দিনই বা এসেছি আমি, এরই মধ্যে বড় ধরনের পাঁচটা ধস নেমেছে। ছোটখাট ধস তো প্রতিমাসেই লেগে আছে। কত ইন্ডিয়ান যে মারা গেছে তার কোন লেখাজোখা নেই, সিনর। হোমায়রা ওখানে অ্যাপাচীদের ব্যবহার করে।'

'অ্যাপাচী ইন্ডিয়ান?' বিস্মিত হলো রানা। 'কি বলছ! ওরা তো পুরানো ওয়েস্ট-এর সাথে গত হয়েছে।'

'সিয়েরা মাদ্রেতে ওরা ইতিহাস নয়, সিনর, জলজ্যান্ত বর্তমান। অতীতে ওই জায়গাতেই ওদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এখনও ওখানে প্রচুর আছে ওরা।'

'খনিটা যদি অতই বিপজ্জনক, আবার তুমি ফিরে যেতে রাজি হলে কেন? পুলিস ছেড়ে দেয়ার পর পালিয়ে গেলেই তো পারো।'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যালবট। 'কোথায় যাব, সিনর? কোথায় কে আছে

আমার? বাজ পড়া এই দেশে নড়তে গেলে টাকা লাগে...' অসহায় একটা ভঙ্গি করে চুপ মেরে গেল সে।

দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল সার্জেন্ট মানটু। 'সিনর রড, দয়া করে এদিকে আসবেন, প্লীজ?'

মেক্সিকানদের ভিড় ঠেলে এগোল রানা, পিছু নিল সার্জেন্টের। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওরা, চুনকাম করা করিডর পেরোল, সবশেষে থামল অফিস কামরার দরজার সামনে। নক করল মানটু, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত দিল রানাকে।

দামী চুরুটের মিষ্টি গন্ধে ঘরের বাতাস ভরে আছে। বসে নয়, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিস চীফ দুবালিয়র পেরন, দাঁতের মাঝখানে জ্বলন্ত চুরুট। সেটা হাতে নিয়ে সহাস্যে রানাকে বলল সে, 'এই যে, আসুন মি. রড, আসুন, আসুন। বসুন, প্লীজ। কথাটা বলতে পারায় কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার। ইয়েস, সিনর, আপনার সব সমস্যা আমরা মিটিয়ে ফেলেছি!'

পেরনকে রানা লক্ষ করল কি করল না, ওর চোখ স্থির হয়ে আছে ডন হোসে স্যামুয়েল দ্য হোমায়রার ওপর। ধীরে ধীরে ঘুরে জানালার দিকে পিছন ফিরল লোকটা, বলল, 'আবার তাহলে আমাদের দেখা হলো, কি বলেন, সিনর রড?'

'তাই তো দেখছি।'

'শুনে আমি খুশি হলাম যে ডন হোমায়রা আপনাকে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছেন,' গালভরা হাসি নিয়ে বলল পেরন। 'উনি মহৎপ্রাণ, সজ্জন ব্যক্তি, সেজন্যেই তো আপনার জরিমানার সব টাকা নিজের পকেট থেকে দিতে রাজি হলেন।'

'হোটেলে ছিলাম, সিনর রড,' বলল ডন হোমায়রা। 'যেই শুনলাম আপনি অ্যারেস্ট হয়েছেন অমনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম। এলাকার হর্তাকর্তাবিধাতা, সে যেই হোক, আমি বা আর কেউ, তাকে না জানিয়ে সম্মানীয় একজন বিদেশীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হবে, এ কেমন কথা?' পেরনের দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাল সে। 'খবরদার, আর যেন কখনও এ-ধরনের অনাসৃষ্টি কাণ্ড না হয়।' ফিরল রানার দিকে। 'আপনাকে যদি কোনভাবে অপমান করা হয়ে থাকে, সিনর, দয়া করে স্রেফ ক্ষমা করে দিন এবং ভুলে যান। চীফ অভ পুলিস এরইমধ্যে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।'

'ধন্যবাদ,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'আপনি আমার জন্যে অনেক করলেন।'

'সিনর পেরনের সাথে কথা বলার পর মনে হলো এবার বোধহয় আপনি আমার কাজের প্রস্তাবটা নতুন আলোকে বিবেচনা করবেন...'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা। প্রচুর কাঠখড় পুড়িয়ে বাঁশ কিনতে চাইছে ডন হোমায়রা, টের পাবে বাছাধন!

'তাহলে সন্ধের ট্রেনে আমি যদি হারমোজায় যাই, আপনি আমার সঙ্গী হবার জন্যে উৎসাহী?'

'এক পায়ে খাড়া। কিন্তু আমার গাড়ির কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

পেরনের দিকে তাকাল ডন হোমায়রা। 'ওটা ওর গর্ব।'

'মেক্সিকো হৃদয়হীন নয়,' বলল দুবালিয়র পেরন। 'সিনর রড তাঁর সুন্দর শেভ্রোলে সাথে নিতে পারবেন, অবশ্যই অস্ত্র ইত্যাদি বাদে।'

টেবিল থেকে রানার পাসপোর্টটা তুলে নিল ডন হোমায়রা। 'এটা যাতে সুবিধেজনক সময়ে সিনর রড ফেরত পান সেদিকে খেয়াল রাখব আমি।'

'অবশ্যই, ডন হোমায়রা। তাহলে কথা হয়ে গেল, বাজেয়াপ্ত করা টাকার কথা কেউ আমরা মনে রাখছি না। সিনর রডের সাথে অবৈধ কোন টাকা ছিল, এ অভিযোগ তোলাই হয়নি। আর যেহেতু সিনর রড আপনার জিম্মায় থাকছেন, জরিমানার প্রশ্নটাও আপাতত আর উঠছে না।'

টাকাটা দু'ভাগ হয়েছে, কিন্তু আধাআধি কিনা সন্দেহ আছে রানার। কম বেশি যে যাই নিয়ে থাকুক, সুদে আসলে সব আদায় করা হবে, প্রতিজ্ঞা করল ও। 'আমি যদি আপনার সাথে যাই, হারমোজায় গাড়িটা কিভাবে পৌঁছুবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'যেভাবে আমারটা পৌঁছায়,' বলল ডন হোমায়রা। 'রেলরোড কারে অটোমোবাইলের জন্যে রিজার্ভ করা ফ্ল্যাটবেড আছে। আপনি তাহলে তৈরি, সিনর রড?'

হ্যাঁ, তোমার দৌড় দেখার জন্যে, ভাবল রানা। সামনে থেকে শীলাকে দেখার জন্যেও তৈরি ও। ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই মেয়েটার সাথে আসলে তার চেহারা কতটুকু মেলে জানতে হবে ওকে। আর শীলা যদি ওর মতই ঘৃণা করে ডন হোমায়রাকে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে একটা দল গঠনে বাধা কোথায়?

তিন

আসলে ওকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ভাবতেই কৌতুক বোধ করল রানা। স্টীম রেলকারে চড়ে এতটা পথ আগে কখনও পাড়ি দেয়নি ও। পাহাড়ী এলাকাটা যে দুর্গম তাতে কোন সন্দেহ নেই, দ্রুতগতি ট্রেনের বাইরে যতদূর দৃষ্টি যায় রুক্ষ পাথর ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। এক ঘণ্টাও হয়নি, গাড়িটার কথা ভেবে খুঁত খুঁত করছিল মন, তাই দেখতে এসেছে। নিরাপদেই আছে শেভ্রোলে। এখন আবার ফিরে আসছে কন্ডাক্টরের পিছু পিছু।

সরু করিডর। এপাশ-ওপাশ ঘন ঘন দুলছে ট্রেন। দু'পা এগিয়ে একবার করে থেমে তাল সামলাতে হয়। ডন হোমায়রার দরজার সামনে একজন অ্যাটেনড্যান্ট রয়েছে, সেই নক করে দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকল রানা।

কমপার্টমেন্টে দুটো বাঙ্ক, কিন্তু ডন হোমায়রা একাই দখল করেছে। দেয়াল থেকে নামিয়ে ছোট একটা টেবিল পাতা হয়েছে একধারে, তাতে অভুক্ত খাবার সহ কয়েকটা প্লেট।

'এসো, রড।'

জানা কথা চাকর-মনিব সম্পর্কটাই চাইবে ডন হোমায়রা, সিনর বাদ পড়াটা প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা। একটা গ্লাসে কনিয়্যাক ভরল অভিজাত মেক্সিকান, আলোর সামনে উঁচু করে ধরে পরীক্ষা করল, তারপর ছোট্ট একটা চুমুক দিল।

'আমি তাহলে আবার রড হলাম?'

'সংশ্লিষ্ট সবার স্বার্থের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটাই ভাল,' বলল ডন হোমায়রা। 'তোমার আসল পরিচয় আমি বাদে আর সবার কাছে অর্থহীন।'

'ট্যালবট জানে।'

'ট্যালবট এখন আমার ক্রীতদাস, তাকে যা বলা হবে তাই সে করবে।'

'ক্রীতদাস? এ-যুগে...'

'শুধু কাল নয়, রড, তোমাকে স্থানের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। বর্তমানে আমিই এখানকার রাজা।'

আসলে নও, সেজেছ, ভাবল রানা। 'আর চীফ অভ পুলিস, পেরন? সে-ও তো জানে।'

ক্ষীণ একটু হাসল ডন হোমায়রা। 'কেন, সে টাকা পায়নি? আমি তার ভাষা কিনে নিয়েছি।'

'কিন্তু টাকাগুলো আমার ছিল,' বলল রানা।

'তার আগে, রড? তার আগে কার ছিল? তোমার কাছে এল কিভাবে? তারচেয়ে এসো, ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাই, অতীত ভুলে যাও। তুমি একজনের কাছ থেকে মেরে দিয়েছ, তোমার কাছ থেকে আরেকজন মেরে দিয়েছে, দুঃখ করার কি আছে? শোনো...'

গ্লাসে আরেকটা ছোট্ট চুমুক দিল ডন হোমায়রা। আবার শুরু করল, 'শোনো। বুঝতেই পেরেছ, ভাল একটা লোকের সন্ধানে ছিলাম আমি। তোমাকে পেয়ে বেঁচে গেছি। ওখানকার মাইনিং অপারেশনটা সত্যি বেশ জটিল। শক্ত একজন লোককে দায়িত্বটা দিতে চাই আমি, যে বেয়াড়া ইন্ডিয়ানগুলোকে আতঙ্কের মধ্যে রাখবে। প্রয়োজনে তার দ্বারা অস্ত্র চালানো সম্ভব। আমার বিশ্বাস এই কাজের জন্যে উপযুক্ত লোককেই পেয়েছি আমি।'

'একবারও মনে হয়নি আমার অন্য কোন প্ল্যান থাকতে পারে?'

'সবচেয়ে কাছের রেললাইন থেকে হারমোজা বিশ মাইল দূরে, পনেরো দিন অন্তর মাত্র একটা করে ট্রেন আসে। আর রাস্তাগুলো, সত্যি বলতে কি, আদৌ রাস্তা নয়—চাঁদের উল্টোপিঠ বলতে পারো। তবে, সভ্যতার সাথে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা আছে বটে—টেলিগ্রাফ লাইন। তাছাড়া, ভুলে যেয়ো না, পেরন তোমাকে আমার জিম্মায় ছেড়ে দিয়েছে। তুমি যদি বেয়াদপি করো, চুক্তির শেষ শর্তটা পূরণ করবে সে।'

'সেটা কি?'

'তোমাকে সীমান্তে নিয়ে গিয়ে আমেরিকান পুলিসের হাতে তুলে দেয়া

হবে, অবশ্যই মাসুদ রানা হিসেবে।'

এক হাতে চিন্তিতভাবে মাথা চুলকাল রানা, অপর হাতটা বাড়িয়ে ডন হোমায়রার গ্লাসে আধ খাওয়া জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলল। 'তারমানে আপনারা ধরেই নিয়েছেন আমি একজন ক্রিমিনাল? ক্রাইম করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি?'

হোমায়রার চোখে পেখম মেলল ক্রোধ। 'তোমার পেছনে অনেক খরচা গেছে আমার, কাজ করে সব তুমি শোধ দেবে। ঠিকমত কাজ করো, কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু যদি ফাঁকিবাজি দেখি··· কি বললে? ক্রিমিনাল নও? ক্রিমিনাল না হলে জাল পাসপোর্ট নিয়ে সীমান্ত পেরোয় কেউ? সাথে বেআইনী টাকা থাকে? লাইসেন্স ছাড়া পিস্তল?'

'যদি ক্রিমিনাল হই, কোন্ সাহসে আমাকে আপনি সাথে নিচ্ছেন, মি. হোমায়রা?'

ডন হোমায়রার বড়সড় লালচে মুখে নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল। 'ক্রিমিনালদের কিভাবে বাগ মানাতে হয় আমার জানা আছে।'

'কারণ যেহেতু আপনি নিজেও একজন ক্রিমিনাল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

উজ্জ্বল হাসিতে যতই উদ্ভাসিত হলো মুখ ততই ছোট হলো ডন হোমায়রার চোখ জোড়া। 'কারণ, যেহেতু আমি একজন অভিজাত।'

'ক্রাইমের সমার্থক একটা শব্দ আছে, আভিজাত্য।'

'জানোই যখন, জিজ্ঞেস করার কি মানে?'

করিডরে বেরিয়ে এল রানা, ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি বলে নিজের ওপর খুশি। সেকেন্ড ক্লাস কোচে এত ভিড় যে সুঁই ঢোকাবার জায়গা নেই। বেশিরভাগ গ্রাম্য চাষা, হাটে যাচ্ছে। এরা বোধহয় কালেভদ্রেও গোসল করে না, গায়ের গন্ধে টেকা দায়। দরজার কাছে এক কোণে ট্যালবটকে খুঁজে পেল রানা, একা একাই তাস খেলছে। মাথা তুলল সে, ঘৃণায় কুঁচকে আছে মুখ। 'এখানে আপনি টিকতে পারবেন না, মি. রানা।'

বেঞ্চের তলা থেকে সুটকেস দুটো বের করে সিধে হলো রানা। 'চলো ফার্স্ট ক্লাসে যাই, শেষ মাথায় অনেক জায়গা দেখে এসেছি। আরেকটা কথা, নামটা রড, রানা নয়। মনে রেখো।'

'জ্বী-আচ্ছা।'

ফার্স্ট ক্লাসের প্রথম যে কামরাটা খালি পাওয়া গেল তাতেই ঢুকে পড়ল ওরা। ক্যানভাস গ্রিপ থেকে বিয়ারের দুটো বোতল বের করল ট্যালবট, জানালার নিচে এক কোণে পা লম্বা করে বসল সে। 'হোমায়রার কাণ্ডটা দেখলেন? আমার কথা না হয় বাদ দিন, অন্তত আপনার জন্যে তো ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কিনতে পারত!' তার বাড়ানো হাত থেকে একটা বোতল নিল রানা। 'এখানে যে নিয়ে এলেন, কন্ডাক্টরকে কি বলবেন?'

'তখন যা মুখে আসবে।'

'আপনি যেন ঠিক ওয়েস্টার্ন যুগের একটা চরিত্র, অন্তত হাবভাব আর চেহারাটা খুবই মিলে যায়,' বলল ট্যালবট। 'অবশ্য আপনার কীর্তি বা পেশা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।'

'আমাকে তোমার ক্রিমিনাল বলে মনে হয় না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সত্যি কথা বলতে কি, হয়।' রানার চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল দেখে তাড়াতাড়ি আবার বলল ট্যালবট, 'তবে আপনি ক্রিমিনাল হলেও আপনাকে আমার ভাল লাগবে। বরং ক্রিমিনাল হলেই বেশি ভাল লাগবে। সত্যিকার উঁচুদরের ক্রিমিনাল এদিকে একজনও নেই, সবই নীচু ক্লাসের ছোটলোক।'

বোতলটা মুখে তুলল রানা। কোন মন্তব্য করল না।

'হোমায়রা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, তাই না? কি চায় সে?'

'এ-কথা জানিয়ে দিতে যে সে-ই বস্।' উল্টোদিকের সীটে পা তুলে দিয়ে চোখ বুজল রানা।

আঁতকে ওঠার সাথে ঘুম ভাঙল রানার। সতর্ক-শ্লথ গতিতে সরু একটা ক্যানিয়নে নামতে শুরু করেছে ট্রেন, এঞ্জিনিয়ার ব্রেক অ্যাপ্লাই করায় ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে কোচগুলো। রানার হাতঘড়িতে ভোর চারটে। নিঃশব্দে সিধে হলো ও, ঘুমন্ত ট্যালবটকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে।

জানালার সামনে দাঁড়াতেই হিম পাহাড়ী বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিল শরীরে। আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার, দিগন্তরেখার কাছে ছড়িয়ে রয়েছে নিরেট সাদা নক্ষত্র, আর ক্ষীণ আলোর ছোঁয়া পেতে শুরু করেছে দুই প্রান্তের উঁচু চূড়াগুলো। একটু পরই ক্যানিয়ন চওড়া হলো, দূরে একটা স্টেশনের আলো দেখতে পেল রানা।

শুনতে পেল পিছন থেকে ট্যালবট বলছে, 'লা লিনা—থামবে শুধু একবার হুইসেল বাজাবার সময়টুকু, ডাক আর আরোহী উঠবে। আমরা যেখানে যাচ্ছি, আর দু'ঘণ্টার পথ।'

'কখন যে চিহুয়াহুয়া পেরিয়ে এলাম টেরই পাইনি।'

'ভাবলাম আপনার বিশ্রাম দরকার, তাই ঘুম ভাঙাইনি। মাত্র বিশ মিনিট থেমেছিলাম, এঞ্জিন বদলানো হয়েছে।'

চারদিকে গভীর অন্ধকার, লা লিনা যেন ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এল ওদের দিকে। ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। ছোট্ট একটা স্টেশন হাউস, পিছনে কয়েকটা কুঁড়েঘর, আশপাশে আর কিছু নেই। লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এল স্টেশন মাস্টার, দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন যুবক শিরদাঁড়া খাড়া করল। চেহারাই বলে দেয় বর্ণসঙ্কর। মা যদি মেক্সিকান হয় তো বাবা ইন্ডিয়ান, কিংবা উল্টোটা।

লাফ দিয়ে ট্রেন থেকে নামল রানা আর ট্যালবট, হাঁটতে হাঁটতে পেছন দিকে চলে এল ওরা। ফ্ল্যাটবেডের সাথে একজোড়া বক্সকার জোড়া হয়েছে, ওরা সিগারেট ধরাবার সময় অস্পষ্ট চিঁহিঁহিঁ শুনতে পেল। বক্সকারের মেঝেতে খুরের আওয়াজও হলো, ভোঁতা।

'ওগুলো আবার কোত্থেকে এল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চিহুয়াহুয়া থেকে তোলা হয়েছে। গার্ড বলল আগামী হপ্তায় রেস আছে জুয়ারেজ-এ।'

ফেরার সময় দো-আঁশলা যুবক তিনজনকে আবার দেখল ওরা, ট্রেনের

পাশে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে, মাথার ওপর হাত, গার্ডকে সাথে নিয়ে তাদেরকে সার্চ করছে স্টেশন মাস্টার।

'কি ব্যাপার?'

'গত চারমাসে ছ'বার ট্রেন-ডাকাতি হয়েছে, সিনর,' বলল ট্যালবট। 'গ্রাম্য চাষার বেশ নিয়ে যে-কোন স্টেশন থেকে চড়ে ওরা। গত বছর নাইট এক্সপ্রেসের এঞ্জিনিয়ারকে গুলি করে মারে, একটা ক্যানিয়নের মাথা থেকে ছেড়ে দেয় ট্রেনটাকে। পাঁচ মাইল নামার পর লাইন থেকে ছিটকে পড়ে এঞ্জিন।'

নিজেদের দখল করা ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টে ঢুকতে পারল না ওরা, বৈধ টিকেটধারী লোকে ভর্তি হয়ে গেছে। 'মানে মানে কেটে পড়াই ভাল, মি. রড,' ফিসফিস করে পরামর্শ দিল ট্যালবট। 'জানতাম এই সুখ বেশিক্ষণ টিকবে না!'

নিজেদের সুটকেস নিয়ে সেকেন্ড ক্লাসে ফিরে এল ওরা। এখানে বেশিরভাগ আরোহী ঘুমাচ্ছে। নিজেদের কোণার সীটে বসল দু'জন, পাশেই খোলা দরজা, তারপর লাগেজ ভ্যান।

মাথার পিছনে হাত, হাতে মাথা, চোখ বুজল ট্যালবট। চোখের কোণে কিছু একটা ধরা পড়ায় হ্যাটটা সিকি ইঞ্চি কাত করল রানা। ইন্ডিয়ান এক কিশোরীকে দেখল ও, লাল স্কার্ট পরে আছে, পায়ের কাছে মোটাসোটা কাপড়ের একটা পুঁটলি। রানাকে ছাড়িয়ে দেয়ালে বিঁধে আছে তার নিষ্পলক দৃষ্টি, যেন সম্মোহিত অবস্থায় রয়েছে।

সিগারেট শেষ করে চোখ বুজল রানা। কয়েক মিনিট পর বুঝতে পারল মেয়েটা নড়াচড়া করছে। সামান্য একটু চোখ খুলে দেখল কোচের পিছন দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোরী, লা লিনা থেকে ওঠা তিনজন বর্ণসঙ্করের একজন ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল তার উদ্দেশে।

কেউ পাশে বসল অনুভব করে চমকে উঠল কিশোরী, ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রানার দিকে। চিৎকার করে কিছু বলতে যাবে, রানা তার মুখে হাতচাপা দিল, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তোমার সামনে সুন্দর ভবিষ্যৎ, ধরা পড়লে কি হবে বোঝো না?'

ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল কিশোরী। তার চোখে আগুন জ্বলছে দেখে অপ্রস্তুত বোধ করল রানা। 'খেতে দেবেন? লজ্জা ঢাকার কাপড়? সমাজে একটু ঠাঁই?'

রানা উত্তর দেবে কি, তার আগেই তৎপর হয়ে উঠল দলটা। রানার ওপর চোখ রেখে প্রথম যুবক গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে সিধে হলো, বাকি দু'জন এগিয়ে এসে মেঝে থেকে তুলে নিল কাপড়ের পুঁটলিটা। আরোহীরা অনেকেই জেগে আছে, কিন্তু ওরা কাউকে গ্রাহ্য করল না। রানার বাড়ানো হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল কিশোরী, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সে-ই গিঁট খুলল পুঁটলির। নাক গলানো টের পেয়ে গেছে, প্রথম যুবক পাহারা দিচ্ছে রানাকে। দীর্ঘদেহী যুবক সে, সুদর্শন, চওড়া কাঁধ, পরে আছে খাকি শার্ট। মুখটা হাসি হাসি, যেন জানে

রানা ওদের জন্যে কোন বিপদ নয়। পুঁটলি থেকে রিভলভার বেরুল, চালান হয়ে গেল তিন যুবকের হাতে।

কনুই দিয়ে ট্যালবটের গায়ে ধাক্কা দিল রানা।

'জেগেই আছি, মি. রড,' চোখ থেকে হাত সরিয়ে বলল ট্যালবট। 'ওর নাম ভিকো।'

'চেনো তুমি?'

'এক সময় হোমায়রার পিয়ন ছিল আলবার্তো ভিকো। বছর দুই আগে একজন ফোরম্যানের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে পালিয়ে যায়। হোমায়রা ছাড়া কেউ ওকে দায়ী করেনি। হারামি ফোরম্যানটা মারা যাওয়ায় সবাই বরং খুশিই হয়েছিল। ডাকাতি করে খুব নাম করেছে ভিকো। চাষাদের কাছে হিরো সে। কিন্তু হোমায়রাকে এখনও সে যমের মত ভয় করে।'

ট্যালবটকে চিনতে পেরে আলোকিত হয়ে উঠল ভিকোর চেহারা। একটা হাত নেড়ে ওদেরকে সতর্ক করে দিল সে, তার অপর দুই সঙ্গী কোচের আরেক মাথায় চলে গেল।

'ওদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে থামানো যায় না?'

'মাথা খারাব!' আঁতকে উঠল ট্যালবট। 'স্রেফ মারা পড়ব।'

'বুদ্ধিমানের কাজ হবে অস্ত্রগুলো যদি টেবিলে জমা রাখো,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সহাস্যে বলল আলবার্তো ভিকো। 'পুরানো বন্ধু, তোমাকে খুন করতে আমার ভাল লাগবে না।'

'আমরা নিরস্ত্র,' বলল ট্যালবট।

'তাহলে যেখানে আছ সেখানেই থাকো, নাক গলাবার চেষ্টা কোরো না।'

সাথে অস্ত্র নেই বলে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল রানার।

রিভলভার উঁচু করে ছাদের দিকে একটা গুলি করল ভিকো। বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া হলো। ঘুমন্ত আরোহীদের ভিড়টা যেন উথলে উঠল, ভোঁতা আর্তচিৎকার শোনা গেল, তারপরই সব চুপচাপ।

'সবার সামনে হ্যাট ধরা হবে,' ঘোষণা করল ভিকো। 'হাত খুলে দান করবেন সবাই।'

রানার পাশে দরজাটা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল কন্ডাক্টর। পিছন ফিরে দৌড় দেয়ার আগে এক সেকেন্ডের বেশি ইতস্তত করেনি সে, কিন্তু তবু দেরি হয়ে গেল। কোচের আরেক প্রান্ত থেকে ডাকাতদের একজন গুলি করল তার পিঠে।

ব্যাপারটা আর সাধারণ থাকল না, ভাবল রানা।

বাচ্চা একটা ছেলে চিৎকার করে উঠল, মুখে হাতচাপা দিল তার মা। লাগেজ কার আর কোচের মাঝখানের করিডরে গোঙাচ্ছে কন্ডাক্টর।

দাঁড়াতে গেল রানা। দলটা একেবারে আনাড়ি।

সাথে সাথে ভিকোর রিভলভার রানার দিকে ঘুরে গেল। ট্যালবট ব্যাকুলস্বরে চেঁচিয়ে বলল, 'না, ভিকো, না!'

ইতস্তত করল ভিকো, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'তোমার একটা উপকার

পাওনা ছিল, সেটা শোধ দিলাম।' কন্ডাক্টরকে যে গুলি করেছে তার দিকে ফিরল সে। 'ওদেরকে ব্যাগেজ কারে আটকে রেখে ফিরে এসো।'

রানার পাঁজরে গুঁতো দিল ট্যালবট। 'পা বাড়ান!'

গোঙানি থেমেছে কন্ডাক্টরের। অসাড় দেহটাকে টপকাল ওরা। লোকটার হাতে এখনও ধরা রয়েছে চাবির গোছা, যুবক ডাকাত ঝুঁকে সেটা নিয়ে নিল, তারপর দু'জনের পিছু পিছু ব্যাগেজ কারের দিকে এগোল। 'বেঈমান আমেরিকানদের আবার খাতির কিসের?' অকারণ রাগের সাথে দাঁতে দাঁত চাপল সে। 'মাথায় একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে দিতে অসুবিধে কোথায়?' হাতের চাবি ফেলে দিয়ে রিভলভারের হ্যামার টানল সে।

'ভিকো পছন্দ করবে না,' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ট্যালবট।

'বলব তোমরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে!'

রিভলভারের মাজল্ ঠেকল রানার পিঠে। ট্রেনিঙের সময় হাজারবার ঠিক এভাবেই ঠেকানো হয়েছে। দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, নড়ে উঠল ও। হাত দুটো তুলল, বাম পায়ে ভর দিয়ে পাক খেতে শুরু করল শরীর, বাঁ হাত নেমে আসছে অস্ত্র ধরা ডাকাতের কব্জিতে, মুঠো পাকানো ডান হাত আঘাত করল প্রতিপক্ষের মুখের একপাশে। বাম হাতের শক্ত মুঠোয় যুবকের কব্জি, পুরো হাতটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে উঁচু করল ও, হাড় ভাঙার আওয়াজ শুনতে পাবার আশাটা পূরণ হলো। রিভলভারটা পড়ে গেল মেঝেতে, ট্যালবট ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিল সেটা। গুঙিয়ে উঠে জ্ঞান হারাল দো-আঁশলা।

চাইলে হয়তো রিভলভারটা রানাকে দেবে ট্যালবট, কিন্তু আত্মরক্ষার অধিকার সবার সমান। 'আমি না বললে এখান থেকে নড়বে না,' তাকে বলল রানা। 'দেখি ছাদ দিয়ে পুলম্যান কারে যেতে পারি কিনা। দুটো অস্ত্র থাকলে ওদেরকে বোধহয় ঠেকানো যাবে।'

দরজা খুলল রানা, হিম বাতাস হাত থেকে টান দিয়ে ছিনিয়ে নিল কবাট, আছড়ে ফেলল কোচের পাশে। ট্রেনের গতি ঘণ্টায় বিশ মাইলের বেশি হবে না, ফুটবোর্ডে বেরিয়ে এসে মাথার ওপর হাত তুলে ধরে ফেলল ছাদের কিনারা, কোচের গায়ে পা বাধিয়ে উঠে পড়ল ছাদে। মাঝখানের ক্যাটওয়াক ধরে ছুটতে ছুটতে ব্যাগেজ কারের শেষ মাথায় চলে এল ও, কিনারা থেকে লাফ দিয়ে সেকেন্ড ক্লাস কোচের ছাদে। ম্লান হয়ে গেছে নক্ষত্রগুলো, পুবদিকের পাহাড়চূড়ায় এরইমধ্যে সূর্যের কিরণ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আবার একটা লাফ দিয়ে পুলম্যান কারের ছাদে এল রানা, ছাদ থেকে নামল জানালায় পা রেখে।

ডন হোমায়রার কমপার্টমেন্টে ঘন ঘন নক করল। প্রায় সাথে সাথে খুলে গেল দরজা। হোমায়রাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা।

এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে ডন হোমায়রার। 'এর মানে কি?'

'লা লিনা থেকে ডাকাত উঠেছে ট্রেনে। কন্ডাক্টর বোধহয় বেঁচে নেই। আপনার কাছে পিস্তল আছে?'

চোখে সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ডন হোমায়রা। তারপর

বাঙ্কের তলা থেকে একটা সুটকেস বের করল সে। সুটকেস থেকে রিভলভার বেরুল, কিন্তু রানার হাতে সেটা এল না। 'ক'জন ডাকাত?'

'তিনজন, তবে লাগেজ ভ্যানে একটার ওপর নজর রাখছে ট্যালবট। লীডারের নাম ভিকো। ট্যালবট বলল সে নাকি একসময় আপনার কাজ করেছে...'

'আলবার্তো ভিকো?' ডন হোমায়রার চেহারা কঠিন হলো। 'সে তো একটা খুনী!'

রানাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল সে, হন হন করে এগোল। সেকেন্ড ক্লাস কোচে এই মুহূর্তে যাই ঘটুক না কেন, চলন্ত ট্রেনের শব্দে সব চাপা পড়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টগুলো পেরিয়ে এল ওরা, তারপর একটা দরজার পাশে থামল ডন হোমায়রা। কয়েক সেকেন্ড শুনল সে। হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

কোচের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিকো, টেবিলে বসা একদল লোকের সামনে হ্যাটটা ধরে। তৃতীয় যুবক মাত্র দু'ফুট দূরে, দরজার দিকে পিঠ। ঝট্ করে এক পা বাড়িয়ে তার ঘাড়ে রিভলভার ঠেকাল ডন হোমায়রা। আড়ষ্ট হয়ে গেল যুবক। তার হাত থেকে রিভলভার নিয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিল ডন।

তারপর সামনে এগোল সে, বলল, 'ভিকো!'

দ্রুত তাকাল ভিকো। দীর্ঘ এক সেকেন্ড তার চেহারায় কোন ভাব ফুটল না, তারপর সে হাসল। 'আহ্, ডন হোমায়রা! আবার আমাদের দেখা হলো!'

'হাত খালি করো,' আদেশ করল ডন।

ভিকোর চেহারায় ইতস্তত ভাব, চিৎকার করে ট্যালবটকে ডাকল রানা। এক মুহূর্ত পর প্রথম যুবক টলতে টলতে কোচে ঢুকল, তার একটা হাত নড়ছে না, পিছনে ট্যালবট।

কাঁধ ঝাঁকাল ভিকো, টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিল অস্ত্রটা।

'ওদেরকে আমার কমপার্টমেন্টে নিয়ে যাও,' ডন হোমায়রা গম্ভীর স্বরে বলল।

শেষদিকের টেবিলটা থেকে ইন্ডিয়ান কিশোরীকেও ধরে আনল ট্যালবট। 'দলে এ-ও ছিল।'

'কন্ডাক্টর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সে নেই।'

ডন হোমায়রার কমপার্টমেন্টে পৌঁছুল ওরা, এই সময় তিনবার স্টীম হুইসেল বাজাল এঞ্জিনিয়ার—জরুরী বিপদ সঙ্কেত—তারপর সজোরে ব্রেক অ্যাপ্লাই করল।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। পনেরো বিশটা গরু, রেললাইনের ওপর জড়ো হয়েছে, ঘোড়ার পিঠে বসা পনেরো বিশজন খেতমজুর সেগুলোকে খেদাবার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। আচমকা খেতমজুরের দল ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে হা-রে-রে-রে হাঁক ছাড়ল, চাদরের তলা থেকে

রিভলভার বের করে ছুটে এল ট্রেনের দিকে। সবাই তারা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে।

ট্রেনের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল তারা।

কোচের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে নিল রানা, ভিকোর দিকে ফিরল। 'তোমার লোক?'

নিঃশব্দে হাসল ভিকো। 'আমার সাথে যে আচরণ করছ তোমরা, ওদের পছন্দ হবার কথা নয়।'

এবার ট্রেনের পিছন দিক থেকে ঘন ঘন বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল। অশ্বারোহী একজন ট্রুপারকে দেখা গেল, সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল জানালার পাশ ঘেঁষে। তারপর আরেকজন। ভিকোকে সামনের দিকে ঠেলে দিল ডন হোমায়রা। 'এর আগে তিনবার ওরা জুয়ারেজ পর্যন্ত ট্রেনে ছিল, আলবার্তো ভিকো। তোমার ওপর ওরা আস্থা হারিয়ে ফেলছিল।'

জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল রানা। বক্সকার থেকে একের পর এক বেরিয়ে আসছে অশ্বারোহী ট্রুপাররা। ঘেরাও-এর মধ্যে আটকা পড়ে গেছে ডাকাত দল, তবু তাদের অনেকে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠতে চাইছে। কেউ কেউ গুলি করছে ট্রুপারদের লক্ষ্য করে, কিন্তু এখন আর তাতে কোন লাভ হবার নয়। বেকায়দা অবস্থায় ধরা পড়ে গেছে তারা, মার খেয়েছে সংখ্যাতেও।

গায়ে জ্যাকেট চড়িয়ে ট্যালবটের দিকে ফিরল ডন হোমায়রা। 'ভিকোর সাথে এখানে থাকছ তুমি। নড়া তো দূরের কথা, যদি দেখো খুব জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে, সাথে সাথে গুলি করবে।' রানার দিকে তাকাল সে। 'বাকিগুলোকে বাইরে আনো।'

ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল সে, সাথে সাথে তরুণ এক অফিসার ছুটে এসে স্যালুট করল তাকে। 'লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ। চিহুয়াহুয়াতে আমাকে জানানো হয়েছে আপনি এই ট্রেনে ভ্রমণ করছেন, ডন হোসে। আপনার সদয় আশীর্বাদে সম্পূর্ণ সফল হয়েছি আমরা, সিনর।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে লেফটেন্যান্টের পাশে দাঁড়ানো রোগা-পাতলা লোকটার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ডন হোমায়রা। তার দিকে অভিজাত ডন হোসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে লক্ষ করে নার্ভাস ভঙ্গিতে একটু হাসল লোকটা।

লেফটেন্যান্ট বলল, 'ম্যাজিস্ট্রেট, সিনর।'

'অ। ভাল।' ম্যাজিস্ট্রেটের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরল ডন হোমায়রা। 'কি বললে? সফল হয়েছ? না। কন্ডাক্টর খুন হয়েছে।'

'এদের মধ্যে ভিকো কে?'

'এই মুহূর্তে আমার কমপার্টমেন্টে বন্দী রাখা হয়েছে তাকে। এখুনি এবং এখানে যদি বিচার অনুষ্ঠিত হয়, অবশ্যই তাতে আমি কোন বাধা দেব না। তবে,' তর্জনী খাড়া করে শর্ত দিল ডন হোসে, 'বিচার হতে হবে ন্যায্য এবং

আলবার্তো ভিকোকে বাদ দিয়ে। তার বিচার হওয়া দরকার চিহুয়াহুয়াতে।'

সার্জেন্টের উদ্দেশে গর্জে উঠল লেফটেন্যান্ট, 'পিনাচিটো, তোমার হাতে ক'জন?'

'পনেরো, লেফটেন্যান্ট।'

ট্রেন থেকে যাদের নামানো হয়েছে তাদের দিকে ফিরল ফার্নান্দেজ। 'ওরাও নাকি?' মাথা ঝাঁকাল ডন হোসে, সামনে ঠেলে দিল দু'জনকে। 'আর মেয়েটা?'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'ওটা একদম বাচ্চা…'

হো হো করে হেসে উঠল ডন হোমায়রা। 'তুমি দেখছি একটা সেন্টিমেন্টালিস্ট। ভুলে যেয়ো না ওই মাগীই ট্রেনে অস্ত্র তুলেছে, জানত তাকে সার্চ করা হবে না। কন্ডাক্টরের মৃত্যুর জন্যে সরাসরি সে-ই তো দায়ী।'

'বিচারে কি রায় হয় জানা নেই,' সহাস্যে বলল লেফটেন্যান্ট, জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চাটল সে। 'তবে মেয়েটাকে যদি বেকসুর খালাস দেয়া হয়, কথা দিলাম, ডন হোসে, ওকে আপনার হাতে তুলে দেব।'

'কি করে বলি, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ওকে হয়তো খালাস দিতেও পারেন!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ডন হোমায়রা! 'আমার কথা যথেষ্ট নয়, সে-ই যে অস্ত্র নিয়ে ট্রেনে উঠেছিল তার প্রমাণ পেতে হবে। আমি তো শুধু শুনে বলছি।'

'প্রথমে তাহলে ছুঁড়িটার বিচারই হোক,' প্রস্তাব দিল লেফটেন্যান্ট। 'ছোটখাট ঝামেলা প্রথমে সেরে ফেলাই ভাল।'

ম্যাজিস্ট্রেট লোকটা কি ব্যাপারে যে নার্ভাস বোধগম্য হলো না রানার। সারাক্ষণ ঢোক গিলছে, হাত কচলাচ্ছে, অস্থিরভাবে পেছনে তাকাচ্ছে বারবার। বন্দী ডাকাতদের সামনে দু'বার হাঁটল সে, মিনমিনে সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কেউ মেয়েটাকে অস্ত্র আনতে দেখেছ?'

প্রথমে কেউ কোন কথা বলল না। দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করা হতে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল ডাকাতদল।

'বেকসুর খালাস দেয়া হলো!' ঘোষণা করল ম্যাজিস্ট্রেট।

অনেক কষ্টে হাসি চাপল রানা। কিন্তু এক মুহূর্ত পর সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নিল ঘটনা, হাসির ব্যাপার রইল না আর।

বন্দীদের সামনে এবং পিছনে কারবাইন হাতে পাহারায় থাকল ট্রুপাররা।

আবার বন্দীদের সামনে দিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে দু'বার হাঁটল ম্যাজিস্ট্রেট। জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি অপরাধ স্বীকার করো? স্বীকার করলে এক রকম, অস্বীকার করলে আরেক রকম শাস্তি।'

এবারও চুপ করে থাকল ডাকাতদল। দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করা হতে কয়েকজন মাথা ঝাঁকাল, কয়েকজন অস্ফুটে বলল, 'হ্যাঁ, স্বীকার করি। আমাদের মাফ করে দেয়া হোক।'

'ক্ষমাপ্রার্থনার আবেদন নাকচ করা হলো,' ঘোষণা করল ম্যাজিস্ট্রেট, কপালের ঘাম মুছল রুমাল দিয়ে, তারপর রায় দিল সে, 'ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড!'

মাথায় বজ্রপাত হলেও রানা এতটা চমকাত কিনা সন্দেহ। ব্যাপারটা হজম করতে ঝাড়া তিন সেকেন্ড লেগে গেল।

লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ হুকুম দিল, 'পিনাচিটো, প্রথম দু'বার ছ'জন করে, শেষবার পাঁচজন। দশজনকে নিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াড।'

রানার মাথায় যেন দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। ছ'জন বন্দীকে নিয়ে ট্রেনের কাছ থেকে দূরে ছোট্ট একটা গর্তের দিকে সরে যাচ্ছে ট্রুপাররা, তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল ও। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ডন হোমায়রা, ম্যাজিস্ট্রেট আর লেফটেন্যান্টের দিকে তাকাল। 'থামুন, ওদেরকে দাঁড়াতে বলুন! এ আপনাদের কি রকম বিচার! ওদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়নি!'

'কে ওটা?' লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ বিস্ময় প্রকাশ করল।

'আমার লোক,' জবাব দিল ডন হোসে। 'কিন্তু গোলমাল পাকানো স্বভাব। রড, এদিকে এসো,' কঠিন সুরে হুকুম করল।

'এ-দেশে কি আইন নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনারা ঠাণ্ডা মাথায় এতগুলো লোককে খুন করতে পারেন না! কন্ডাক্টরকে গুলি করেছে একজন, বাকি সবাই ডাকাতি করতে এসেছিল, তাহলে সবার একই শাস্তি হয় কি করে?'

খুব শান্ত ভঙ্গিতে, যেন রানাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ফিরিয়ে আনতে চায়, এগিয়ে এল লেফটেন্যান্ট। কিন্তু রানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সে, তারপর ঝট্ করে ফিরে রানার মাথায় রিভলভারের মাজল্ চেপে ধরল। ডন হোসের দিকে তাকাল সে। 'উটকো ঝামেলা রেখে লাভ কি, ডন হোসে?' জিজ্ঞেস করল সে।

সেকেন্ড ক্লাস কোচ থেকে অসংখ্য মাথা বেরিয়ে এসেছে, বিস্ফারিত চোখে নাটকীয় দৃশ্যটা অবলোকন করছে আরোহীরা।

ট্রেনের বাইরে স্তব্ধ হয়ে গেছে পরিবেশ। মাথা নিচু করে চিন্তা করছে ডন হোমায়রা। তাঁর দিকে চোখে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে লেফটেন্যান্ট। জীবন-মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। আত্মরক্ষার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না ও। মাথায় রিভলভার ধরে রাখলেও, ফার্নান্দেজকে হয়তো কাবু করা সম্ভব। কিন্তু পনেরো বিশ জন ট্রুপার, যারা ওর দিকে কারবাইন তাক করে অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের আক্রোশ থেকে বাঁচার পথ কি?

'না,' অবশেষে মুখ তুলল ডন হোসে। 'ওর পেছনে বিস্তর খরচ করেছি আমি। নিয়ে যাচ্ছি কাজ করাব বলে। আমার ধৈর্য এখনও শেষ সীমায় পৌঁছায়নি। ওকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের কর্তব্য সারো তোমরা।'

ঘন ঘন কারবাইনের গুঁতো দিয়ে বন্দীদের সামনে থেকে সরিয়ে আনা হলো রানাকে। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে মরে যেতে ইচ্ছে করল রানার। এতগুলো লোককে চোখের সামনে খুন করা হবে, অথচ কিছুই করার নেই ওর। 'দোহাই লাগে তোমাদের!' চেঁচিয়ে আবেদন জানাল ও। 'একবার ভাবো! অপরাধ করেছে ওরা, কিন্তু সেজন্যে মৃত্যুদণ্ড পাওনা হয়নি! অন্তত আপীল করার সুযোগ কেন পাবে না ওরা?' ওর মুখের ওপর হাসতে লাগল ডন

হোসে আর লেফটেন্যান্ট।

'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব,' কারবাইনের গুঁতো খেয়েও দাড়াবার চেষ্টা করছে রানা। 'ইচ্ছে করলে আপনি ওদেরকে বাঁচার একটা সুযোগ দিতে পারেন। প্লীজ, ভাই! একটু দয়া দেখান!'

কিছু না বলে রানার দিকে পিছন ফিরল ম্যাজিস্ট্রেট।

সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল ফার্নান্দেজ, 'আমাদের দেশের আইন সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

'এ স্রেফ গণহত্যা!' অসহায় রানার চোখে পানি এসে গেছে। 'আপনাদের আইন সম্পর্কে আমার জানা নেই, কিন্তু এটুকু জানি কোন আইনই এমন যুক্তিহীন হতে পারে না! আপনাদের হাতে ক্ষমতা আছে, আইন আপনারা তৈরি করে নিচ্ছেন নিজেদের সুবিধে মত। ঈশ্বরের দোহাই, ওদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ দিন!' ট্রুপারদের দিকে ফিরল রানা। 'আপনারা বিদ্রোহ করুন, বলে দিন গুলি করতে পারবেন না। বন্দীরা আপনাদের ভাই...'

ট্রুপাররা হাসতে লাগল। একজন বলল, 'ভাই? ধ্যেৎ, ওরা তো দো-আঁশলা!'

'এই খবর কিন্তু কাগজে বেরুবে,' ভয় দেখাল রানা, জানে বৃথাই চেষ্টা করছে। 'যদি ভেবে থাকেন এত বড় নিষ্ঠুর একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে আপনারা বেঁচে যাবেন...'

লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ গর্জে উঠল, 'ফায়ার!'

একসাথে বিস্ফোরিত হলো দশটা কারবাইন। ছোট একটা গর্তের ভেতর লুটিয়ে পড়ল ছয়জন বন্দী। ধীর পায়ে সেদিকে এগোল ফার্নান্দেজ, সাথে সার্জেন্ট পিনাচিটো। ধরাশায়ী বন্দীদের মধ্যে দু'জন চিৎকার করছে। সামনে দাঁড়িয়ে তাদের মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে গুলি করল ওরা।

পাথর হয়ে গেছে রানা। ডন হোসে হোমায়রা আড়চোখে তাকাল রানার দিকে, আয়েশ করে একটা চুরুট ধরাল সে।

ঘুরল রানা, ক্লান্ত পায়ে ফিরে এল ট্রেনের কাছে। মাথার ভেতরটা খালি খালি লাগছে, তুলোর মত হালকা হয়ে গেছে শরীর। ট্রেনে উঠে ডন হোমায়রার কমপার্টমেন্টে ফিরে এল ও।

বাঙ্কে বসে রয়েছে ভিকো। দোরগোড়ায় একা দাঁড়িয়ে ট্যালবট, হাতে রিভলভার।

'পাহারায় থাকছি আমি,' ট্যালবটকে বলল রানা।

'খুন-খারাবি দেখতে আমার ভাল লাগে না,' ম্লান মুখে বলল ট্যালবট। 'যাচ্ছি না কোথাও।'

'যাচ্ছ,' বলল রানা। 'নিচে নামতে হবে না, কোথাও গিয়ে সিগারেট খেয়ে এসো। ভিকোর সাথে আমার কথা আছে।'

'ঠিক আছে,' বলে করিডর ধরে চলে গেল ট্যালবট।

ভিকো আর রানা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, সকালের বাতাসে

পরিষ্কার ভেসে এল ফার্নান্দেজের কমান্ড। ভিকোর চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র দেখল না রানা, চোখ জোড়া থেকে সাহস আর বুদ্ধিমত্তা ঠিকরে বেরুচ্ছে।

'বাইরে কি ঘটছে আশা করি আন্দাজ করতে পারছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি হয়তো জানো না, কিন্তু আমি জানি. রক্তপাত ঘটানো ডন হোমায়রার-প্রিয় একটা নেশা।'

'তোমাকে সে খুনী বলল।'

'মিথ্যে বলেনি, সিনর। ওর খনিতে একজন ফোরম্যান ছিল, আর আমার ছিল কচি বউ, যে কিনা আত্মহত্যা করল। কারণটা আবিষ্কার করতে বেশি দেরি হয়নি আমার। মনে হলো ফোরম্যানের বুকে ছুরি ঢোকাতে পারলে সুবিচার নিশ্চিত হয়। কিন্তু ডন হোসে ব্যাপারটা পছন্দ করল না।'

'আমারও ধারণা ছিল এরকম কিছু একটা ঘটেছে।' আরেক পশলা গুলির আওয়াজের সাথে নিস্তব্ধতা চুরমার হলো। কমপার্টমেন্টের দ্বিতীয় দরজাটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা, ফিরল ভিকোর দিকে। 'তোমার বোধহয় দেরি করা ঠিক হবে না। সময় খুব কম পাবে।'

'মারবেই যদি, সামনে থেকে মারো,' বলল ভিকো। 'পিঠে গুলি খেতে রাজি নই আমি।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা, ছুঁড়ে দিল ভিকোর দিকে। 'এগুলো রাখতে পারো।'

চওড়া হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভিকোর মুখ। 'মাঝেমধ্যে ঈশ্বর তাহলে মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেয়! সব মিলিয়ে এ যেন আবার বিশ্বাসী হয়ে ওঠার জন্যে যথেষ্ট।' খোলা দরজা দিয়ে লাফ দেয়ার আগে রানার কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল সে, সরু একটা নালায় নেমে তীরবেগে ছুটল। নালাটা এঁকেবেঁকে খানিকদূর এগিয়ে একটা ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেছে। তাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা, তারপর রিভলভার খুলে খালি করল, রাউন্ডগুলো ফেলে দিল ছুঁড়ে। ঠিক তখুনি আরেকবার গর্জে উঠল কারবাইনগুলো।

কয়েক মিনিট পর ফিরে এল ডন হোমায়রা, খোলা দরজাটা দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'কি ঘটেছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'ঠিক যা ঘটার,' বলল রানা। 'ভিকো পালিয়ে গেছে।'

দরজার সামনে, ট্রেনের নিচে, উদয় হলো ফার্নান্দেজ। ওদের কথাবার্তা শুনছে। ডন হোমায়রা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তাকে গুলি করোনি কেন?'

'চেষ্টা করেছি।' পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে বাড়িয়ে ধরল সে। 'দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, শালার রিভলভারে গুলি ছিল না।'

ডন হোমায়রার চোখে আগুন জ্বলে উঠল, তার দিকে পিছন ফিরল রানা। নিজের ঘোড়া লক্ষ্য করে ছুটল ফার্নান্দেজ, ট্রুপারদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ছে। ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে রানা, ট্যালবটকে দেখতে পেয়ে বেঞ্চের ওপর তার পাশে ধপ করে বসে পড়ল।

'ওখানে এত উত্তেজনা কিসের?' জিজ্ঞেস করল ট্যালবট।

'ভিকো পালিয়েছে।'

ট্রেন আবার ছুটতে শুরু করার পর মৃদু কণ্ঠে ট্যালবট বলল, 'ভিকো পালিয়েছে, আমার জন্যে এটা কোন নতুন খবর নয়, সিনর রড। এরকম কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে সে আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। সন্দেহ নেই, দুটো চরিত্রের মধ্যে প্রচুর মিল আছে। কিন্তু কাউকে পালাতে সাহায্য করা আর নিজে পালানো, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কে বলল আমি পালাতে চাই?' নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে। 'যদি উল্টোটা ঘটে, তুমি কি খুব অবাক হবে, ট্যালবট?'

খানিকক্ষণ চিন্তা করল বুড়ো ট্যালবট। 'আপনার ওপর আস্থা রেখেই বলছি, সিনর, খুবই অবাক হব। আমার ধারণা ডন হোসে হোমায়রাকে এখনও আপনি চিনতে পারেননি।'

তর্কের মধ্যে না গিয়ে প্রসঙ্গ বদল করল রানা, 'ওখানে পৌঁছুনোর পর তোমার শীলামণিকে একবার দেখতে চাই...'

'হোমায়রা যদি জানতে পারে তাহলে প্রথমবারই শেষবার, মনে রাখবেন। সে চায় না তার লোকেরা তার শত্রুর সাথে মেলামেশা করুক।'

মারমুখো হয়ে উঠল রানা। 'খবরদার, আমাকে তার লোক বলবে না!'

'দুঃখিত,' একটা ঢোক গিলে বলল ট্যালবট। 'আমার ভুল হয়ে গেছে, সিনর।'

শান্ত হলো রানা। 'একটা কথা পরিষ্কার জানবে, ট্যালবট। আমি একটা বিপদের মধ্যে আছি বটে, কিন্তু সেটা থেকে কেউ ফায়দা লুটতে চাইলে তাকে পস্তাতে হবে। আমি হোমায়রার কাজ করতে রাজি হয়েছি কেন জানো? এই এলাকায় আরও কি কি অন্যায় অত্যাচার চলছে আমাকে জানতে হবে।'

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ট্যালবট, রানাকে যেন এই প্রথম দেখছে সে। 'জানলেন, তারপর?'

'তারপর আমার কাজ শুরু হবে। তার মধ্যে একটা, তোমার মুক্তি। তোমার সমস্যা বাড়ি ফিরতে পারছ না, এই তো? কিছু টাকা-পয়সা দরকার, তাহলে সীমান্তের এপারে ভদ্রভাবে টিকে যেতে পারো, ঠিক?'

মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা ঝাঁকাল ট্যালবট। 'আর আপনার সমস্যা, সিনর?'

'আমার কোন সমস্যাই নেই।'

'কিন্তু হোমায়রা জানে আপনি মাসুদ রানা।'

'জানে। সেজন্যে ওকে কিছু খেসারত দিতে হবে।'

'সেটা কি হতে পারে?'

'তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসই হবে সেটা।'

'প্রাণ?'

'তার সোনা।'

চার

'আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, সিনর,' রানাকে বলল ট্যালবট।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা, বহুদূর পিছনে ফেলে আসা ধোঁয়ার অস্পষ্ট রেখা জানিয়ে দিচ্ছে কোন্ পথ ধরে এগিয়ে এসেছে ট্রেন, আশপাশের পাহাড় প্রাচীর থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে হুইসেলের করুণ বিলাপ। মানব বসতির অস্তিত্ব ঘোষণা করছে শুধু টেলিগ্রাফ পোলগুলো, রেললাইনের সাথে সমান্তরাল রেখায় রয়েছে ওগুলো, দুর্গম পথটাকে চিহ্নিতকরণের উপকরণ হিসেবে কাজ করছে, পথটা পাহাড়শ্রেণীর নিম্নাংশের ঢালগুলো বেয়ে নেমে গেছে হারমোজার দিকে।

ক্যানিয়নের নিচটা কাঁকর, নুড়ি আর বোল্ডারের রাজ্য, সকালের রোদে উজ্জ্বল। এখানে সেখানে গোটা কয়েক বিবর্ণ কাঁটাঝোপ। এরইমধ্যে নিষ্প্রাণ পাথুরে জমি থেকে গরম ভাপ উঠতে শুরু করেছে।

স্টেশনে পৌঁছে সমস্ত তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল ডন হোমায়রা। তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এক এক করে লাগেজগুলো নামানো হলো। কিশোরী ইন্ডিয়ান মেয়েটাকে কোথাও দেখল না রানা। জিজ্ঞেস করতে রুচি হয় না, তবু কৌতূহলেরই জয় হলো।

একগাল হেসে ডন হোমায়রা বলল, 'তুমি যে ওর প্রতি আকৃষ্ট, সে আমি প্রথমেই টের পেয়েছি, রড। পাবে, পাবে। ওকে কি আর আমার জন্যে বাঁচিয়েছি! দিন পনেরোর জন্যে নিয়ে গেছে ফার্নান্দেজ, তারপর পাঠিয়ে দেবে। তখন ও তোমার। তুমি আমার খাস নওকর, তোমার ভোগবিলাসের দিকে একশোবার নজর রাখব আমি!' রানার দিকে পিছন ফিরে নিজের লোকদের ধমক লাগাল সে, 'হাঁ করে দেখছ কি? গাড়িটা নামাও!'

'ওদের বলো, গাড়ির রঙ একটু যদি চটে, সব ক'টার ছাল তুলব আমি।'

'তাড়াতাড়ি আঞ্চলিক ভাষাটা শিখে ফেলো হে,' জবাব দিল ডন হোমায়রা। 'কারণ খনিতে পৌঁছেই ওদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবে তুমি।'

দড়ি-দড়া খুলে ট্রেন থেকে নামানো হলো শেভ্রোলে। গাড়িটার নাকে হাত বোলাল রানা, যেন ওটা একটা ঘোড়া। স্টেশনের বাইরের পাম্প থেকে এক বালতি পানি নিয়ে এল ও, হুড অর্নামেন্ট খুলে রেডিয়েটরে ঢালল, তারপর হুইলের পিছনে এমন ভঙ্গিতে বসল যেন ওটা একটা সিংহাসন।

'দেখো-দেখো,' কৌতুকের হাসি নিয়ে ট্যালবটকে বলল ডন হোমায়রা, রানার দিকে একটা আঙুল তাক করে আছে। 'একদম বাচ্চা!'

'আস্তে বলুন,' তার কানের কাছে ফিসফিস করল ট্যালবট। 'উনি যেন শুনতে না পান।'

ঠিক তখুনি পাহাড়ের ওদিক থেকে একটা বাকবোর্ডকে ছুটে আসতে

দেখা গেল, এক জোড়া ঘোড়া যেন উড়িয়ে আনছে। লোহায় মোড়া চাকা মেঠো পথে ছড়ানো পাথরগুলোকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।

চালক যেন গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী থেকে উঠে আসা মহাশক্তিধর হারকিউলিস। চওড়া কার্নিস স্ট্র হ্যাটের নিচে ওটা একটা কুৎসিত কর্কশ বেয়াড়া মুখ। কোমরে স্ট্র্যাপের সাথে রয়েছে রিভলভার আর কারট্রিজ বেল্ট। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে, শুধু হাঁটু দুটো সামান্য ভাঁজ হলো, গোটা শরীর একটুও ঝাঁকি খেল না, ছুটে এসে দাঁড়াল ডন হোসের সামনে। মাথা থেকে হ্যাটটা নামাল।

'দেরি করে পৌঁছুলে,' বলল ডন হোমায়রা। 'তোমার জন্যে আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি আমি, হ্যামার।'

'খনিতে ঝামেলা হয়েছিল, ডন হোসে,' বলল হ্যামার, গলার আও-য়াজটাও তার বাজখাঁই।

'সিরিয়াস?'

'মিটিয়ে ফেলেছি।' হাতুড়ির মত শক্ত মুঠো উঁচু করে দেখাল হ্যামার।

'গুড,' বলল ডন হোমায়রা। 'তুমি আমার তার পেয়েছিলে?'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে রানার দিকে তাকাল হ্যামার। 'নতুন মাল—এটার কথাই বলেছেন?'

ডন হোমায়রা তাড়াতাড়ি বলল, 'সিনর রড, প্রয়োজনের সময়, সরাসরি আমার নির্দেশে দায়িত্ব পালন করবে। লোকজনকে কন্ট্রোল করার কাজটা, আগের মত তোমার হাতেই থাকছে, হ্যামার।' খনিতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব কখনোই একজনের ওপর ছেড়ে দেয় না সে। তার নেক নজরে থাকার জন্যে আগের মতই চেষ্টা করবে হ্যামার, আর প্রতিদ্বন্দ্বী রানা সারাক্ষণ অস্থির করে রাখবে হ্যামারকে, এ-ধরনের একটা প্ল্যান আগেই করে রেখেছে সে।

'আরে-আরে,' চেঁচিয়ে উঠল হ্যামার, ট্যালবটকে দেখতে পেয়েছে। 'বুড়ো গাধাটা দেখছি ফিরে এসেছে!' বিপুলবিক্রমে ট্যালবটের দিকে ছুটে এল সে, সন্দেহ নেই খেলাচ্ছলে দু'চার ঘা লাগাবার ইচ্ছে। রানা বাধা হয়ে মাঝখানে দাঁড়াল।

'বুড়ো গাধাটার নাম মি. ট্যালবট। আমার নাম মি. রড। তোমার?'

'হ্যামার,' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

'তোমার পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম, সিনর হ্যামার।' সুন্দর করে হাসল রানা, হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'যথেষ্ট ছেলেমানুষি হয়েছে,' তাড়া লাগাল ডন হোমায়রা। 'বাকবোর্ড লোড করো তোমরা। সময় কম।'

একটা প্যাকিং কেস দু'জন মিলে তোলার জন্যে রানা আর ট্যালবট ঝুঁকল। ওদেরকে দেখানোর ছলে হ্যামার একাই একটা কেস অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিল দু'হাতে।

তাচ্ছিল্যের সাথে হাসল সে। 'কোত্থেকে দু'জন মেয়েলোককে ধরে

এনেছেন, ডন হোসে! অ্যাই, জলদি করো, তোমাদের জন্যে সারাটা দিন নষ্ট করতে পারব না।'

বাকবোর্ডে কেসটা রেখে ফিরে এল সে, ঠেলে সরিয়ে দিল ট্যালবটকে, প্যাকিং কেসটার একটা দিক ধরল, তারপর টান দিয়ে কেড়ে নিতে চাইল রানার হাত থেকে। ছাড়ল না রানা, শক্ত করে ধরে রাখল, ডান বুটের ডগা দিয়ে সজোরে মারল হ্যামারের হাঁটুর নিচে। ওখানে সামান্য একটা আঘাতই চোখে সর্ষে ফুল দেখাবার জন্যে যথেষ্ট। এক পায়ে হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে গেল হ্যামার, অশ্রাব্য গাল বেরিয়ে আসছে বিকৃত মুখ থেকে। দেখেও না দেখার ভান করল রানা, একাই প্যাকিং কেসটা রেখে এল বাকবোর্ডে। তারপর হ্যামারের দিকে ফিরল সে। 'দুঃখিত, ওখানে তুমি ছিলে বুঝতে পারিনি,' শান্তভাবে বলল ও।

সাবধানে এক পা এগোল হ্যামার, বিশাল হাত দুটো সামনে বাড়ানো। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ডন হোসে, 'হ্যামার—বাদ দাও!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছু হটল হ্যামার, ধিকিধিকি জ্বলছে লাল চোখ জোড়া। 'আপনি যা বলেন, ডন হোসে।'

'বাকবোর্ড নিয়ে পিছনে থাকো, হ্যামার,' শেভ্রোলের পিছনের সীটে ওঠার সময় বলল ডন হোমায়রা। সামনের সীটে রানার পাশে বসল ট্যালবট। গাড়ি নিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে এল রানা, ট্যালবটকে একটা সিগারেট দিল।

বুড়ো নিচু গলায় বলল, 'কি করতে যাচ্ছিলেন—আত্মহত্যা?'

'হ্যামার?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'গ্রানিট পাথরের একটা বড়সড় টুকরো, ঠিক জায়গায় বাড়ি মারো, একেবারে মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে যাবে।'

'তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি, রড,' পিছন থেকে বলল ডন হোমায়রা।

'আমি চেয়েছিও তাই,' জবাব দিল রানা, ট্যালবটের উদ্দেশে একটা চোখ টিপল।

সাহস আর শক্তি যতই থাক, রানা জানে, সত্যিকার লড়াই বাধলে হ্যামারের সাথে টিকতে পারবে এমন পুরুষ খুব কমই আছে। ও নিজেও পারবে বলে মনে করে না, কিন্তু পারবে কি পারবে না এই সংশয় থেকে যে চ্যালেঞ্জটা মনের ভেতর পাখা ঝাপটায় সেটার মাহাত্ম্য ট্যালবটের মত লোক কোন দিন বুঝবে না। ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে দৈত্যের হাত থেকে বাঁচার উপায় হয় না।

সীটে হেলান দিল রানা, দিনের তাপ কাবু করছে ওকে, ছোট হয়ে আসছে চোখ দুটো। প্রচণ্ড উত্তাপে এরইমধ্যে ঝাপসা দেখাতে শুরু করেছে পাহাড়ী এলাকা, চারপাশের সব কিছু আকৃতি হারাচ্ছে। পাহাড়শ্রেণীর যতই ওপরে উঠল ওরা, প্রকৃতি ততই হয়ে উঠল নিরেট নিষ্প্রাণ। চারদিকে শক্ত-কঠিন লাভার বিস্তার, বিশাল পাথুরে প্রাচীরগুলো পাকানো রশির মত, ঢেউ খেলানো পথ, অনুর্বর। সোনা বাদ দিলে, ভাবল রানা, কে জানে আর কিসের আশায় মানুষ এখানে পড়ে থাকে!

'ট্যাঙ্কে ছয় ক্যান গ্যাস আছে,' এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার চিৎকার, পিছন ফিরে হ্যামারের দিকে তাকাল। 'চিরকাল চলবে না। এদিকে গ্যাস পাবার উপায় কি?'

'উপায় আমি,' পিছনের সীট থেকে বলল ডন হোমায়রা। 'আমার খনিতে একটা ট্যাঙ্ক আছে।'

নিজেকে বলে রাখল রানা, রিজার্ভ গ্যাস থেকে খানিকটা কোথাও সরিয়ে রাখতে হবে। ওর ঘোড়ার জন্যে হোমায়রার ছোলার ওপর নির্ভর করে থাকা উচিত হবে না।

'এখন পর্যন্ত কোন গাড়িকে পাশ কাটাতে দেখলাম না,' বলল রানা।

'কেন, সিনরকে কেউ বলেনি আমরা ওল্ড ওয়েস্ট-এ রয়েছি?' হেসে উঠল ট্যালবট।

ডন হোমায়রাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'রাস্তাটা পাকা হবে কবে?'

'নরকের আগুন নিভলে,' ফিসফিস করে বলল ট্যালবট, ডন হোমায়রা যাতে শুনতে না পায়। দু'জনেই ওরা গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

'এত হাসির কি হলো?' জিজ্ঞেস করল ডন হোমায়রা।

কাঁধ ঝাঁকাল দু'জন একসাথে, ফলে আরেকচোট হাসল ওরা। কোন কারণ না থাকলেও রাগে ফুলতে লাগল ডন হোসে। তার দৃষ্টিতে বিদেশী মাত্রই পূর্ণ বয়স্ক শিশু।

এক ঘণ্টা পর একটা পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে আরেক দিকে চলে এল গাড়ি, সেই সাথে ওদের চোখের সামনে উন্মোচিত হলো সোনালি এক বিশাল উপত্যকা, রোদ আর উত্তাপে এতই উজ্জ্বল যে তাকিয়ে থাকলে ব্যথা করে চোখ। একপাশে খাড়া গা নিয়ে সুদীর্ঘ রিজ, শৈলশিরাগুলো চোখা আর উঁচু-নিচু, পরিষ্কার আকাশে আঁকাবাঁকা রেখা টেনেছে, নিরেট নিষ্প্রাণ কাঠিন্যের ভেতরও ফুটে রয়েছে অবিশ্বাস্য রকম সৌন্দর্য।

'লোকে নাম দিয়েছে,' বলল ট্যালবট, 'ডেভিল'স স্পাইন।'

'দেখে মনে হচ্ছে দুর্ভেদ্য দুর্গ!' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রানা।

'প্রাচীন কালে তাই ছিল বটে। বলা হয় ওটার ওপরে কোথাও বিধ্বস্ত অ্যাজটেক শহর আছে।'

তারপরই গুলি হলো, শব্দ এবং প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল দ্রুত। সাথে সাথে ব্রেক করেছে রানা, চোখের ওপর দু'হাতের ছায়া নিয়ে চারদিকে চোখ বোলাল।

'সম্ভবত কোন শিকারী,' মন্তব্য করল ডন হোমায়রা।

'অসম্ভব,' ফিসফিস করল ট্যালবট।

ছোট একজোড়া পনি নিয়ে পাহাড় টপকে নেমে এল দু'জন ইন্ডিয়ান। লাল ফ্ল্যানেল শার্ট আর বহুরঙা আঁটো পাজামা পরে আছে, প্রায় ইউনিফর্মের মত দেখতে, লম্বা চুল লাল ফ্ল্যানেল দিয়ে পিছন দিকে এক করে বাঁধা, হাতের ভাঁজে একটা করে রাইফেল। একজন তার জিনের ওপর ফেলে রেখেছে ছোট

একটা হরিণের ধড়।

'বললাম না শিকারী,' ওদেরকে আশ্বস্ত করতে চাইল ডন হোমায়রা।

ঢাল বেয়ে নেমে আসছে তারা, তীরবেগে। লাগাম না টেনে, দাঁড়িয়ে পড়া গাড়িটার দিকে এমনভাবে আসছে যেন চড়াও হতে চায় বা কোন মেসেজ দেয়ার জন্যে একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াবার ইচ্ছে।

শ্লথগতিতে গাড়ি নিয়ে সামনে এগোল রানা। ইন্ডিয়ানদের একজন তার রাইফেলের ব্যারেল সামান্য একটু তুলল।

'সাবধান, রড,' সতর্ক করে দিল ডন হোমায়রা। 'এদের সাথে আমরা লাগতে চাই না।' কিন্তু রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়তেই রানা দেখল, ওয়েস্ট ব্যান্ড থেকে রিভলভার বের করেছে সে। সাথে কোল্ট না থাকায় নিজেকে নগ্ন-লাগল ওর।

অকস্মাৎ শকুনের মত তীক্ষ্ণ একটা মনুষ্যকণ্ঠ শোনা গেল, কিন্তু ভাষাটা রানার অজানা। পরমুহূর্তে পাহাড়ের মাথায় তৃতীয় ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল, চওড়া ঢালে ধুলোর মেঘ তুলে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। প্রায় চোখের পলকে প্রথম আর দ্বিতীয় ঘোড়সওয়ারকে পিছনে ফেলল সে, লাগাম টেনে ধরায় প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল তার ঘোড়া। শেভ্রোলের পাশে থামল। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ডন হোমায়রার দিকে।

হিংস্র চেহারার একজন ইন্ডিয়ান, নিখুঁত লাটিম আকৃতির মুখ, যেন খয়েরি পাথর কেটে তৈরি। চওড়া লাল একটা রুমালে কপাল আর মাথা ঢাকা, যদিও কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কালো চুল পতাকার মত উড়ছে বাতাসে। পরনে রঙচটা কালো আলখিল্লা, হাঁটু পর্যন্ত গুটানো। হাতে তৈরি কর্কশ হাইড বুট পায়ে।

নিস্তব্ধতার ভেতর উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল পরিবেশ, গাড়ির পাশে নৃত্যরত পনিগুলো পায়ের কাছে ধুলোর ছোট ছোট ঘূর্ণি তৈরি করছে। ডন হোসে হোমায়রার চেহারা রীতিমত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান বীরপুরুষের দিকে পাল্টা দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে থাকল সে, চোয়ালের একটা পেশী বার কয়েক লাফাল। ইন্ডিয়ান সর্দারের স্লেটরঙা চোখে শান্ত সমাহিত দৃষ্টি, চোখের সরু ফাটলে উজ্জ্বল গোলাপী রোদ ঢুকলেও পাতা একচুল কাঁপল না পর্যন্ত। একেবারে হঠাৎ করেই সে তার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, ঘন ঘন দীর্ঘ লাফে চোখের পলকে সরে গেল দূরে, সঙ্গীরাও তাকে অনুসরণ করল, পিছনে শেভ্রোলেটাকে রেখে গেল ঘন ধুলোর ভেতর।

'জানোয়ারটাকে একদিন আমি খুন করব,' পিছন থেকে বলল ডন হোমায়রা। গিয়ার বদলে স্পীড তুলল রানা।

'খুব কঠিন একটা কাজ,' মন্তব্য করল রানা।

'অসভ্য অ্যাপাচী!' রাগে গরগর করছে ডন হোসে।

'কার্টিজ নাম—হুয়ান কার্টিজ,' পাশ থেকে বলল ট্যালবট। 'আগে কখনও অ্যাপাচীদের সাথে মোলাকাত হয়েছে, বস্?'

মাথা নাড়ল রানা। 'শুধু সিনেমায় দেখেছি।'

'তাহলে শুনুন...'

গাড়ি চালাচ্ছে রানা, ট্যালবট ওকে জ্ঞানদান করছে।

'অ্যাপাচী মানেই হলো শত্রু। আগেকার দিনে ওরা বাঁচতই যুদ্ধ করার জন্যে। অন্য গোত্রের সাথে, বসতিস্থাপনকারীদের সাথে, নিজেদের সাথে—একটা না একটা যুদ্ধের মধ্যে থাকতেই হবে ওদের। স্টেটস্-এর অ্যাপাচীদের যথেষ্ট পোষ মানানো গিয়েছিল। ফ্লোরিডার কোথায় যেন ওদের অনেককে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু বাকি যারা এদিকে চলে আসে...ওদের সাথে লাগলে আপনার জীবনে অভিশাপ নেমে আসবে। কার্টিজ একজন ব্রঙ্কো অ্যাপাচী, গোত্রটা এখনও তাদের প্রাচীন বিশ্বাস আর নীতি আঁকড়ে ধরে আছে। এক দুর্ঘটনায় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পিঠ ভাঙে, নাকোজারি মিশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, ওখানে খ্রীস্টান যাজকরা তাকে লেখাপড়া শেখায়।'

'পাগলামি আর কি!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ডন হোমায়রা।

'এখন সে পেশাদার না হলেও একজন ব্রাদার, হারমোজার ফাদার পামকিনের সাথে কাজ করে। সবার ধারণা বুড়ো ফাদার মারা গেলে তার জায়গায় কার্টিজই আসবে।'

'তার আগে আমার লাশ ফেলতে হবে,' হুঙ্কার ছাড়ল ডন হোমায়রা। 'কার্টিজ চিরিকাহুয়া অ্যাপাচী, ঈশ্বরের দুনিয়ায় সবচেয়ে হিংস্র পশু। আজও যারা বেঁচে আছে তাদের প্রত্যেককে গুলি করে মারা উচিত।'

'হারমোজায় ঠিক তাই করছে সে,' রানার কানে ফিসফিস করল ট্যালবট।

ওদের দিকে কটমট করে তাকাল ডন হোমায়রা। 'ফিসফাস করছ কেন?'

'সন্দেহ করবেন না,' হাসল রানা। 'দু'জন প্রবাসী নির্দোষ গল্পগুজব করছি খানিক।' ট্যালবটকে জিজ্ঞেস করল, 'খনিতে ইন্ডিয়ান যারা কাজ করে তারা অ্যাপাচী?'

মাথা ঝাঁকাল ট্যালবট। 'বেশির ভাগ চিরিকাহুয়া, দু'একজন মিমব্রেনোসও আছে।'

'এত সব তুমি জানলে কোত্থেকে?'

'রেমারিক আমার বন্ধু, তার কাছ থেকে। ছোকরা ত্রিশও পেরোয়নি, কিন্তু অ্যাপাচীদের সম্পর্কে তারচেয়ে বেশি কেউ জানে না। প্যারিস থেকে এসেছিল ওদেরকে নিয়ে একটা বই লেখার জন্যে, চাইনীজ রেস্তোরাঁয় শীলা হংকঙের ম্যানেজার শেষ পরিণতি।'

কয়েক মুহূর্ত পর উঁচু একটা ঢালের মাথায় উঠে এল গাড়ি, নিচের উপত্যকায় হারমোজা দেখা গেল। একটাই রাস্তা, দু'পাশে রোদে পোড়ানো ইঁটের তৈরি পঁচিশ-ত্রিশটা সমতল ছাদ নিয়ে ছোট-বড় বাড়ি। সাদা চুনকাম করা একটা চার্চ রয়েছে, একধারে বেল টাওয়ার। হোটেল ও রেস্তোরাঁটাই হারমোজার একমাত্র দোতলা, ঢালের মাথা থেকে পরিষ্কার চেনা গেল।

দীনহীন চেহারার ছেলেমেয়ের দল হাত বাড়িয়ে শেভ্রোলের পিছু পিছু ছুটল, পয়সা চায়। এক মুঠো খুচরো পয়সা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিল ডন

হোমায়রা, কুড়োবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাচ্চারা. তাই দেখে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে লাগল সে। হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল রানা। সামনেই ঝলমল করছে সাইনবোর্ডটা—শীলা হংকং। তার নিচে লেখা রয়েছে, চাইনীজ হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ।

গাড়ি থেকে নামল ওরা। ছড়ি ঘুরিয়ে রোদ আর উত্তাপকে শাসাল ডন হোমায়রা। 'এই শালার গরমে জান খারাপ হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় রোদ গুটোলে ঠাণ্ডা পড়বে, তখন খনিতে যাব আমি।' সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

ঢোকার মুখে রানার কনুই ধরে টানল ট্যালবট। 'প্রার্থনা করি প্রথমেই যাতে শীলার সাথে দেখা না হয় ওর,' নিচু গলায় বলল সে। 'কেউ কাউকে দেখতে পারে না।'

'পথ দেখাও হে,' ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল রানা। 'আমার হুইসেলটা ভেজাতে চাই।'

ভেতরে ঢুকে ডন হোমায়রাকে কোথাও দেখল না ওরা। পাথরের দেয়াল ঘেরা বড়সড় একটা কামরায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল দেখতে পাচ্ছে, তামা দিয়ে মোড়া বার রয়েছে এককোণে। এক যুবক ওদের জন্যে দুটো গ্লাসে বিয়ার ঢালল।

ট্যালবটকে দেখে হাসল যুবক, বলল, 'দ্বিতীয় ঈশ্বর এইমাত্র জানিয়ে গেল তুমি ফিরে এসেছ, বন্ধু। সে তার নিজের কামরায় উঠে গেল।' এই ছোকরাই যে রেমারিক বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার, ইংরেজী উচ্চারণে পরিষ্কার ফরাসী টান।

দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করল ট্যালবট। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'এরকম আরেক গ্লাস পেলে আবার আমি মানুষ হয়ে উঠব। আঁদ্রে রেমারিক, পিটার রড।'

করমর্দন করল ওরা, সহাস্যে আরও দুটো গ্লাস ভরে দিল ফরাসী যুবক। 'তোমরা যে আসছ সে-খবর হোমায়রার টেলিগ্রামে আগেই জেনেছি আমরা, মশিয়ে রড।'

রেমারিক সহজ-সরল, ভীরু প্রকৃতির যুবক, অন্তত চেহারা দেখে তাই মনে হলো রানার। একটু বেশি রোগা, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল চেহারায় শিল্পীসুলভ ভাব এনে দিয়েছে। এ-ধরনের লোককে অপছন্দ করা কঠিন।

ট্যালবটের দিকে ফিরল রানা। 'এরপর কি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যালবট। 'শুনলেন না রেমারিক বলল দ্বিতীয় ঈশ্বর। তার মেজাজ-মর্জির কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। সম্ভবত কাল সে আমাদেরকে খনিতে দেখতে চাইবে।'

'তার আগে পর্যন্ত কি হবে আমাদের?'

জবাব দিল রেমারিক, 'হোমায়রা রাতের জন্যে তোমাদের কামরা রিজার্ভ করেছে। সিঁড়ির মাথায় বাদামী দরজা।'

'তারপর,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমরা যখন খনিতে কাজ করব?'

'কর্মচারীদের থাকার আলাদা ব্যবস্থা আছে, খনিতেই।'

বিয়ার শেষ করল রানা। 'যদি কিছু মনে না করো, ওপরে যাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে পুরো এক হপ্তা ঘুমাইনি।'

রেমারিকের দিকে ফিরে হাসতে শুরু করল ট্যালবট। 'আসার পথে যা ঘটল না! ভিকো তার দলবল নিয়ে ট্রেন দখল করতে চেয়েছিল। তারপর কার্টিজের সামনে পড়ে গেলাম। বুঝতেই পারছ, তোমার দ্বিতীয় ঈশ্বর খোশমেজাজে নেই।'

'কি বললে? কার্টিজকে দেখেছ?' আগ্রহে চকচক করে উঠল রেমারিকের চোখ। 'কেমন আছে সে?'

'সত্যি কথা যদি বলি, তার চোখে রক্ত নাচছে। দেখো, এই বলে রাখলাম, বেশি দেরি নেই, হোমায়রা তার একটা ব্যবস্থা করবে।'

রেমারিক গম্ভীর হলো। 'সেদিন দ্বিতীয় ঈশ্বরের পতন ঘটবে,' ভবিষ্যদ্বাণী করল সে।

'কেন, তোমার ধারণা কার্টিজ বিপজ্জনক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কানের পিছন থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল রেমারিক। 'সময় গড়িয়েছে, সময়ের সাথে সব কিছু বদলেছে, কিন্তু বন্ধু,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে, '—না, অ্যাপাচীরা বদলায়নি। মাটির বুকে ওদের মত বিপজ্জনক যোদ্ধা আর কেউ কখনও হাঁটেনি। হোমায়রা একদিন টের পাবে কার্টিজকে ঘাঁটানো তার উচিত হয়নি। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

তাল মেলাল ট্যালবট, 'যা বলছে বুঝেশুনেই বলছে আঁদ্রে, অ্যাপাচীদের সম্পর্কে ওর চেয়ে ভাল কেউ জানে না।'

'এই মুহূর্তে আমি অবশ্য শুধু,' বলল রানা, 'আট ঘণ্টা টানা ঘুম আর ঘুমের আগে গোসলের ব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী।'

বার থেকে হলের আবছা অন্ধকারে বেরিয়ে এল রানা, জ্যাকেটটা খোলার জন্যে থামল, ঘাম গড়িয়ে পড়ায় পিট পিট করছে চোখ। পোর্চ থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল, স্পার-এর ঝুনঝুন আওয়াজ তুলে ভেতরে ঢুকল কেউ।

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা। দোরগোড়া থেকে তাকিয়ে আছে যুবতী এক মেয়ে। রাস্তার প্রকট সাদা আলো তার একহারা কাঠামো ঘিরে রেখা তৈরি করেছে। বুটের সাথে গোড়ালিতে স্পার, পরে আছে কালো চামড়ার স্প্যানিশ রাইডিং ব্রীচ, গলার কাছে খোলা সাদা শার্ট, আর একটা কর্ডোবান হ্যাট।

তবে অন্ধ করে দিল মেয়েটার মুখ। এমন কালো হরিণ চোখ বঙ্গললনা ছাড়া আর কারও এই প্রথম দেখছে রানা, মুখের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়। সুগঠিত নাক, নাকের ফুটো, ঠোঁট, কপাল, সব মিলিয়ে যেন আলাদা একটা সপ্রাণ অস্তিত্ব। একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার তার এই অনায়াস ভঙ্গি এক নিমেষে অনেক কিছু ফাঁস করে দেয়—নিজের ওপর অবিচল আস্থা রয়েছে তার, দিন কাটে অফুরান আনন্দে, ঈশ্বর তাকে প্রশান্তি দান করেছেন। চার চোখের মিলন হতে না হতেই অযৌক্তিক উত্তেজনায় কাতর হয়ে পড়ল রানা।

তারপর রানার মনে পড়ল। হ্যাঁ, ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই মেয়েটার সাথে মিল আছে, কিন্তু চেহারায় নাকি ভঙ্গিতে, কিংবা আর কিছুতে,

ঠিক খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হলো, মিল খুঁজতে যাওয়াটাই যেন মস্ত এক বোকামি। আদর্শ সৌন্দর্যের এই হলো বৈশিষ্ট্য, তুলনা চলে না।

'তুমি সিনর রড?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'পিটার রড, যে আমার কাকার খনি চালাবে? আমি শীলা ফনটেলা কনসুয়েলা দ্য হোমায়রা।'

মাথা থেকে হ্যাট নামাল শীলা, ব্লু-ব্ল্যাক চুল বেরিয়ে পড়ল, মাথার পিছনে মস্ত এক খোঁপা। হাতটা বাড়াল সে আশ্চর্য বালকসুলভ ভঙ্গিতে, প্রয়োজনের চেয়ে কয়েক সেকেন্ড বেশি মুঠোর ভেতর ধরে রাখল রানা, কোমল আঙুলের শীতল স্পর্শ ওকে যেন অবশ করে দিল।

'জানো, এই প্রথম মনে হচ্ছে মেক্সিকোয় এসে আমি ভুল করিনি,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা।

চেহারায় যে দৃষ্টিটা ফুটল স্থায়ী হলো মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই হাসল শীলা। গলার ভেতর থেকে সুমধুর হাসি উথলে বেরিয়ে এল, যেন পানির ওপর দিয়ে ভেসে এল জাহাজের ঘণ্টাধ্বনি।

পাঁচ

চোখ মেলল সন্ধ্যায়। ঘুমের মধ্যে গা থেকে সরে গেছে চাদর, কয়েক মুহূর্ত অর্ধ-নগ্ন পড়ে থাকল বিছানায়, চোখ পিটপিট করে দেখল সিলিঙে গাঢ় হচ্ছে ছায়া, তারপর ছোট্ট লাফ দিয়ে মেঝেতে দাঁড়াল। ঝুল-বারান্দার দিকে জানালাটা খোলা, মৃদু বাতাসে পর্দা দুলছে।

উঁকি দিয়ে দেখল হোটেলের পিছন দিককার উঠান খালি। বাথরুম একটা আছে বটে, কিন্তু পরিচ্ছন্ন নয় বলে মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। পাথরের মস্ত একটা টব থেকে দুটো টিনের বালতিতে পানি ভরে ঝুল-বারান্দায় নিয়ে এল ও, এক এক করে দুটো বালতিই খালি করল মাথায়।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছল, ট্রাউজার আর শার্ট পরে দাঁড়াল ভাঙা আয়নার সামনে, হাত বোলাল খোঁচা খোঁচা দাড়িতে। একটা সুটকেস থেকে বেরুল রেজার আর শেভিং ক্রীম।

দাড়ি কামানো শেষ হয়েছে, নক হলো দরজায়। ভেতরে ঢুকল ডন হোসে হোমায়রা, হাতে রানার হোলস্টার আর কোল্ট পয়েন্ট থ্রী-টু। বিনাবাক্যব্যয়ে সেগুলো বিছানায় ফেলল সে।

'বিচিত্র ঘটনা আজও তাহলে ঘটে,' মন্তব্য করল রানা।

'ওতে আট রাউন্ড আছে, মাই ফ্রেন্ড, তুমিও জানো। আমাদের সাথে যদি কার্টিজের গোলমাল বাধে, আট রাউন্ড কি যথেষ্ট বলে মনে করো?'

কোল্টটা দ্রুত চেক করল রানা; 'এক রাউন্ডই যথেষ্ট। আবার আট রাউন্ডও খুব কম হতে পারে। নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর।'

'তোমাকে বিশ্বাস করা আমার ভুল হবে?'

'কাউকে বিশ্বাস করাই ভুল।'

হেসে উঠল ডন হোমায়রা। 'এখানে কিছু পেসো আছে, নিচের সেলুনে বসলে লাগতে পারে। এটা দান নয়, তোমার বেতনের অগ্রিম। দেখো, পোকার খেলে হেরে বোসো না।'

'পোকারে আমি হারি না,' বলল রানা। 'আমার গাড়ির জন্যে গ্যাস দরকার, তার কি ব্যবস্থা?'

'অস্ত্র দিয়ে তোমাকে বিশ্বাস করেছি, কারণ আমার কাছে আরও আছে,' বলল ডন হোমায়রা। 'তাছাড়া, অস্ত্র ছাড়াও আমার আরেকটা শক্তি আছে—হ্যামার। কিন্তু এখুনি তোমাকে আমি গ্যাস দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি না, কারণ অতিরিক্ত গ্যাস পেলে তোমার মাথায় হারমোজা ত্যাগ করার কুবুদ্ধি গজাতে পারে। তারচেয়ে, বন্ধু, ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস করো।' করিডরে বেরিয়ে গেল সে, তারপরও কিছুক্ষণ তার হাসির আওয়াজ পেল রানা।

কোথায় কে যেন গিটার বাজাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে, সুরের সাথে তাল রেখে কোমল সুরে এবার একটা মেয়ে গান ধরল। ভাষা বা সুর কিছুই পরিষ্কার নয়, অচেনা, তবু রানার মনটা আকুলিবিকুলি করতে লাগল। ঘরে থাকা দায় হয়ে উঠল, ঝুল-বারান্দায় টেনে নিয়ে এল সুরটা ওকে।

সন্ধ্যা নেমেছে, কিন্তু এখনও চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়নি। যতদূর দৃষ্টি যায়, রুক্ষ প্রকৃতি নিশ্চল পড়ে আছে। আকাশের গায়ে আঁকাবাঁকা খাঁজ কেটেছে পাহাড়ের চূড়াগুলো, গোটা আকাশ এত বিরাট যে নিজেকে পতঙ্গের মত ক্ষুদ্র মনে হলো, বন্ধ হয়ে আসতে চাইল দম। মেক্সিকোর এই দুর্গম পার্বত্য এলাকায় কোনও দিনও আসা হত না ওর, যদি না রাহাত খান হার্মিসের ফেলা জালের বাইরে থাকার পরামর্শ দিতেন ওকে। বিদেশ-বিভূঁই, সাবধানে থাকতে হবে ওকে, কারণ বিপদে পড়লে কোথাও সাহায্য পাওয়া যাবে না। পরিবেশটা বৈরী, সন্দেহ নেই, লোকগুলোও সুবিধের নয়। তবে শুধু যে ডন হোমায়রা আর হ্যামার বাস করে এখানে তা নয়, ট্যালবট আর রেমারিকের মত লোকও আছে। আছে কার্টিজ, যার সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানে না ও। আর আছে শীলা···

হঠাৎ করে, প্রায় বিদ্যুৎ চমকের মত, গানের প্রতিটি শব্দ অর্থময় হয়ে উঠল। কখনও শোনেনি রানা, তবে ইংরেজী গান। সুরটাও অচেনা, কিন্তু ব্যাকুল আহ্বান ঠিকই অস্থির কাতর করে তুলল ওর হৃদয়টাকে। মেয়েটা তার মানসপ্রিয়কে ডাকছে। রোদন ভরা কোমল করুণ সুর, গানের কথাগুলো প্রেমের রসে সিক্ত। প্রিয় হে, ধূমকেতু, তোমার আগমনে পুলকে আবেগে অধীর হলাম, সার্থক হলো নিঃসঙ্গ এই জীবন, কিন্তু বিদায়ের ঘণ্টা যখন বাজবে তখন বিচ্ছেদ যাতনা সইব কিভাবে। কাজেই হে মহানুভব, কাছে এসে চুমো খাও ঠোঁটে, মন্ত্র দাও কানে, অঙ্গজ্বালা নেভাও, তোমার ছাপ রেখে যাও আমার সর্বাঙ্গে, হয়তো তাহলেই শুধু তোমাকে হারাবার শক্তি আর সাহস পাব আমি।

শোল্ডার হোলস্টার পরে চুল আঁচড়াল রানা, বেরিয়ে এল কামরা থেকে। গানের সুর অনুসরণ করে গায়িকার খোঁজ বের করে ফেলল ও।

বিল্ডিংটার শেষ মাথায়, ঝুল-বারান্দার রেলিঙে কোমর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শীলা দ্য হোমায়রা, গিটারের তারে আঙুল, দৃষ্টি বহুদূর সূর্যাস্তের দিকে। কণ্ঠস্বর স্ফটিকের মত স্বচ্ছ।

ওর পায়ের শব্দে দ্রুত ঘাড় ফেরাল শীলা, তারের ওপর আঙুলের শেষ আঁচড় উচ্চকিত ঝন ঝন আওয়াজ তুলে সন্ধ্যার বাতাসে মিলিয়ে যেতে লাগল। মাথায় নীল একটা ম্যানটিলা বা ওড়না জড়িয়েছে সে, কাঁধ ঢাকা শালটা টকটকে লাল। পরনে কালো সিল্ক, বুক আর গলার কাছে চৌকো করে কাটা। বডিসের কিনারায় সাদা আর নীল ইন্ডিয়ান এমব্রয়ডারি।

ঠোঁট টিপে হাসল, ঠিক যেন মোনালিসা। 'গোসল করে এখন ভাল লাগছে তোমার?'

'তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ, দেখেই পিছন ফিরে দাঁড়াই।'

'তোমার ড্রেসের প্রশংসা করতে হয়। ঠিক এরকম কিছু আশা করিনি।'

'কি আশা করেছিলে, উত্তেজক চাইনীজ কিছু? ওগুলোও আমি পরি, যদি মূড ভাল থাকে, কিন্তু আজ রাতে স্প্যানিশ অনুভূতিগুলো আমাকে পেয়ে বসেছে।'

'তোমার কোন্ অংশটা নিয়ে তুমি বেশি গর্বিত—স্প্যানিশ হাফ, নাকি চাইনীজ হাফ?'

'নিজেকে যখন চীনা বলে মনে করি, গর্ব হয় আমি একটা প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতার উত্তরাধিকারিণী বলে, শুধু একটা জিনিস ভাল লাগে না।'

'কি সেটা?'

'ওরা গানপাউডার আবিষ্কার করেছিল,' বলল শীলা, কাছে সরে এল। রানা জানে না ঠিক কি আশা করবে ও। তবে শীলা শুধু ওর শরীরের একটা পাশ স্পর্শ করল, যেখানে শোল্ডার হোলস্টার মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। 'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আর যখন নিজেকে স্প্যানিশ মনে করো?' প্রশ্ন করল রানা, এড়িয়ে গেল প্রশ্নটা।

'বাবা বলতেন, হোমায়রাদের একজন স্প্যানিশ আর্মাডায় ছিল।'

'কিন্তু তারা ইংরেজদের কাছে হেরে যায়।'

'সব সময় বিজয়ী হওয়াটাই কি সবকিছু?' ম্লান হাসল শীলা। 'আমার কথা থাক। তোমার কথা বলো।'

'কি মনে হয়?'

'জেদি, গর্বিত, অসম্ভব একটা চরিত্র। শুধু নিজের পথেই চলতে চাও। এখন নাহয় আমার কাকার পেশী হিসেবে কাজ করছ, কিন্তু আগে-পরে তোমার পেশা কি? নিশ্চয় টের পেয়েছ কাকা তোমাকে হ্যামারের বিরুদ্ধে খেলাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাকার হয়ে শেষ যে আমেরিকান লোকটা কাজ করত, তার পরিণতি সম্পর্কে শুনেছ?'

'শুনেছি।'

'তোমার কি ধারণা, অন্যেরা দুর্ভাগা হলেও তোমার ওপর ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আছে?'

হেসে ফেলল রানা। 'হ্যাঁ।'

'তুমি আমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিলে না। তুমি এত রহস্যময় কেন?'

শীলার একটা হাত ধরল রানা। 'কাকে ডাকছিলে, বলবে?'

'ধূমকেতু জানে,' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল শীলা, আগেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। একটু জোর খাটিয়ে তাকে নিজের দিকে ফেরাল রানা, আলতোভাবে চুমো খেল ঠোঁটে, বুক জোড়া এক হতে দিল না শোল্ডার হোলস্টার ব্যথা দিতে পারে ভেবে। এর আগেও একটা মেক্সিকান মেয়েকে চুমো খেয়েছে রানা, সাথে সাথে হাত দিয়ে বুক ঢেকে ফেলেছিল সে। কিন্তু শীলা শুধু হাসল, তারপর সামান্য একটু ঘুরল যাতে দ্বিতীয়বার রানা চেষ্টা না করে।

এক সেকেন্ডের জন্যে রানার মনে হলো হৃৎপিণ্ডটাই বোধহয় খুব জোরে লাফাচ্ছে, তারপর বুঝল—না, সন্ধ্যার বাতাসে ভর করে ড্রাম পেটানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। কান পাততে মানুষজনের গলাও পাওয়া গেল। এক কি দেড়শো গজ দূরে একটা গর্তের ভেতর থেকে আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠল। আবছাভাবে শিবিরটাও চোখে পড়ল এবার।

'ইন্ডিয়ান?'

'চিরিকাহুয়া অ্যাপাচী। গান গেয়ে প্রার্থনা করছে ওরা, স্কাই গডকে বলছে কাল সকালে যেন সূর্যকে ফিরিয়ে দেন তিনি। ওদের ওখান থেকে ঘুরে আসতে চাও? সাপারের আগে হাতে সময় আছে।'

নির্জন কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে পিছনের উঠানে। কাউকে পাশে নিয়ে নামতে চাইলে জায়গায় কুলোয় না, তবু রানার পাশেই থাকল শীলা। ধীরে ধীরে নামল ওরা। চারদিক ঘেরা উঠানের মেঝে স্লেট-রঙা পাথরের, দেয়ালগুলোও। মাথার দিকটা ফাঁকা, প্রচুর বাতাস আসছে। রানার একটা হাত ধরল শীলা, চাপ দিল মৃদু। নিজেকে রানার বিপুল ঐশ্বর্যের একচ্ছত্র অধিপতি বলে মনে হলো, যে সম্পদ হারালে কষ্ট হবে ওর।

কথা হলো না, উঠান থেকে বিল্ডিঙের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। দু'জনের দুটো হাত এক হয়ে আছে।

খানিক পর শীলা বলল, 'ট্যালবটের কাছে শুনলাম কিভাবে কাকা তোমাকে ফাঁসিয়েছে। মানুষটা যে...'

'হ্যাঁ, খুব বিরক্তিকর। শুনেছি ওর সাথে তোমার বনে না। ডন কি চায় তুমি বিদায় হও?'

'হ্যাঁ, আমার অস্তিত্বই মেনে নিতে পারে না। প্রস্তাবটা দিয়ে রেখেছে,

আমি রাজি হলেই কিনে নেবে হোটেল।'

'কিন্তু তুমি এখানে থাকতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল শীলা। 'আমার যখন বারো বছর বয়স, বাবা আমাকে মেক্সিকো সিটির কনভেন্ট স্কুলে পাঠিয়েছিল। পাঁচ বছর ছিলাম ওখানে। যেদিন ফিরলাম, মনে হলো এই জায়গা ছেড়ে আমি কখনও কোথাও যাইনি।'

'কেন সে-কথা মনে হলো? কি আছে এখানে?'

'সে কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না। কি নেই এখানে? ছেলেবেলার স্মৃতি, আমার কৈশোর, যৌবনের প্রথম স্বপ্নগুলো, সবই তো এখানে। আমার মা আর বাবা। আর কারও কথা জানি না, আমি একজনের অপেক্ষায় ছিলাম—দেখো না, কিভাবে যেন দুনিয়ার এই এক কোণে, দুর্গম এই প্রান্তরে খুঁজে খুঁজে ঠিকই চলে এসেছে সে। আর কোথাও কেন আমি যাব, বলো? এখানকার প্রকৃতিকে আমি চিনি, আমার সব আশাই পূরণ করে সে…'

'যে চলে এল, তাকে আটকাতে…,' শেষ করতে পারল না রানা, ওর মুখে হাতচাপা দিল শীলা।

বলল, 'ও-সব কথা থাক না এখন। কি জানো, শহর আমার একদম পছন্দ নয়। তোমার?'

'খুব একটা না।'

'আমাকে খুশি করার জন্যে মিথ্যে কথা বলছ।'

রানা নিরুত্তর।

'মেক্সিকোর ধরন-ধারণ সম্পর্কে জানো তুমি, রড? এখানকার লোকেরা দুর্ধর্ষ অপরাধীদের মধ্যে থেকে হিরো নির্বাচন করে। তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানকার লোকেরাও কি তাই করে, রড?'

শীলা কি ওর পরিচয় আন্দাজ করতে চাইছে? কিছু কি শুনেছে সে? 'তোমার কাকা,' বলল রানা, 'ভিকোর চেয়ে অনেক বড় অপরাধী।'

'হ্যাঁ,' বলল সে, হেসে উঠল, ছেড়ে দিয়ে আবার ধরল রানার হাত, আবার ছেড়ে দিল।

রানার ইচ্ছে হলো আবার তাকে চুমো খায়। চোখ রাঙাল নিজেকে, বাড়াবাড়ি কোরো না, সংযমী হতে শেখো।

'এদিকের একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল শীলা। 'পাথর চকমক করে, পাহাড় নাচে, আর সব কিছুর মধ্যে আবছা নীল কুয়াশার ছোঁয়া আছে? আমার কি মনে হয় জানো? শহর থেকে বহুদূরে এই সব দুর্গম এলাকাগুলো আসলে ঈশ্বরের মুখ, যা কিনা খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের দেখতে পাবার নয়।'

রানা টের পায়নি আবার কখন ওর কনুইয়ের ওপরটা ধরেছে শীলা, চোখ নামিয়ে হাতটার দিকে তাকাল ও। লালচে হলো শীলা, এবং মুহূর্তের জন্যে আত্মপ্রত্যয়ের আড়ষ্ট ভাবটুকু ছেড়ে গেল তাকে। বিষণ্ন, লাজুক ক্ষীণ হাসি ফুটল সারা মুখে। রানার মনে হলো দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও।

কুমারী মেয়েদের চোখে যে-ধরনের সন্ত্রস্ত একটা ভাব থাকে, প্রায় তার কাছাকাছি একটা ভাব লক্ষ করল রানা শীলার চোখে। এবার তার হাতে হাত রেখে ও-ই চাপ দিল একটু। তার হাসি আরও গভীর আর উজ্জ্বল হলো, এখন আর সন্ত্রস্ত লাগছে না, যেন নিজের ওপর আবার সে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে।

কথা না বলে ঘুরল ওরা, তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। চামড়ার তৈরি তিনটে তাঁবু, গোলাপী একটা অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে। একপাশে তিন কি চারজন লোক বসে গান করছে, তাদের একজন বাড়ি মারছে ড্রামে। আরেক দিকে রাতের খাবার তৈরিতে মেয়েরা ব্যস্ত।

চারদিক থেকে ছুটে এলেও, হঠাৎ আড়ষ্টভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েকটা বাচ্চা। হাসল শীলা। 'নতুন লোক দেখলে ওদের আর পা চলে না।' নিজেই এগিয়ে গেল সে, তাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আনন্দ মুখর হয়ে উঠল দলটা। কিছুক্ষণ অ্যাপাচীদের ভাষায় ভাব বিনিময় চলল, তারপর রানার দিকে ইঙ্গিত করল শীলা। 'নতুন, কিন্তু লোক ভাল—তোমাদের বন্ধু হতে চায়।' সবাইকে নিয়ে সবচেয়ে বড় তাঁবুটার দিকে এগোল সে, কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই তাঁবুর পর্দাটা গুটিয়ে ওপর দিকে উঠে গেল। বেরিয়ে আসা লোকটাকে অসম্ভব ভঙ্গুর মনে হলো, যেন জোরে বাতাস লাগলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। তার পা হরিণের চামড়া দিয়ে ঢাকা, পরনে ফালি কাপড় দিয়ে তৈরি আঁটো পাজামা আর নীল ফ্ল্যানেল শার্ট, একই কাপড়ের পট্টি বেঁধেছে মাথার চারদিকে। সাদা চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, মুখটা চোখা আর ধারাল, সরু ঠোঁট, সরল নাক, গায়ের চামড়া সিরিশ কাগজের মত। চোখমুখ বুদ্ধিদীপ্ত, সেখানে দুর্বলতার চিহ্নমাত্র নেই। মহাজ্ঞানীর বা কোন সাধুর অবয়ব, যে-কোন মানদণ্ডে মানবশ্রেষ্ঠদের একজন।

আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে তার সামনে মাথা নত করল শীলা, তারপর তার দু'গালে চুমো খেল। রানার দিকে ফিরল সে। 'আমার পরম বন্ধু ও, তামবারু—চিরিকাহুয়াদের শেষ বংশধর।'

হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা, অনুভব করল ইস্পাতের মুঠোর ভেতর আটকা পড়েছে সেটা, চাপ দিলেই গুঁড়িয়ে যাবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, বিশুদ্ধ ইংরেজীতে কথা বলল বুড়ো লোকটা, কণ্ঠস্বর যেন সান্ধ্যকালীন বনভূমিতে দমকা বাতাস। 'তুমি পিটার রড। হোমায়রার নতুন লোক।'

'সবাই তাই বলছে বটে,' জবাব দিল রানা।

তামবারুর চোখ থেকে স্যাঁৎ করে যেন একটা ছায়া সরে গেল। মৃদু ঝাঁকি দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল সে।

চারদিক তাকাল রানা। 'জায়গাটা বেশ সুন্দর তো।'

ওর পিছনে ঝুঁকল তামবারু, শুকনো একটা ডাল তুলে নিয়ে এক ঝটকায় ভাঙল, ঠিক যেন একটা আগ্নেয়াস্ত্র কক্ করা হলো। বিদ্যুদ্বেগে আধপাক ঘুরল রানা, হাতে যাদুমন্ত্রের মত চলে এসেছে কোল্টটা।

মৃদু হাসল তামবারু, ঘুরল, ফিরে গেল নিজের তাঁবুতে। শিক্ষাটা দান করা হলো শীলাকে। এমন একজন লোককে সে নিয়ে এসেছে, যে কিনা নিজের

হাতের মতই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।

শীলার দিকে তাকাল রানা। তার চেহারা গম্ভীর, অগ্নিকুণ্ডের আগুন নাচানাচি করছে দু'চোখে। হেসে উঠে অস্ত্রটা হোলস্টারে ভরল ও। 'তোমার বন্ধু তামবারু দেখছি খুব কৌতুকপ্রিয়।'

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল শীলা, তারপর বলল, 'এবার হোটেলে ফিরতে হয়। সাপারের সময় হয়েছে।'

তাঁবুর দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল ওরা, শীলার একটা হাত ধরল রানা। 'কত বয়স হবে?'

'কেউ বলতে পারে না, তবে এমন কয়েকটা যুদ্ধে ছিল যখন আমার বাবারও জন্ম হয়নি।'

'নিশ্চয় খুব বড় যোদ্ধা ছিল।'

বিধ্বস্ত পাঁচিলের কাছাকাছি একটা পাথুরে ঢালের ওপর থামল ওরা। 'একশতকের শুরুর দিকে পনেরোজন বীরসেনাকে নিয়ে আরিজোনায় হামলা চালিয়েছিল ওল্ড নানা। তখন তার বয়স ছিল আশি। তামবারু ছিল বীরসেনাদের একজন। দু'মাসেরও কম সময়ে এক হাজার মাইল পাড়ি দেয় তারা, আমেরিকানদের আটবার হারায়, নিরাপদে ফিরে আসে মেক্সিকোয়—তবে পিছু পিছু ধাওয়া করে আসে এক হাজার সৈনিক আর কয়েকশো সিভিলিয়ান। তামবারু কি ধরনের যোদ্ধা ছিল বুঝতে পারছ তো?'

'তবু শেষ পর্যন্ত অ্যাপাচীরা হেরে যায়, এবং সেটাই স্বাভাবিক ছিল।'

'পরাজয় অবধারিত জেনেও লড়ে যেতে দুর্দান্ত সাহসের দরকার হয়।'

শীলা জানতে পারল না, কথাটা শুনে গর্ব অনুভব করল রানা।

সাপারের পর বারে নেমে এল রানা, কোণের একটা টেবিলে রেমারিকের সাথে বসে থাকতে দেখল ট্যালবটকে। পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বের করে ফাঁটতে শুরু করল সে। 'পোকার চলবে নাকি, বস?'

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল রানা। 'আপত্তি নেই।'

যেন অদৃশ্য একটা সঙ্কেত পেয়ে, একটা ট্রেতে বিয়ারের বোতল আর গ্লাস নিয়ে উদয় হলো শীলাও, সহাস্যে বলল, 'ম্যানেজারকে অনুমতি দেয়া আছে, ইচ্ছে করলে বিশেষ অতিথিদের সাথে মেলামেশা করতে পারবে সে।'

'আমি আপনার অনুগত ক্রীতদাস, মাদাম!' বলে শীলার হাতে চুমো খেল রেমারিক। তার চুল এলোমেলো করে দিয়ে কিচেনের দিকে ফিরে গেল শীলা।

ক্ষীণ একটু ঈর্ষা বোধ করল রানা। বলল, 'বুড়ো তামবারুর সাথে পরিচয় হলো। আশ্চর্য একটা মানুষ।'

'গ্রেট ম্যানদের সেরা গুণগুলো ওর মধ্যে দেখতে পাবে তুমি,' বলল রেমারিক। 'অ্যাপাচীদের সম্পর্কে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি।'

'ট্যালবট বলল, তুমি একজন এক্সপার্ট।'

কাঁধ ঝাঁকাল ফরাসী যুবক। 'ইউনিভার্সিটিতে অ্যানথ্রোপলজি পড়েছি,

তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম বাড়ি থেকে যতটা সম্ভব দূরে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করার পর থিসিস লিখব। ভেবেছিলাম ছ'মাসের বেশি থাকতে হবে না। কিন্তু পরে দেখলাম, এ-ধরনের মজার চাকরি ত্রিভুবনে পাব না, থেকে গেলে অসুবিধে কোথায়?' হাসতে লাগল সে। 'শীলা দ্য হোমায়রার মত বসের অধীনে চাকরি পাওয়া, কোন সন্দেহ নেই আমার পুণ্যবান চোদ্দপুরুষের আশীর্বাদ আছে আমার ওপর।'

ঈর্ষার খোঁচাটা আবার অনুভব করল রানা। ফরাসী যুবক আর শীলার মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? শীলা এমন ভঙ্গিতে তার চুল নেড়ে দিয়ে গেল, ওটা যেন কোন ব্যাপারই না।

সবার বিয়ার শেষ হলে পকেট থেকে কিছু পেসো বের করে টেবিলে ফেলল রানা। 'আরেক রাউন্ড হবে নাকি?'

'উইথ প্লেজার,' বলে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল ট্যালবট।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'আজ যার সাথে রাস্তায় আমাদের দেখা হলো, হুয়ান কার্টিজ, তার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'অনেস্টলি, জানি না। আরও কম বয়েসে দুর্নাম ছিল ওর। লোকে বলে অন্তত তিনজনকে খুন করেছে। ছুরি নিয়ে মারামারি, ইত্যাদি। পাহাড়ী এলাকায় আবার আইন কি! যুগটা পুরানো হলে আমার ধারণা নাম করত সে। তবে দুর্নাম যা কিছু কিনেছে সব নাকোজারিরির ধর্মযাজকদের হাতে পড়ার আগে।'

'তারমানে কি সত্যি বদলে গেছে লোকটা?'

'তাকে দেখে তোমার কি মনে হলো?'

চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'আমার মনে হলো, নিজস্ব কায়দায় হোমায়রাকে ত্যক্ত করছে সে। যেন ধৈর্য হারাবার আহ্বান জানাচ্ছে।'

'কিন্তু তা সে কেন…?'

'জানি না। হয়তো আঘাত করার অজুহাত খুঁজছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রেমারিক। 'রক্তের বন্যা এ-দেশে নতুন নয়। চারশো বছর ধরে শুধু হত্যাকাণ্ডই চলছে।'

'অথচ তুমি রয়ে গেলে।'

'গেলাম!'

ট্যালবট বিয়ার নিয়ে ফিরে আসার পর রানা দেখল দূরে ছোট একটা টেবিলে বসে আছে ডন হোমায়রা। কাপড় বদলেছে সে, চুরুট ধরিয়েছে। ছড়ি দিয়ে টেবিলে আঘাত করল, সাথে সাথে উঠে গেল রেমারিক। ডন হোমায়রার কথা শোনার পর কিচেনের দিকে চলে গেল সে, ফিরে এল ট্রে-তে করে শ্যাম্পেনের বোতল আর গ্লাস নিয়ে।

রেমারিক ওদের কাছে ফিরে এলে রানা বলল, 'শ্যাম্পেন? এখানে?'

'শুধু দ্বিতীয় ঈশ্বরের জন্যে আমদানী করা হয়,' ব্যাখ্যা করল রেমারিক। 'এ তার অনেকগুলো প্রচার-কৌশলের একটা, আর সবার সাথে তার যে একটা

পার্থক্য আছে সবাইকে তা বুঝিয়ে দেয়া।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বারে ঢুকল হ্যামার, মনে হলো নেশা করেছে। ডন হোমায়রাকে দেখে হ্যাট নামাল সে, সশ্রদ্ধভঙ্গিতে মাথা নত করল। কাছে ডেকে তার কানে কানে কি যেন বলল ডন হোমায়রা। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল হ্যামার, সিধে হলো, বারের সামনে পৌঁছে ঘুসি মারল কাউন্টারে। 'সার্ভিস দেয়ার জন্যে কে আছ!'

রেমারিক চেয়ার ছাড়ার আগেই কিচেন থেকে বেরিয়ে এল শীলা। কাউন্টারের পিছনে দাঁড়াল সে, হ্যামারের দিকে সরাসরি তাকিয়ে, হাত দুটো কোমরে। 'প্রথমে গলা নামাও। তারপর ওটা খুলে ঝুলিয়ে রাখো হলে, অন্যগুলোর সাথে।' হ্যামারের কোমরে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো রিভলভারটা ইঙ্গিতে দেখাল সে।

কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল হ্যামার, ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে। একটু পর রিভলভার রেখে ফিরে এল, তার সামনে মদের একটা বোতল আর গ্লাস রাখল শীলা।

গ্লাসে মদ ঢেলে ঢক ঢক করে পান করল হ্যামার, ঠোঁটের দুই কোণ থেকে গড়িয়ে পড়ল দুটো ধারা। ডন হোমায়রার দিকে তাকাল রানা, ঠাণ্ডা চোখে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে দিল সে, গ্লাসে শ্যাম্পেন ভরল, চুমুক দিল ছোট্ট করে।

বিয়ারের গ্লাসে ঠোঁট ঠেকাল রানা, ঠক্ করে নামিয়ে রাখল টেবিলে। 'ওই শ্যাম্পেনের দাম কত?'

'এক বোতল পঁচিশ পেসো,' বলল রেমারিক।

ঝুঁকে ডান পায়ের বুট খুলল রানা, সুখতলিটা তুলে ভাঁজ করা একটা নোট বের করল। বুটটা আবার পরে নিয়ে নোটটা মেলে ধরল রেমারিকের দিকে। 'আমেরিকান বিশ ডলারে হবে?'

'হয়ে বেশি।'

'তাহলে দেরি করছ কেন? জলদি একটা বোতল আর গ্লাস নিয়ে এসো। শীলাকে বলো আমাদের পার্টিতে যোগ দিক।'

ডন হোমায়রার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল রেমারিক, চেয়ার পিছনে ঠেলে দিয়ে দাঁড়াল, প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল কিচেনের দিকে।

একটু পরই নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল সে, পিছনে ট্রে হাতে শীলা, ট্রে-তে শ্যাম্পেনের বোতল আর গ্লাস। হঠাৎ করেই আনন্দ-ফুর্তিতে সরগরম হয়ে উঠল পরিবেশ, সংক্রামক ব্যাধির মত মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল হাসি। চট্ করে একবার ডন হোমায়রার দিকে তাকাল রানা, ওর দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সাত গ্রামের মোড়ল।

'আমি প্রস্তাব করছি,' ট্যালবট মুখ খুলতেই চুপ হয়ে গেল সবাই। 'বোতল খোলার সম্মান দানবীর পিটার্ব রডকে দেয়া হোক...'

সবাই হাততালি দিয়ে উঠে কোরাস গাইল, 'সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়ে গেল প্রস্তাব।'

হাত বাড়াল রানা, কালো একটা ছায়া পড়ল টেবিলে। পথ থেকে ঠেলে

রেমারিককে সরিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড হাতে বোতলটা ধরল হ্যামার। 'আমার বহুদিনের সাধ শ্যাম্পেন কি জিনিস জানব।'

বোতলের ঘাড়টা শক্ত করে ধরে রাখল রানা। 'তাহলে যাও, নিজের পয়সা দিয়ে কেনো।'

'কেনার কি দরকার, তুমি যখন আমাকে সাপ্লাই দেয়ার জন্যে রয়েছ এখানে?' মেক্সিকান দৈত্য টেবিল থেকে বোতলটা তোলার চেষ্টা করল। সবটুকু শক্তি দিয়ে টেবিলে সেটাকে রাখতে চাইছে রানা। টেবিলের কিনারা ধরল হ্যামার, চেষ্টা করল উল্টে দেয়ার। রানাও গায়ের ভর চাপিয়ে ঠেকিয়ে রাখল।

চেয়ারের ওপর আধাআধি ঘুরে যাচ্ছে রানা, পলকের জন্যে দেখল আগের মতই কামরার কোণে বসে শান্তভাবে নিজের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে ডন হোমায়রা। আগে দেখা যায়নি, এখন তার ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি। গোটা ব্যাপারটা যে পরিকল্পিত, বুঝতে পারল ও। হ্যামারের ধারণা, ডন হোসের নির্দেশে পিটার রডকে শিক্ষা দিচ্ছে সে। আসলে ডন হোমায়রার জানার খুব আগ্রহ রানার তুলনায় কত বেশি শক্তি রাখে হ্যামার।

হ্যামারের একটা বাহু আঁকড়ে ধরল শীলা, টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল। 'প্লীজ,' আবেদন জানাল সে। 'আমার এখানে মারামারি কোরো না।'

বোতল না ছেড়েই শীলার দিকে ঘাড় ফেরাল হ্যামার, তার মুখে এক দলা থুথু ফেলল।

বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল রেমারিক। দমিয়ে রাখা সমস্ত রাগ টগবগ করে ফুটে উঠল রানার মাথার। ঝট করে পিছনে হেলান দিল ও, টেবিল থেকে তুলে নিল সবটুকু চাপ। ভারসাম্য হারাল হ্যামার, বোতল ছেড়ে দিয়ে টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল সে। বোতলটা তুলল রানা, দড়াম করে ভাঙল বৃষস্কন্ধে।

ছিটকে সরে গেছে সবাই। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে সিধে হলো সে। ছোঁ দিয়ে একটা চেয়ার মাথার ওপর তুলল রানা, বিশাল মাথা আর ঘাড়ের ওপর সজোরে ভাঙল সেটা।

মুখ মুছছে শীলা, কাঁদছে।

দ্বিতীয়বার সিধে হলো হ্যামার, এক হাত দিয়ে রক্ত মুছছে শান্তভাবে, যেন কিছুই হয়নি তার, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

রানা দ্রুত এগোল। পিছিয়ে যাবার ভঙ্গি করল হ্যামার, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুসি চালাল রানার চোয়ালে।

মেঝেতে এক মুহূর্ত পড়ে থাকল রানা, ঘুসির আঘাতে চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। উঠে বসতে যাবে, টের পেল ওর একটা পা ধরে মোচড় দিচ্ছে হ্যামার, হা-হা হো-হো করে হাসছে সে।

মেঝেতে গড়াতে শুরু করল রানা। হঠাৎ শক্ত করল শরীর, মুক্ত পা দিয়ে হ্যামারের তলপেটে লাথি মারল। কোঁক্ করে উঠে পিছিয়ে গেল হ্যামার, কিন্তু পরমুহূর্তে এগিয়ে এল আবার। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে দাঁড়াল রানা, বাধা

দিতে দেরি করায় দমাদম ঘুসি খেল কয়েকটা মুখে আর পাঁজরে।

দ্বিতীয়বার ধরাশায়ী হলো রানা, এবার ধীর ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে রানার মুখ লক্ষ্য করে বুট তুলল হ্যামার। খপ্ করে দু'হাতের ভেতর ধরল রানা পা-টা, মোচড় দিল। ওর পাশে দড়াম করে আছাড় খেল হ্যামার। দু'জনেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে গড়াতে শুরু করল। জোড়া শরীর বাড়ি খেল দেয়ালে, নিজেকে হ্যামারের ওপর তুলে ফেলল রানা। শত্রুর গলার দিকে হাত বাড়াল। অকস্মাৎ হ্যাঁচকা টানে পিছন দিকে ছিটকে পড়ল ও।

দাঁড়াল রানা, একই সাথে দাঁড়াল হ্যামারও। ডান হাতের শক্ত মুঠো মিসাইলের মত ছুটে এসে আঘাত করল মেক্সিকানের মুখে। ফাটা ঠোঁট থেকে ছিটকে রক্ত বেরিয়ে এল। আঘাত করেই নাগালের বাইরে পিছিয়ে গেছে রানা, তারপর আবার—সেই একই ভঙ্গিতে শক্ত মুঠো ডান হাতের ঘুসি, ট্রেড মার্কসহ সর্বস্বত্ব যেন একা ওরই সংরক্ষিত।

আবারও পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ব্যর্থ হলো এবার, পা পিছলে যাওয়ায় ওর কপালের পাশে ডান হাত দিয়ে হাতুড়ির বাড়ি মারার সুযোগ পেল হ্যামার। ঘন ঘন হোঁচট খেয়ে পিছু হটল রানা, পিঠের সাথে ধাক্কা লাগল খোলা জানালার, নিচু কার্নিসে নিতম্ব, পড়ো পড়ো অবস্থা। পলকের জন্যে ঘুরে উঠল মাথাটা।

কোন রকমে তাল সামলে সিধে হলো ও, ইতোমধ্যে এগিয়ে এসেছে হ্যামার। সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, হ্যামারের দিকে কাঁধ বাড়াল। দুটো শরীর এক হলো, হ্যামারকে কাঁধে নিয়ে সিধে হলো রানা, খোলা জানালা দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল হ্যামার।

কার্নিসে উঠল রানা, টালমাটাল অবস্থা। বারান্দায় যখন নামল, তাড়াহুড়ো করে মেঝেতে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে হ্যামার, যেন রানার মোক্ষম একটা ঘুসির সামনে নিজেকে পরিবেশন করার জন্যে অস্থির। খালি হাতে লড়াইটা উপভোগ করছে রানা। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে মারল ও, সরাসরি নাকের ওপর। দু'জনের ওজন সমান সমান হলে বারান্দা থেকে উড়ে যেত হ্যামার। তার বদলে খসে পড়ল সে।

কয়েক মুহূর্ত রাস্তায় পড়ে থাকল হ্যামার। বারান্দার একটা থাম ধরে নিজেকে সামলাল রানা, অসুস্থ বোধ করছে। ধীরে ধীরে দাঁড়াল হ্যামার, লাইটপোস্টের নিচে টলমল করছে পা, মুখ নয় যেন রক্তাক্ত মুখোশ, ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে চোখ, তারপরই তার হাত চলে গেল কোমরের বেল্টে।

সামনে বাড়ল দৈত্য, হাতে ঝিক্ করে উঠল ছুরির ফলা।

হ্যামারের পিছনে, গাঢ় অন্ধকার থেকে ভূতের মত বেরিয়ে এল বৃদ্ধ তামবারু। বিরতিহীন, সাবলীল ভঙ্গিতে একবার মাত্র নড়ে উঠল তার ডান হাত—রানার পায়ের সামনে কাঠের বারান্দায় খ্যাঁচ্ করে গেঁথে গেল একটা ছুরি। ঝুঁকল রানা, ছুরিটা নিয়ে সিধে হলো। 'আয় শালা, খুন করে ফেলব!'

ছুরির সাথে নয়, ছুরি নিয়ে খালি হাতের সাথে লড়তে চেয়েছিল হ্যামার। দ্রুত ঘুরল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

পায়ের শব্দ শুনে ঘুরল রানা, দেখল দরজা দিয়ে বারান্দার এক কোণে বেরিয়ে এসেছে সবাই, লাইটপোস্টের আলোয় হতচকিত, বিহ্বল দেখাচ্ছে ওদেরকে। সিঁড়ির গোড়ায় ওদের সাথে ডন হোমায়রাও রয়েছে। সেদিকে এগোল রানা, ছুরি ধরা হাতটা লম্বা করা।

হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটল ডন হোমায়রা, সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে ঘুরল, পালিয়ে গেল লেজ তুলে। কব্জিতে লোহার বজ্রআঁটুনি অনুভব করল রানা। বৃদ্ধ তামবারু ওর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে নিল, আরেক পাশে উদয় হলো শীলা।

কারণটা বুঝতে পারল না রানা, তখনও কাঁদছে শীলা। তামবারু আর শীলা ওকে মাঝখানে নিয়ে বারে ঢুকল, উত্তেজনায় নাচতে নাচতে সামনে এসে দাঁড়াল ট্যালবট।

'মাইরি বলছি, মি. রানা, এমন ভেলকি জীবনে দেখিনি! মারের ভয়ে দৈত্যটা সত্যি পালাল!'

'রানা?' শীলার বিস্মিত কণ্ঠস্বর। 'আমি তো জানি তোমার নাম পিটার রড। কে তুমি?'

হাসতে শুরু করে ঘাড় ফেরাতে গেল রানা, আবার ঘুরে উঠল মাথা। ভীষণ ক্লান্ত আর দুর্বল লাগছে, অন্ধকার হয়ে এল চোখের সামনেটা। ট্যালবট আর শীলা, দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলল ওকে।

ওয়াশিংটন, এফ.বি.আই. হেডকোয়ার্টার। অপরেশনাল ব্রাঞ্চের পদস্থ অফিসার জন হপকিন্স মার্কিন নাগরিক হলেও জন্মসূত্রে ফরাসী, ইউনিয়ন কর্সের সাথে তার গোপন সম্পর্ক দীর্ঘকালের। অফিসের দরজা বন্ধ করে ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র নাড়াচাড়া করছে সে।

বেশ কয়েকটা তথ্য এসেছে হাতে। হার্মিসের একজন সিনিয়র সদস্য হিসেবে তার দায়িত্ব তথ্যগুলোর মূল্যায়ন করা, এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া। একটা নিষ্কণ্টক টেলিফোন তুলে ডায়াল করল জন হপকিন্স। হার্মিসের আরেক সদস্যর সাথে কথা বলবে।

'সাদা একটা শেভ্রোলে,' কুশলাদি বিনিময়ের পর মিত্রকে জানাল সে। 'টেক্সাস থেকে সংগ্রহ করেছে রানা। রিকন্ডিশনড্ গাড়ি, ডিলার বলছে তার ধারণা ড্রাইভার দক্ষিণ দিকে যেতে পারে।'

'তারমানে মেক্সিকোয়?'

'ভেবে দেখো না, তুমি যদি রানা হতে, যেভাবে তাকে খোঁজা হচ্ছে, তুমিও কি যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে পালাবার কথা ভাবতে না?'

'ঠিক আছে, মেক্সিকো সিটিতে আমাদের লোককে এখুনি আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। পুলিস চীফদের কাছে গোপন একটা সার্কুলার পৌছে দেয়া কোন ব্যাপারই না। ওরা ঘুষ খেতে পছন্দ করে, আর আমরা মোটা টাকা অফার করব। সাদা শেভ্রোলে নিয়ে কোন বিদেশীকে দেখা গেছে কিনা, এই তো?'

'হ্যাঁ, দেখা পাওয়া গেলে ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, খবরটা আমার

কাছে পৌঁছুতে হবে সরাসরি। সার্কুলারে আরও কয়েকটা কথা থাকা দরকার—গাড়িটা চুরি করা, লোকটা বিপজ্জনক, এবং তার কাছে সম্ভবত আগ্নেয়াস্ত্র আছে।'

ছয়

ঝাপসা মেটে রঙ মরু বিস্তৃত হয়ে বহুদূর পাহাড়শ্রেণী পর্যন্ত চলে গেছে, ঘন ছায়ার ভেতর ক্যানিয়নগুলো এখনও অন্ধকার। দিনের এই সময়টাই সবচেয়ে ভাল, বালি আর পাথর ঢাকা প্রান্তর থেকে সূর্যতাপ বিদায় নেয়ার আগে ঠাণ্ডা আর শীতল বাতাস বইছে।

ট্যালবটের পাশে, শেভ্রোলের ড্রাইভিং সীটে বসেছে রানা, সারা শরীর টন টন করছে ব্যথায়। অসমতল ট্রেইল ধরে শ্লথ গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে ও—একটা কারণ, নিজের ওপর অবিচার করতে চাইছে না, তাছাড়া তামাটে একটা ঘোড়ায় চড়ে ওদের সাথে আসছে শীলা।

'কেমন বোধ করছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি আজ আমাকে সুদর্শন বলা যাবে না।' রানার মুখের ডান দিকটায় বড় একটা বেগুনি-লাল চিহ্ন, চেহারাটাকে অসুন্দর করে তুলেছে

'ওর সাথে লাগতে যাবার কোন মানে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'মানে? হাহ্!'

ট্যালবটের দিকে তাকাল শীলা। 'তুমি বলতে পারবে, ও কি প্রায়ই এরকম আত্মহত্যার তাড়নায় ভোগে?'

'শুধু কেউ যখন ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমা না চায়।' ট্যালবট একাধারে গম্ভীর ও গর্বিত।

সামনে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে পাথুরে স্তম্ভ, কোনটা মিনার আকৃতির, কোনটা খাড়া করা সুটকেসের মত দেখতে, যেন পাতা বাদ দিয়ে পাথরের তৈরি গাছপালা নিয়ে গভীর একটা জঙ্গল, সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে ট্রেইল, ঢুকে পড়েছে সংকীর্ণ একটা ক্যানিয়নে। মাঝখানটায় পিরিচ আকৃতি নিয়ে চওড়া হয়েছে ক্যানিয়ন, তারপর আবার খোলা প্রান্তরে মিলিত হবার আগে সরু হয়ে গেছে।

ঠিক ওখানটায় দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে ট্রেইল।

দাঁড়িয়ে পড়ল শীলা। 'এখান থেকে আমাদের পথ আলাদা। আমি সরাসরি খনিতে যাব। ফাদার পামকিন দিনকয়েক গ্রামে থাকবেন, তাঁকে কিছু ওষুধ পৌঁছে দেয়ার কথা হয়ে আছে। পরে হয়তো আবার দেখা হবে আমাদের?'

এঞ্জিন বন্ধ করল রানা। 'তার আগে তোমার সাথে আমার কথা হওয়া দরকার।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শীলা, ঘোড়ার পিঠে এক চুল নড়ল না সে। তারপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। 'বেশ।' দুলকি চালে সামনে বাড়ল তার ঘোড়া।

গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়ার পাশে চলে এল রানা, রেকাব ধরে হাঁটছে। 'কাল সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই আমি কোন অন্যায় বা বাড়াবাড়ি করে ফেলিনি, মানে তোমাকে নিশ্চয়ই আমি···'

'একটা চুমো খেয়ে যদি ধরে নিয়ে থাকো আরও ভাল কিছু পাবার পথ খোলসা হয়ে গেছে, তাহলে বলব অন্যায় চিন্তা। আমি তোমার উচ্ছ্বাসটুকু অনুমোদন করছি, কিন্তু সেটা কোন প্রতিশ্রুতি বহন করে না।'

'স্বীকার করছি, আমি যে-সব মেয়েদের সাথে মেলামেশা করেছি তারা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।'

'তুমি আড়ষ্ট হয়ে উঠছ কেন! কেমন লাল হয়ে যাচ্ছ।'

'অসম্ভব!'

'তাহলে হয়তো রোদ।' হাসল শীলা। 'শোনো, কথাটা তোমাকে বলাই ভাল।'

ঈর্ষার খোঁচাটা আবার অনুভব করল রানা। কি বলবে শীলা? কি ধরনের স্বীকারোক্তি করবে সে? ফরাসী যুবকের সাথে ওর সম্পর্ক কি এতদূর গড়িয়েছে যে···!

'রড—বা রানা—তোমার আসল নাম যাই হোক···,' ঘাড় ফিরিয়ে ট্যালবটের দিকে তাকাল শীলা, সে যে ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না নিশ্চিত হয়ে নিল। '···আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়েছিলাম। পুলিসের কাছে গোপন একটা অ্যালার্ম এসেছে। টেলিগ্রাফ অফিসে আমার বন্ধু আছে, তাই জানতে পেরেছি। খোঁজ করা হচ্ছে সাদা একটা শেভ্রোলে।'

'কে খুঁজছে—মানটু, নাকি দুবালিয়র?'

'ওদের কাছে এসেছে অ্যালার্মটা—এফ.বি.আই. থেকে।'

'সর্বনাশ! আর কে জানে?'

'টেলিগ্রাফার। ভাগ্য ভাল যে তোমার গাড়িটা সে দেখেনি। কিন্তু আমার কাকা তাকে নিয়মিত টাকা দেয়, বেতারে যাই আসুক সব তাকে জানাতে সে বাধ্য।'

'শহরে কি পুলিস আছে?'

'দু'জন। দু'জনই বুড়ো। কাকা না চাইলে মেসেজটা ওদের কাছে পৌঁছুবে না। আমাকে বলবে, কেন তারা খুঁজছে তোমাকে?'

'আমাকে নয়।' হাসল রানা। 'আমার গাড়িটাকে। অনেককেই ধার দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ হয়তো কোন অপরাধ করে থাকবে।'

'যখন মিথ্যে কথা বলো, শিশুর মত দুষ্টু লাগে দেখতে।' ঘোড়ার ঘাড়ে মৃদু চাপড় মারল শীলা। 'পরে তাহলে দেখা হবে। তখন হয়তো তোমার মুখে কিছু দেব আমি।'

'মুখে দেবে? কি?'

'আমার হাত,' বলে দ্রুত বেগে ঘোড়া ছোটাল শীলা দ্য হোমায়রা।

আধঘণ্টা পর সাদা শেভ্রোলে একটা ঢালের মাথায় উঠে এল, তারপরই সামনের পথটা অপ্রত্যাশিতভাবে দেবে গেছে, নেমে গেছে চওড়া একটা উপত্যকায়। ওদের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন ধাঁচে তৈরি একটা র‍্যাঞ্চ।

র‍্যাঞ্চের ভেতর চারদিকে সুফলা জমি, গোটা এলাকা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, গেটে মস্ত একটা তালা ঝুলছে। ভবনগুলো পুরানো হলেও নিয়মিত মেরামত আর যত্নের ছোঁয়া পেয়ে ঝকঝক তকতক করছে। রাইডিং বুট আর জিনস পরা একজন শ্রমিক ধূসর রঙের একটা মাদী ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাচ্ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে মুখ তুলল, কপালে হাত রেখে রোদ সরাল চোখ থেকে তারপর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির ভেতর।

শেভ্রোলে নিয়ে উঠানে ঢুকল রানা, থামল সিঁড়ির গোড়ায়। গাড়ি থেকে নামছে ও, সামনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে, কিসের সাথে যেন ঠোকর খেল। পড়ে যাচ্ছে, লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল রানা।

বছর তিনেক বয়স হবে মেয়েটার, ভেলভেটের কলার সহ নীল রাইডিং স্যুট দারুণ মানিয়েছে তাকে, বোতামগুলো চকচকে সোনার। ছোট্ট অসহায় দেবকন্যা, দোর্দণ্ড প্রতাপ সূর্যের দেশে মুখটা তার যেমন বড়বেশি ম্লান তেমনি চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়।

আলতোভাবে তাকে পায়ের ওপর দাঁড় করাল রানা, ঠিক তখনি সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এল এক মহিলা, দু'হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিল মেয়েটাকে। 'টেরেসা, এক কথা কতবার বলব তোমাকে?' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। 'ধন্যবাদ, সিনর।'

রোগা-পাতলা গড়ন মহিলার, কপালের দু'পাশে পাক ধরেছে চুলে, কালো ড্রেসে গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। কোন রকম অলঙ্কার নেই, প্রসাধনীর ব্যবহার নেই। চোখ দুটো অস্থির, ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাল, যেন কি একটা আশঙ্কায় সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত।

মাথা থেকে হ্যাট খুলছে রানা, পোর্চে উদয় হলো ডন হোমায়রা। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকল সে, কোন কথা বলল না। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে দ্রুত বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল মহিলা।

রানার দিকে ফিরল ডন হোমায়রা। 'তোমার সাথে খনিতে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখানে কিছু কাজ আগে সারতে হবে। ওখানে হ্যামারকে পাবে তুমি, সে-ই তোমাকে দেখিয়ে দেবে। আমি পরে আসছি।' রানার কথা শোনার জন্যে দাঁড়াল না সে, ঘুরে ভেতরে চলে গেল।

খারাপ কথা, হ্যামার আগেই পৌঁছে গেছে খনিতে, ভাবল রানা। শীলার নিরাপত্তার কথা ভেবে অস্বস্তিবোধ করল ও। ঘোড়া না এনে ওদের সাথে গাড়িতেই থাকতে পারত শীলা।

তাড়াতাড়ি গাড়িতে ফিরে এসে আবার রওনা হলো রানা। ট্যালবট পথ-

নির্দেশ দিল, পিছনে উপত্যকা ফেলে উঠে এল ঢালের গায়ে। রোদের মেজাজ গরম হচ্ছে, বুঝতে পারছে পিঠের শার্ট ভিজে গেছে ঘামে।

অবশেষে পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে আরেক উপত্যকার মাথায় বেরিয়ে এল ওরা। জীবনে এমন বেদনাদায়ক বসতি খুব কমই দেখেছে রানা। চারদিকে গু-গোবরের স্তূপ, তার মাঝখানে বিশ-পঁচিশটা ধসে পড়া ইঁটের ঘর। ঘরগুলোর সামনে খোলা একটা ল্যাট্রিন, নর্দমা উপচে রয়েছে।

ছোট্ট গ্রামের মাঝখানে একটা কুয়া, এক বালতি পানি তুলে মাটিতে নামাচ্ছিল এক মহিলা, এই সময় পৌঁছুল ওরা। আজকালকের মধ্যে বাচ্চা হবে তার, ফুলে ঢোল হয়ে আছে পেট। বালতি নামিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে, কোমরে হাত রেখে দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। তারপর আবার সে বালতি তোলার জন্যে ঝুঁকল।

গাড়ি থেকে নেমে বালতিটা তার হাত থেকে নিল রানা। 'কোথায় পৌঁছে দিতে হবে বলো,' আঞ্চলিক ভাষায় বলল ও, কান খাড়া করল শিক্ষক ট্যালবট না আবার ভুল ধরে।

নিঃশব্দে হাত তুলে রাস্তার ওপারটা দেখাল মহিলা, তার আগে আগে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা খুলল রানা। গ্রামে বোধহয় এটাই একমাত্র কামরা যার সবগুলো দেয়াল অক্ষত, তবে কোন জানালা নেই। আধো অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। তারপর দেখতে পেল লোলচর্মসর্বস্ব বুড়িটাকে, ছোট্ট একটা গর্তের ভেতর প্রায় নিভে যাওয়া আগুনে বসানো ছোট্ট একটা পাতিল পাহারা দিচ্ছে সে। এক কোণে ময়লা তেল চিটচিটে কয়েকটা ইন্ডিয়ান চাদর ভাঁজ করা রয়েছে, ওগুলোই সম্ভবত বিছানা। চৌকি বা অন্য কোন ফার্নিচার নেই। বালতিটা নামিয়ে রাখল রানা, ভাপসা গরম আর দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল ওর, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল বাইরে।

'এই পরিবেশে একটা কুকুরও থাকবে না,' গাড়িতে উঠে ট্যালবটকে বলল রানা। 'এদের জন্যে কেউ কিছু করে না কেন?'

'করে না মানে? সাধ্যমত যথেষ্ট করে শীলা। ফাদার পামকিনও করেন। তিনিই তো ওদের সেরা বন্ধু। কিন্তু ওরা ভূতে পাওয়া মানুষের মত ঘোরের মধ্যে জীবন কাটায়। ওদেরকে দিয়ে পনেরো থেকে আঠারো ঘণ্টা কাজ করায় হোমায়রা। এত কঠিন পরিশ্রম করতে হয় যে দুনিয়ার আর সমস্ত ব্যাপার ওরা ভুলে বসে আছে।'

গ্রামের আরেক মাথায়, একটা ঘরের বাইরে শীলার ঘোড়াটা দেখা গেল, পাশেই কার যেন বাকবোর্ড। ব্রেক করল রানা। 'খনিটা কি এখান থেকে আরও অনেক দূরে?'

'পাহাড়ের মাথা টপকালেই, তিন কি চারশো গজ।'

'তুমি হেঁটে চলে যাও, আমি পরে আসছি।'

রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল ট্যালবট, গাড়ি থেকে নেমে ঘরটার দিকে পা বাড়াল রানা, ঠিক তখুনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল শীলা। গাড়ির শব্দ পেয়েছে

সে। তাকে ক্লান্ত আর ম্লান দেখল রানা, মুখে ঘাম লেপ্টে রয়েছে। গাড়ি থেকে পানি ভর্তি ক্যান্টিন বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?'

'ও কিছু না, ঘরটার ভেতর অসম্ভব গরম।' হাতে পানি নিয়ে চোখে-মুখে ছিটাল শীলা।

'ভেতরে কে?'

'ফাদার পামকিন। এসো তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।'

শীলার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল রানা। ভেতরটা আর সব ঘরের মতই—মাটিতে ছোট একটা গর্ত, তাতে ঘুঁটে পুড়ছে। ভাপসা গরম, ধোঁয়া আর দুর্গন্ধে টেকা দায়। এককোণে নোংরা চাদরের ওপর শুয়ে আছে এক লোক, অ্যাপাচী মহিলা তার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। লোকটার মাথার কাছে একজন শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধ, তার সব চুল পাকা। অসুস্থ ইন্ডিয়ানের মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে সে। সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল করে দেখল রানা। বেশ বোঝা গেল লোকটা গুরুতর অসুস্থ, তার চামড়া প্রায় স্বচ্ছই বলা যায়, প্রতিটি হাড় আলাদাভাবে চেনা যায়।

দু'হাত এক করে প্রার্থনা শুরু করল ফাদার, মুখটা স্বর্গের দিকে তোলা, ধোঁয়া ফুটো করে নিঃসঙ্গ একটা রোদের বাহু তার সাদা চুল স্পর্শ করেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা, পিছু নিয়ে শীলাও। পকেট থেকে মদের ছোট একটা বোতল বের করে ছিপি খুলল ও, খাড়া করে ধরল মুখের সামনে। আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে ফিরল শীলার দিকে। 'কিছুই কি করার নেই?'

সাথে সাথে জবাব দিল শীলা দ্য হোমায়রা, 'বাবার একটা প্ল্যান ছিল, চমৎকার প্ল্যান। উপত্যকার শেষ মাথায়, র‍্যাঞ্চের ওপরে কয়েকটা স্রোত নেমে এসেছে—সার সার পাহাড়ের বরফ গলা পানি। বাবা একটা বাঁধ তৈরি করতে চেয়েছিল। বাঁধ দিয়ে পানি আটকানোর পর যদি সেচের ব্যবস্থা করা যায় গোটা উপত্যকা ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।'

'কিন্তু তোমার কাকা এ নিয়ে চিন্তা করতে রাজি নয়?'

'মোটেও না, সিনর,' বললেন ফাদার, ঘর থেকে ওদের পিছনে বেরিয়ে এলেন তিনি। 'ডন হোসে শুধু ওদেরকে দিয়ে খনি থেকে যতটা সম্ভব সোনা তুলিয়ে নিতে চায়। যখন সে সন্তুষ্ট হবে যে, না, মৌচাকে আর একফোঁটাও মধু নেই, তখন সে সরে গিয়ে আরেক আস্তানা গাড়বে।'

'ইনি সিনর রড, ফাদার,' বলল শীলা। 'কাকা যাকে গায়ের জোরে এখানে আসতে বাধ্য করেছে।'

'জোর করে?' ফাদারের মুখে নির্মল হাসি, মাথা নাড়লেন তিনি। 'না, তা হতে পারে না।' রানার বাড়ানো হাতটা ধরলেন তিনি। 'কাল রাতে হারমোজায় কি ঘটেছে আমি শুনেছি, মাই সান। ঈশ্বর তাঁর অনুকূল সময়ে আমাদেরকে নিয়ে খেলেন। ডন হোসে সত্যি হয়তো জোর খাটিয়েছে, কিন্তু তোমার এখানে আসার সেটাই একমাত্র কারণ নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছে তাকে দিয়ে একটা ভুল করানো, সেজন্যেই জোর খাটানোর কুবুদ্ধি হয়েছে তার।'

রানা কিছু বলার আগেই, পাহাড়ের মাথা টপকে ঢালে নেমে এল দু'জন অশ্বারোহী, একজনের পিছনে একজন। রাস্তায় নেমে এল ওরা, হ্যামার সামান্য একটু আগে। এত দ্রুত আর আচমকা লাগাম টানল সে, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে তার ঘোড়া একপাশে সরে গেল নাচের ভঙ্গিতে, রানা, শীলা আর বৃদ্ধ ফাদারকে প্রায় ঠেলে নিয়ে ফেলল ঘরের দেয়ালের ওপর, ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল ওরা।

তোবড়ানো স্ট্র হ্যাট মাথায় তার সঙ্গীটি দো-আঁশলা, লোকটা সগোত্রের বিরুদ্ধে চলে গেছে। কর্কশ চেহারা তার, হিংস্র নেকড়ের মত, মোটা চামড়ার তৈরি একটা চাবুক হাতে।

ঘোড়ার পিঠে বীরয়োদ্ধার মত বসে থাকল হ্যামার, শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। নিচের সারি থেকে দুটো দাঁত হারিয়েছে সে, ফুলে স্বাভাবিক আকৃতির চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে ঠোঁট। চিবুকের বাম দিক থেকে দগদগে একটা গোলাপী ঘা উঠে গেছে চোখ পর্যন্ত, প্রায় বুজে আছে সেটা।

'কি চাই তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন ফাদার।

'কয়োটকে নিতে এসেছি। কুত্তার বাচ্চাটা আজ কাজে যায়নি।'

'কিন্তু সে তো অসুস্থ,' নরম সুরে বললেন ফাদার।

'অসুস্থ তো ওরা চিরকাল।' ঘোড়া থেকে নামল হ্যামার। 'শালারা জানে যে খনিতে আমাদের প্রতিটা লোককে দরকার, আর ঠিক সেই সুযোগটাই নেয়...'

এক পা সামনে বাড়ল সে, কিন্তু তার বুকে একটা হাত রাখল রানা। 'শুনলে না ফাদার কি বললেন?'

পিছিয়ে গেল হ্যামার, ডান হাত রিভলভারের বাঁটে নেমে গেল।

'ভুল কোরো না,' শান্তভাবে বলল রানা।

নিস্তব্ধতার মধ্যে স্টীম এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, খনির কনভেয়র বেল্ট সচল রাখছে। ইন্ডিয়ানদের অস্পষ্ট, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরও ভেসে এল। দো-আঁশলা লোকটা নার্ভাস ভঙ্গিতে চাবুক নাড়াচাড়া করছে, ভুলেও রানার দিকে তাকাল না। একটা কথাও না বলে ঘুরল হ্যামার, উঠে বসল জিনে, পেটে বুটের খোঁচা মেরে ঘোড়া ছোটাল।

শীলা আর ফাদারের দিকে ফিরল রানা। 'এবার বোধহয় খনিতে গিয়ে দেখা দরকার কি হচ্ছে ওখানে।'

ঘোড়ায় চড়ল শীলা। 'হারমোজায় ফিরছি আমি। সন্ধ্যায় তুমি আসছ নাকি?'

'আগে ভেবে দেখো আমার মত বিপজ্জনক লোকের সঙ্গ তুমি চাও কিনা।'

'তোমার পদ্ধতিতে কোথায় ভুল আমি হয়তো দেখিয়ে দিতে পারব।'

'সন্দেহ আছে। তবে তোমার কি করা উচিত সেটা বলে দিতে পারি।'

'কি করা উচিত?'

'এবারের শ্যাম্পেনটা তুমি কিনতে পারো।'

মুখ টিপে হাসল শীলা। তার ঘোড়ার নিতম্বে চাপড় মারল রানা। ঘন ঘন দীর্ঘ লাফে শীলাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোড়াটা।

গাড়ি চালিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল রানা। পাহাড়ের গায়ে বারান্দার মত ঝুলে আছে পথটা, পথের শেষে ছোট একটা মালভূমিতে উঠে এল শেভ্রোলে। বরফ মোড়া পাহাড়চূড়া থেকে নেমে আসা পানির দশ-বারোটা স্রোতকে একটা ধারায় ভোঁতা আকৃতির দুই মুখ খোলা শেড-এর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়েছে।

ব্যাপক কর্মব্যস্ততার একটা দৃশ্য। খনির মুখের কাছে পুরানো একটা স্টীম এঞ্জিন ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে, ভেতরে টেনে নিচ্ছে চওড়া একটা স্টীল কেবল, স্টীল কেবল বহন করছে খনিজ পদার্থ ভর্তি ট্রাকগুলোকে।

শেভ্রোলে থেকে নেমে ওর শেডের দিকে এগোল রানা। বাইরে বেরিয়ে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকল ট্যালবট। 'দেখে যান!'

শেডের ভেতর মেশিন বলতে একটা মাত্র স্টীম-অপারেটেড ক্রাশার। দু'জন ইন্ডিয়ান অক্লান্ত চেষ্টায় ওটার আগুনে কাঠ যোগান দিয়ে যাচ্ছে। উত্তাপ এককথায় অসহনীয়। ফুটো বন্ধ করার জন্যে কাদামাটি দিয়ে মোড়া বিশাল একটা ট্যাঙ্ক রয়েছে, পানির দ্রুতগতি ধারা ঢুকে যাচ্ছে সেটার ভেতর। কয়েকটা ক্রেডল আর একজোড়া পাডলিং ট্রফও আছে। ওগুলো নিয়ে ইন্ডিয়ান যারা কাজ করছে তাদের কোমরে নেংটি, উদোম গা চকচক করছে ঘামে।

'আরও মেশিনারি নেই কেন? খনিতে যদি তোলার মত সোনা থাকে, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে তো হোমায়রারই লাভ।'

'আপনাকে বলেছি না, পঞ্চাশ বছর আগে দু'শো ইন্ডিয়ানের ওপর ধসে গিয়েছিল খনিটা! আমি আসার পর থেকেও এতবার ধস নেমেছে যে সংখ্যাটা ভুলে গেছি। প্রতিমাসেই মারা যাচ্ছে মানুষ।'

'তাহলে টিমবারিঙে ক্রটি আছে। বোলো না, ওখানেও পয়সা বাঁচাবার চেষ্টা করছে হোমায়রা।'

মাথা নাড়ল ট্যালবট। 'পাহাড়টাই আসলে পড়ো পড়ো, বস্। কখন আমাদেরকে চাপা দেবে সেই অপেক্ষায় আছে। যে-কোন টানেলে জোরে একবার কাশি দিলেও হুড়মুড় করে নেমে আসে পাথরগুলো। সেজন্যেই অন্যান্য মেশিনারি ব্যবহার করতে সাহস পাই না আমরা। হতে পারে, আর হয়তো খানিকটা কাঁপনই শুধু দরকার, তাহলেই সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হয়।'

তিনটে কাঠের কেবিনের সামনে থামল ওরা, প্রথমটার দরজা খুলল ট্যালবট। 'এখানে আমরা বাস করি।'

ভেতরে সাদামাঠা চেয়ার আর টেবিল, দুটো বাঙ্ক, এক কোণে লোহার একটা স্টোভ।

'বাকি দুটো কেবিনে কারা থাকে?'

'একটা পাউডার স্টোর। শেষেরটায় থাকে হ্যামার।'

'এখন সে কোথায়?'

'মিনিট পাঁচেক আগে খনিতে গেছে, রাগে দাঁত কিড়মিড় করছিল। তার সামনে পড়লে আজ আর কারও রক্ষে নেই।'

রেললাইনের পাশ ঘেঁষে এগোল ওরা, স্টীম এঞ্জিন পেরিয়ে এসে টানেলের মুখে ঢুকল। রানা আশা করেছিল টানেলের ভেতরটা ঠাণ্ডা হবে, কিন্তু এখানে উত্তাপ যেন আরও বেশি। 'এখানে দেখছি বাতাস বলতে কিছু নেই। নিশ্চয়ই ত্রুটি আছে ভেন্টিলেশন-এ।'

'মাস দুই আগে পাথর ধসে এয়ার শ্যাফট বন্ধ হয়ে গেছে,' বলল ট্যালবট। 'ওটায় হাত লাগাতে নিষেধ করে দেয় হোমায়রা।'

'শুনে তো আমার ভয়ই লাগছে। কেউ তাকে কথাটা বলোনি তোমরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যালবট। 'তার কথা হলো নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের।'

দিনের আলো পেছনে ফেলে বাঁক ঘুরল ওরা, সামনে লণ্ঠন আর মোমের আলো। খানিক এগিয়ে থামল ট্যালবট, টানেল দু'ভাগ হয়ে গেছে, বলল, 'খনির দুটো ফেস, উত্তর আর দক্ষিণ। দুটোর যে-কোন একটায় থাকতে পারে হ্যামার।'

একপাশে সরে দাঁড়াল ওরা, ধুলো মাখা ছয় জন ইন্ডিয়ান ক্লান্তদেহে ঠেলে নিয়ে গেল একটা ট্রাক। দেয়াল থেকে লণ্ঠন নামাল ট্যালবট, রানাকে পিছনে নিয়ে এগোল সে।

প্রথমে অস্পষ্ট আওয়াজ শুনল রানা, তারপর আলো দেখল। সরু হয়ে গেল টানেল, ঘাড়-মাথা নিচু করে এগোতে হচ্ছে। খানিক পরই একটা চওড়া গুহায় বেরিয়ে এল ওরা, ছাদটা নিচু, মোমবাতির আলোয় অন্ধকার দূর হয়নি।

দশ কি বারো জন ইন্ডিয়ান পাথুরে পাঁচিলে ছোট হাতলের কোদাল চালাচ্ছে। কয়েকজন মাটি মেশানো পাথর ভরছে বাস্কেটে, বাস্কেটগুলো খালি করা হচ্ছে ট্রাকে। আগুনের আঁচ লাগল গায়ে, ধোঁয়ায় শ্বাস টানার উপায় নেই।

ঘুরল রানা, ফিরে এল টানেলে। থামল একবার, হেলান দিল দেয়ালে, ঘন ঘন কেশে ফুসফুস থেকে ধুলো আর ধোঁয়া বের করার চেষ্টা করল। মাথার ওপর অন্ধকার থেকে ঝুর ঝুর করে প্রচুর ধুলো আর কয়েকটা নুড়ি পাথর খসে পড়ল।

'কি বলেছিলাম বুঝতে পারছেন তো?' ট্যালবটও কাশছে।

কথা না বলে টানেল ধরে ফিরে আসছে রানা। অকস্মাৎ একজন লোক আর্তচিৎকার করে উঠল, নিঃসঙ্গ একটা ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর চারদিকের অন্ধকার থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে লাগল।

ছুটল রানা। ক্রমশ উজ্জ্বল হলো আলো, তারপর মেইন টানেলে বেরিয়ে এল ও। দেখল কয়েকজন ইন্ডিয়ান দেয়াল ঘেঁষে সেজদার ভঙ্গিতে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে, কাত হয়ে পড়ে গেছে তাদের ট্রাক, লাইনের ওপর স্তূপ হয়ে রয়েছে খনিজ আবর্জনা।

কিশোর এক ইন্ডিয়ানকে মেঝের সাথে একহাতে চেপে ধরেছে হ্যামার,

তার অপর হাতে ধরা চাবুকটা মাথার ওপর তোলা। বাতাসে শিস কেটে নেমে এল চাবুক, চামড়া ছিলে বেরিয়ে পড়ল কাঁধের লাল মাংস আর তাজা রক্ত। তীব্র যন্ত্রণায় আবার আর্তনাদ করে উঠল কিশোর ছেলেটা।

আবার যখন উঠল চাবুক, দু'হাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় লাটিমের মত ঘুরিয়ে দিল রানা হ্যামারকে, দড়াম করে দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে থামল সে। ক্রোধে উন্মাদ মেক্সিকান বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল, লাফ দিয়ে সিধে হয়েই এক ঝটকায় বের করল রিভলভার।

তৈরি ছিল রানা, ত্বরিত এগিয়ে গিয়ে এক হাতে দৈত্যটার গলা চেপে ধরল, কব্জিটা মুঠোয় নিয়ে নিচের দিকে ঘুরিয়ে দিল রিভলভারের মাজ্ল্। এক কি দুই মুহূর্ত ধস্তাধস্তি করল ওরা, তারপরই বেরিয়ে গেল গুলি।

বদ্ধ জায়গার ভেতর ডিনামাইট বিস্ফোরণের মত আওয়াজ হলো, তারই সাথে কেঁপে উঠল চারদিকের দেয়াল। ভয়ার্ত আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ইন্ডিয়ানদের গলা থেকে। পরমুহূর্তে পাহাড়টা ধসে পড়ল ওদের ওপর।

সাত

মৃত্যুভয় ওদের সবাইকে গ্রাস করল। দীর্ঘ প্রায় এক কি দেড় সেকেন্ড রানার মাথা কোন কাজই করল না—নিজের অস্তিত্ব, বিপদের গুরুত্ব, প্রাণরক্ষার তাগিদ, কিছুই ওকে বিচলিত করতে পারল না। তারপর যখন চেতনা ফিরে পেল, আধ সেকেন্ডের জন্যে জীবনের প্রতি প্রচণ্ড মায়া অনুভব করল ও। অবধারিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে পরম সত্যটা উপলব্ধি করল, জীবন বড় সুন্দর। পরবর্তী মুহূর্তে বাস্তব জগতে প্রবেশ করল—রাহাত খানকে আভাস দেয়া আছে কোথায় থাকতে পারে ও, লাশ নিতে লোক পাঠাবেন তিনি। অবশ্য যদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরমুহূর্তে সবচেয়ে দুর্লভ আর মানবিক গুণটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ওর মনের ভেতর। লোকগুলোকে বাঁচাতে হবে। আর লোকগুলোকে বাঁচাতে হলে প্রথমে বাঁচতে হবে নিজেকে।

পায়ের নিচে গুহার মেঝে থরথর করে কাঁপছে। দূর থেকে ভেসে এল ভোঁতা আর গুরুগম্ভীর পতনের আওয়াজ। সবগুলো গুহা আর টানেল ধসে পড়ছে। ধুলোয় চারদিক অন্ধকার, আশপাশে দড়াম দড়াম শব্দে পাথরবৃষ্টি হচ্ছে, প্রথমে আহত কিশোর আর বুড়ো ট্যালবটের কথা মনে পড়ল রানার। এক হাত দিয়ে মাথা ঢেকে গড়াতে শুরু করল ও।

চার বার গড়ান দিয়ে একটা শরীরে বাধা পেল, হুমড়ি খেয়ে রয়েছে কে যেন। হাত দিয়ে ঝাঁকি দিল রানা, সাড়া পাওয়া গেল না। হাত বুলোতে শুরু করে টের পেল উদোম পিঠ আর কাঁধে লম্বা হয়ে ফুলে আছে মাংস—চাবুক মারার দাগ। কিন্তু ঘাড়ের ওপর মাথা নেই, উষ্ণ তরল রক্তে ভিজে উঠল হাতটা। মাখনের মত কি যেন লেপ্টে গেল আঙুলে। সম্ভবত বড় পাথর চিড়ে-

চ্যাপ্টা করে দিয়ে গেছে কিশোরের গোটা মাথা।

হাঁপাচ্ছে রানা, খক্‌ খক্‌ করে কাশছে। ঝরে পড়া পাথর আর ধুলোর স্তূপে শরীরটা ঘুরিয়ে নিল ও, হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। পাথরের ফাঁকে ক্ষীণ আলোর আভাস দেখতে পেল।

ট্যালবটের নাম ধরে ডাকল ও, কিন্তু ধসের শব্দে নিজের চিৎকারই শুনতে পেল না। হাত দিয়ে পাথর সরাচ্ছে ও। দু'মিনিট পর দু'পাশে উঠে এল হ্যামার আর ট্যালবট। ট্যালবটের নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। হ্যামারকে অক্ষত বলেই মনে হলো, কিন্তু ফোঁপাচ্ছে সে, কাঁপছে থরথর করে। কয়েক মিনিট পর ফাঁকটা বড় করা সম্ভব হলো। রোদের ভেতর বেরিয়ে এল ওরা, ওদের পিছু পিছু তিনজন ইন্ডিয়ান।

শেড খালি করে ভিড় একটা এরইমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে। আর ফাদার পামকিন এলেন পাহাড় টপকে বাকবোর্ড নিয়ে তাদের পিছু পিছু। কয়েক ফুট দূরে থাকতে লাগাম টেনে ধরলেন তিনি, লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেন। 'কতটা খারাপ?'

ট্যালবটের মুখে রক্ত আর ধুলো মাখামাখি, মোছার কথা মনে নেই। 'আমার ধারণা গোটা পাহাড় ধসে গেছে।'

পকেট থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে ঢক ঢক করে খানিকটা খেল রানা, তারপর ধরিয়ে দিল ট্যালবটের হাতে। একটা বোল্ডারের ওপর মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে হ্যামার, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ট্যালবটের কাছ থেকে নিয়ে বোতলটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা, কড়া সুরে বলল, 'দু'ঢোক গিলে শক্ত হও।'

বোতলটা প্রায় খালি করে ফেলল হ্যামার, দাঁড়াল সে, মুখ মুছল।

'এবার বলো, ভেতরে কতজন ছিল?'

'ঠিক বলতে পারব না। বিশ কি বাইশ জন হবে।'

হামাগুড়ি দিয়ে বোল্ডারের মাথায় উঠল ট্যালবট রানার নির্দেশে। স্প্যানিশ ভাষায় জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভেতরে যারা রয়ে গেছে বেশিক্ষণ বাঁচবে না ওরা। ওদের জন্যে আমরা যদি কিছু করতে চাই, এখুনি তা করতে হবে। কোদাল, শাবল, বাস্কেট যে যা পাও তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

তৈরি হতে খুব বেশি সময় নিল না ওরা, তারপর রানার নেতৃত্বে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠল সবাই, শুরু হলো প্রবেশমুখ থেকে পাথর সরাবার কাজ। সবাই অংশ গ্রহণ করল, এমনকি বৃদ্ধ ফাদার পামকিনও—তৈরি হয়ে গেল একটা মানব-শৃঙ্খল। মাটি আর পাথর পিছনের দিকে ফেলা হতে লাগল, ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল শিকলটা, ঢুকে পড়ল টানেলের ভেতর। হঠাৎ করেই একটা ব্যাপার লক্ষ করল রানা—ওদের সাথে উদ্ধারপ্রাপ্ত তিনজন ইন্ডিয়ানের মধ্যে দু'জনকে দেখা যাচ্ছে, বাকি একজন কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছে। তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হওয়ায় ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাল না ও।

যে ফাঁকটা গলে বেরিয়ে এসেছিল ওরা সেটাকে চওড়া করা হলো,

ইকুইপমেন্ট নিয়ে বারোজনের একটা দল ঢুকল ভেতরে, সামনের সারির কয়েকজনের হাতে লণ্ঠন। গায়ের শার্ট খুলে সাবধানে নতুন পাথরের দেয়ালটা পরীক্ষা করল রানা, ছাদ ধসে পড়ে বন্ধ করে দিয়েছে টানেলের পিছন দিকটা।

জায়গাটা আগুনের মত গরম, বাতাসে এখনও ধুলো উড়ছে। রানার পাশে সরে এল ট্যালবট। 'খুঁড়তে খুঁড়তেই এগোতে হবে আমাদের, বস্। অন্তত প্রয়োজনীয় টুলস তো আছে…'

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল হ্যামার, তারপর সিধে হলো, একটা হাত তুলে সিলিং স্পর্শ করল সে। সাথে সাথে খসে পড়ল কয়েকটা পাথর। 'যারা বেঁচে আছি সব ক'জনের জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে।'

'বাজে কথা বোলো না,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল ট্যালবট। 'সাবধানে কাজ করলে আর একটা ধস নামবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

কয়েকটা মুহূর্ত উত্তেজনা আর নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল। এক সময় মনে হলো একজন যদি পিছিয়ে যায়, সবাই তাকে অনুসরণ করবে। লণ্ঠনের আলোয় ভয়ে বিকৃত দেখাল সবার চেহারা। তারপর নড়ে উঠল রানা। কাউকে কিছু বলল না, ঝুঁকে পাথর সরাতে শুরু করল ও। অত্যন্ত সাবধানে, একটা একটা করে। দেখাদেখি একজন একজন করে হাত লাগাল আবার সবাই।

সতর্কতার কোন অভাব নেই, এগিয়ে চলল কাজ। ঊর্ধ্বাঙ্গ খালি, ঘামে চকচক করছে শরীরগুলো, তাজা বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে স্বেচ্ছাসেবকরা। নিজেকে শক্তির একটা স্তম্ভ প্রমাণ করে ছাড়ল হ্যামার, তার বিশাল হাত এমন এক-একটা পাথর কোন সাহায্য ছাড়াই অনায়াসে তুলে সরিয়ে দিচ্ছে, রানা আর ট্যালবট দু'জনে মিলে যেটাকে নড়াতেও পারেনি। ওদের পিছনে ইন্ডিয়ানরা একটা লাইন তৈরি করেছে, লাইনের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলে যাচ্ছে পাথর ভরা বাস্কেটগুলো।

পালা করে কাজ করল ওরা, নতুন বাঁশ দিয়ে বেঁধে নেয়া হলো সিলিং সামনে এগোবার আগে। তবে ঢিলে তালে এগোল কাজ। প্রচণ্ড গরম আর বাতাসের অভাব পাথুরে দেয়ালের সামনে প্রতিবার কাউকে আধঘণ্টার বেশি থাকতে দিল না। মাঝ বিকেলের দিকে টানেল ধরে মাত্র চল্লিশ ফুটের মত এগোতে পারল ওরা।

তিনটের খানিক পর হ্যামারের হাত থেকে বড় একটা পাথর পড়ে গেল।

'কি হলো?' জানতে চাইল রানা।

ঘুরল হ্যামার, ল্যাম্পের আলোয় তার চোখের সাদা অংশ জ্বলজ্বল করছে। দেয়ালের মাঝখান থেকে পাথর সরিয়ে সরু একটা পথ তৈরি করা হয়েছে, হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগোল রানা। বিশাল একটা পাথর সামনে এগোবার পথ বন্ধ করে রেখেছে, কম করেও সাত টন ওজন হবে।

হামাগুড়ি দিয়ে রানার পাশে চলে এল ট্যালবট। 'ওটাকে হাত দিয়ে সরানো সম্ভব নয়।'

'ডিনামাইট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

খুব জোরে শ্বাস টানল হ্যামার। 'নির্ঘাত একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছি আমরা। ডিনামাইট লাগবে না, ছোট একটা পটকা ফাটালেও চলবে—বাকি পাহাড় ধসে যাবে।'

'ভেতরে এখনও যদি কেউ বেঁচে থাকে, এমনিতেও তারা মরবে,' বলল রানা। 'কিভাবে মরল সেটা বড় কথা নয়। কাজেই শেষ চেষ্টা করে দেখব আমরা।' হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এল ও, ইন্ডিয়ানদের লাইনকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল চোখ ধাঁধানো রোদে। চোখ কুঁচকে দেখল খনির সামনে গোটা গ্রাম উঠে এসেছে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কেউ বাকি নেই। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে কেউ কেউ, অনেকেই স্তব্ধ পাথর হয়ে গেছে শোকে। একজন ইন্ডিয়ান ওর হাতে এক বালতি পানি ধরিয়ে দিল, বালতিটা মুখের ওপর ধরে কাত করল ও, মাথায় ঢালার আগে ঢক ঢক করে পান করল কুয়ার হিম-শীতল পানি। তারপর ডন হোমায়রার উপস্থিতি লক্ষ করল ও।

'কতটা খারাপ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কোদাল আর শাবল দিয়ে যতটা সম্ভব এগিয়েছি। সাত টনী একটা পাথর সরাব কিভাবে?'

'ভাঙা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখেছ?'

'হাত দিয়ে কয়েক ঘণ্টা লাগবে,' বলল রানা। 'একমাত্র উপায় ডিনামাইট।'

'তাতে গোটা পাহাড় ধসে পড়ার আশঙ্কা আছে।'

'হয়তো, কিন্তু সবার আগে ভাবতে হবে বিশ-বাইশজন লোকের কথা। তিন কি চার ঘণ্টার মধ্যে ওদেরকে যদি বের করে আনতে না পারা যায়, একজনকেও বাঁচানো যাবে না।'

'তুমি কি জানো, এখনও ওরা বেঁচে আছে?'

'কি বলতে চান?'

'বাদ দাও। যখন হচ্ছে না তখন আর চেষ্টা করে লাভ কি।'

'ফর গডস সেক, হচ্ছে না কে বলল আপনাকে? চেষ্টাই তো করা হয়নি!' চেঁচিয়ে উঠল ট্যালবট।

'আমি ডিনামাইটের কথা বলেছি,' শান্তভাবে মনে করিয়ে দিল রানা।

দৃঢ় ভঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়ল ডন হোমায়রা। 'ক'জন ইন্ডিয়ানকে বাঁচানোর জন্যে সোনার উৎসটা আমি হারাতে পারি না। আমিও দেখতে চাই ওদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে, কোদাল আর শাবল দিয়ে চেষ্টা করতে পারো। কোন অবস্থাতেই ডিনামাইট ব্যবহার করা যাবে না।'

'দেখা যাক,' বলল রানা, তারপর যেই যাবার জন্যে ঘুরেছে অমনি চিৎকার দিয়ে উঠল ট্যালবট।

'ওয়াচ আউট!'

ট্যালবটের কথা শেষ হয়নি, রানার ঘাড়ের পিছনে ঠাণ্ডা আর শক্ত কি যেন একটা ঠেকল।

'একদম নড়বে না,' রানার পিছন থেকে বলল ডন হোমায়রা, তার হাতে রিভলভার, মাজ্‌ল্‌টা চেপে বসেছে রানার খুলির নিচে। 'তুমি আছ নাকি, হ্যামার?'

'ইয়েস, ডন হোসে।' হ্যামারের পাশে এই মুহূর্তে তিনজন দো-আঁশলা, সবাই সশস্ত্র।

'চমৎকার। শোনো কি চাই আমি। তুমি, ট্যালবট, খনিতে ফিরে যাও। লোকজন নিয়ে বড় পাথরটার চারপাশ খুঁড়তে থাকো। ডিনামাইটের কথা ভুলেও মুখে আনবে না।'

'ঠিক আছে, সিনর,' পরাজিত লোকের মত ম্লানস্বরে বলল ট্যালবট, রানার দিকে তাকাতে পারল না।

'এবার তোমার প্রেসক্রিপশন,' রানাকে বলল ডন হোমায়রা। 'হারমোজায় ফিরে যাচ্ছ তুমি। তোমার সুন্দর গাড়ি তুমিই চালাবে, তোমার পাশে তোমার পরম বন্ধু হ্যামার থাকবে। হারমোজায় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হবে তোমাকে। কর্তৃপক্ষ এফ.বি.আই.-কে জানাবে, সাদা একটা শেভ্রোলে সহ এক ভবঘুরে লোককে তারা আটক করেছে। বুঝতে পারছ তো? এখানে তোমার দিন ফুরিয়েছে।'

'এখানে' বলতে কি বোঝায় চারদিকে চোখ বুলিয়ে আরেকবার দেখে নিল রানা। উদ্ধারকর্মীদের একটা ভিড়, সাথে তাদের মহিলা। পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে ওর দিকে সতর্কদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে হ্যামার। তার পাশে, পরনে কালো পোশাক, ফাদার পামকিন। আর সবার পিছনে, একটা ঝুল-পাথরের কিনারায়, দাঁড়িয়ে রয়েছে হুয়ান কার্টিজ, তার দু'জন যোদ্ধাকে নিয়ে।

হঠাৎ করে যেন একটা জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল, রানা বুঝতে পারল কর্কশ-কঠোর একটা সম্প্রদায়কে ডন হোমায়রার মত লোক কিভাবে নিজের অনুগত করে রাখে। আর সবাইকে শিক্ষণীয় একটা দৃষ্টান্ত উপহার দেয়ার জন্যে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতেও এতটুকু দ্বিধা করবে না সে। বেআইনী কাজ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যে লোক, টার্গেট হিসেবে সে-ই তো আদর্শ।

রানাকে অবাক করে দিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন ফাদার পামকিন।

সাথে সাথে তাঁর দিকে রিভলভার তুলল ডন হোমায়রা। 'আর এক পা-ও এগিয়ো না, ফাদার।'

কিন্তু ফাদার থামলেন না, যেমন হেঁটে আসছিলেন তেমনি আসতে লাগলেন। তাঁর পিছু নিয়ে পিঠের কাছে সেঁটে থাকল হ্যামার আর দো-আঁশলারা।

ডন হোমায়রার সামনে এসে থামলেন ফাদার, আঙুল দিয়ে তার রিভলভার ধরা হাতের কব্জি স্পর্শ করলেন। 'দয়া করুন, ডন হোসে হোমায়রা। বিদেশী এই ভদ্রলোক ঠিক কথাই বলছেন। খনির ভেতর একজনও যদি বেঁচে থাকে, আমাদের অপেক্ষায় আছে সে। তার এই অপেক্ষা ঈশ্বরের অপেক্ষা, তিনি দেখতে চাইছেন আমরা তাঁকে উদ্ধার করি কিনা। যদি

ডিনামাইটই একমাত্র উত্তর হয়, তবে তাই হোক না। ঈশ্বর চাইলে…'

'ঈশ্বর চাইলে পাহাড়টা দেবে যেতে পারে, তারপর আর এক আউন্স সোনাও ওখান থেকে পাব না আমি। হাত সরাও, ফাদার। ঈশ্বরকে উদ্ধার করা তোমার কাজ, আমার কাজ সোনার উৎস ঠিক রাখা।'

'দয়া করুন,' মিনতি জানালেন ফাদার। 'রিভলভারটা রেখে দিন।' আবার তিনি ডন হোমায়রার রিভলভার ধরা হাতটা ছুঁতে গেলেন। ঠিক তখুনি অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটে গেল। কাউকে কিছু মাত্র বুঝতে না দিয়ে রিভলভার তুলল ডন হোমায়রা, আধ হাত দূর থেকে গুলি করল ফাদার পামকিনের কপালে। ফাদারের খুলি উড়ে গেল, ছিটকে পড়ল লাশ, লোকজন আঁতকে উঠে পশুর মত চেঁচিয়ে উঠল।

'কুত্তার বাচ্চা!' বাঘের মত গর্জে উঠল রানা, লাফ দিতে গিয়ে বাধা পেল পিছন থেকে, চারজন ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে রাখল ওকে, ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল হ্যামারের বিশাল হাত।

ঠিক তখুনি বজ্রপাত ঘটল। বজ্রপাত নয়, তারচেয়েও গুরুগম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। লোকটা প্রাচীন যোদ্ধা হুয়ান কার্টিজ। দু'জন সঙ্গী যোদ্ধাকে নিয়ে ঝুল-পাথরের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। 'হোমায়রা!' হাঁক ছেড়ে বলল সে। 'ঈশ্বর আমার সাক্ষী, তুমি একটা মরা মানুষ!'

যোদ্ধাদের নিয়ে পাথর থেকে নেমে এল কার্টিজ, নিজেদের ঘোড়ায় চড়ল, তারপর তাদের সেই স্বর্ণযুগের অনুকরণে রণহুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে।

হারমোজায় ফিরে আসছে রানা, গাড়ি চালাচ্ছে ধীরগতিতে। পাশেই প্যাসেঞ্জার সীটে রয়েছে হ্যামার, অজুহাত খুঁজছে পুলিসের হাতে তুলে দেয়ার বদলে কিভাবে পথেই মিটিয়ে ফেলা যায় ঝামেলা।

একটা পাথুরে বাঁক ঘুরতেই সামনে পড়ে গেল কার্টিজ আর তার দল। ঘোড়ার লাগাম টানার সময় পেল কার্টিজ, কিন্তু রাইফেল তোলার অবকাশ পেল না। রাইফেলটা জিনে রয়েছে, জানে তুলতে চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, তার আগেই বিদেশী লোকটাকে গুলি করবে ঘৃণ্য হ্যামার।

'পরদেশী,' চিৎকার করে বলল কার্টিজ। 'তুমি জানো না, খনির ভেতর আমার একমাত্র সন্তান আটকা পড়েছে। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, কারণ তুমি ডিনামাইট ব্যবহার করতে চেয়েছ। আমরা ডিনামাইট ব্যবহার করতে জানি না, জিনিসটা আমাদের কাছে নেইও। আমরা অ্যাপাচী, করুণা ভিক্ষা চাওয়া আমাদের স্বভাব নয়। তবে, জেনো, কিভাবে প্রতিশোধ নিতে হয় তা জানা আছে। তোমার প্রতি অনুরোধ, আমাদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ো না।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে, গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে।

'ধরো ওকে, ধাওয়া করো!' তাগাদা দিল হ্যামার।

'সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'রেডিয়েটর টগবগ করে ফুটছে, বাষ্প উঠছে

দেখছ না? আগে ওটায় পানি ঢালতে হবে।'

'গাড়িতে পানি নেই?'

'শুধু গ্যাসোলিন।'

'তাহলে? আমরা পৌছুব কিভাবে?'

গাড়ি থামাল রানা। 'নার্ভাস হয়ো না, সব সমস্যারই সমাধান আছে।' রেডিয়েটরের ছিপি খুলে হুডের ওপর দাঁড়াল ও, ট্রাউজারের বোতাম খুলে প্রস্রাব করল। 'কার্টিজকে তুমি ধাওয়া করতে চাইছিলে, তাই না, হ্যামার?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ডন হোসে ওকে ভয় পান, কিন্তু আমি না। কত দিন বলেছি, অনুমতি দিন, ইন্ডিয়ান কুকুরটাকে সাবাড় করে দিই।'

'একটা ব্যাপার তুমি বুঝছ না, হ্যামার। কার্টিজকে তুমি ভয় করো, হোমায়রা যতটা ভয় করে তারচেয়ে বেশি, সেজন্যেই ওকে খুন করতে চাও তুমি। আরও একটা জিনিস তোমার মাথায় ঢোকেনি। ধাওয়া তুমি ওকে নয়, ও তোমাকে করবে। হুয়ান কার্টিজ এখনও জানে না ওর ছেলেকে তুমি চাবুক মারছিলে, জানে না পাথর ধসের জন্যেও তুমিই দায়ী।'

'কার্টিজের ছেলে বলেই তো চাবুক মারছিলাম।' নিষ্ঠুর হেসে বলল হ্যামার। 'কিন্তু তুমি কিভাবে জানলে ছোকরা কার্টিজের ছেলে…?'

'জানতাম না, এখন জানলাম।'

গ্রামে ঢোকার সাথে সাথে উত্তেজিত ভিড়টা দেখতে পেল ওরা। প্রধান চৌরাস্তার ওপর কার্টিজকে ঘিরে ছটফট করছে লোকজন।

'সবাইকে জড়ো করছে হারামির বাচ্চাটা,' দাঁতে দাঁত ঘসে বলল হ্যামার। 'থামছ কেন?'

'অনেক লোকজন।'

'যেতে থাকো!' গর্জে উঠল হ্যামার।

'তারপর, কেউ আহত হলে?' গাড়ির গতি আরও কমিয়ে আনল রানা।

'ও, চালাকি হচ্ছে!' রানার কপালের পাশে রিভলভারের মাজ্‌ল্‌ চেপে ধরল হ্যামার। 'তবে রে!'

হাসল রানা। 'উহুঁ, হ্যামার, মিথ্যে ভান কোরো না। আমি এখন তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, আমাকে তুমি গুলি করতে পারো না।' ব্রেক করল রানা, শব্দ পেয়ে জনতা ওদের দিকে ফিরল, গোটা ভিড় যেন একজন মানুষ। তারপরই ছুটতে শুরু করল সবাই গাড়ির দিকে। পরাজিত মানুষ নয়, উত্তেজিত জনতা।

'কি হলো, হ্যামার, গুলি করছ না যে?' কপালে রিভলভারের মাজ্‌ল্‌ নিয়ে আবার হাসল রানা। 'জানি, প্রাণের ওপর তোমার খুব মায়া। তুমি মরতে চাও না। আমি মারা গেলে গাড়ি চালাবে কে, তাই না? আর গাড়ি না চললে, তুমি পালাবে কিভাবে? ওরা যে তোমাকে টুকরো টুকরো করবে।'

রানা শুনতে পেল কার্টিজ চিৎকার করছে, 'ওই গাড়িতে হোমায়রার লোক

হ্যামার রয়েছে। খুনীর ভাড়াটে খুনী। যে আমার ছেলেকে উদ্ধার করার জন্যে ডিনামাইট ব্যবহার করতে রাজি হয়নি।'

বিপদের গুরুত্ব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে হ্যামার। 'ঘুরিয়ে নাও গাড়ি,' রানাকে নির্দেশ দিল সে।

রিভলভারের স্পর্শ গ্রাহ্য না করে গাড়ি থেকে নামতে গেল রানা, বলল, 'তুমি চালাও।'

'দেখো, মরতে হয় তোমাকে নিয়ে মরব!' শাসাল হ্যামার, কিন্তু রানা নেমে যেতেও গুলি করল না। 'গাড়ি যদি চালাতে জানতাম, এতক্ষণে…'

'আমাকে মেরে ফেলতে…'

'ফিরে এসো বলছি!' দরদর করে ঘামছে হ্যামার, রানার বুক লক্ষ্য করে রিভলভার ধরে আছে।

শর্ত দিল রানা। 'রিভলভারটা নামিয়ে রাখো সীটের ওপর। আস্তে আস্তে।'

রাগে কাঁপছে হ্যামার। চট্ করে উত্তেজিত জনতার দিকে একবার তাকাল সে, তারপর আর সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না। জানে প্রথমবার যত লোককেই গুলি করুক সে, রি-লোড করার আগেই পিঁপড়ের ঝাঁকের মত ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ইন্ডিয়ানরা, কিল-ঘুসি-লাথি মেরে ছাতু বানিয়ে ফেলবে, তারপর ওদের ঐতিহ্য অনুসারে কঙ্কালটা ঝুলিয়ে রাখবে গাছের ডালে।

সাবধানে সীটের ওপর রিভলভারটা রাখল সে। হুইলের পিছনে বসার আগে রিভলভারটা তুলে নিল রানা, তারপর ধীরে ধীরে গাড়ি ঘোরাল।

দ্রুতবেগে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এল শেভ্রোলে। এক হাতে হুইল, অপর হাতের রিভলভার হ্যামারের দিকে তাক করা, গুণ গুণ করছে রানা, 'হু ইজ অ্যাফ্রেড অভ দ্য বিগ ব্যাড উলফ?'

একটানা প্রায় আধঘণ্টা তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল কার্টিজ, পৌঁছুল ছোট্ট জলাশয়ের ধারে গা ঘেঁষে থাকা তিনজোড়া তাঁবুর সামনে। তাঁবুগুলোকে ঘিরে আছে ছোট বড় অসংখ্য বোল্ডার, পথনির্দেশ না পেলে এখানকার ইন্ডিয়ানদের খোঁজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

ছোট একটা হরিণের ধড় ঝলসানো হচ্ছে গনগনে আগুনে, সেটাকে ঘিরে বসে আছে পাঁচজন তরুণ ইন্ডিয়ান, নিবিষ্টমনে সিগারেট ফুঁকছে!

ঘোড়া থেকে নেমে একটা পাথরে লাগাম জড়াল কার্টিজ। গম্ভীর চেহারা নিয়ে তরুণদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে, তারপর নিজের তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়ল, বন্ধ করল চোখের পাতা।

দীর্ঘ পনেরো সেকেন্ড লাগল তার সিদ্ধান্তে আসতে। অন্ধকার ও শান্তিময় তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল সে, দেখল এরইমধ্যে অন্যান্য তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে তার লোকজন।

'আর কোন চেষ্টা করার দরকার ছিল না, আমি ধর্মযাজক হতে

যাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ আমি একজন ধর্মযাজককে, ঈশ্বরের একজন প্রতিনিধিকে, গুলি খেয়ে মরতে দেখেছি। আমার চোখের সামনে ফাদার পামকিনকে কসাই হোমায়রা গুলি করে মারল। সব কথার শেষ কথা, আমি একজন অ্যাপাচী, ধর্মযাজক হওয়া আমার পোষাবে না।' এক টানে গায়ের আলখিল্লা ছিঁড়ে নামিয়ে ফেলল সে, ভেতরে দেখা গেল আঁটসাঁট পাজামা পরে রয়েছে সে, গায়ে চামড়ার বর্ম। এবার মাথায় সে লাল পট্টি বাঁধল।

বলে চলেছে, 'অ্যাপাচীদের ঐতিহ্য আমি বজায় রেখেছি। আমি করুণা ভিক্ষা করিনি। আমার একমাত্র সন্তান আমার অজ্ঞাতে হোমায়রার খনিতে কাজ করতে গিয়েছিল। তাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেয়া হয়নি। সবাই জানি, হোমায়রার হাতে-পায়ে ধরলেও কোন লাভ হত না। আমরা অ্যাপাচী, কাজেই যে-পথে গিয়ে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন আমরাও সেই পথে যাব। হ্যাঁ, আমরা প্রতিশোধের পথে যাব।

'এবার, কি করা হবে। কাটু আর চার্ট, আমাদের সব ভাইবেরাদারকে খবর দাও, আমাদের হাতকে শক্তিশালী করবে তারা। ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাও উত্তরের খামারে, বেড়া ভাঙো, হত্যা করো কিছু গরু-ছাগল। রাখালদের অন্তত একজনকে মারবে না। হোমায়রার কাছে খবর পৌঁছুনোর জন্যে বাঁচিয়ে রাখবে।

'তুমি, কিরিকিরি, লুকানো রাইফেলগুলো নিয়ে—যতগুলো পারো—ফিরে এসো আমার কাছে।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রওনা হয়ে গেল ইন্ডিয়ানরা, নিজের জায়গায় একা দাঁড়িয়ে থাকল হুয়ান কার্টিজ। আগুনে সেদ্ধ হচ্ছে হরিণের ধড়, সেদিকে ধীরে ধীরে পিছন ফিরল সে। প্রতিশোধ নেয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত জল বা আহার কিছুই গ্রহণ করবে না সে।

পাথরের মূর্তির মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর আবার ঘুরল, নিভিয়ে দিল আগুনটা। শুধু তার বুকের আগুনটা জ্বলতেই থাকল।

আট

'তোমার বাপের নাম কি?' গাড়ি চালাচ্ছে রানা, নিরীহভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেছে হ্যামার। শুধু যে রিভলভারটা রানার হাতে চলে গেছে তাই নয়, ছুটন্ত একটা গাড়িতে রয়েছে সে। মান্ধাতা আমলের চারচাকা ডন হোমায়রার একটা আছে বটে, কিন্তু ভুলেও সেটায় কখনও চড়েনি সে, তার গা ছমছম করে। 'কেন, কি দরকার?'

'ভুলিয়ে দেব।'

রাগে গরগর করতে লাগল হ্যামার, অন্য দিক মুখ ফেরাল। নিজের ঘাড়ে হাত দিয়ে টিপতে শুরু করল সে।

'ঠিক আছে, বাদ দাও, বিশেষ করে তুমি যখন হাই ব্লাড প্রেশারের রোগী, তোমাকে উত্তেজিত করা ঠিক হবে না। কি করে বুঝলাম?' হাসছে রানা। 'ঘাড় টিপতে দেখে। কিছুদিন ওরকম ঘাড় ব্যথা হবে, তারপর হঠাৎ একদিন দু'বার পিড়িক-পিড়িক করে উঠবে, ব্যস, সমস্ত পিড়িক-প্যাড়াক চিরকালের জন্যে বন্ধ।'

'দেখে নিয়ো, তোমাকে আমি ঠিকই খুন করব…'

ডান পা দিয়ে ব্রেকের ওপর এত জোরে চাপ দিল রানা, সামনের দিকে ছিটকে পড়ল হ্যামার, উইন্ডস্ক্রীনে বাড়ি খেয়ে থেঁতলে গেল নাক আর কপাল। 'দুঃখিত,' বলল রানা। 'মনে হলো যেন একটা সাপ দেখলাম রাস্তার ওপর।'

'গাড়ি আরও আস্তে চালাতে পারো না?' রীতিমত কুঁকড়ে গেছে হ্যামার, কখন আবার কোন্‌দিকে ছিটকে পড়তে হয়।

'কি!' খপ্‌ করে কথাটা ধরল রানা। 'আমি গাড়ি চালাতে পারি না? এত বড় কথা! নামো, নেমে যাও বলছি!' হ্যামারের দিকে রিভলভার নাড়ল ও। 'আউট!'

'এখানে তুমি আমাকে নামিয়ে দিতে পারো না। র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দাও।'

'অসম্ভব, তোমাকে আমি আর একদণ্ডও গাড়িতে রাখব না। বলে কি, আমি নাকি গাড়ি চালাতে পারি না! র‍্যাঞ্চে যাবে কি জাহান্নামে যাবে, সে তোমার ব্যাপার, আমি তোমাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছি না।' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'তবে তুমি চাইলে তোমাকে আমি ওই গ্রামে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারি। কি, যাবে?'

'না!'

'কিন্তু আমি তো সেখানেই যাচ্ছি, হ্যামার। আউট।'

'ধরো এ-পথে কেউ যদি না আসে, আমার কি হবে?' গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল হ্যামার।

'খনির ভেতরও তো কেউ যায়নি, যারা আটকা পড়েছে তাদের কি হয়েছে? তবে তুমি কোথাও আটকা পড়োনি, কেউ না কেউ আসবে। মানুষ যদি না-ও হয়, তোমার মত কেউ—কুকুর, শুকুন, কয়োট…' গলা ছেড়ে হাসল রানা, ঘুরিয়ে নিল গাড়ি, একরাশ ধুলোয় হ্যামারকে ঢেকে দিয়ে চলল শহরের দিকে।

শহর দু'মাইল দূরে থাকতে ট্রেইলের ধারে কিছু কাঁটাঝোপ দেখল রানা, গাঢ় নীল আর হলুদ বুনো ফুলে ছেয়ে আছে। শেভ্রোলে থামিয়ে এক ডজনের মত ফুল তুলে সীটের ওপর রাখল ও।

শহরটাকে ফাঁকা লাগল।

হোটেলের ভেতর একটা হাত তুলে ওকে অভ্যর্থনা জানাল ব্রেমারিক।

'শীলা ওপরে?'

মাথা ঝাঁকাল রেমারিক, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও তার চেহারায় ঈর্ষার ভাব আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলো রানা।

ওপরে উঠে এল ও, নক করল দরজায়, বুনো ফুলগুলো পিছনে লুকাল।

'কে?' শীলার গলা ভেসে এল।

একি দশা, ভাবল রানা, আওয়াজ শুনেই শিরশির করবে গা! 'তোমার প্রিয় আউটল,' জবাব দিল ও।

গাঢ় সবুজ কিমোনো পরেছে শীলা দ্য হোমায়রা, কিনারায় সোনালি-রূপালি ঝালর। এক হাতে কিমোনোর সামনেটা ধরে আছে সে, সিল্ক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে সুগঠিত বুক। 'আমার ধারণা ছিল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে তোমাকে,' বলল সে।

'তোমাকেই তো আমার কর্তৃপক্ষদের একজন বলে মনে হচ্ছে। ভেতরে আসতে পারি?' ঝট্ করে ফুলগুলো সামনে এনে শীলাকে চমকে দিল রানা।

'ওমা, কি সুন্দর!' রানার হাত ধরে ভেতরে ঢোকাল শীলা, চারদিকে তাকাল ফুলদানীর সন্ধানে। ফুলদানীতে ফুল সাজানোর পর বলল, 'তোমার মুখ খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠল দেখছি, আবার সুদর্শন লাগছে।'

'মুখে কি যেন দেবে বলেছিলে, এড়িয়ে যাচ্ছ নাকি?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

হাসল না শীলা, এগিয়ে এসে রানার ঠিক সামনে দাঁড়াল। হাত দুটো তুলল সে, দশ আঙুল দিয়ে রানার গাল স্পর্শ করল। সারা মুখে আঙুলগুলো নড়াচড়া করছে। 'ভয় হয়, রড, তোমাকে ভালভাবে চিনতে ভীষণ ভয় করে আমার।' হঠাৎ হাত নামিয়ে পিছন ফিরল সে। 'তারচেয়ে দূরে দূরে থাকো, রহস্যময় থাকো, নিজের কোন কথাই আমাকে জানিয়ো না…তাহলে তুমি চলে যাবার পর ভাবব যার আসার কথা ছিল আসেনি সে, কিংবা জানতেও পারিনি এসে চলে গেছে…'

'হ্যাঁ, এসেছিলাম, কিন্তু চলে যাচ্ছি…দরজাটা বন্ধ করে দাও।' বলে ঘুরল রানা,পা বাড়াল দরজার দিকে। পিছন থেকে বাধা পেল ও, প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে জড়িয়ে ধরল শীলা।

ঘুরল রানা, মুখোমুখি হলো দু'জন। হাসতে শুরু করল একসাথে, তখনও ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে, কিন্তু হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল শীলার। এ তার আনন্দের কান্না কিনা কে জানে।

'দরজাটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বন্ধ করবে না?'

নিঃশব্দে ওপর-নিচে মাথা দোলাল শীলা, তারপর বলল, 'করব। কিন্তু তারপর? কি চাইবে তুমি?' চোখে টলটল করছে মুক্তোর মত স্বচ্ছ পানি। ক্ষুধার্তের মত একটা ঢোক গিলল সে।

'চাইব? বলো কি চাইব না!'

'কিন্তু রানা, তুমি চাইলে আমি যে বিপদে পড়ে যাব, তার কি হবে?'

'মানে?'

'তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব সে ক্ষমতা আমার নেই,' শীলার বিষণ্ন মুখে মৃদু হাসি। 'আমি বড়জোর অনুরোধ করতে পারি, সবটুকু তুমি চেয়ো না।'

'উঁহুঁ,' গোঁয়ারের মত মাথা নাড়ল রানা। 'অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া আমার স্বভাব নয়। চাইলে আমি সবটুকুই চাইব, তা না হলে কিছুই চাইব না!'

'ওরে পাজি, ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে!' আকস্মিক ধাক্কায় রানাকে সরিয়ে দিল শীলা, ছুটে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। কবাটে পিঠ রেখে দু'হাত তুলে হাতছানি দিল। 'এসো, পারলে জোর করে আদায় করো···'

'আসছি।' চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল রানা।

মস্ত একটা হাই তুলল ট্যালবট, হাত উল্টো করে ঘুম লেগে থাকা লাল চোখ দুটো রগড়াল। বিছানা থেকে নেমে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, পাহাড়ের গায়ে ভোরের ম্লান আলো কেমন যেন অশুভ আর ভৌতিক লাগল তার কাছে। নির্জন গ্রামের রাস্তাটা ফাঁকা পড়ে আছে, খড় আর গাছের পাতা উড়ছে বাতাসে।

ঠাণ্ডা হিম বাতাস, কাঁপ ধরে গেল শরীরে, মুখের ভেতরটা টক টক। মুশকিল হলো, বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সে। আয়ু যখন শেষই হয়ে এসেছে, আর পালিয়ে বেড়ানোই যখন বিধিলিপি, যতক্ষণ বেঁচে আছে ব্যস্ত থাকা উচিত ভাল কোন কাজে। কসাই হোমায়রার ক্রীতদাস হয়ে থাকাটা জীবন নয়।

কাল ওরা মাঝরাতের পর খনিতে পাথর ভাঙার কাজ বন্ধ রেখেছিল, কারণ কাজ চালিয়ে যাবার শক্তি ছিল না কারও। সিনর রড যেমন বলেছিলেন, ভাবল সে, ডিনামাইট ছাড়া লোকগুলোকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু হোমায়রাকে বোঝায় কে! নিজের সোনা বাঁচাতে গিয়ে লোকগুলোকে খুন করল সে।

সন্ধের পর থেকে ইন্ডিয়ানদের সাথে কাজ করার সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে ট্যালবট। কি যেন জানে ওরা, ওকে বলার প্রয়োজন বোধ করেনি। নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে তাদেরকে ফিসফিস করতে দেখেছে সে, চোখ ইশারায় ভাব বিনিময় হতে দেখেছে।

কোট পরে মাথায় হ্যাট চাপাল ট্যালবট। দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়। এখনও নির্জন গ্রাম, শুধু বাতাস পেয়ে ঝোপঝাড়গুলো দুলছে। গোটা গ্রামটাকে ভূতুড়ে, পরিত্যক্ত লাগল। কোঁচকানো ভুরু নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল সে, ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

শেড খালি, কেউ নেই ভেতরে। সাধারণত আরও আগেই ইন্ডিয়ানরা ভিড় জমায় শেডের ভেতর, দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রথম শিফট শুরু হবার অপেক্ষায়। হাত দিয়ে দেখল ট্যালবট, স্টীম এঞ্জিনটা ঠাণ্ডা। কয়েকজন পাহারাদার থাকার কথা, তাদের একজনের দায়িত্ব এঞ্জিনটাকে মাঝে মধ্যে চালু করে গরম রাখা। তারমানে রাতে শেডের ভেতর কেউ ছিল

না।

ঘোড়া নিয়ে কেবিনের দিকে ফিরে এল সে, পিছন দিকে এসে জিন চাপাল। গ্রামের ভেতর দিয়ে যাবার সময়ও লক্ষ করল, সব কিছু স্থির হয়ে আছে। কোথাও আগুন জ্বলছে না। বাচ্চারা কাঁদছে না। কুয়ার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল সে। রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত নেই।

ধীর পায়ে হেঁটে এসে সবচেয়ে কাছের একটা দরজা খুলল সে। ঘর খালি। রান্না করার জন্যে একটাই পাতিল থাকে, সেটাও গায়েব। চুলোয় হাত দিল ট্যালবট। ঠাণ্ডা।

এক এক করে আরও দুটো ঘরে ঢুকল সে। খালি।

ধীর পায়ে কুয়ার কাছে ফিরে এল। মরু প্রান্তর থেকে করুণ সুরে ডেকে উঠল একটা কুকুর। গা ছমছম করতে লাগল ট্যালবটের। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তারপর সে চমকে উঠল—ওটা কি আসলেই কুকুরের ডাক ছিল? নাকি ইন্ডিয়ানদের কোন গোপন সঙ্কেত? ভয়ে ভয়ে ঘোড়ায় চড়ল ট্যালবট, দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল চারদিকে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

কি ঘটেছে বুঝতে পারল না ট্যালবট। যাই ঘটুক, ঘটনাটা গ্রামের সবাইকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। এই সব চিন্তা করতে করতে তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল সে। আধ ঘন্টা পর উপত্যকার মাথায় পৌঁছুল, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল র‍্যাঞ্চে।

উঠানে ঢোকার পর দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল মোনা লিজা। তার চুল এলোমেলো হয়ে আছে দেখে অবাক হলো ট্যালবট। মহিলা অত্যন্ত ফিটফাট থাকতে ভালবাসেন, স্বভাব-চরিত্রও স্বামীর ঠিক উল্টো। তার চেহারায় কেমন যেন একটা অস্থির ভাবও লক্ষ করল সে।

'সিনর ট্যালবট, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনি এসে পড়েছেন!'

ঘোড়া থেকে না নেমেই তাকিয়ে থাকল ট্যালবট। 'কেন, কি হয়েছে? ডন হোসে কি বাড়িতে নেই?'

মাথা নাড়ল মোনা লিজা। 'শুধু টেরেসাকে নিয়ে আমি, আর সারা, আমার চাকরানীটা আছে। সেই ভোর অন্ধকারে হ্যামারকে নিয়ে আমার স্বামী উত্তরের চারণভূমিতে গেছে। একজন রাখাল খবর নিয়ে এসেছিল গরু-ছাগল সব নাকি কারা মেরে ফেলেছে।'

'চাকরবাকররা, তারা কোথায়?'

'একজন তো রোজই ছ'টার সময় বিছানায় কফি দেয় আমাকে। আজ সে না আসায় খুঁজতে যাই আমি।' অবিশ্বাস আর বিস্ময়ে মাথা নাড়ল মোনা লিজা। 'রান্নাঘর ঠাণ্ডা, চুলোই জ্বালা হয়নি। তারপর গোটা বাড়ি খুঁজলাম। কেউ নেই, আমাকে কিছু না বলে চলে গেছে সবাই।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে ট্যালবট বলল, 'কাল খনিতে যা ঘটেছে তার সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে গিয়ে দেখছি, ওখানে নিশ্চয়ই

এমন কেউ আছে যে বলতে পারবে আসলে কি ঘটছে।'

ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে এল ট্যালবট, তারপর ঢাল বেয়ে ঝর্ণার আশপাশে ছড়িয়ে থাকা কুঁড়েগুলোর দিকে নামল। প্রথম দরজায় লাথি মেরে ভেতরে ঢুকে সেই একই দৃশ্য দেখল সে। চাকরবাকররা তাদের জিনিস-পত্র সহ বিদায় হয়েছে।

বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ছে, র‍্যাঞ্চের দিক থেকে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভেসে এল। তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছোটাল ট্যালবট। ঢালের মাথা হয়ে আবার যখন উঠানে ফিরল সে, দেখল সামনের দরজার পাশে একটা বাকবোর্ড। দেয়ালে কাঁধ আর মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোনা লিজা। আর গিবন, ডন হোমায়রার খাস চাকর, দাঁড়িয়ে রয়েছে সিঁড়ির একটা ধাপে, হাতে হ্যাট।

'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল ট্যালবট।

ধীরে ধীরে ধাপ থেকে নেমে এল গিবন, চেহারা খুবই ম্লান। 'নিজের চোখেই দেখুন, সিনর।'

বাকবোর্ডের পিছনে, সীটের ওপর, রঙচঙে ইন্ডিয়ান চাদরে কি যেন একটা ঢাকা রয়েছে। সামনে এগিয়ে ঝুঁকল ট্যালবট, সশব্দে নিঃশ্বাস বন্ধ করল। আকাশের দিকে ভাষাহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন ফাদার পামকিন। খুলি উড়ে যাওয়া মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে।

চাদরের প্রান্ত দিয়ে সেটা ঢাকল ট্যালবট। 'কোথায় পেলে তুমি ওকে?'

'আমার কুঁড়ে থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, সিনর। আশ্চর্য কি জানেন, ঘোড়াগুলোর পা এক করে বাঁধা ছিল।'

'ওরা তাহলে ওকে কবর দেয়নি। লাশটা পাঠিয়েছে একটা মেসেজ হিসেবে।'

দেয়ালের কাছ থেকে ওদের দিকে ফিরল মোনা লিজা। তার চেহারা ফ্যাকাসে দেখালেও, ইতোমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'সিনর ট্যালবট, আমাকে সত্যি কথা বলবেন। এর মানে কি?'

'ডন হোসে আপনাকে কি বলেছেন?'

'তিনি আমাকে কিছুই বলেননি। প্লীজ, এসব কি ঘটছে আমার জানা দরকার।'

'খনিতে একটা ব্যাপার নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছিল। পাথর ধসের ফলে ভেতরে বিশ-বাইশজন লোক আটকা পড়ে। মি. পিটার রড, নতুন বিদেশী ভদ্রলোক, পরামর্শ দেন বড় একটা পাথর সরাবার জন্যে ডিনামাইট ব্যবহার করা উচিত, তা না হলে ইন্ডিয়ানদেরকে উদ্ধার করা যাবে না। কিন্তু ডন হোসে তার ওপর খুব রেগে গেলেন, বললেন তাকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হবে। ফাদার পামকিন ডন হোসেকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু···আমি দুঃখিত, মিসেস হোসে···ডন হোসে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে গুলি করলেন ফাদার পামকিনকে।'

'এত কিছু ঘটে গেছে আর আমি কিছু জানি না! এ অসম্ভব, এ আমি

বিশ্বাস করি না!'

ট্যালবট শান্তভাবে বলল, 'বহুলোক দেখেছে।'

'সেজন্যেই কি গরু-ছাগলগুলোকে জবাই করা হয়েছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যালবট।

'সেজন্যেই কি চাকরবাকররা পালিয়েছে?'

ট্যালবট কোন জবাব দিল না।

'সিনর ট্যালবট,' মোনা লিজা বলল, 'এই মুহূর্তে আমি হারমোজায় যেতে চাই। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।'

ইতস্তত করল ট্যালবট। 'আপনার স্বামী না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হত না?'

'না!' মাথা নাড়ল মোনা লিজা। 'শহরে আমরা এখানকার চেয়ে নিরাপদে থাকব। বাকবোর্ড নিয়ে যাব আমরা, ফাদার পামকিনও আমাদের সাথে থাকবেন। গিবন চালাবে।' ট্যালবটকে আর কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল সে।

ইতস্তত ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না ট্যালবট, অশুভ আশঙ্কায় খুঁত খুঁত করছে মনটা। দূর পাহাড়ের দিকে তাকাল সে, দিনের প্রথম সূর্য সোনালি আলো ঢেলে দিয়েছে। কে জানে, ওদের জন্যে কি অপেক্ষা করছে ওখানে। গিবনের দিকে ফিরল সে, জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাছে কোন অস্ত্র আছে?'

'ডন হোসে তাঁর সব অস্ত্র সেলারে তালা দিয়ে রাখেন, সিনর। শুধু তাঁর কাছে চাবি থাকে। দরজা ভাঙতে হলে স্লেজহ্যামার লাগবে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মোনা লিজা, কাঁধ আর মাথা শাল দিয়ে ঢাকা। তার পিছনে কোলে ছোট্ট টেরেসাকে নিয়ে সারা। বাচ্চাটাকে নিয়ে সে পিছনে বসল। নিজের ঘোড়ায় চড়ল ট্যালবট। গেট থেকে বেরিয়ে এসে রওনা হলো সে, পিছনে বাকবোর্ড। ট্রেইল ধরে উপত্যকার মাথায় উঠে যাচ্ছে ওরা।

পাহাড়শ্রেণীর মাথায় চড়ে বসল সূর্য, মরু থেকে তাড়া করে আনল নীলচে ছায়াগুলোকে, আর ঘোড়ার পিঠে দমাদম চাবুক কষল গিবন, বেপরোয়া হয়ে ওঠার তাগাদা দিচ্ছে।

পায়ের নিচের মাটি, পাথর আর বালি থেকে এরইমধ্যে ঘন কুয়াশার মত ভাপ বেরুতে শুরু করেছে, খানিক পরপর আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে গিবন। শুকনো, সরু, গভীর একটা গিরিখাতে নেমে এল ওরা। গোপন হত্যাকাণ্ডের জন্যে জায়গাটা আদর্শ, কথাটা বারবার মনে হতে লাগল ট্যালবটের। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বারবার পিছন দিকে তাকাল সে, ঘন ঘন ঢোক গিলেও ভেজাতে পারল না গলা। কিন্তু কিছুই ঘটল না, নিরাপদে গিরিখাত থেকে উঠে এল ওরা, তারপর নির্দিষ্ট একটা পথচিহ্নের দিকে এগোল, যেখানে খনি থেকে আসা ট্রেইলটা হারমোজার দিকে যাবার আরেকটা ট্রেইলের সাথে

মিশেছে। সামনে আরও একটা গভীর ক্যানিয়ন, এতই গভীর আর বিশাল বেঢপ আকৃতির পাথরবহুল যে সূর্যের আলো নিচে নামার পথ পায় না, গোটা ক্যানিয়ন আশ্চর্য ঠাণ্ডা।

গভীর অটুট নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা জে পাখি ডেকে উঠল তিনবার, ঝট করে মাথার ওপর দৃষ্টি ফেলল ট্যালবট। নাকি জে পাখি নয়? জে-রা সাধারণত পানির ধারেকাছে থাকে, অথচ এদিকে কোন জলাশয় নেই। ঠিক সেই মুহূর্তে রক্ত-হুলকানো একটা চিৎকার ভেসে এল পিছন থেকে, ক্যানিয়নের দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল, মরু থেকে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এল দু'জন অ্যাপাচী, বন্ধ করে দিল বাকবোর্ডের পিছু হটার পথ।

গিবনের মুখ যেন আতঙ্কের মুখোশ, একবার মাত্র পিছনে তাকিয়ে ঘোড়ার পিঠে সপাং সপাং চাবুক চালাল সে। সামনে চওড়া হয়ে গেছে ক্যানিয়ন, পিরিচ আকৃতির গভীর খাদ, চারদিকে প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে ঢালগুলো। পিরিচের পুরোটা দৈর্ঘ্য পেরিয়ে ওরা যদি ওপারে যেতে পারে, সামনে খোলা প্রান্তর। উন্মাদের মত আবার চাবুক মারল গিবন। সামনে তিনটে বিন্দু দেখতে পেল সে। দূরত্ব কমিয়ে আনার পর বিন্দু তিনটে আকৃতি পেতে শুরু করল। তারপর পরিষ্কার চেনা গেল ঘোড়সওয়ার তিনজন অ্যাপাচীকে।

এবার গিবন লাগাম টেনে ঘাবড়ে যাওয়া ঘোড়াগুলোকে থামাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সামনের অ্যাপাচীরা এত কাছে চলে এসেছে যে তারা এখন রাইফেলের নাগালের মধ্যে পাবে ওদেরকে। রাইফেল তুলেই গুলি করল একজন অ্যাপাচী, অনায়াস ভঙ্গিতে। গুলিটা গিবনকে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল, তারপরও সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলোকে থামাবার চেষ্টা করল সে। দ্বিতীয়বার গুলি হলো, এবার বুলেটটা ঠিকমত পেল টার্গেটকে। চিৎকার করে কিনারা থেকে পড়ে গেল গিবন।

মেয়েরা আর্তনাদ করে উঠল, কাত হয়ে পড়ল বাকবোর্ড, পিছনের চাকা ধাক্কা খেল একটা বোল্ডারের সাথে। হতচকিত ঘোড়াগুলো পিছনের পায়ে ভর দিয়ে প্রায় খাড়া হয়ে গেল, পাশ কাটাল অ্যাপাচীদের দলটাকে, পরমুহূর্তে উল্টে গেল বাকবোর্ড, পাথরের ওপর ছড়িয়ে দিল আরোহীদের।

লাগাম টেনে ধরেছে ট্যালবট, তার ঘোড়ার নিচে গড়াচ্ছে সারা। আচমকা পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা, জিন থেকে পড়ে গেল সে। একটা গড়ান দিয়ে দাঁড়াল, পাথরের সাথে ঠুকে যাওয়ায় ঝিমঝিম করছে মাথা। আবার পড়ে গেল সে, এবার উল্টে পড়া বাকবোর্ডের পাশে ফাদার পামকিনের লাশের ওপর।

ক্যানিয়নে ঢোকার সরু প্রবেশপথটার দিকে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে মোনা লিজা, বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে আছে ছোট্ট টেরেসাকে, স্কার্টে পা বেধে গিয়ে হোঁচট খেল সে, আছাড় খেয়ে পড়ল, শব্দহীন চিৎকারে হাঁ হয়ে আছে মুখ। পুরানো নীল কোট পরা একজন অ্যাপাচী, কোটের বোতামগুলো চকচকে পিতলের, ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এল তার পিছন থেকে, ঠা ঠা হাসছে, এক

হাতে উঁচু করে ধরে আছে রাইফেল। একটা বৃত্ত রচনা করে রাইফেলটা ঘোরাল সে, নল স্থির হলো মোনা লিজার মাথা লক্ষ্য করে। অসহায় দর্শকের মত তাকিয়ে থাকল ট্যালবট, রাইফেলের একের পর এক বিস্ফোরণের সাথে গুঁড়ো গুঁড়ো হতে থাকল মোনা লিজার হাড়গোড়। টেরেসা তার মাকে জড়িয়ে ধরে ত্রাহি চিৎকার ছাড়ছে, দুর্বল ছোট দুটো হাতে ঝাঁকি দিয়ে প্রাণ ফেরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

মরিয়া হয়ে চারদিকে তাকাল ট্যালবট, কিন্তু পালাবার কোন পথ দেখল না। সাদা বালি থেকে ঢালগুলো খাড়া আর মসৃণভাবে উঠে গেছে। লোহার মত শক্ত একজোড়া হাত টেনে-হিঁচড়ে বাকবোর্ডের তলা থেকে বের করে আনল তাকে।

ইন্ডিয়ানরা তাকে বাকবোর্ডের পিছন দিকে রশি দিয়ে বাঁধল, হাত দুটো আগেই পিছমোড়া করে বেঁধেছে। ইতোমধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে তার বিবিসাহেবার কাছে চলে এসেছে সারা, ফোঁপাচ্ছে সে, চেষ্টা করল মায়ের বুক থেকে টেরেসাকে টেনে নিতে। কিন্তু বাচ্চাটা তার মাকে ছাড়ছে না। একটা পাথরে হেলান দিয়ে রয়েছে গিবন, রক্তাক্ত হাতটা অপর হাতে খামচে ধরে আছে। অ্যাপাচীদের কাছে রাইফেল রয়েছে, দু'জনের বেল্টে রিভলভার। লাল, সাদা আর নীল ডোরা আঁকা মুখ।

অ্যাপাচীদের একজন মোনা লিজাকে চিৎ করল। তার ভাগ্য ভাল যে সে মারা গেছে। আতঙ্কিত সারার দিকে এগিয়ে গেল ইন্ডিয়ান। দয়া ভিক্ষা চাইছে সারা, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। কিন্তু অ্যাপাচীর মুখে কোন ভাব নেই। রাইফেলটা উল্টো করে ধরল সে, বাঁট দিয়ে সারার মাথায় বাড়ি মারল একের পর এক। রক্ত আর মগজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। টেরেসাকে দু'হাতে তুলে নিল সে, বাচ্চা মেয়েটা চিৎকার করছে, হাত-পা ছুঁড়ছে। থাকতে না পেরে, সম্ভবত নিজের অজান্তেই, চিৎকার করে ট্যালবট বলল, 'ছেড়ে দাও, বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও...' এগিয়ে এসে ট্যালবটের মুখে থুথু ছিটাল লোকটা।

ভাঙা বাকবোর্ডের কাঠ, কাপড়চোপড় ইত্যাদি জড়ো করে একটা আগুন জ্বালা হলো। আগুন যখন বেশ দাউদাউ করে উঠল, ধরাধরি করে তাতে ফেলা হলো গিবনকে, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো তাকে। এ-সবই করা হলো তারা শুধু ডন হোমায়রার লোক বলে।

সূর্য আরও ওপরে ওঠার সাথে সাথে গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠল পোড়া মাংসের। ট্যালবটের মনে হলো অনন্তকাল ধরে ঝুলে আছে সে, অপেক্ষা করছে কখন তার পালা আসবে। বুকের ওপর নুয়ে পড়ল তার মাথা।

একাধিক খুরের আওয়াজ শুনে মুখ তুলল সে। পনেরো বিশজন যোদ্ধাকে নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হলো হুয়ান কার্টিজ। ঘোড়া থেকে নামল সে, উত্তেজিতভাবে যারা তার সামনে এসে দাঁড়াল সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিল। আর সবার মত তার মুখে যুদ্ধের রঙচঙে নকশা নেই, তবে লাল ফ্ল্যানেল শার্ট

আর মাথার পট্টিটা ট্যালবটের দৃষ্টি এড়াল না। এ-থেকেই যা বোঝার বুঝে নিল সে।

শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে ট্যালবট সাহস সঞ্চয় করল। 'হুয়ান,' বলল সে। 'এসব কি?'

'হুয়ান কার্টিজ নামে যাকে তুমি চিনতে, আমি সে-লোক নই,' জবাব দিল অ্যাপাচী সর্দার। 'তুমি একজন অ্যাপাচীকে দেখছ, যার কাঁধে প্রতিশোধ নেয়ার গুরুদায়িত্ব চেপেছে। আমার সাথে সাথে বলো, প্রতিশোধ।'

'প্রতিশোধ,' বিড়বিড় করল ট্যালবট।

'গুড,' বলল কার্টিজ, কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে ট্যালবটের দিকে এগিয়ে এল সে, ঘ্যাচ্ করে এক পোচে কেটে দিল তার বাঁধন।

দাঁড়াতে গিয়ে টলতে লাগল ট্যালবট, বোকার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, যেন পথ খুঁজছে পালাবার। তার হাবভাব লক্ষ করে হাসাহাসি করতে লাগল অ্যাপাচীরা। একটা পনি আনা হলো, সেটার পিঠে তুলে দেয়া হলো তাকে। এগিয়ে এসে তার বাহুতে হাত রাখল কার্টিজ।

'হোমায়রার কাছে ফিরে যাও, তাকে বলো আমি তার মেয়েকে রেখে দিয়েছি। এই কাজটার জন্যে তোমাকে আমি প্রাণে মারছি না। বুঝতে পারছ তো?' লাগামটা ট্যালবটের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

ঘোড়া ছোটাল বুড়ো ট্যালবট।

নয়

ঘুম ভাঙার পর বিছানায় শীলাকে না পেয়ে ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। দূর পাহাড়ের মাথার কাছে সবে উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে সূর্য।

গত রাতে ওকে জোর করে নিজের ঘরে রেখে দিয়েছিল শীলা। মেয়েটা যে আশ্চর্য একটা ব্যতিক্রম, উপলব্ধি করতে পেরেছে রানা। প্রায় সারারাত খাটে বসে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে কেটেছে, দুনিয়ার গল্প করেছে ওরা, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রশ্ন তুলে কেউ কাউকে বিব্রত করেনি। শীলা তাকে শুনিয়েছে নিজের ছেলেবেলার মধুর কাহিনী, বাপদাদার মুখে শোনা রোমাঞ্চকর ওয়েস্টার্ন সত্যঘটনা, এবং একান্ত ব্যক্তিগত কিছু আশা আর স্বপ্নের কথা। স্বীকার করেছে, তার স্বভাবটা রোমান্টিক। তার যত ভালবাসা সব এই শীলা হংকং চাইনীজ রেস্তোরাঁটাকে ঘিরে। তার স্বপ্ন রুক্ষ-কঠিন পাথুরে প্রান্তরে তার রেস্তোরাঁটা আনন্দ-ফুর্তি আর সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। আশা আছে, অশিক্ষিত বর্বর অধিবাসীদের জন্যে একটা স্কুল খুলবে সে, সেখানে দিনে পড়াশোনা করবে বাচ্চারা, রাতে বয়স্করা। ইচ্ছে করলেই সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে ভদ্র ও সভ্য কোন জায়গায় চলে যেতে পারে সে.

কিন্তু শীলা চায় তার এই জন্মভূমিটাকেই নিজের চেষ্টায় ভদ্র ও সভ্য করে গড়ে নিতে।

আর রানা তাকে শুনিয়েছে রক্ত হিম করা ভূতের গল্প।

মাঝে মধ্যে উঠে গিয়ে দু'জনের জন্যে কফি তৈরি করে এনেছে শীলা, তার পিছু পিছু কিচেন পর্যন্ত গেছে রানা, দেখতে না পাবার ভান করে ধাক্কা খেয়েছে তার সাথে। কৃত্রিম রাগে চোখ রাঙিয়েছে শীলা, 'ফাজলামি হচ্ছে, না? নিজেকে আনাড়ি প্রমাণ করতে চাও?' ধরা পড়ে গিয়ে হেসে ফেলেছে রানা। 'এ-ধরনের অভদ্রতা আমি ঘৃণা করি।' রানার হাসি যখন দপ্ করে নিভে গেল ঠিক তখুনি অপ্রত্যাশিতভাবে পাল্টা একটা ধাক্কা দিল শীলা। ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠল রানা, তারপর একসাথে দু'জনের হেসে ওঠা। মাঝরাতে ছাদেও উঠেছিল ওরা, পরস্পরের হাত ধরে হেঁটেছিল কিছুক্ষণ, তারপর নিচে নেমে এসে রানার শার্টের বোতাম খুলে দিয়েছিল শীলা, রানা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে দেখে লাইটারটা কেড়ে নিয়ে নিজে জ্বেলে ধরিয়ে দিয়েছিল। রাত যখন শেষের দিকে, রানা বলল সে না হয় ড্রইংরুমে শোবে। 'পাগল নাকি,' প্রতিবাদ করে বলল শীলা। 'দু'জনেই আমরা পরিণত মানুষ, নিজেরা চাই না এমন কিছু ঘটতেই পারে না। আর যদি চাই, যা চাইব তা তো শুধু পরিণত মানুষেরই প্রাপ্য। না, তুমি আমার সাথে আমার ঘরে এই বিছানায় আমার পাশে শোবে। এই সুযোগ আর যদি না পাই?' শোয়ার পর রানার চুলে বিলি কেটে দিল শীলা। হাত বুলিয়ে দিল মুখে আর বুকে। 'আমিও দেব,' বিছানায় উঠে বসে জেদ ধরল রানা। 'কেউ কিছু দান করলে প্রতিদান না দিয়ে ছাড়ি না আমি। আমিও তোমার চুলে আঙুল চালাব, হাত বোলাব…' খিল খিল করে হেসে উঠে বলল শীলা, 'ভীরু করব করব ভাব দেখায়, সাহস করে করা আর হয়ে ওঠে না। কেউ মানা করেছে তোমাকে?'

কাল রাতের কথা স্মরণ করে আপনমনে ক্ষীণ একটু হাসল রানা। অথচ খচ্ খচ্ করে কি যেন একটা বিঁধছে বুকে, এত সুখ আর ভালবাসার মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যথা আছে।

নিচে নেমে এসে রানা দেখল বার খালি, শব্দ আসছে কিচেন থেকে।

দোরগোড়ায় হেলান দিল ও। স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শীলা, পরনে রাইডিং ড্রেস।

'জিনিসটা যাই হোক, ঘ্রাণটা দারুণ।'

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে হাসল শীলা। 'আজ সকালে ডিম পাইনি। আলু, কড়াইশুঁটি, সীম, মটরশুঁটি, বীট, গাজর, বেগুন, টমেটো—সব একসাথে করে…'

'থাক থাক। শুনেই পেট ভরে যাচ্ছে।'

'পটে কফি আছে।'

একটা কাপ খুঁজে নিয়ে কফি ঢালল রানা।

'খনির দিকে যাচ্ছ নাকি আবার?' জিজ্ঞেস করল শীলা।

'হ্যাঁ। শেষ একটা চেষ্টা করে দেখব···'

'কারণ এখন তোমার হাতে একটা রিভলভার আছে?' আবার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল শীলা। 'কাল রাতে দেখেছি ওটা।'

'হ্যামারের। ইতিমধ্যে সে নিশ্চয়ই আরও একটা জোগাড় করে নিয়েছে।' চেয়ারে বসল রানা, চুমুক দিল কাপে। 'আচ্ছা, কেমন মেয়ে বলো তো তুমি, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমার কোন কৌতূহল নেই? রাতে নিজের সব কথাই তো শোনালে, কই, আমার কথা তো কিছু জিজ্ঞেস করলে না?'

'তোমাকে আমি চিনি, তোমার সব কথা আমার জানা।'

ঘাবড়ে গেল রানা। 'মানে?'

'তুমি কোন অপরাধ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছ, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলল শীলা। 'কল্পনায় একজনকে দেখতাম—কল্পনা যখন, নায়কোচিত সমস্ত গুণ ভরে দিয়েছিলাম তার ভেতর—তারপর তুমি এলে, দেখলাম এ তো আমার নিজের বানানো সেই প্রিয় পুরুষ। অতি চেনা।'

হেসে উঠল রানা। 'শোনো। বিশ্বাস করে তোমাকে একটা কথা বলব।'

'কাকা বলে, ভুলেও কখনও কোন মেয়েকে বিশ্বাস কোরো না।'

'কিন্তু আমি তোমাকে বিশ্বাস করব। করা দরকার। শোনো। ডন হোমায়রা আমার সম্পর্কে জানে···'

কৌতুক করল শীলা। 'আমার চেয়ে বেশি?'

'জানে, কিন্তু ভুল জানে। আমি লুকিয়ে আছি এ-কথা ঠিক, কিন্তু আইনের হাত থেকে নয়···' নিজের পরিচয়, হার্মিসের দৌরাত্ম্য, ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দিল ও। গভীর মনোযোগ দিয়ে সব শুনল শীলা। সবশেষে রানা বলল, 'পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমাকে ফিরে যেতে হবে। কিংবা তার আগেই অন্য কোথাও সরে যাওয়ার দরকার হবে, বাংলাদেশ থেকে হুকুম এলেই···'

ম্লান মুখে ছোট্ট মন্তব্য করল শীলা, 'আমার জন্যে দুঃসংবাদ।'

'যদি না তুমি আমার সাথে যেতে পারো।'

'তোমাকে তো বলেছি, রানা,' বিষণ্ন চোখে তাকাল শীলা। 'এই হোটেলটাই আমার দুনিয়া। এখানকার মাটি, পাথর, বালি আর মানুষগুলোকে আমি ভালবাসি। সব যদি সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারি, আমি নিজেও সরতে পারি না। তুমি যেমন তোমার নিজের জগতে বন্দী, তেমনি আমি আমার নিজের জগতে।'

ঠিক সেই সময় কিচেনে ঢুকল রেমারিক, পাথরের একটা গামলা রাখল টেবিলে। 'কি ঘটছে আমি জানি না। গোটা এলাকায় কোথাও কোন ইন্ডিয়ানের ছায়া পর্যন্ত দেখছি না। দুধ দোয়ার কাজটাও আমাকে করতে হলো।'

মাথা উঁচু করল শীলা। 'কি বলছ তুমি?'

'ইন্ডিয়ানরা কেউ কোথাও নেই, সবাই চলে গেছে। আছে শুধু দো-

আঁশলাগুলো, তারাও ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।'

'ভয়ে কাঁপছে?' অবাক হলো রানা। 'কেন? আবার কি হলো?'

ভুরু কুঁচকে শীলা বলল, 'সকালে যখন মানচিটা ডিম নিয়ে এল না তখনই আমি ভেবেছি কিছু একটা ঘটছে।'

স্টোভ থেকে কড়াই নামিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল সে, বারে চলে এল, পিছন পিছন এল রানা আর রেমারিক। সকালের প্রথম রোদে জনশূন্য ফাঁকা লাগল শহরটাকে। প্রৌঢ় ডি কস্টা, টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করানোর জন্যে যাকে আমদানী করেছে ডন হোমায়রা, ক্রাচে ভর দিয়ে বেরিয়ে এল তার অফিস থেকে। দরজায় তালা লাগিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তা পেরোল সে, শীলার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে হ্যাট নামাল।

'সবাই কোথায় গেছে বলতে পারবে, ডি কস্টা?'

'পরম করুণাময় ঈশ্বর জানেন, সিনোরিটা। আমি আমার নিজের জ্বালায় বাঁচি না। লাইনে আবার গোলযোগ দেখা দিয়েছে।'

'ঠিক জানো?'

ডি কস্টা মাথা ঝাঁকাল। 'রোজ সকাল ছ'টায় চিহুয়াহুয়া থেকে একটা সিগনাল পাই, স্রেফ লাইন ঠিক আছে কিনা চেক করার জন্যে। তারপর আমি জবাব দিই। কিন্তু আজ সকালে কোন সিগনাল আসেনি।'

'এখন তাহলে কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। লোকটা নিশ্চয়ই জানে এফ.বি.আই. এমন একজন লোককে খুঁজছে যে সাদা একটা শেভ্রোলে চালায়।

কাঁধ ঝাঁকাল ডি কস্টা। 'ত্রুটি খুঁজে বের করে মেরামতের জন্যে তিন দিন সময় দেয় ওরা। তারপর আমার কাছ থেকে কোন খবর না পেলে মাকোজারি থেকে মেকানিক পাঠায়। মোটামুটি এই রকম ব্যবস্থা করা আছে। কিন্তু শুধু কাগজে-কলমে। শেষবার যখন লাইনে গোলযোগ দেখা দিল, লোক পাঠাতে দশ দিন পেরিয়ে যায় ওদের।'

বারান্দা থেকে নেমে রাস্তায় পৌঁছুল সে, ঠিক তখুনি চার্চ থেকে বেরিয়ে এল চল্লিশ-পঞ্চাশজন দো-আঁশলা। হোটেলের দিকে এগিয়ে এল তারা।

ওদের প্রতিনিধি মোটাসোটা এক দীর্ঘদেহী লোক, মাঝ-বয়স্ক। সে তার হ্যাট নামিয়ে শীলাকে বলল, 'সিনোরিটা, রাতের অন্ধকারে ইন্ডিয়ানরা আমাদের গাধাগুলোকে চুরি করে নিয়ে গেছে। এর কারণ কি?'

'আমরা জানি না, জর্জি,' জবাব দিল শীলা। 'হতে পারে খনির ঘটনার সাথে এ-সবের সম্পর্ক আছে। ওরা হয়তো ভেবেছে যারা মারা গেছে তাদের বদলে ওদেরকে জোর করে কাজ করাতে নিয়ে যাবে ডন হোমায়রা।'

মাথা নাড়ল জর্জি। 'না, সিনোরিটা, এর ভেতর আরও কোন ব্যাপার আছে। আমরা ভয় পাচ্ছি।'

'ভয় পাবার কি আছে, জর্জি?'

জবাবে এল বহুকণ্ঠের সম্মিলিত রণহুঙ্কার। হঠাৎ করে একটা বুলেট

চৌকাঠের কাঠ ছিলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। গুলির ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসার আগেই দ্বিতীয় একটা গুলির শব্দ শোনা গেল, চুরমার করে দিল একটা জানালার সবগুলো কাঁচ। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাতেই ইন্ডিয়ানদের দেখতে পেল রানা, পাহাড়ের মাথা টপকে শহরের উল্টোদিকে হাজির হচ্ছে তারা। বাড়ি-ঘরের মাঝখান দিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে ঘোড়াগুলো।

ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, বেশিরভাগ ভয়ার্তস্বরে চিৎকার করতে করতে যে যার বাড়ির দিকে ছুটল। শীলাকে ঠেলতে ঠেলতে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এল রানা, ওদের পিছু নিল রেমারিক।

সামনের দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল রানা, রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল রেমারিক পিছনের দরজা বন্ধ করার জন্যে। সামনের রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল কয়েকজন ইন্ডিয়ান, রেমারিক ফিরে আসার আগে বাড়িটাকে লক্ষ করে পাঁচটা গুলি হলো।

'ওরা খেপে গেছে,' বলল শীলা। 'গত একশো বছর এ-ধরনের কিছু ঘটেনি।'

জানালা দিয়ে উঁকি দিল রানা, উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে মুখ। 'যুদ্ধের নকশা আঁকা অ্যাপাচী! কোন দিন দেখব বলে ভাবিনি।'

ওর পাশের জানালাটাও চুরমার হলো, উল্টোদিকের দেয়ালে লাগল বুলেট। কোল্ট অটোমেটিকটা বের করল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে শীলার কাছে চলে এল, একটা জানালার নিচে বসে রয়েছে সে। তার মুখ রক্তশূন্য, ভুরুর পাশে রক্ত। কাঁচ লেগে কেটে গেছে।

'এখানে কোন অস্ত্র নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার দিকে কেমন আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকাল শীলা, যেন নেশা করেছে। ভুরুর পাশে রক্তটুকু আবার মুছল সে। 'আমার বেডরূমে চলে যাও। ড্রেসারের টপ ড্রয়ারে পাবে। পুরানো একটা রিভলভার।'

শীলার হাতে কোল্টটা ধরিয়ে দিল রানা। 'চালাতে জানো তো?'

দপ করে আলো জ্বলে উঠল শীলার চোখে, সেই সাথে যেন হুঁশ ফিরে পেল। 'জানি না মানে!'

'ঠিক আছে। এখান থেকে নড়বে না। নাগালের মধ্যে কাউকে পেলে মাথায় গুলি করবে, কেমন? আমি আসছি।'

তিনটে করে ধাপ লাফ দিয়ে টপকে দোতলায় উঠে এল ও, করিডর ধরে ছুটল, লাথি মেরে দরজা খুলল, ঢুকে পড়ল শীলার বেডরূমে। প্রথমে রিভলভারটা বের করল, পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। অস্ত্রটা খালি, তবে কারট্রিজের একটা বাক্স পাওয়া গেল। দ্রুত হাতে লোড করে ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল।

নিচে উঁকি দিতেই দেখল তিনজন অ্যাপাচী উঠানে ঢুকছে, একজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল। বারান্দার মেঝেতে একটা হাঁটু গেড়ে নিচু হলো, রিভলভারের ব্যারেল ঠেকাল রেইলের গায়ে, লক্ষ্যস্থির করল নিচের দিকে।

আস্তাবল লক্ষ্য করে মশালটা ছোঁড়ার জন্যে মাথার ওপর তুলেছে, ভারী বুলেটের ধাক্কায় জিন থেকে ছিটকে পড়ে গেল অ্যাপাচী ইন্ডিয়ান। তার বাকি দু'জন সঙ্গী তাদের পনির ঘাড়ের সাথে লেপ্টে গেল, আড়ালের খোঁজে ঘুরিয়ে নিল ঘোড়া।

বেডরুমে ফিরে এল রানা, তারপর সব ক'টা ঘরের জানালা বন্ধ করে নেমে এল নিচে। হামাগুড়ি দিয়ে শীলার পাশে পৌঁছুল ও। ঘাড় ফিরিয়ে শীলা বলল, 'ওদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে কার্টিজ। এইমাত্র তাকে আমি পাশ কাটাতে দেখলাম। সে তার আলখেল্লা খুলে ফেলেছে।'

'কার্টিজ তার আসল পরিচয় ফিরে পেয়েছে আবার—এখন সে আপাদ-মস্তক অ্যাপাচী।' জানালার কিনারা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। বেশিরভাগ দো-আঁশলা নিজেদের ঘর-বাড়িতে ফিরে যেতে পেরেছে, কিন্তু দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখলেও এই নিরাপদ আশ্রয় সাময়িক। তাদের তিন চারজনকে দেখা গেল হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার ওপর পড়ে আছে। একজন অ্যাপাচী আহত এক লোকের সামনে দাঁড়িয়ে, উল্টো করে ধরা রাইফেলটা মাথার ওপর তুলছে, খুলি ফাটাবে। রানা তার শিরদাঁড়ায় গুলি করল।

আস্তাবলের উল্টোদিকে শুকনো কাঠের কাঠামো থেকে সরু একটা আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠল। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এল একজন অ্যাপাচী, হাতের জ্বলন্ত মশালটা ছুঁড়ে দিল হোটেলের পোর্চ লক্ষ্য করে।

'নো! প্লীজ, নো! আমার বাড়িতে কেন!' ককিয়ে উঠল শীলা।

খালি বোর্ডের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মত ছুটে এল আগুন, লাল জিভ জানালার দিকে লম্বা হলো। পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো ওরা।

উঠানে আরও কয়েকজন অ্যাপাচী ঢুকে পড়ল, এলোপাতাড়ি গুলি করছে তারা। হাতের চাপে শীলাকে মেঝেতে শুইয়ে দিল রানা।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল রেমারিক। 'এখানে থাকলে মারা পড়ব আমরা!'

জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল আগুন, অবশিষ্ট কাঁচ ফেটে যাচ্ছে। রানার হাত ধরে দাঁড়াল শীলা। 'ছাদে চলো, ওখানে কোন বিপদ হবে না। হোটেলের বাকি সব ক'টা দেয়াল পাথরের।'

সবাইকে নিয়ে ওপরতলায় উঠে আসছে শীলা। করিডর পেরোচ্ছে, নিচে থেকে বিকট আওয়াজ ভেসে এল। টালির ছাদসহ পোর্চের থামগুলো ধসে পড়েছে।

করিডরের শেষ মাথায় স্টোররুম, একটা মই ট্র্যাপ-ডোরের দিকে উঠে গেছে। প্রথমে ছাদে উঠল রেমারিক, আর সবাইকে উঠতে সাহায্য করল সে। রাস্তা থেকে আবার কয়েকটা গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

শীলা ছাদে ওঠার পর তাকে অনুসরণ করল রানা। নড়বড় করছিল মইটা, হঠাৎ বিকট আওয়াজের সাথে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল। ছিটকে পড়েই যাচ্ছিল রানা, কোন রকমে সামলে নিয়ে মই ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে নামল। আওয়াজটা

করিডর থেকে এসেছে। দরজার দিকে ছুটল ও, উল্টোদিকের বন্ধ জানালা বিস্ফোরিত হলো। চৌকাঠের নিচের কাঠ টপকে কালো একটা পা ঢুকল ভেতরে, হোঁৎকা চেহারার এক অ্যাপাচী, রঙচঙে মুখ, রাইফেল তুলল রানার দিকে।

তার মুখে গুলি করল রানা। রাইফেল ছেড়ে দিয়ে পিছন দিকে অদৃশ্য হলো সে, পতনের সাথে তার চিৎকার নিচের দিকে নেমে গেল

পুরানো একটা উইনচেস্টার কারবাইন। তুলে নিয়ে স্টোররুমে ফিরে এল রানা, মই বেয়ে তরতর করে উঠে গেল। মইটা তুলে নিল রেমারিক, বন্ধ করে দিল ট্র্যাপ-ডোর।

সমতল ছাদটা তিন ফুট উঁচু ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। রিভলভারটা রেমারিকের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পাঁচিলের দিকে এগোল রানা।

আস্তাবল, আস্তাবলের উল্টোদিকের দো-চালা, এবং শহরের আরও কয়েকটা বাড়িতে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে প্রধান রাস্তাটা।

আস্তাবলের একটা দিক জ্বলছে, আরেক দিকের সরু গলিটায় রয়েছে রানার সাদা শেভ্রোলে। ধোঁয়ার ভেতর থেকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে এল একজন ইন্ডিয়ান, চোখের পলকে ঢুকে পড়ল গলির ভেতর, আগেই তার হাতে চলে এসেছে কুড়ালটা।

ঘোড়া থামিয়ে গাড়ির ছাদ লক্ষ্য করে কুড়াল তুলল সে। গুলি করে তাকে জিন থেকে নামিয়ে দিল রানা। আধ পাক ঘুরল ঘোড়াটা, ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অ্যাপাচীরা এখন একই সাথে অনেকগুলো বাড়ির ওপর হামলা চালাচ্ছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে হুয়ান কার্টিজ, তার গায়ের লাল শার্ট পতপত করে উড়ছে বাতাসে। তিনজন লোক জেনারেল স্টোর ভাঙার জন্যে মস্ত একটা গাছের শুকনো কাণ্ড দিয়ে আঘাত করছে দরজায়। রাইফেল তুলে লক্ষ্যস্থির করল রানা। কাণ্ডটা কাঁধে নিয়ে পিছিয়ে আসছে লোকগুলো, তারপর ছুটে যাচ্ছে দরজার দিকে, বারবার। পিছনের লোকটাকে গুলি করল রানা। মুখ সবটুকু খুলে গেল তার, আছাড় খেল সামনের দু'জনের গায়ে। কাণ্ড ফেলে দিয়ে দৌড় দিল তারা, রানার বুলেটও ধাওয়া করল তাদেরকে। চোখের কোণ দিয়ে কার্টিজকে দেখতে পেল ও, ছাদের দিকে রাইফেল তুলছে। পাঁচিলের নিচে মাথা নামাল রানা।

ক্রল করে ওর পাশে চলে এল শীলা আর রেমারিক।

'কার্টিজ পাগল হয়ে গেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল শীলা। 'ওকে থামাতে হবে।'

মাথা নেড়ে রেমারিক বলল, 'আমাদের কাজ নয়। আরেকজন ইন্ডিয়ান যদি পারে৭'

'ওরা বেশিক্ষণ এখানে থাকবে না,' বলল শীলা। 'আর খানিক পর

উত্তেজনা কমলে বুঝতে পারবে কি করে বসেছে ওরা, জানবে এর খেসারত দিতে হবে। সবাই তখন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে পাহাড়ে, ওদের বাপ-দাদাদের মত।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল রেমারিক। 'যা করছে বুঝেশুনেই করছে কার্টিজ, ঝোঁকের মাথায় নয়। ছেলেকে হারিয়েছে সে, প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না।'

রাস্তায় কে যেন চিৎকার করে উঠল। এতক্ষণে অ্যাপাচীরা একটা বাড়ির দরজা ভাঙতে পেরেছে, এক মহিলার চুলের গোছা ধরে হিড়হিড় করে টেনে বের করে আনল রাস্তায়। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে সাবধানে গুলি করল রানা, পরমুহূর্তে মাথা নামাল। পাঁচিলের কিনারা থেকে প্লাস্টার খসিয়ে বেরিয়ে গেল দুটো বুলেট।

তারপর হঠাৎ করেই গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল।

রাস্তায় পড়ে থাকা মহিলাটার কান্না ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই। পাঁচিলের কিনারা দিয়ে সাবধানে নিচে তাকাল রানা। অ্যাপাচীরা সবাই একসাথে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, তাকিয়ে আছে পাহাড়ের দিকে।

চোখ তুলল রানা, খাকি কাপড় পরা এক সার ঘোড়সওয়ারকে রিজ টপকে ঢালে নেমে আসতে দেখল, পিছনে ধুলোর মেঘ।

'মেক্সিকান ক্যাভল্‌রি না?' জিজ্ঞেস করল রেমারিক।

'অশ্বারোহী পুলিস,' বলল রানা। 'সম্ভবত ভিকোর খোঁজে বেরিয়েছে।' অথবা সাদা শেভ্রোলের সন্ধানে, ভাবল ও।

তীক্ষ্ণ, কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ দিল কার্টিজ। যারা দাঁড়িয়ে ছিল, সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। গোটা দল এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল ধোঁয়ার ভেতর।

ট্র্যাপ-ডোরের ঢাকনি সরিয়ে মইটা নিচে নামাল রানা।

পোর্চের আগুন সামনের দরজাটাকে পুড়িয়ে ফেলেছে, কব্জা থেকে খুলে পড়ে গেছে আধপোড়া ফ্রেম। পায়ের কয়েকটা ধাক্কায় সেটাকে রাস্তায় ফেলে দিল রানা। ওর পাশে রাস্তায় নেমে এল শীলা আর রেমারিক, ঘর্মাক্ত ঘোড়া নিয়ে পুলিসবাহিনীও সামনে চলে এল, নেতৃত্বে রয়েছে লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ।

একটা হাত তুলল ফার্নান্দেজ, তার বারোজন সহকারী ঘোড়া থামাল। রেকাবে পা দিয়ে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে জিন থেকে নিচে নামল সে। বারোজন পুলিস ছাড়াও তার সাথে সার্জেন্ট পিনাচিটোও রয়েছে, কব্জিতে একটা রশির লূপ, অপরপ্রান্তটা বৃত্ত রচনা করেছে আলবার্তো ভিকোর গলার চারপাশে।

ভিকোর হাত দুটো সামনে, এক করে বাঁধা। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বেশ আয়েশী ভঙ্গিতে বসে আছে সে। হাসছে না, গম্ভীর নয়, যেন নিরীহ নির্লিপ্ত একটা মূর্তি। কিন্তু রানাকে দেখামাত্র তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, নিঃশব্দে হাসল সে। 'উপকারী বন্ধু, আবার তাহলে আমাদের দেখা হলো!'

উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এল লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ, ধুলোয় সাদা হয়ে আছে তার কোট। 'আর কোন হাঙ্গামা নয়। আইন পৌঁছে গেছে। কি হয়েছে কি এখানে?'

ফিক্ করে হেসে ফেলল শীলা।

'কাল রাতে এলাকার সব ক'টা ইন্ডিয়ান ভেগেছে,' বলল রেমারিক। 'ব্যাপারটা কি বোঝার আগেই অ্যাপাচীরা আমাদের ওপর হামলা চালায়।'

'কেন তারা হামলা চালাবে?'

'খনিতে কাল পাথর-ধস নেমেছিল,' বলল শীলা। 'বিশ-বাইশ জন ইন্ডিয়ানকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাদের মধ্যে কার্টিজের ছেলেটাও ছিল। সে যে খনিতে কেন কাজ করতে গিয়েছিল বুঝতে পারছি না। নিজের পরিবারের কাউকে খনির ধারেকাছে যেতে দেয় না কার্টিজ।'

'বিদেশী ভদ্রলোকের কি ভূমিকা?' আড়চোখে রানার দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ।

'লোকগুলোকে উদ্ধার করার জন্যে ডিনামাইট ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন উনি,' বলল শীলা। 'কিন্তু ডন হোসে অনুমতি দেয়নি। তারপর ফাদার পামকিন অনুরোধ করায় ডন হোসে তাকে গুলি করে মারল। কার্টিজ ঘোষণা করল, ডন হোসে একজন মরা মানুষ। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে ওরা।'

রাস্তা পেরিয়ে দৃঢ় পায়ে জেনারেল স্টোরের দিকে হেঁটে গেল ইউনিফর্ম পরা আইন। ছাদ থেকে রানার করা গুলিতে নিহত অ্যাপাচীদের একজন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দোকানটার সামনে, পা দিয়ে তাকে চিৎ করল ফার্নান্দেজ, রঙচঙে মুখটা দেখল। 'কে মেরেছে এগুলোকে?' চারদিকে তাকিয়ে আরও ইন্ডিয়ানের লাশ দেখল সে।

'আমি,' এগিয়ে এসে বলল রানা।

'আমি আপনার তারিফ করি।' যদিও হাসল না ফার্নান্দেজ। 'এ-ধরনের কেসে কেউ যদি নিজের হাতে আইন তুলে নেয়,' কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'দোষ দেয়া যায় না। কতজন ছিল ওরা?'

'বারো কি পনেরোজন। চারজনকে মেরেছি আমরা। আপনাদের আসতে দেখে পালিয়ে গেল বাকি সবাই।'

'এখন যে এখানে আইন আছে, ওদেরকে সেটা বোঝাতে হবে,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াও, সার্জেন্ট। এখুনি রওনা হব আমরা।'

'বন্দীর কি হবে?' পিনাচিটো জিজ্ঞেস করল।

'উপায় নেই, ওকে আমরা রেখে যাব।' রানার দিকে ফিরে অস্পষ্ট একটু হাসল ফার্নান্দেজ। 'এবার, সিনর, আপনাকে কথা দিতে হবে যে আপনার জিম্মায় থাকার সময় বন্দী পালাবে না।'

তার দৃষ্টি বাঁচিয়ে ভিকোর উদ্দেশে একটা চোখ টিপল রানা।

কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে শীলাকে স্যালুট করল ফার্নান্দেজ। 'আবার আপনার সাথে দেখা হওয়ার আনন্দটাই মাটি করে দিল এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। যা ঘটেছে সেজন্যে আমি যারপর নাই দুঃখিত, শীলা দ্য হোমায়রা। আপনাকে আমি কথা দিলাম, অ্যাপাচীদের উচিত শিক্ষা দেব।'

রেমারিক বলল, একটু যেন ব্যঙ্গের সুরে, 'ওদের নাগাল পাওয়া সহজ কাজ হবে না, লেফটেন্যান্ট। গোটা পাহাড়ী এলাকা চেনে ওরা, জানে কোন্ গর্তে পানি পাওয়া যায়।'

'আপনি ঠিক যেন আমার লোকদের সম্পর্কে বললেন। ভুলে যাবেন না, এদের অর্ধেকই ইন্ডিয়ান।'

'কিন্তু অ্যাপাচী নয় একজনও,' মন্তব্য করল রেমারিক।

ঘোড়ায় চড়ল লেফটেন্যান্ট, থুতনিতে ঠিকমত বসাল স্ট্র্যাপটা, তারপর হাসল। 'সন্ধ্যার আগেই, বন্ধুরা, হুয়ান কার্টিজকে হাজির করব বলে কথা দিলাম। ঘোড়ার পিঠেই থাকবে, তবে শুয়ে।'

দলবল নিয়ে হালকা হয়ে আসা ধোঁয়ার ভেতর ঢুকছে সে, একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আলবার্তো ভিকো। 'অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছুই শিখি না।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নিচে নামল সে, বাঁধা হাত দুটো রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। দাঁত বের করে হাসছে। 'ঋণের বোঝা আরেকটু বাড়াবেন নাকি? পছন্দসই এমন কোন জায়গা আপাতত দেখছি না যেখানে পালাতে ইচ্ছে করে। তাছাড়া,' হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল, 'হাতে রশি থাকায় মহাশয়কে স্যালুট করতে পারছি না।'

মাত্র ছ'মাস হলো লেফটেন্যান্ট হয়েছে ফার্নান্দেজ, আরও অন্তত তিন বছর লাগবে প্রমোশন পেয়ে ক্যাপ্টেন হতে। সঙ্গতভাবেই তার ধারণা হলো, কার্টিজ আর তার দলকে কুপোকাত করতে পারলে সময়টা অনেক কমে আসবে। এই চিন্তাটা বাকি সমস্ত বিবেচনা বের করে দিল মাথা থেকে।

হারমোজা ত্যাগ করার আধঘণ্টা পর একটা ঢালের মাথায় ঘোড়াসহ দাড়িওয়ালা এক লোককে দেখল সে। ইন্ডিয়ান একটা পনিতে চড়ে তাদের দিকেই আসছে বুড়ো। খাকি কাপড় চিনতে পেরে কর্কশ আর্তনাদ বেরিয়ে এল ট্যালবটের গলা থেকে, ঘোড়া থামিয়ে নামল সে, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল।

থরথর করে কাঁপছে ট্যালবট, মুখে ধরা ক্যান্টিনের পানি অর্ধেকই ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। ক্যান্টিনের ছিপি লাগাতে লাগাতে শান্তস্বরে প্রশ্ন করল ফার্নান্দেজ।

তোতলাতে শুরু করল ট্যালবট। তবে পুরো কাহিনীটা শেষ করতে বেশি সময় নিল না।

পিনাচিটোর দিকে ফিরল ফার্নান্দেজ। 'ক্যানিয়ন অ্যামবুশে ছিল চারজন, শহর থেকে বারো থেকে পনেরোজন যোগ দিয়েছে পরে।' ঠোঁট টিপে হাসল

সে। 'শালাদের হাগিয়ে ছাড়ব, কি বলো? ওদের তিনজনের সমান আমাদের একজন, হিসেবটা তো এইরকম, তাই না?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট।

তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ল ফার্নান্দেজ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ধুলোর একটা মেঘে পরিণত হলো দলটা, মরুর ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পনিতে চড়ল ট্যালবট। ঘন ঘন মাথা নাড়ল সে। আবার রওনা হলো হারমোজার দিকে।

ক্যানিয়নের প্রবেশমুখে থামল ফার্নান্দেজ, একজন সহকারীকে নিয়ে সামনে এগোল পিনাচিটো। গভীর খাদে নেমে এল তারা, অকুস্থলের কাছে পৌঁছে হঠাৎ লাগাম টানল।

আগুন থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে, জ্বলন্ত কয়লার ওপর গিবনের শব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, মুখের চেহারা চেনার কোন উপায় নেই।

ঘোড়া নিয়ে উল্টোদিকে চলে এল সার্জেন্ট, ওখান থেকে একদল পনির পায়ের ছাপ মরুর দিকে চলে গেছে। সহকারীর কাছে ফিরে এল সে। 'লেফটেন্যান্টকে আসতে বলো। নেই ওরা।'

ঘোড়া থেকে নেমে সিগারেট ধরাল সে, দাঁড়িয়ে থেকে চোখ বোলাল খাড়া ঢালগুলোর ওপর। ঢালের মাথায় জগদ্দল পাথর। বুঝতে অসুবিধে হয় না, পালাবার পথ পায়নি অভাগারা। এ-ধরনের একটা গভীর খাদে গোটা একটা পুলিসবাহিনীকে আটকে রাখা যায়।

বাকি লোকদের নিয়ে হাজির হলো লেফটেন্যান্ট। ঘোড়া থেকে নেমে চারদিকটা ঘুরেফিরে দেখল সে। মোনা লিজার লাশ দেখে গম্ভীর হলো তার চেহারা, স্যালুট করল, ভাবল ডন হোসে দ্য হোমায়রা এই ক্ষতি মেনে নেবেন না। সারা, গিবন, ফাদার পামকিন, এক এক করে সবগুলো লাশ পরীক্ষা করল সে। হাত দুটো পেছনে, থমথম করছে চেহারা, ঘুরে দাঁড়াল।

'সবার জন্যে একটাই কবর, তারপর চলো সরে যাই এখান থেকে। এখনও খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি ইন্ডিয়ানরা, ধাওয়া করে ধরা যাবে।'

ছোট হাতলের একটা করে কোদাল রয়েছে সবার কাছে, জিনের পিছন থেকে স্ট্র্যাপ খুলে হাতে নিল তারা। কারবাইন রেখে মাটি খুঁড়তে শুরু করল।

লেফটেন্যান্ট আর সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে থাকল। কারও মুখে কথা নেই। চওড়া কবরটা যখন তিন ফুট গভীর হয়েছে, মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। গর্তের ভেতর পাশাপাশি নামানো হলো লাশগুলো। চোখে লোভ নিয়ে কবরের আশপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল পুলিসরা, এটা-সেটা যা পেল পকেটে ভরল। হঠাৎ লেফটেন্যান্ট হাঁক ছাড়ল একটা।

হ্যাট নামিয়ে এক সারে দাঁড়াল সবাই, ফার্নান্দেজের সাথে যোগ দিল প্রার্থনায়।

ঢালের মাথা থেকে লেফটেন্যান্টের খুলি লক্ষ্য করে গুলি করল হুয়ান

কার্টিজ। প্রথম গুলি, একটা সঙ্কেতও বটে। ধাক্কা খেয়ে কবরে পড়ে গেল ফার্নান্দেজ, তার আগেই ইন্ডিয়ানরা পুলিসবাহিনীর প্রত্যেককে লক্ষ্য করে গুলি চালাল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সব। এখানে সেখানে অভাগা দু'একজন পুলিস নড়াচড়া করছে, গড়িয়ে বা ক্রল করে বন্ধুদের লাশের আড়ালে লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। গুলি চলতেই থাকল, তারপর এক সময় আর একজনও নড়ল না। অবশেষে একটা হাত তুলল কার্টিজ, সিধে হয়ে দাঁড়াল।

ঠাণ্ডা চোখে খাদের নিচে তাকিয়ে আছে সে, বোল্ডারের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে এল একজন লোক, অস্থির আর উত্তেজিত, কার্টিজের শার্টের আস্তিন ধরে টান দিল সে। তাকে অনুসরণ করে ঢালের আরেক মাথায় চলে এল কার্টিজ, লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিচে তাকাল। র‍্যাঞ্চের দিক থেকে দু'জন ঘোড়সওয়ার আসছে মরু পেরিয়ে।

বোল্ডারের ফাঁক গলে ছুটল কার্টিজ, ঠোঁটে আঙুল রেখে নিজের লোকদের চুপ থাকতে বলল। যে যার নিজের জায়গায় আবার পজিশন নিল সবাই। কয়েক মিনিট পর নিচের খাদে পৌঁছে গেল ডন হোসে হোমায়রা আর হ্যামার।

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল তারা। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করল ডন হোমায়রা। ছায়ার মত তার পিছনে থাকল হ্যামার, মাঝে মধ্যে মুখ তুলে ঢালের মাথাগুলো পরীক্ষা করছে সে। হঠাৎ করেই স্ত্রীর লাশ দেখতে পেল ডন হোমায়রা, এগোতে গিয়ে কবরের পাশে হোঁচট খেল সে। পড়ার পর আর উঠল না, হামাগুড়ি দিয়ে নেমে গেল কবরের ভেতর। দু'হাতে লাশগুলো সরাল সে, ওগুলো তার স্ত্রীকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। স্ত্রীর ঠোঁটে চুমো খেল সে, কপালে কপাল ঘষল।

তারপর উন্মাদের মত নিজের সন্তানের খোঁজে ছুটোছুটি করতে লাগল ডন হোমায়রা। যখন বুঝল টেরেসা এখানে কোথাও নেই, স্থির পাথর হয়ে গেল সে।

কার্টিজের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোয়ান্টা, রাইফেলটা তুলল সে। তারপর অনুমতির জন্যে তাকাল সর্দারের দিকে।

কিন্তু মাথা নাড়ল কার্টিজ, ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসি।

'কেন, ওকেই তো চাই আমরা,' বিস্ময় প্রকাশ করল কোয়ান্টা। 'ওকে মারতে পারলেই তো আমাদের প্রতিশোধ নেয়া শেষ হবে।'

'প্রথমে ওকে ভুগতে হবে,' জবাব দিল কার্টিজ। 'সেজন্যেই তো বাচ্চাটাকে রেখে দিয়েছি।'

দশ

হ্যামার আর বেতনভুক একদল দো-আঁশলা বড় একটা ওয়াগনে করে লাশগুলো নিয়ে এল।

ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে ওয়াগনে কাকাকে উঠতে দেখে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল শীলার। আবার স্ত্রীর লাশটা দেখছে ডন হোমায়রা।

'টেরেসাকে পাওয়া গেল?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল শীলা।

'না, সিনোরিটা, ওখানে নেই সে,' ম্লান মুখে জবাব দিল হ্যামার।

ডন হোমায়রা স্ত্রীর ওপর থেকে চোখ সরাল, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজের ওপর, যেন পুলিসবাহিনীই তার শেষ ভরসা ছিল। তারপর সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে, শীলা বা আর কেউ যা কখনও দেখেনি। কাঁদতে কাঁদতে ওয়াগন থেকে নামল সে, দিশেহারা, কোথায় যাবে বা কি করবে জানা নেই। থাকতে পারল না শীলা, ছুটে গিয়ে কাকার ফুলে ফুলে ওঠা কাঁধ জড়িয়ে ধরল।

'যে গেছে সে গেছে, তার জন্যে আমি কাঁদছি না,' ডন হোমায়রা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল। 'আমি আমার টেরেসামণির জন্যে কাঁদছি।'

'শান্ত হও, কাকা,' ছলছল চোখে বলল শীলা। 'টেরেসাকে আমরা ফিরিয়ে আনব।'

'নারে মা, আমার মন বলছে…,' চোখ মুছল ডন হোমায়রা, '…কে তাকে ফিরিয়ে আনবে? পুলিসের অত বড় একটা দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।…নাহ্। পরবর্তী টেলিগ্রাফ স্টেশনে লোক পাঠাতে পারি, এবার হয়তো ফার্নান্দেজের খুনের বদলা নেয়ার জন্যে পঞ্চাশজন পুলিস পাঠাবে ওরা, কিন্তু ততদিনে কি আমার বুকের ধনকে বাঁচিয়ে রাখবে কার্টিজ?'

'না, নষ্ট করার মত অত সময় নেই আমাদের,' শীলা নয়, কথা বলছে রানা। 'যা করার এখুনি করব। যেভাবেই হোক টেরেসাকে ফেরত আনতে হবে। তবে আপনি পুলিস ডাকতে পারবেন না।'

তাকাতেই ডন হোমায়রা দেখল রানা আর শীলা দৃষ্টি বিনিময় করল।

'শীলা,' বলল সে, 'আমার এই চরম শোকের মুহূর্তে, বাধ্য হয়ে একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না। বিদেশী ওই লোকটাকে তুমি চেনো না, ওকে পাত্তা দেয়া হলে নিজের মস্ত ক্ষতি করবে তুমি।'

'চিনি, কাকা। ওর নাম পিটার রড নয়। মাসুদ রানা। আর পাত্তা দেয়ার কথা যদি বলো, প্রশ্ন হলো রানা আমাকে পাত্তা দেবে কিনা।'

'তুমি জানো মার্কিন কর্তৃপক্ষ ওকে খুঁজছে? ও একজন ওয়ান্টেড ম্যান?'

শান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে শীলা বলল, 'আমিও ওকে খুঁজছি, কাকা। হি ইজ

ওয়ান্টেড বাই মি।'

'তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ, শীলা। আমার কাছে প্রমাণ আছে এফ. বি. আই. খুঁজছে ওকে কোন সন্দেহ নেই ও একজন গুণ্ডা বা খুনী…'

ধৈর্য ধরে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল শীলা, তারপর বলল, 'কাকা, ও যে কি ধরনের মানুষ তা আমি ওকে দেখেই বুঝে নিয়েছিলাম। ওর সব কথা আমাকে যদি না-ও বলত, ওর সম্পর্কে কিছুই আমার অজানা থাকত না। যা জানো না তা নিয়ে কথা বোলো না, এমনকি ব্যাখ্যা করলেও তুমি বুঝবে না রানা কোন্ ধাতুতে গড়া কোন্ জগতের মানুষ। ওকে তুমি খুনী বলছ, কিন্তু তুমি নিজে কি একবার ভেবে দেখেছ?'

'কি আমি?' ডন হোমায়রার চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল। 'কি বলতে চাস তুই?'

'কালকের কথাই ধরো না, খুনীর পরিচয় বেরিয়ে আসবে। ডিনামাইট ফাটাতে না দিয়ে বিশ-বাইশজন লোককে জ্যান্ত কবর দিলে তুমি। আর রানা? লোকগুলোকে বাঁচাতে চেয়েছিল। ফাদার পামকিনকে কে খুন করল? পাহাড় থেকে সোনা পাবার জন্যে প্রতি বছর কত লোককে খুন করছ তুমি হিসেব রাখো? খুনী যদি এখানে কেউ থেকে থাকে তো তুমিই আছ!'

থরথর করে কাঁপছে ডন হোমায়রা, তার চোখ কালো ইস্পাতের মত। শীলা, ট্যালবট, ও সবশেষে রানার দিকে তাকাল সে। তিনজনই ওরা পিছিয়ে এল, সে যেন বিষধর একটা কেউটে।

'আমি আমার মেয়েকে ফেরত চাই,' নিস্তব্ধতার ভেতর তার কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনাল।

রানা বলল, 'হোমায়রা, আপনি একজন ব্যবসায়ী। আপনার সাথে আমি একটা ব্যবসায়িক চুক্তিতে আসতে চাই।'

ধীরে ধীরে রানার দিকে তাকাল ডন হোমায়রা। 'বলুন, সিনর রানা।'

ঠেকায় পড়লে 'সিনর', ভাবল রানা। বলল, 'ছোট একটা দল নিয়ে পাহাড়ে যাব আমি। ট্যালবট, হ্যামার, ভিকো, আর গাইড হিসেবে তামবারু। ইচ্ছে হলে আপনিও যেতে পারেন, কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার বুঝে দেখুন। নিঃশর্ত নেতৃত্ব থাকবে আমার হাতে।'

'বলে যান,' রানার কথা মন দিয়ে শুনছে ডন হোমায়রা।

'আর সবার মত হ্যামারকে আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে।'

সাথে সাথে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল হ্যামার, কিন্তু ডন হোমায়রা তাকে বাধা দিল।

'বলে যান।'

'আপনার স্টোর হাউজ থেকে অস্ত্র যোগান দেবেন আপনি। থম্পসন সাবমেশিন গানটাও লাগবে। গাড়ির জন্যে গ্যাস আর ঘোড়া, তা-ও দেবেন আপনি। ব্যস, তাহলেই হবে। পুলিস যা পারেনি আমরা তা করে দেখাব।'

'সেটা কি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডন হোমায়রা।

'আপনার টেরেসাকে ফিরিয়ে আনব।'

তির্যকদৃষ্টিতে তাকাল ডন হোমায়রা। 'ব্যস, শুধু টেরেসাকে ফেরত পাব?'

'আর কি চান আপনি?'

ঘাড় ফিরিয়ে ওয়াগনের দিকে একবার তাকাল ডন হোমায়রা। 'আমি ওদের লাশ দেখতে চাই, সব ক'টার।'

'দুঃখিত, সেক্ষেত্রে আপনার সাথে আমার চুক্তি হবে না। যদি লড়াই করে টেরেসাকে ছিনিয়ে আনতে হয়, তাহলে হয়তো ইন্ডিয়ানদের লাশ দু'একটা পড়তেও পারে, কিন্তু অকারণে তাদেরকে খুন করার ঠিকাদারি আমি নেব না।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ডন হোমায়রা। 'ঠিক আছে...'

'দাঁড়ান, বিনিময়ে আমি কি চাইব সেটা বলিনি। আপনি আমাকে এগারো লাখ মার্কিন ডলারের সমান সোনা দেবেন। আর...'

ক্যাঙ্গারুর মত লাফাতে শুরু করল ডন হোমায়রা। তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। 'বলেছি না, এই লোক ডাকাত! আমার সর্বস্ব লুট করতে চায় সে! এগারো লাখ ডলার...আমি মারা যাচ্ছি...আমাকে এক গ্লাস পানি দাও...ডাকাত, ডাকাত! ওকে তোমরা আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও...'

রানা সম্পূর্ণ শান্ত, এমন সুরে কথা বলল যেন ডন হোমায়রার চিৎকার বা লম্ফঝম্প সম্পর্কে সচেতন নয়। 'আমি জানি, আপনি আমার শর্তে রাজি হবেন। আর মাত্র একটা শর্ত আছে। সেটা হলো, আপনার ওই খনিতে ডিনামাইট ব্যবহার করব আমি। আপনিই সাপ্লাই দেবেন। লোকগুলোকে জীবিত পাব বলে মনে হয় না, তবু চেষ্টা করে দেখব একবার। তবে ডিনামাইট ব্যবহার করতে চাইছি আরেকটা কারণে। আপনার ওই খনি স্থায়ী একটা মরণফাঁদ। ওটাকে চিরকালের জন্যে ধসিয়ে দেব আমি, কেউ যাতে ভেতরে ঢোকার পথ না পায়।'

আশ্চর্য, রানার প্রতিটি কথা কান খাড়া করে শুনল ডন হোমায়রা। তারপর আবার সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। 'আমাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে! এর ফল ভাল হবে না! আমিও দেখে নেব।' মনে মনে হাসল রানা, এত কথা বলছে ডন হোমায়রা, কিন্তু একবারও বলছে না যে প্রস্তাবটা সে মানবে না।

'এগারো লাখ ডলার, রানা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল শীলা।

'মাথা পিছু পঞ্চাশ হাজার করে ক্ষতিপূরণ,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল রানা।

প্রথমে বুঝল না শীলা, তারপর তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খনিতে বাইশজন আটকা পড়েছে ধরে নিয়ে হিসাব করেছে রানা, এগারো দু'গুণে বাইশ।

'কাকা, আমার মনে হয়...'

'তুই থাম!' গর্জে উঠল ডন হোমায়রা। 'আমার কাছে অত টাকা আছে

নাকি যে···

'কাকে জিজ্ঞেস করছ, কাকা? আমাকে? তারচেয়ে হ্যামারকে জিজ্ঞেস করো, সে তোমার মনের মত একটা জবাব দিয়ে দেবে। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি সত্যি কথাই বলব। রানা যদি মাথা পিছু এক লাখ করেও চায়, তাও তুমি দিতে পারবে এবং তারপরও অঢেল থাকবে তোমার।'

'বাচাল মেয়ে! তুই আমার টাকা-পয়সা সম্পর্কে কি জানিস, অ্যাঁ?'

'তাছাড়া, কাকা,' বলল শীলা, ডন হোমায়রার কথা যেন শুনতে পায়নি সে। 'টাকাগুলো আসলে ওদেরই, রানা যাদেরকে দিতে চাইছে। বছরের পর বছর ধরে ওদের তুমি ঠকিয়েছ···'

'মাথাপিছু আমি পঁচিশ হাজার করে দেব, তার বেশি একটা ফুটো পয়সাও না।'

হঠাৎ রানার দিকে ফিরল শীলা। 'আরে, তুমি দেখছি ফাদার পামকিনের কথা ভুলে গেছ। ওঁর জন্যে ক্ষতিপূরণ চাইবে না?'

'ফাদার পামকিন ছিলেন দেবতাতুল্য,' এই প্রথম মুখ খুলল ট্যালবট। 'কম করেও তার জন্যে বিশ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ চাওয়া উচিত।'

'পঞ্চাশ লাখ,' প্রস্তাব দিল রেমারিক।

'ঠিক আছে, মাথা পিছু পঞ্চাশ হাজারই দেব,' তাড়াতাড়ি বলল ডন হোমায়রা। 'কিন্তু পামকিনের জন্যে যদি কিছু চাওয়া হয়, চুক্তি হবে না। আমি বরং পুলিসেই খবর দেব···'

'ফাদার পামকিন ছিলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি,' বলল রানা। 'শুনেছি তাঁর পরিবার-পরিজন বলতে কেউ কোথাও ছিল না বা নেই। তাঁর মৃত্যুর জন্যে ক্ষতিপূরণ চাওয়া হলে তাঁর আত্মাকে কষ্ট দেয়া হবে। আপনি তাহলে সব শর্ত মেনে নিচ্ছেন, ডন হোমায়রা?'

'এক কথা ক'বার বলব? বললাম তো, আমি রাজি।'

সাবধান করে দিল রানা, 'যদি ভেবে থাকেন কাজ উদ্ধারের পর আমাকে ফাঁকি দেবেন, ভুলে যান। এখনও সময় আছে, ইচ্ছে করলে আপনি প্রস্তাবটা ফিরিয়েও দিতে পারেন। পরে আর কোন কৌশল খাটবে না।'

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, সিনর রানা।' রানার মনে হলো হাসতে গিয়েও নিজেকে যেন সামলে নিল ডন হোমায়রা। এগিয়ে এসে রানার দিকে একটা হাত লম্বা করল সে।

'তার কোন দরকার নেই।' হাত মেলাতে রুচি হলো না রানার। মনে মনে খুশি ও। ভাবল, ভালই হলো প্যাঁচে ফেলে শর্তগুলো গেলানো গেছে। হারামজাদা রাজি না হলেও,কচি মেয়েটাকে উদ্ধারের জন্যে যেতে হত ওকে। 'এসো, হ্যামার,' নির্দেশ দিল ও। 'চলো যাই অস্ত্রগুলো নিয়ে আসি।'

বালির ওপর বসে পুরানো একটা পুতুল নিয়ে খেলছে টেরেসা। তার চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অ্যাপাচী ইন্ডিয়ানরা। অতটুকুন মেয়ে, তাও সে

ওদেরকে দেখে ভয় না পাবার ভান করছে।

মেয়েটাকে নিয়ে ইন্ডিয়ানরাও খুব অস্বস্তির মধ্যে আছে। একবার কান্না শুরু করলে থামানো যায় না। আদর করতে গেলে কান্না আরও বাড়ে। ইতোমধ্যে একবার মাত্র খাওয়ানো গেছে তাকে, তাও জোর-জবরদস্তি করে গেলানো হয়েছে।

ওদের পিছনে পাহাড় প্রাচীর খাড়াভাবে নেমে গেছে নিচের মরুতে। পশ্চিমে পর্বতশ্রেণীর মাঝখানটাকে চিরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বিশাল ক্যানিয়ন।

রঙচঙে ভূতের চেহারা নিয়ে ঢাল বেয়ে ওদের মাথার ওপর উঠে গেল হুয়ান কার্টিজ। পাথরের একটা স্তূপের ওপর চড়ল সে, তাকাল দূর পুবে। আশা ধুলোর ছোট্ট একটা মেঘ দেখতে পাবে।

নিচে, সবার কাছ থেকে দূরে, কোয়ান্টা আর চিকু একসাথে বসে আছে. ফিসফাস করছে দু'জনে। কোয়ান্টা বলল, 'কার্টিজ যে হোমায়রাকে ঘৃণা করে তা বুঝি, বুঝি ছেলেকে হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে সে। কিন্তু পুলিস মারার পর ব্যাপারটা এখন স্রেফ যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা হেরে গেলে খুন হয়ে যাব, আর যদি অল্প সময়ের জন্যে জিতিও, তাতে করে আরও শয়ে শয়ে পুলিসকে ডেকে আনা হবে। ওরা আমাদেরকে পাহাড়ের শেষ সীমা পর্যন্ত খেদিয়ে নিয়ে যাবে।'

'তুমি, ভাই, সত্যি কথা বলছ,' সায় দিল চিকু। 'আশা ছিল, দিন ফিরলে নিউ মেক্সিকোয় যাব কাজের সন্ধানে, ছেলেটাকে স্কুলে পাঠাব, কিন্তু কার্টিজ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সব ভেস্তে দিল।'

'আমরা যদি পালাই, ভাই,' কোয়ান্টা বলল, 'আমাদেরকে বেঈমান বলা হবে।'

'আর যদি থাকি,' চিকু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'আমাকে হয়তো আরও খুন করতে হবে।'

'কাকে?' চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল কোয়ান্টা।

দু'জনেই ওরা ঘাড় ফেরাল, কারণ ঢাল থেকে নেমে এসেছে কার্টিজ।

ডন হোমায়রাকে শীলা বলল, 'তোমার শরীর এখন কেমন, কাকা? আমার কাছে আছে, ঘুমের ওষুধ খাবে?'

'ঘুম আর এ-জীবনে আসবে কিনা সন্দেহ,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল ডন হোমায়রা। 'এগারো লাখ ডলার···আমি বাঁচব কিনা তাই সন্দেহ। তা, কি কথা? একা আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিস কেন?

'অতীতে অনেক তিক্ত ঘটনা ঘটেছে, সে-সব আমি ভুলে যেতে চাই, কাকা। তুমি টেরেসাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমার বন্ধুকে দিয়েছ, সেজন্যে আমি খুশি।'

'এ-যুগে ন্যায্য কথা বলতে নেই, আবার বলতেও হয়। রানা তোর বন্ধু

হলো কি করে? ওকে তো চাকরি দিয়ে আমি এখানে আনলাম।'

'কেন যে তুমি শুধু ঝগড়া খুঁজে বেড়াও! তাহলে শোনো, রানাকে তুমি আনোনি, ও স্বেচ্ছায় এসেছে। ওর আসার একাধিক কারণ আছে। বাদ দাও, ওসব বুঝবে না। আমি যে কথা বলার জন্যে এসেছি—সব ভুলে আবার কি আমরা আপন হতে পারি না? আপনজন বলতে তোমারও কেউ নেই, আমারও নেই…'

'হ্যাঁ, দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরস্পরের কাছে আসে মানুষ,' বলল ডন হোমায়রা। 'ভাল কথা, তোর বন্ধু চিরকাল এখানে থেকে যাবার প্ল্যান করেনি তো?'

হেসে উঠল শীলা। 'না, সে ভয় নেই।'

'তাহলে? তুই ওর সাথে চলে যাবার প্ল্যান করছিস বুঝি?'

'এখনও কিছু ভাবিনি, কাকা।' হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে উঠল শীলা। 'নিজেকে ঠিক বুঝতে পারছি না। তাছাড়া, আমার কি এত বড় ভাগ্য যে রানা আমাকে সাথে নেবে!'

'আমি রসকষহীন পাথর, কাব্য বুঝি না। তবে জানি প্রেম-ভালবাসা বড় কথা, ওর ওপর যদি চোখ পড়ে থাকে তো সাথে গেলেই পারিস। যদি যাস, হোটেলটা দিয়ে যাস আমাকে, দেখেশুনে রাখব।'

'যদি যাই আর কখনও ফিরব না, কাজেই হোটেল আমাকে বিক্রি করে দিয়ে যেতে হবে।'

'দান করে গেলেও পারিস। এই না বললি, আমি ছাড়া তোর আর কেউ আপনজন নেই?'

'যদি যাই সে তখন দেখা যাবে। আগে টেরেসা তো ফিরুক।'

'তোকে আশীর্বাদ করি, মা,' বলল ডন হোমায়রা। 'এত বছরের তিক্ততার পর নিজে থেকে মিল করতে এলি তুই।'

শীলা কামরা থেকে বেরিয়ে যেতেই ভাবল সে, টেরেসাকে ফিরে পাই, তারপর খেল্ কাকে বলে দেখাব তোর বন্ধুকে। ও নিজেই কোথাও যাচ্ছে না, তুই আবার ওর সাথে কোথায় যাবি, অ্যাঁ? রানার কবর আমার র‍্যাঞ্চেই খোঁড়া হবে। তারপর আরেকটা কাজ বাকি থাকবে, যেটা অনেক আগেই সেরে ফেলা উচিত ছিল আমার। হ্যাঁ, রানার সাথে তোরও ব্যবস্থা করব এবার। দাঁড়া!

রানা, শীলা, রেমারিক, ভিকো আর ট্যালবটকে নিয়ে কোম্পানী অফিসে এল ডন হোমায়রা, হোটেল থেকে রাস্তা পেরিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে। দরজার ওপর সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, হোসে মাইনিং কোম্পানী। তালা খোলা হলো। সামনের ঘরটা অফিসের মত করে সাজানো, মেটাল কেবিনেটটা এক কোণে। সেটারও তালা খোলা হলো, ভেতরে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।

পিছন দিকে ইস্পাতের দরজা, সেদিকে হাত তুলে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওদিকে কি?'

দরজার পিছনে কি আছে ভালই জানে ট্যালবট, এমন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সে, ও যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে।

কিন্তু ডন হোমায়রা সহজভাবে উত্তর দিল। 'ওখানে? খনির সোনা। প্রসেস করার পর ওখানেই সব রাখা হয়। অল্প সময়ের জন্যে, তারপর তো পাঠিয়ে দেয়া চিহুয়াহুয়ায়। ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, সিনর রানা, আপনার ফি দেয়ার জন্যে যথেষ্টই আছে ওখানে।'

শীলার উদ্দেশে একটা চোখ টিপল রানা। 'ডন হোমায়রা, কিছু যদি মনে না করেন, একবার দেখতে পারি? এত সোনা এক সাথে দেখার সুযোগ আর হয়তো কখনও পাব না!'

'না!' গর্জে উঠল ডন হোমায়রা। 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনি নাক গলাতে পারেন না!'

'কাকা,' নিরীহভঙ্গিতে বলল শীলা, 'শুনেছি শুধু এখানে নয়, আরও নাকি অন্তত পাঁচ জায়গায় সোনা রাখা হয়? সত্যি?'

'কে··· কে বলেছে? আমি তাকে খুন করব···'

অনেক কষ্টে হাসি চাপল শীলা। 'কথায় কথায় কাকীমাই তো একদিন বলছিল···'

'তাকে আমি ডিভোর্স···,' তারপর মনে পড়ল ডন হোমায়রার, মুখ নিচু করে নিল সে, বলল, 'বাজে কথা বলা তার একটা বদ অভ্যাস ছিল। সব মিথ্যে।'

মেটাল কেবিনেট থেকে প্রিয় অস্ত্র থম্পসন সাবমেশিনগানটা তুলে নিল রানা, হানড্রেড-রাউন্ড সার্কুলার ম্যাগাজিন দিয়ে লোড করল। 'এখানে দেখছি একটা শটগান রয়েছে, খুব ভাল জিনিস। কেউ একজন নিতে পারো।'

শটগানটা রেমারিক নিল। একটা রিভলভারও নিল সে। শীলার দিকে ফিরতে স্থির হয়ে গেল রানার দৃষ্টিতে। সরু কোমরে অ্যামুনিশন বেল্ট বাঁধছে শীলা, সে-ও একটা রিভলভার নিয়েছে। তার হাতে একটা রাইফেল ধরিয়ে দিল ও, বলল, 'এটাও রাখো। ওদের তুমি খুব কাছে পাবে কিনা বলা কঠিন।' নিজেকে মনে করিয়ে দিল, বিপদ থেকে যতটা সম্ভব সরিয়ে রাখতে হবে শীলাকে।

দু'জন দো-আঁশলা গাধা আর ঘোড়ার সাহায্যে হোটেলের পোড়া জঞ্জাল পরিষ্কার করছে।

'সাবধানে কাজ করো,' তাদেরকে বলল শীলা। 'মেইন বিল্ডিঙের যেন কোন ক্ষতি না হয়।'

ঠিক তখুনি নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল সে। দেখতে পাবে এই আশায় অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছিল শীলা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাছে চলে এল তামবারু, শীলার সামনে ঘোড়া থেকে নামল, তার দম হারানো ঘোড়া মাটিতে পা ঠুকছে ঘন ঘন, চিঁহিঁহিঁ করছে।

'কি জানতে পারলেন?' অধীরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল শীলা।

শীলার পাশে রানা আর ট্যালবট এসে দাঁড়াল, রেমারিক আর ভিকো হেঁটে আসছে।

'কার্টিজ খুব চালাক। যেখানে রয়েছে, বহুদূর থেকে তোমাদেরকে আসতে দেখবে সে। তার ক্যাম্পের যত কাছে পৌঁছুবে তোমরা, ততই কঠিন হয়ে উঠবে পিছু হটা। পাথর দিয়ে প্রকৃতিই ওখানে ওই দুর্গ তৈরি করে রেখেছে। এত উঁচু, দূর পাহাড়ের মাথায় ট্রেইলগুলো দেখতে পাবে সে।'

'সে কি টেরেসার কোন ক্ষতি করবে?' প্রশ্ন করল শীলা।

'তার আশা পূরণ হলে করবে না।'

'তার আশা?'

'সে একটা জিনিস চায়।'

'কি জিনিস?'

'সেটা হলো···' হ্যামারের দিকে ইঙ্গিত করল তামবারু, ডন হোসে হোমায়রার সাথে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে সে।

'সে যা চায় তা পেলে, তারপরও কি টেরেসার ক্ষতি করবে?'

'কার্টিজের মত মানুষের কাছে, শক্রর স্ত্রী শক্রর অংশবিশেষ। সে জন্যেই সে মোনা লিজাকে খুন করেছে। শক্রর সন্তানও শক্রর অংশবিশেষ। টেরেসাকে সে খুন করেনি, কারণ তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করবে। ছাগল বেঁধে রেখে যেমন বাঘকে ডেকে আনা যায়, তেমনি টেরেসাকে ধরে রেখে তার শক্রকে রেঞ্জের ভেতর পেতে চায় সে।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নিশ্চয়ই ভাল একটা প্ল্যান করেছেন?'

'বহু চাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি,' বলল তামবারু, 'যে প্ল্যান সফল হয় সেটাই ভাল, যেটা ব্যর্থ হয় সেটাই খারাপ। আমাদের সাফল্য নির্ভর করছে চালাকির ওপর। কার্টিজও প্ল্যান করেছে, সে-ও জানে তার সাফল্য নির্ভর করছে চালাকির ওপর। এখন দেখা যাক কে কাকে হারাতে পারে।'

এগারো

হারমোজা ত্যাগ করার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। সামনের ঘোড়ায় থাকবে তামবারু, সাথে ভিকো, তবে পাশে নয়, ঠিক তার পিছনে। পরবর্তী জোড়া ডন হোমায়রা আর হ্যামার। ডন হোমায়রার নিরাপত্তার দিকে নজর রাখার জন্যে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হলো হ্যামারকে। ওদের পিছনে থাকছে ট্যালবট আর রেমারিক। প্রত্যেকেই ওরা সশস্ত্র।

রানাকে আস্তাবলে নিয়ে যেতে চাইল শীলা, বলল, 'আমার অনেক আছে, যে-কোন একটা বেছে নিতে পারো তুমি।'

পাল্টা প্রস্তাব দিল রানা, 'তুমিই বরং আমার গাড়িতে এসো। শেভ্রোলেটা

না থাকলে ঘোড়া নিতে বাধ্য হতাম, কিন্তু আছে যখন...' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কি, আসবে গাড়িতে?'

ছোটবেলা থেকে ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস শীলার, তার জন্যে ব্যাপারটা সহজ আর স্বস্তিকর। গাড়িতে সে চড়েছে বটে, কিন্তু খুব কম, কেমন যেন ভয় ভয় করে তার। বার কয়েক চালিয়েওছে, কিন্তু হাত কাঁপে। অপ্রতিভ, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল সে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

'কি হলো? নাকি ঘোড়াতেই থাকবে?'

'তুমি পাশে থাকলে ভয় কি?' আস্তাবলে ঘোড়া রেখে ফিরে এল শীলা, দেখল সামনের দলটা রওনা হবার জন্যে ছটফট করছে। হাত ধরে তাকে গাড়িতে তুলল রানা।

'কিন্তু এই গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে কতটা উঠতে পারবে জানি না।'

'আগে রওনা তো হই, তারপর দেখা যাবে,' স্টিয়ারিং হুইলে টোকা মেরে বলল রানা। 'এ আমার বন্ধুর মত, হতাশ করবে বলে মনে হয় না।' গাড়িটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে ও, কোথাও কোন ত্রুটি নেই। ট্রাঙ্কে কয়েকটা পেট্রল ভর্তি ক্যান আর পানিও নিয়েছে।

সিগারেট ধরাল রানা, টপটা তুলে দিল মাথার ওপর। রোদ থেকে বাঁচা যাবে, কার্টিজও জানতে পারবে না ক'জন আছে গাড়িতে। 'ওদেরকে এগিয়ে যেতে বলো, ধরতে পারব আমরা।'

সীটের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দলটাকে রওনা হবার ইঙ্গিত দিল শীলা, রানার পাশে বসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি ভয় করছে?'

'কিসের ভয়?'

'এতেই আমার উত্তর পাওয়া হলো।'

'নিশ্চয়ই,' আবার স্টিয়ারিং হুইলে টোকা দিল রানা, 'ভয় লাগছে এই সুন্দরীর গায়ে বুলেট না ফুটো তৈরি করে। এদিকে কোন গ্যারেজ আছে বলে তো মনে হয় না। গাড়িটাকে সত্যি ভালবাসি, শীলা।'

'তুমি যখন বাসো তখন আমাকেও বাসার অভ্যেস করতে হবে। কিন্তু তোমার ভয় করছে না পিছনের ক্যানগুলোয় বুলেট লাগতে পারে?'

'ওগুলোয় বুলেট লাগলে ভয় পাবার জন্যে কেউ আমরা থাকব না। নাকি ঘোড়াতেই চড়বে আবার?'

'যেখানে আছি সেখানেই থাকছি।'

'বিপদ হতে পারে জেনেও?'

'তোমার চেহারায় কিসের আলো, রানা? কি ভাবছ তুমি? কি আশা করছ?'

'এইমাত্র সিদ্ধান্ত নিলাম তোমাকে একটা জিনিস উপহার দেব।'

শিশুর মত খুশি হয়ে উঠল শীলা। 'উপহার! প্লীজ বলো না, কি দেবে?'

'এখন নয়, যখন দেব তখন দেখো,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না যে? বিপদ জেনেও এই গাড়িতে থাকবে?'

'এইমাত্র আমিও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমাকে আমি মুহূর্তের জন্যেও কাছছাড়া করতে চাই না।'

রাতের আকাশ পরিষ্কার, চাঁদের সাদা আলোয় স্নান করছে মরুভূমি। উপত্যকার বালি আর ধুলোর ওপর কার্টিজের দল চিহ্ন রেখে গেছে, অনুসরণ করতে কোন অসুবিধে হলো না তামবারুর।

বিরতি ছাড়া ঘোড়া ছোটাল ওরা, আরও দ্রুতগতি আদায়ের জন্যে তাগাদা দিচ্ছে পনিগুলোকে। মাঝরাতের ঠিক পরই প্রথম সারির পাহাড়গুলোর দিকে ঘুরে গেল ট্রেইল। বিশ্রামের জন্যে ওদেরকে থামাল তামবারু, গাড়ি থেকে নেমে ছোট একটা ঢালের মাথায় উঠে গেল রানা।

সামনে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। বুকে উঁচু-নিচু পাহাড় নিয়ে জ্যোছনাঢালা মরু দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, গভীর গিরিখাদ আর গর্তগুলো গাঢ় অন্ধকার অভিশপ্ত ফাঁদ যেন, বিশাল আর বিচিত্র আকৃতির ঘন ছায়াগুলো জ্যান্ত প্রাণীর মত, যেন কাছে গেলেই নড়ে উঠবে।

'সুন্দর, কিন্তু গা ছমছম করে, তাই না?' রানার পাশে একটা বোল্ডারে বসে রয়েছে শীলা, হ্যাট খুলে মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা চুল থেকে ক্লিপ খুলছে।

'হ্যাঁ,' অস্ফুটে বলল রানা।

মৃদু হাসল শীলা, তারপর মরুভূমির দিকে তাকাল। খানিক পর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে, 'একটা কথা বলবে? কেন এলে বলো তো? টেরেসা তোমার কেউ নয়, আমার কাকার সাথে তোমার শত্রুতা, আর কার্টিজ তোমার শত্রুও নয় বন্ধুও নয়। তাহলে কিসের তাগিদে?'

'মানুষ একটা ফুলকে বাঁচানোর জন্যে যুদ্ধ করে না?'

অনেকক্ষণ কথা বলল না শীলা, উত্তর পেয়ে গেছে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'কি উপহার দেবে জানি না, জানতে চাইও না। কিন্তু আমি একটা জিনিস চাইলে দেবে, রানা?'

'চেয়েই দেখো,' আশ্বাস দিল রানা।

'জানি তোমাকে ধরে রাখতে পারব না। তোমার সাথে আমার হয়তো যাওয়াও হবে না। যদি না যাই, ওরকম একটা ফুল চাইলে পাব?'

চমকে উঠল রানা। 'কি বলছ তুমি!'

'খুব কি কঠিন সমস্যায় ফেলছি তোমাকে? চাওয়াটা কি খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে? তোমাকে না পাই, তোমার সন্তানের মধ্যে তোমাকে আমি খুঁজে নেব—সে অধিকারটুকু আমাকে দেবে না?'

ঘেমে গোসল হয়ে গেল রানা। এমন আকুল প্রার্থনা কিভাবে প্রত্যাখ্যান করে সে! ভালবাসার দাবি নিয়ে কথা বলছে শীলা। অথচ রানার পক্ষে তার এই আশা পূরণ করা অসম্ভব। যেখানে কোনদিন ওর ফিরে আসা হবে কিনা সন্দেহ, সেখানে কিভাবে সে রেখে যাবে... 'ব্যাপারটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় আরও চিন্তা করা দরকার, শীলা, দু'জনেরই, তাই না?'

দীর্ঘশ্বাস চাপল শীলা। কথা না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল সে। ঠিক তখুনি ঢাল বেয়ে উঠে এসে ওদেরকে অস্বস্তিবোধ থেকে বাঁচাল রেমারিক।

রেমারিক সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল রানা। 'লাইটার জ্বেলো না।'

দাঁত দিয়ে জিভ কাটল রেমারিক। 'দুঃখিত।' সিগারেট আর লাইটার পকেটে রেখে দিল সে।

'ভাবছি কতটা কাছাকাছি এলাম। বিশ মাইলের মত এগিয়েছি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তামবারুর ধারণা,' বলল রেমারিক, 'পাহাড়ের নিচে চর পাঠিয়ে থাকতে পারে কার্টিজ। এখন থেকে আস্তে-ধীরে এগোতে হবে আমাদের। হয়তো আরও এক ঘণ্টা, কিংবা দু'ঘণ্টা। কে বলতে পারে!'

গরম রাত, মাথার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক নক্ষত্র। মুখের ঘাম মুছে রানা বলল, 'কোথাও বোধহয় নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে।'

ঢাল বেয়ে উঠে এল ট্যালবট, রানার কথা শুনতে পেয়েছে সে। দূর পাহাড়শ্রেণীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল বুড়ো আমেরিকান। ওদিকের নক্ষত্রগুলো ইতোমধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে কালো মেঘে। 'ঠিক বলেছেন, বস্। ঝড় একটা তৈরি হচ্ছে বটে।'

'এরপর সামনের পথ,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'শেভ্রোলে নিয়ে যেতে পারব?'

'আগেকার দিনে ওয়াগন ট্রেন আসা যাওয়া করেছে,' বলল ট্যালবট। 'তখন এদিককার সব পাহাড়ে সোনার খনি ছিল। র‍্যাঞ্চও ছিল দু'চারটে। পাহাড় সারির ওপারে আবার মরুভূমি।'

'সুন্দরী, তোমার পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে,' নিচে নেমে গাড়িটাকে উদ্দেশ্য করে বলল রানা। সামনের দলটা রওনা হবার পর এঞ্জিন চালু করল ও।

ভাঙা, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে উঠে গেছে পাহাড়, গায়ে আঁকাবাঁকা রেখার মত বিছিয়ে আছে অসংখ্য সরু ট্রেইল, বহুকাল আগে শুকিয়ে যাওয়া পানির উৎসের দিকে চলে গেছে। প্রধান ট্রেইলটা যথেষ্ট চওড়া, দু'পাশের ঢাল ঢাকা পড়ে আছে শুকনো ঘাস আর কাঁটাঝোপে। আরও ওপরে ওঠার পর কিছু কিছু ক্যাকটাস দেখা গেল।

গাড়ি থামাতে হলো একবার। সবাইকে ডেকে সাহায্য চাওয়া হলো, বড় একটা বোল্ডার না সরালে গাড়ি এগোবে না। ছড়ি দিয়ে শেভ্রোলের গায়ে একটা বাড়ি মারল ডন হোমায়রা।

'এই ঝামেলাটা সাথে আনার কি মানে?'

জবাবে, বেশি দূর থেকে নয়, গুরু গম্ভীর ডাক শোনা গেল মেঘের। একজন বাদে হেসে ফেলল সবাই। আবার গাড়ি চলতে শুরু করলে শীলা মুচকি হেসে বলল, 'দেখা যাচ্ছে প্রকৃতিও তোমার দলে।'

সময় যতই গড়াল, কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল ওদের। গরম ভাবটা কেটে

গেছে, জোরাল বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দূর আকাশে। উপত্যকার ওপারের পাহাড়গুলো আলোকিত হয়ে উঠছে মাঝে মধ্যে।

বেশ কিছুক্ষণ হলো হাঁটছে তামবারু। গতি খুব মন্থর। মাঝে মাঝেই থামছে সে, চিনে নিচ্ছে ট্রেইল। তার ঘোড়াটাকে নিয়ে আসছে রেমারিক। ইতোমধ্যে আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে, চাঁদ না থাকায় অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। পাহাড়ে উঠতে শুরু করার পর একবারও আলো জ্বালেনি রানা।

পাহাড়ের কাঁধে উঠে এল ওরা। খানিক পর কাঁটাঝোপে ঘেরা ছোট একটা মালভূমি দেখা গেল। বুড়ো তামবারু ঘুরল, হাত তুলল মাথার ওপর। 'সকাল পর্যন্ত এখানে থামলাম আমরা। আলো নয়, আগুন নয়। ওদের খুব কাছে রয়েছি।'

ঘোড়া থামিয়ে নামল সবাই। কয়েকটা পাইন গাছের নিচে শেভ্রোলেটাকে রেখে ফিরে এল রানা। ডন হোমায়রা বিরক্তির সাথে জিজ্ঞেস করল, 'এখুনি আমরা হামলা করছি না কেন? ওরা আমাদেরকে আশা করছে না, হামলা করলে দিশেহারা হয়ে পড়বে।'

মাথা নাড়ল তামবারু। 'কানে শব্দ শোনার আগে ঘোড়ার গন্ধ পাবে ওরা—রাতের বাতাস কিনা। আমরাও পাহাড়ে রয়েছি, কিন্তু ওদের চেয়ে নিচে, তারমানে হামলার জন্যে অবস্থাটা সুবিধের নয়। যদি আক্রমণ করি, তাতে বিস্ময়ের ধাক্কা থাকবে না। অন্ধকারে ওদের চোখ জ্বলে, একটা একটা করে বেছে নিয়ে গুলি করতে পারবে।'

'কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম ইন্ডিয়ানরা রাতে যুদ্ধ করতে ভয় পায়,' বলল রানা।

'যে-ই বলে থাকুক, অ্যাপাচী ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে বলেনি সে,' উত্তর এল রেমারিকের কাছ থেকে, ডন হোমায়রার দিকে ফিরল সে। 'আমাদের ওপরে ওরা সতেরোজন। আমরা যে শুধু সংখ্যায় কম তাই নয়, অন্ধকার রাতে ঝড়টাও ওদের পক্ষে কাজ করবে। কোন্টা ভাল তামবারু জানে। আমি অপেক্ষা করার পক্ষে।'

'আমরাও,' বলল ট্যালবট।

ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ডন হোমায়রা। 'তারমানে আমার কোন কর্তৃত্ব নেই এখানে?'

'কোন কালেই ছিল না,' মন্তব্য করল রানা।

দীর্ঘ নিস্তব্ধতার মাঝখানে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাল। তারপর মাথার ওপর ছড়িটা একবার ঘুরিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরল ডন হোমায়রা, জিন নামাল ঘোড়া থেকে।

ছোট্ট মালভূমির কিনারায় ঘোড়া বাঁধল ওরা। লাঠিপেটা করে কিছু ঝোপ-ঝাড় শুইয়ে দিল রেমারিক আর ভিকো, সাপ তাড়াচ্ছে। লম্বা হবার জন্যে শেভ্রোলের পিছনের সীটে উঠে গেল শীলা। বাকি সবাই তাকে ঘিরে থাকল,

কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে, গল্প-গুজব করছে, শুধু ডন হোমায়রা বাদে। ফাঁকা জায়গাটার শেষ প্রান্তে একা বসে আছে সে। আর হ্যামার তার সঙ্গী সাথী হিসেবে বেছে নিল ঘোড়াগুলোকে।

কথা বলছে ওরা নিচু গলায়, গুঞ্জনটা রাতের বাতাসে বেশি দূরে যেতে পারছে না, মাঝে মধ্যেই মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি থামাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেল অথচ এখনও বিয়ে করেনি, ছি, তাহলে কি ধরে নিতে হবে বিশেষ একটা জিনিসই তার নেই? ট্যালবটকে খেপিয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল রেমারিক। শীলা জানে, ওরা আসলে ওর মনটাকে ভয় আর উত্তেজনা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করছে, বোঝাতে চাইছে তারা থাকতে ওর কোন বিপদ হবে না। ওদের সবার জন্যে আকস্মিক স্নেহ-ভালবাসার একটা বিশাল ঢেউ সারা দেহমনে ছড়িয়ে পড়ল। আর ঠিক সেই সময় ঘোড়াগুলোর দিক থেকে দপ্ করে ছোট্ট একটা আগুন জ্বলে উঠল। সিগারেট ধরাল হ্যামার।

চাপা গলায় গুঙিয়ে উঠল রেমারিক, সটান দাঁড়িয়ে পড়েছে সে, কিন্তু রানা এরইমধ্যে ঘোড়াগুলোর দিকে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে আঘাত করল ও, মেক্সিকান লোকটার মুখ থেকে খসিয়ে দিল সিগারেটটা, তাল হারিয়ে ঝোপের ওপর পড়ল সে। হ্যামার উঠতে গেল, এক হাতে তার বুকে চাপ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখল ভিকো, ছুরির ডগা ঠেকাল তার নাকের নিচে।

'ফের যদি এরকম বোকামি করতে দেখি, তোমার আমি গলা কাটব।'

সিধে হলো ভিকো, তার সাথে সাথে হ্যামারও দাঁড়াল। বিপজ্জনক একটা মুহূর্ত। মনে হলো এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যামার। রক্তচক্ষু মেলে একবার রানা, একবার ভিকোর দিকে তাকাল সে। কি ঘটছে, দূর থেকে সবই দেখল ডন হোমায়রা। ছড়ি হাতে উঠে এল সে, তার হাঁটার ভঙ্গিতে থামার কোন লক্ষণ নেই, যেন হ্যামারের সাথে ধাক্কা খাবে। ঠাস করে একটা চড় কষাল হ্যামারের গালে। 'ইডিয়েট! তুমি শুধু আমাদেরকে বিপদে ফেলছ না। বাচ্চাটার সর্বনাশ করতে যাচ্ছ।'

একটাও শব্দ না করে ঘুরে দাঁড়াল হ্যামার, হোঁচট খেতে খেতে ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেল।

'এখন থেকে ও যাতে কথা শোনে, সেদিকটা দেখব আমি,' বলে নিজের জায়গায় ফিরে গেল ডন হোমায়রা। আর যদি কাউকে না-ও পারে, অন্তত হ্যামারকে সে বশে রাখতে পারবে।

ফাঁকা জায়গাটার কিনারা পর্যন্ত হেঁটে গেল তামবারু, কিছু শোনার চেষ্টা করল, একদিকে সামান্য কাত হয়ে আছে মাথা। 'কোন ক্ষতি হয়নি তো?' জিজ্ঞেস করল রেমারিক।

মাথা নাড়ল তামবারু। 'এখানে আমরা ভালভাবে লুকিয়ে আছি। তবে পাহারায় একজনের থাকা দরকার।'

ঠিক হলো পালা করে পাহারা দেয়া হবে, প্রথম রেমারিক স্বেচ্ছাসেবক হলো। শেভ্রোলের পিছনের সীটে কুণ্ডলী পাকাল শীলা। সামনের সীটে হেলান

দিয়ে বসে আছে রানা, যতটা সম্ভব ঢিল করে দিয়েছে পেশী। চোখ বন্ধ করল ও, সাথে সাথে গ্রাস করল চরম ক্লান্তি, ডুবে গেল ঘুমের রাজ্যে।

রাত তিনটের খানিক পর ট্যালবটের মৃদু ডাকে ঘুম ভাঙল ওর। 'আপনার পালা, বস্। ফুটো কম্বলটা সাথে নিলে ভাল করবেন। বৃষ্টি এল বলে।'

প্রথমে রানা দেখল শীলা কেমন আছে। লম্বা শরীরটা ভাঁজ খেয়ে ছোট্ট হয়ে আছে ব্যাক সীটে। বাচ্চা মেয়েরা যেমন মুঠো করা দুটো হাত চিবুকের নিচে রেখে ঘুমায়, শীলাও তেমনি ঘুমাচ্ছে, ভাঁজ করা পায়ের হাঁটু উঠে এসেছে বুকের কাছে। পাশ ফিরে শুয়ে থাকলেও মুখটা সামান্য ওপর দিকে তোলা, অন্ধকারে ঘন কোমল শীতল আভা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। ঠিক যেন পুতুল পুতুল লাগছে শীলাকে। ছোট্ট আরেকটা পুতুল হলে সত্যি দারুণ মানাত ওকে।

ঘোড়াগুলোর পাশে বোল্ডারের ওপর পাহারায় বসল রানা, গুটানো কম্বলটা বগলের নিচে, হাঁটুর ওপর থম্পসন। ডান চোখের ঠিক পিছনে ভোঁতা একটা ব্যথা অনুভব করছে ও। ঘুম কম হলে যেমন হয়।

অন্ধকারে রানা দেখতে পেল না, ঝোপের ভেতর বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হ্যামার ওর দিকে।

সে কাপুরুষ নয় বটে কিন্তু নিজের চোখে দেখেছে কতটুকু নিষ্ঠুর হতে পারে কার্টিজ। দরদ বা আবেগের বশে এখানে আসেনি হ্যামার, এসেছে যার চাকরি করে তার হুকুমে। এবার নিয়ে দু'বার হলো, সবার সামনে অপমান করা হলো তাকে।

সামান্য যে-টুকু আনুগত্য অবশিষ্ট ছিল চড় খাওয়ার পর তা-ও আর নেই। ঘণ্টাখানেক হলো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। ওরা সব মরুক, জাহান্নামে যাক। ঘোড়াগুলোকে নিয়ে পালাবে সে। ঘোড়া না থাকলেও গাড়িটা থাকবে, তবে সবার ওতে জায়গা হবে না, অন্তত কয়েকজনকে হাঁটতে হবে। অ্যাপাচীরা যদি নাগাল পায়, একটাকেও আস্ত রাখবে না। সেই সাথে তার প্রতিশোধ গ্রহণের আশাও পূরণ হবে।

এতক্ষণ রানার পালা শুরু হবার অপেক্ষায় ছিল হ্যামার। ঝোপ থেকে গা বাঁচিয়ে সাবধানে দাঁড়াল সে, ছুরিটা বের করে সামনে এগোল, নিঃশব্দে।

ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিক থেকে হ্যামারকে সিধে হতে দেখল তামবারু। 'সাবধান, রড!'

সামনের দিকে লাফ দিল হ্যামার। ঘুরল রানা, ওর সাথে ঘুরল মেশিনগান। কব্জির হাড়ে ব্যারেলের বাড়ি খেল হ্যামার, ছুরিটা পড়ে গেল হাত থেকে। বুকে বুক ঠেকল, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রানার হাত থেকে থম্পসনটা কেড়ে নিতে চাইছে হ্যামার। তার গোড়ালির পিছনে পা বাধিয়ে টান দিল রানা, দু'জন একসাথে পড়ে গেল, ঘোড়াগুলোর মাঝখান দিয়ে গড়াতে গড়াতে প্রবেশ করল ঝোপের ভেতর।

অকস্মাৎ রানাকে ছেড়ে দিয়ে রিভলভার বের করল হ্যামার। রানা ধাক্কা

দিয়ে তাকে বুক থেকে সরিয়ে দিচ্ছে, গুলি করল মেক্সিকান, পাথুরে মাটিতে লেগে আরেকদিকে ছিটকে গেল বুলেট। দলের আর সবাই যখন পড়িমরি করে ছুটে আসছে, ঝোপের ভেতর দিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল হ্যামার।

দাঁড়াল রানা, বাকি সবাই পৌঁছুল। 'কি হয়েছে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ট্যালবট।

'হ্যামার আমাকে ছুরি মারতে এসেছিল,' শান্তভাবে বলল রানা। 'তামবারু সাবধান করায় বেঁচে গেছি।' ইন্ডিয়ান লোকটার দিকে ঘুরল ও। 'গুলির আওয়াজ কি…?' প্রশ্নটা শেষ করল না।

গম্ভীর তামবারু মাথা ঝাঁকাল। 'আমরা কোথায় ওরা জানল। তৈরি হও সবাই।'

ভয়ের ঠাণ্ডা একটা শিরশিরে ভাব নিয়ে অ্যাপাচীদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে প্রস্তুতি নিল ওরা। হঠাৎ বিরাট একটা আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎরেখা আঘাত করল পাথরে, তারপর শোনা গেল বজ্রবিস্ফোরণের কড়াৎ শব্দ। সেই সাথে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি, বাতাস ভরে উঠল সোঁদা একটা গন্ধে।

আতঙ্কে অন্ধ হয়ে ছুটছে হ্যামার, তার ধারণা ধাওয়া করা হচ্ছে তাকে, যে-কোন মুহূর্তে ঝোপের ভেতর থেকে ছুটে আসবে গুলি। অন্ধকার এত গাঢ়, নিজের হাতও দেখতে পাচ্ছে না। একটা হাত মুখের সামনে তোলা, ঝোপের ডালপালা থেকে চোখ বাঁচানোর ভঙ্গিতে।

কিসে যেন পা বেধে গেল, আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে হ্যামার। কিন্তু মাটির সাথে সংঘর্ষ হতে দেরি দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। একটা ঢালের উঁচু কিনারায় পা বেধে গিয়েছিল তার, কিনারা থেকে শূন্যে খসে পড়ল শরীরটা, ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে ঝোপের ওপর দিয়ে গড়াতে শুরু করল, হাত থেকে পাখির মত উড়ে গেল রিভলভারটা। ওটা আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। শক্ত একটা কিছু ধরে পতনটা রোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। শরীরটা থেঁতলে যাচ্ছে। ঢালের নিচে কি আছে জানা নেই, নিচে কখন পৌঁছুবে তা-ও বুঝতে পারছে না।

অবশেষে একটা গাছের শুকনো গুঁড়ি ধরে নিজেকে থামাতে পারল হ্যামার। আর ঠিক তখুনি মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। কয়েক সেকেন্ড কিছুই চিন্তা করতে পারল না সে। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে, তারপরও মনে হলো বাতাসের অভাবে ফেটে যাবে ফুসফুস।

ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি ফিরে এল। সারা শরীরে জ্বালা, তবে কোন হাড় ভাঙেনি। হাঁটতে পারবে। প্রথম কাজ, পাহাড় থেকে নেমে যাওয়া। অন্ধকারের ভেতর দাঁড়াল সে, ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ। ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে। নিচে শুকনো একটা নালা। সেটা পেরোবার পর আবার একটা ঢাল বেয়ে নামতে হলো খানিকটা, তারপর আবার একটা গভীর নালা। এবার সেটা না পেরিয়ে মাঝখান দিয়ে হাঁটতে লাগল হ্যামার। কিন্তু

কোন্ দিক থেকে কোথায় যাচ্ছে জানে না।

এক সময় বিশ্রামের জন্যে থামল হ্যামার, জানে হারিয়ে গেছে সে। বৃষ্টি আগের মতই ঝমঝম করে ঝরছে, বাকি সব শব্দ চাপা পড়ে গেলেও তার পাশের আর পিছনের ঢাল থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ পাচ্ছে সে। খানিক পর দাঁড়াল, তাকাল চারদিকে। কিন্তু না, চোখের সামনে কালো পর্দার মত ঝুলে আছে অন্ধকার। আরও এক পশলা পাথর গড়াতে শুরু করল তার পিছনে। গা ছম ছম করে উঠল তার। আবার ছোটার জন্যে পা তুলল।

দু'হাতের বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল হ্যামার। দাঁড়াতে যাবে, কয়েক জোড়া হাত তাকে পাথুরে মাটির সাথে চেপে ধরে রাখল।

তার শরীরের সব জায়গায় অদৃশ্য হাতের চাপ। দুই কব্জি দুটো মুঠোর ভেতর চলে গেল। দুই পায়ের ওপর দু'জোড়া হাত চেপে বসল। গলায় একজোড়া। চিৎকার করার চেষ্টা করল হ্যামার, মুখের ভেতর কি যেন একটা ঢুকিয়ে দেয়া হলো। আশপাশে অচেনা কণ্ঠস্বর।

কোয়ান্টা বলল, 'এটাকে উপহার পেলে কার্টিজ সম্ভবত সন্তুষ্ট হবে। খনিতে আমাদের লোকের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল এই ব্যাটা।'

চিকু বলল, 'উঁহু, কার্টিজ শুধু হোমায়রাকে পেলে সন্তুষ্ট হবে।'

'তাহলে এটাকে নিয়ে কি করব আমরা?'

'গাড়ি নিয়ে আসায় এখন সবাই খুশি তো?' জিজ্ঞেস করল রানা, তামবারু ছাড়া বাকি সবাই টপ ঢাকা শেভ্রোলের ভেতর ঠাঁই নিয়েছে, বৃষ্টির সময় কলেজ ছাত্ররা যেমন ফোন বুদে ভিড় করে। ব্যাপারটা উপভোগ করছে রানা, কারণ সবাইকে জায়গা দিতে গিয়ে প্রায় ওর কোলেরই ওপর বসতে হয়েছে শীলাকে।

'দেখো-দেখো, তামবারুর মাথায় ছাতা!' হঠাৎ হেসে উঠল ট্যালবট।

বৃদ্ধ ইন্ডিয়ান তার পোঁটলা থেকে তালপাতা দিয়ে বোনা দুটো ছোট মাদুর বের করে মাথা ঢেকেছে।

'ছাতা নয়, পোর্টেবল ছাদ বলতে পারো,' মন্তব্য করল রানা।

'ঠিক,' সায় দিল রেমারিক। 'ইন্ডিয়ানরা ছাতা পাবে কোথায়!'

হঠাৎ করেই ওদের হাস্য-কৌতুক থেমে গেল, বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে উঠল প্যাঁচার ডাক।

'ওটা প্যাঁচা নয়,' ফিসফিস করে বলল ট্যালবট।

'গাড়ি থেকে নামো সবাই, জলদি!' জরুরী তাগাদা দিল রানা। 'এটা একটা সহজ টার্গেট।'

তাড়াহুড়ো করে গাড়ি থেকে বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়ল সবাই। তামবারু দাঁড়িয়ে রয়েছে উত্তর দিকে। ফাঁকা জায়গাটার দূর প্রান্তে একটা ঝোপ যেন নড়ে উঠল।

ঘোড়াগুলোর দিকে ছুট দেয়ার একটা ঝোঁক চাপল ট্যালবটের। মাথা নিচু

করে দৌড় দিল সে, তামবারু যেদিকে তাকিয়ে আছে তার উল্টো দিকে যাচ্ছে সে। সামনে ঝোপ-ঝাড়ের উঁচু কিনারা, ওখানেই বাঁধা রয়েছে ঘোড়াগুলো। ধ্যেৎ, আজকাল আর আগের মত দৌড়াতেও পারি না, নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ভাবল সে।

ঘোড়াগুলো অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে, ঘন ঘন পা ঠুকছে মাটিতে। অন্ধকার চিরে দৃষ্টি ফেলার চেষ্টা করল ট্যালবট, তার হাতের রাইফেল গুলি করার ভঙ্গিতে তৈরি।

হঠাৎ বিদ্যুতের একটা চমক আকাশটাকে যেন চৌচির করে দিল। কাছে কোথাও বজ্রপাত হলো, কেঁপে উঠল ঘোড়াগুলো। প্রথম বিদ্যুৎ চমকানির আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও দ্বিতীয় আলোয় ঘোড়াগুলোর মাঝখানে অ্যাপাচী লোকটাকে দেখতে পেল ট্যালবট।

সাবধান করে দিয়ে হাঁক ছাড়ল সে। তার দিকে ধেয়ে এল অ্যাপাচী। ট্যালবটও গুলি করতে করতে ছুটছে। একের পর এক বেরিয়ে গেল বুলেট, কিন্তু অ্যাপাচী থামছে না, তার ডান হাত সামনে বাড়ানো, হাতে ছুরি। ছুরিটা আসছে বুঝতে পারল ট্যালবট, কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। থুতনির নিচে ঢুকে গেল ছুরির ডগা, তারপর সাঁৎ করে তালু ভেদ করে গেঁথে গেল মগজে।

পরবর্তী বিদ্যুৎ চমকের আলোয় কি ঘটছে দেখতে পেল রানা। ট্যালবটকে বাঁচানোর জন্যে ছুটল ও, কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ ঘটে গেছে। অ্যাপাচী আর ট্যালবট, দুটো লাশ একটার ওপর আরেকটা পড়ে আছে।

ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল মেঘগুলো, থেমে গেল বৃষ্টি। ঘন অন্ধকার যখন ফিকে হয়ে আসছে, ঝোপের ভেতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল তামবারু। আবার যখন ফিরল সে, বলল, 'চলে গেছে ওরা।'

ট্যালবটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ভিকো, টেনে বের করে নিল ছুরিটা, প্যান্টে মুছল সেটা। চোখে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে শীলা।

'বুড়ো মোটেও সতর্ক ছিল না!' চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে বলল ডন হোমায়রা।

'আপনি ডিনামাইট ফাটাতে দিলে লোকটা আজ বেঁচে থাকত,' জবাব দিল রানা।

দুলে উঠল শীলা, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল রানা।

ট্যালবটের জিনের সাথে ছোট হাতলের একটা কোদাল পাওয়া গেল, সেটা দিয়ে অগভীর দুটো কবর খোঁড়া হলো। লাশ নামাবার পর মাটি আর পাথর দিয়ে ভরা হলো গর্তগুলো।

শীলা বিড়বিড় করে বলল, 'বাড়ি ফেরা হলো না, একজন বিদেশী রয়ে গেল এখানে।'

সময় নষ্ট না করে রওনা হয়ে গেল ওরা।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর প্রথমে রানার চোখে ধরা পড়ল ধোঁয়াটে রেখাটা। গাড়ি থামিয়ে নামল ও। গাছ আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে সাবধানে

এগোল তামবারু। তার পিছু পিছু নিঃশব্দে আসছে ওরা। সামনেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সাদা ধোঁয়া সেখান থেকেই উঠছে আকাশে।

হ্যামারকে পেল ওরা, বা বলা যায় যতটুকু তার অবশিষ্ট আছে। মরা একটা কাঁটা-গাছের ডাল থেকে ঝুলছে, একটা অগ্নিকুণ্ডের ওপর।

বারো

ইন্ডিয়ানরা সবাই কার্টিজকে ঘিরে জড়ো হলো।

'আমরা একজনকে হারিয়েছি, কিন্তু ওরা হারিয়েছে দু'জনকে,' বলে চলেছে কার্টিজ। 'এ-থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, ঈশ্বর আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন।'

সে থামতে নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর চিকু এগিয়ে এল। 'হ্যামারকে খুন করাই যথেষ্ট ছিল। বুড়ো লোকটাকে মারা আমাদের ভুল হয়েছে। আমি মনে করি...'

'চোপ!' দৃঢ়তার সাথে বাধা দিল কার্টিজ। 'কি ঘটেছে সেটা একবার চিন্তা করে দেখো। আমাদের একজন ওদের ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিতে গিয়েছিল। বুড়ো তাকে দেখে ফেলে, রাইফেল তোলে গুলি করার জন্যে। ফলাফল? দু'জনেই মারা গেছে। কাজেই এরমধ্যে কোন ভুল-ভাল দেখতে চেয়ো না। তবে হ্যাঁ, এরপর যে লোকটা মারা যাবে তাকে হোমায়রা হতেই হবে।'

'আমরা কি তাদের জন্যে এখানে অপেক্ষা করব?' জানতে চাইল কোয়ান্টা।

মাথা নেড়ে কার্টিজ বলল, 'প্রথমে ওদেরকে আমরা খানিকটা নাজেহাল করব।' পাকানো রশির মত ছোটখাট এক অ্যাপাচীর দিকে ফিরল সে, পরনে সবুজ শার্ট আর লেদার ওয়েস্টকোট। 'লোকা, ছ'লোক লোক আর আমার ঘোড়াটাকে সাথে নাও। সোজা অ্যাডাবে কুয়া পর্যন্ত যাবে তোমরা, তারপর ঘুরপথে ফিরে আসবে এদিকে। আমরা ট্রেইল ধরে ক্যানিয়ন পেরোব, পাহাড় টপকে চলে যাব গ্রীন ওয়াটারস-এ। ওখানে তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার।'

'কি করে বুঝব আমাদের নয়, লোকাদের পিছু নেবে তামবারু?' জিজ্ঞেস করল চিকু। 'বুড়োটা শেয়ালের মত চালাক।'

'চালাক বলেই তো আমার ঘোড়াটাকে চিনতে পারবে সে, দলটারও পিছু নেবে।' কার্টিজ হাসল।

'এমন হতে পারে ওরাও হয়তো দু'দলে ভাগ হয়ে গেল।'

'সংখ্যায় ওরা খুব কম।' মাথা নাড়ল কার্টিজ।

এরই মধ্যে লোক বাছাইয়ের কাজ সেরে ফেলেছে লোকা, কার্টিজের

ঘোড়াটায় চড়ল সে, পিছনে দলটাকে নিয়ে মরুভূমির দিকে নামতে শুরু করল।
ঘাড় ফিরিয়ে পুব দিকে তাকাল কার্টিজ। ছোট্ট দলটা যথেষ্ট ধুলো ওড়াচ্ছে। ডন হোমায়রার কথা ভাবতেই ঠোঁট স্পর্শ করল নিষ্ঠুর হাসি। খুব বেশি দেরি নেই আর। প্রতিশোধের যে আগুন তার বুকে জ্বলছে তা অচিরেই নিভবে।
লাফ দিয়ে লোকার ঘোড়ায় চড়ে বসল সে, নিজের লোকদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল, রওনা হয়ে গেল ক্যানিয়নের দিকে।

দুপুরের দিকে ক্লান্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল হারমোজা দল। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, পাথর আর বালির বিস্তৃতি, বালির ওপর অসংখ্য আঁকাবাঁকা ট্রেইল পানির শুকিয়ে যাওয়া উৎসমুখের দিকে চলে গেছে। একফোঁটা বাতাস নেই, পাথর আর বালি থেকে আগুনের মত তাপ বেরুচ্ছে। প্রধান ট্রেইলটা যথেষ্ট চওড়া, তবে এত বেশি শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে যে পথ ভুল না করাই বিস্ময়কর। ধুলো মেখে সাদা হয়ে গেছে সবাই, পিপাসায় ফেটে যাচ্ছে ছাতি, মাথার ওপর দোর্দণ্ডপ্রতাপ সূর্য যেন পণ করেছে এক চুল নড়বে না। এবার সামনে রয়েছে রানা, ফাঁকা জায়গায় ফেলে আসা ট্যালবটের স্মৃতি দগ্ধ করছে ওকে। ট্যালবটকে হারিয়ে সবাই ওরা বিষণ্ণ, এমনকি যে কিনা সদা প্রফুল্ল থাকতে ভালবাসে, সেই রেমারিকও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। জিনের ওপর নেতিয়ে আছে, মাঝে মাঝেই চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে।
ঘাড় ফিরিয়ে আর সবার দিকে তাকাল রানা, ট্রেইলটা নিচের দিকে নামতে শুরু করায় ঘোড়াগুলো যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। শেভ্রোলের গতি বাড়িয়ে দিল ও, তামবারু কি করছে দেখা যাক।
ছোট একটা ঢালের মাথায় চড়ল গাড়ি, নেমে এল বালি ঢাকা মরুভূমিতে, ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপে ভর্তি। কয়েকশো গজ দূরে পাহাড়ের একটা কাঁধ বিশাল পর্বতশ্রেণীর সারি সারি চূড়াগুলোর দিকে তীক্ষ্ণভাবে উঁচু হয়েছে। একধারে একটা ক্যানিয়ন, পাথর আর বালি ঢাকা প্রান্তরটাকে দু'ভাগ করেছে, কাঁটাঝোপ আর ক্যাকটাস বুকে নিয়ে হঠাৎ করে দেবে গেছে নিচের দিকে। আরেক দিকে একটা ঢাল, মরুভূমির দিকে উন্মুক্ত, দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে পাথর আর বালির, ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপের একঘেয়ে বিস্তৃতি।
পাহাড়ের কাঁধের নিচে ঘোড়া থেকে নেমেছে তামবারু। ধুলোয় ঢাকা শেভ্রোলে নিয়ে তার পাশে থামল রানা। মাটিতে বসে বালির দাগ আর কাঁটাঝোপের ভাঙা শাখা পরীক্ষা করছে তামবারু। রানার পিছু পিছু শীলাও নামল গাড়ি থেকে।
পোড়া মাটিতে অসংখ্য সরু দাগ। হাঁটু গেড়ে বসে রানাও সেগুলো পরীক্ষা করল।
'ওরা ভাগ হয়ে গেছে,' বলল তামবারু। 'ন'জন গেছে ক্যানিয়নের দিকে, বাকি কয়েকজন মরুর দিকে।'

'কেন তারা ভাগ হবে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তামবারু বলল, 'হয়তো ঝগড়ার পরিণতি। ওদের মধ্যে যারা তরুণ, কাজটা ভাল হচ্ছে না ভেবে ভয় পেয়ে থাকতে পারে। কোয়ান্টা আর চিকুকে আমি চিনি, আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আছে। গত যুগে ফিরে গিয়ে কার্টিজ যে অন্যায় করেছে, একসময় তাদের বোঝার কথা। প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ, প্রতিমুহূর্তে পলায়ন, এটা কোন জীবন নয়। কার্টিজ খুন-খারাবি চালিয়ে গেলে, ওরা জানে, ওদেরকেও তার মাশুল দিতে হবে।'

তামবারুকে চুইংগামের একটা স্টিক দিল রানা। কিন্তু মাথা নাড়ল তামবারু। 'কার্টিজ কোন দিকে গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মরুতে। তার পনির রেখে যাওয়া পায়ের ছাপ আমি চিনতে পারছি।'

বাকি সবাই এসে পৌঁছুল, ঘোড়া থেকে নামল এক এক করে। বগলে ছড়ি নিয়ে এগিয়ে এল ডন হোমায়রা, হাত দিয়ে কোটের ধুলো ঝাড়ছে। 'আবার কি ঘটল?'

'দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে ওরা,' বলল রানা। 'কার্টিজ ছ'জনকে নিয়ে মরুভূমির দিকে গেছে। বাকি সবাই গেছে ক্যানিয়নের দিকে। আল্লাই জানে কোথায় ওরা পৌঁছুতে চায়।'

'আমরা জানব কিভাবে টেরেসা কোন্ দলের সাথে আছে?'

'কার্টিজ বোকা নয়। টেরেসাকে নিজের সাথে রাখবে সে,' বলল তামবারু।

'এদিকে আগেও আমার আসা হয়েছে,' বলল ভিকো। 'অবশ্য অনেক দিন আগের কথা। পুরানো একটা প্যাক ট্রেইল পাহাড় টপকেছে। আজকাল কেউ আর ব্যবহার করে না। পাহাড়ের মধ্যে ছোট একটা গির্জা আছে, পাইন বনের মাঝখানে। ওটাকে সান্তা মারিয়া ডেল আগুয়া মাদ্রে বলা হয়। মানে হলো: সবুজ পানিতে আমাদের জলকন্যা। একটা ঝর্ণা আছে কিনা। চল্লিশ মাইলের মধ্যে এই একটাই উৎস, যেখানে এখনও পানি পাওয়া যেতে পারে।'

'উঁহুঁ,' বলে মাথা নাড়ল তামবারু। 'পাহাড় যেখানে মরুতে মিশেছে, এখান থেকে দশ বারো মাইল দূরে পানি পাবে তুমি। এক সময় ছোট একটা র‍্যাঞ্চ ছিল ওখানে। এখন শুধু ইঁটের ক'খানা দেয়াল আর কুয়োটা আছে।'

'তুমি তাহলে বলতে চাইছ ওদিকেই গেছে কার্টিজ?' জিজ্ঞেস করল ডন হোমায়রা।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল তামবারু, কিন্তু কথা বলে উঠল রেমারিক। 'ধারণাটায় যুক্তি আছে। বিদ্রোহীদেরকে কঠিন পথে যেতে বাধ্য করেছে কার্টিজ। আগুয়া মাদ্রেতে পৌঁছুনোর আগেই সব ক'টার জিভ বেরিয়ে পড়বে।'

সন্তুষ্ট দেখাল ডন হোমায়রাকে। 'এবার বাছাধন আমাদের ফাঁদে পা না দিয়ে যাবে কোথায়!'

'কিন্তু,' কণ্ঠে দ্বিধা নিয়ে মৃদু স্বরে বলল রানা, 'মনে কি হচ্ছে না যে আমাদেরকে ফাঁদ পাতার জন্যে প্ররোচিত করা হচ্ছে?'

'আপনি, সিনর, কার্টিজকে খুব বুদ্ধিমান বলে ধরে নিচ্ছেন,' ডন হোমায়রা অভিযোগ করল।

মাথা নাড়ল রেমারিক। 'আমি একমত। মশিয়ে রানা বলার পর এখন আমারও মনে হচ্ছে যে সিদ্ধান্তে আসার জন্যে যে-সব লক্ষণ আমাদের পাওয়া দরকার সব যেন অনায়াসে পেয়ে যাচ্ছি আমরা।' তামবারুর দিকে তাকাল সে। 'কার্টিজ জানে আমরা পিছু নিয়েছি। তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাবার উপায় কি?'

তামবারুর দুর্লভ হাসি চাক্ষুষ করল ওরা। 'উপায় আছে বৈকি, কিন্তু আমরা অপেক্ষা করব। প্রথমে আমি ট্রেইল পরীক্ষা করতে চাই।' ঘোড়ায় চড়ে ছুটল সে।

পিছনের সীট থেকে পানির ক্যান্টিন বের করে শীলার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। তারপর নিজে খেল। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মোছার সময় লক্ষ করল, শীলা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'মানে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হঠাৎ করে মনে হলো, তোমাকে আসলে আমি চিনি না।' বিষণ্ন একটু হাসল শীলা। 'হয়তো সবটাই আমার কল্পনা, অর্থাৎ ভুল। হার্মিস, সি.আই.এ., বি.সি.আই. আরও যে-সব গল্প শুনিয়েছ সবই হয়তো মিথ্যে। আসলে তুমি হয়তো একটা খুনী বা ডাকাত, পালিয়ে বেড়াচ্ছ। হতে পারে না?'

'খুব পারে,' রানা হাসছে না। 'কিন্তু যদি তাই হয়, ভালবাসার কি গতি হবে?'

অন্তরের পুলক আর আনন্দ ঝর্ণার মত মুখর হয়ে ছিটকে বেরুল, প্রাণ খুলে হেসে উঠল শীলা। 'একজন এসপিওনাজ এজেন্টের চেয়ে একজন দুর্ধর্ষ অপরাধীকে ভালবাসা কেন যেন মনে হয় অনেক বেশি রোমান্টিক। উত্তর পেলে? সম্ভবত এ-ধরনের ভালবাসায়, প্রেমিক যেহেতু অপরাধী, তার ওপর প্রেমিকার বেশ কর্তৃত্ব থাকে।'

'কিন্তু আমি যা বলেছি সব যদি সত্যি হয়?'

'সেক্ষেত্রে আমার যে যোগ্যতা আর স্ট্যান্ডার্ড, প্রেমিকপ্রবরটিকে মনে হবে নাগালের বাইরে। তাকে যদি ভালবাসি, নেট প্রফিট বিচ্ছেদ আর বিরহ, কান্না আর অনুতাপ।'

ভিকোর দিকে তাকাল রানা, দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে রেমারিকের সাথে। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল শীলাও। 'তোমার তাহলে,' বলল রানা, 'ভিকোকে ভালবাসা উচিত নয়?'

'ধ্যেৎ, বোকা নাকি!' হেসে উঠল শীলা। 'উচিত নয় বুঝতে পারলেও ঢলে পড়ে মন, তারই নাম ভালবাসা। তোমার বেলায় আমার ঠিক তাই-ই হয়েছে। ভাল কথা, আমি তো অনেক চিন্তা করেছি। তুমি কি ভাবলে?'

'আমাকে আরও খানিক সময় দাও,' অনুরোধ করল রানা।

'উত্তর এখনও পাওনি, নাকি উত্তর দিতে সংকোচ বোধ করছ বলে সময়

নিচ্ছ?'

'আমার স্থির বিশ্বাস,' বলল রানা, 'আমাদের ভালবাসা যদি খাঁটি হয়, কোন সন্দেহ নেই, এই সমস্যার সুন্দর একটা সমাধান হয়ে যাবে। এসো না, দু'জনেই আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি? হয়তো ঈশ্বর...'

রানার ঘাড়ে হাত রাখল শীলা, কাছে টেনে ওর গলায়, তারপর ঠোঁটে চুমো খেল। তারপর যা বলল, শুনে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। 'তুমিই আমার ঈশ্বর, রানা। আমি জানি তোমার দ্বারা আমার ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ হবে।'

আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছে বৃদ্ধ তামবারু। ব্রেক করে গাড়ি থামাল রানা, পাশে এসে থামল ঘোড়সওয়ার।

'ওদের পেয়েছি,' বলল সে। 'আমাকে অনুসরণ করো। সাবধান!'

দূরে সরু একটা পাথরের শিরদাঁড়া মত দেখা গেল, বাঁধের মত, মরুভূমিতে গিয়ে মিশেছে। সেটার কাছাকাছি পৌঁছে ওদেরকে পথ দেখিয়ে একটা সরু নালার ভেতর নিয়ে এল তামবারু। তার ইঙ্গিতে এঞ্জিন বন্ধ করল রানা।

ঘোড়া থেকে নেমে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল তামবারু। শীলাকে পাশে নিয়ে পিছু নিল রানা। ঢালটা বেশ খাড়া, ওঠা খুব কষ্টকর, মাথার কাছে পৌঁছুনোর আগেই কাঁধে চাপ দিয়ে ওদেরকে বসিয়ে দিল তামবারু। 'খুব সাবধান।'

মরা একটা পাইন গাছের আড়ালে থাকল রানা, উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল ঢালের মাথায় কি আছে। কয়েকশো গজ দূরে আরেকটা ঢাল, চল্লিশ ফুটের মত উঠে গিয়ে পাহাড়ের দিকে আবার দেবে গেছে।

তামবারু বলল, 'ইঁটের দেয়াল আর কুয়োটা অপরদিকে, একটা ছোট খাদের ভেতর।'

'কি করে বুঝব ওখানে আছে ওরা?'

'অপরদিকে প্রথমে একটা নালা পড়বে, কাঁটাঝোপের ভেতর একজন পাহারায় আছে। সরাসরি হামলা করা নেহাত বোকামি হবে।'

শীলা বলল, 'প্রথমেই হামলার কথা না ভাবলে হয় না? আলাপ করে দেখা যায় না টেরেসার বদলে কি চায় কার্টিজ?'

এক সেকেন্ড পর উত্তর দিল তামবারু, 'ওদের দিকে হেঁটে যেতে পারি আমি। চিৎকার করে পাহারাদারকে বলতে পারি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো, আমি তামবারু, তোমাদের সাথে আপোস করতে চাই।'

'কি ঘটবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কার্টিজ আমাকে খুন করবে, নয়তো আপোস করবে।'

দ্রুত মাথা নাড়ল শীলা। 'এ-ধরনের ঝুঁকি নেয়া যায় না।'

'তাছাড়া, যদি আপোসে সে রাজিও হয়, এমন কিছু চাইতে পারে যা

আমরা তাকে দিতে পারব না।'

'যেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হোমায়রার জীবন!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল তামবারু। 'সবাই এসে পৌঁছুক, তারপর দেখা যাক কার কি মত।'

রানার পাশে শীলা, শেভ্রোলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই দেখতে পেল ওরা আসছে। আশপাশে একঘেয়েমি দূর করার মত কোন দৃশ্য চোখে পড়ল না। তিন হাত দূরে সবুজ একটা গিরগিটি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল, লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল জোড়া পাথরের মাঝখানে। ঢাল বেয়ে উঠে আসছে দলটা।

একটা বোল্ডারের সামনে দাঁড়াল ডন হোমায়রা; ছড়ির ওপর ভর দিয়ে। বাকি সবাই রানা আর তামবারুকে ঘিরে অর্ধবৃত্ত রচনা করল। সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল তামবারু।

'তারমানে বিস্ময়ের ধাক্কা দেব তার কোন উপায় নেই,' সব শোনার পর মন্তব্য করল রেমারিক।

তামবারু বলল, 'প্ল্যানটা হওয়া উচিত, ওরা আমাদের কাছে আসবে। এটাই একমাত্র...'

'তা কি করে সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল ডন হোমায়রা।

'আসুন, আমি দেখাচ্ছি।'

তামবারুকে অনুসরণ করে মরুভূমির দিকে নেমে এল ওরা। পাথুরে শিরদাঁড়ার মাঝখানটাকে ভেদ করে এগিয়ে গেছে একটা শুকনো নালা। বেশি হলে শিরদাঁড়াটা আর একশো গজের মত এগিয়েছে।

'আমাদের ঘোড়া নিয়ে দু'জনকে মরুভূমি ধরে এগোতে হবে, যতক্ষণ না তারা কার্টিজের চোখে পড়ে।'

'কার্টিজ ওদের ধাওয়া করবে?' প্রশ্ন করল রেমারিক।

মাথা ঝাঁকিয়ে বৃদ্ধ বলল, 'দলের আর সবাই রিজ-এর পিছনে লুকিয়ে থাকব। কার্টিজ যখন আমাদের দু'জন ঘোড়সওয়ারকে ধাওয়া করবে...বাকিটা পানির মত সহজ।'

'দু'জন ঘোড়সওয়ার কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একজন লোক সন্দেহজনক, কিন্তু দু'জনকে দেখলে ওরা ভাবতে পারে ওদের মত আমরাও ভাগ হয়ে গেছি।'

'কিন্তু আমার মেয়ে?' ডন হোমায়রা গম্ভীর।

'প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় একজন পাহারাদারের কাছে তাকে রেখে যাবে কার্টিজ। সবাই যখন তার দলের ওপর এখানে চড়াও হবে, আমি পায়ে হেঁটে পিছন দিক থেকে ওদের আস্তানায় হানা দেব।'

মাটিতে ছড়ি ঠুকে সন্তোষ প্রকাশ করল ডন হোমায়রা। 'চমৎকার প্ল্যান।'

'শুধু ঠিক করা বাকি থাকল টোপ হিসেবে কাদের পাঠানো হবে,' মন্তব্য

করল ভিকো। 'কাজটা মোটেও লোভনীয় বা ঈর্ষাযোগ্য নয়।'

রানা বলল, 'টোপটা বেশ মোটাতাজা দেখাবে আমি যদি টপ গুটিয়ে শেভ্রোলে চালাই, যেন দুনিয়ার কাউকেই আমি পরোয়া করি না।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর তামবারু বলল, 'আমি একমত, কিন্তু তারপরও আপনার সাথে একজনকে থাকতে হবে। কাউকে একা দেখলে টোপ বলে সন্দেহ করবে কার্টিজ।'

'ও একা নয়,' বলল শীলা।

প্রতিবাদ জানাল রেমারিক, 'কেউ যদি যায় তো আমি।'

'ভুল করছ, রেমারিক,' বলল শীলা। 'আমাদেরকে আগেও যদি দেখে থাকে ওরা…'

'আমি জানি দেখেছে,' বলল তামবারু।

'তাহলে এখনও রানার সাথে আমাকে দেখলে সেটাকে স্বাভাবিক বলে ভাববে ওরা।'

তামবারু বলল, 'কথাটায় যুক্তি আছে। তাহলে তাই ঠিক হলো। পনেরো মিনিট সময় দাও আমাকে, তারপর রওনা হয়ে যাও তোমরা।'

ঘুরল সে, এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমির ওপর দিয়ে ছুটে বোল্ডারগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দ্রুত। ওরা সবাই প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

থম্পসনটা চেক করল রানা। কোল্টের ক্লিপ খুলে চেক করল। সাবমেশিনগানটা রাখল পায়ের কাছে গাড়ির মেঝেতে, শীলার রাইফেলের পাশে। ঝুঁকে ওর কপালে চুমো খেল শীলা। 'ফর লাক।'

কোল্টটা শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল রানা। টপ সরাবার পর চুমো খেল শীলাকে। 'ফর সাকসেস।' স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ও।

একটা বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে রয়েছে রেমারিক, তার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা। ডন হোমায়রা আর ভিকো তার ঠিক উল্টোদিকের একটা বোল্ডারের পিছনে রয়েছে।

মরুভূমির দূর প্রান্ত নেমে আসা আকাশের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। শিরদাঁড়ার শেষ মাথা ঘুরে চওড়া প্রান্তরে বেরিয়ে এল শেভ্রোলে, বিধ্বস্ত র‍্যাঞ্চ আর ওদের মাঝখানে উঁচু একটা ঢাল মাথাচাড়া দিয়ে আছে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সেদিকে একবার তাকাল রানা, কিন্তু নিস্তব্ধতায় চিড় ধরাবার মত কোন শব্দ শোনা গেল না।

'আমার কিন্তু ভয় করছে,' বিড়বিড় করে বলল শীলা। 'যদি এমন হয় রেমারিকরা ওদেরকে থামাতে পারল না?'

'আমার করছে না, একজন আউটল-রও করত না। একজন অপরাধী আর একজন স্পাই, দু'জনের পেশাগত বৈশিষ্ট্য প্রায় একইরকম। পার্থক্য শুধু স্পাই, ঝুঁকিটা নেয় দশজনের স্বার্থে।'

'তুমি বলতে চাইছ তোমাকে ভালবেসে আমি রোমান্টিকতা থেকে বঞ্চিত হইনি?'

ঠিক তখুনি ঘোড়ার ডাক শুনল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতেই ঘোড়ার পিঠে ছয়জন অ্যাপাচীকে দেখতে পেল শীলা। পাহাড়ের মাথা থেকে তীরবেগে নেমে আসছে ওদের দিকে, হঠাৎ তাদের রণহুঙ্কারে কেঁপে উঠল স্থির বাতাস।

ব্রেক করল রানা, নিমেষে একটা ধুলোর মেঘ তৈরি হলো, মেঘটা গ্রাস করল শেভ্রোলেকে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ও। ফিরতি পথে ছুটল ফুলস্পীডে, নাক বরাবর অ্যাপাচীগুলোর দিকে।

অ্যাপাচীদের ঘোড়াগুলোর পায়ের নিচে শুকনো ধুলো যেন টগবগ করে ফুটছে, হঠাৎ তারা দেখল তাদের শিকার ঘন ধুলোর ভেতর অদৃশ্য হয়েছে। পরমহূর্তে ঘাবড়ে দিয়ে, ধুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গাড়িটা, ছুটে আসছে ওদেরই দিকে। সন্ত্রস্ত ঘোড়ার লাগাম টানল তারা, কিন্তু গাড়িটার থামার কোন লক্ষণ নেই। অগত্যা বাধ্য হয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল তারা, কিন্তু সামনে দেখতে পেল ভিকো, রেমারিক আর ডন হোমায়রাকে, সরাসরি তাদের দিকে একের পর এক গুলি করে যাচ্ছে।

রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল রানা। এদিক থেকে প্রথম গুলিটা শীলা করল। একজন অ্যাপাচীকে জিন থেকে ফেলে দিল সে, আরোহীকে হারিয়ে ঘোড়াটা একই জায়গায় ঘুরতে লাগল। সামান্য দূরত্ব, থম্পসন ব্যবহার করতে ভয় পেল রানা। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করল শেভ্রোলেটাকে। আবার ছেড়ে দিয়ে স্পীড তুলল ও, সরাসরি অ্যাপাচীদের দিকে চালাল। একজন অ্যাপাচী ঘোড়া নিয়ে ঘুরল, গাড়িটাকে ছুটে আসতে দেখে পথ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল সে। পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হলো তার ঘোড়া, জিন থেকে খসে পড়ছে সে, পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল ভিকোর বুলেট।

মাত্র পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে সব শেষ। রানাদের কেউ আহত হয়নি। ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে লাশগুলো পরীক্ষা করল ডন হোমায়রা। তাদের মধ্যে কার্টিজ নেই।

তেরো

কুয়ার চারপাশে কোথাও টেরেসাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। রাগে ফুলে উঠল ডন হোমায়রা। সন্দেহ নেই তামবারু কোথাও ভুল করেছে। বোকার মত আরেক দলের পিছু নিয়েছিল ওরা।

রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে শীলা আর রানা উঠে এল ঢালের মাথায়, খাদের ভেতর নেমে কুয়ার পাশে দাঁড়াল ওরা। আগুন জ্বেলে কফির জন্যে পানি গরম করছে তামবারু, মুখ তুলে তাকাল। তাকে পাশ কাটিয়ে ভেঙে পড়া ইঁটের পাঁচিলগুলোর দিকে এগোল রানা।

চারদিক আশ্চর্য শান্ত, কোথাও কোন শব্দ নেই, অসহ্য গরমে জ্বালা করছে শরীর। হঠাৎ খানিকটা লু হাওয়া এলোমেলো করে দিল রানার চুল, শিউরে মত উঠল ও। মেয়েটা কি মারা গেছে? এত পরিশ্রম সবই কি বৃথা গেল? মুহূর্তের জন্যে নিজের ছেলেবেলা ভেসে উঠল চোখের সামনে, রঙিন স্বপ্নে বিভোর নিরীহ সরল আনন্দমুখর একটা অস্তিত্ব। শিশুদের ফেরেশতা বলা হয় এই জন্যে, যে তারা পবিত্র। কার্টিজ যত বড় পাষণ্ডই হোক, সে-ও তো সন্তানদের পিতা ও ভুক্তভোগী, অসহায় টেরেসার কোন দোষ নেই, এ-কথা জানার পরও কি তাকে খুন করবে সে?

ওর দিকে হেঁটে এল শীলা, কর্ডোভান হ্যাটটা গলার সাথে ঝুলছে। পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানাকে, ব্যথার ওপর কোমল প্রলেপ। তার বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল, 'ভাঙা ঘরের মত দুঃখজনক আর বোধহয় কিছু নেই।'

'আশা আর স্বপ্ন,' বলল রানা, 'সব শেষ।'

ঘুরে মরুভূমির দিকে তাকাল রানা, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। দু'জনেই কি যেন বলতে চায়, কিন্তু কেউ কোন শব্দ করল না। নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'চলো, কফি খাই।'

ফিরে এসে দেখল আগুনটাকে ঘিরে বসেছে সবাই। কি নিয়ে যেন রেমারিকের সাথে তর্ক হচ্ছে ডন হোমায়রার।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সব দোষ নাকি তামবারুর!' মুখ হাঁড়ি করে বলল রেমারিক। 'এর কোন মানে হয়!'

'কথা ছিল তামবারু আমাদেরকে কার্টিজের কাছে নিয়ে যাবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ডন হোমায়রা। 'তা কি সে নিয়ে যেতে পেরেছে?'

একটা কাপে কফি ঢেলে শীলার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা, তাকাল তামবারুর দিকে।

ক্ষীণ একটু হাসল বৃদ্ধ। 'আমরা কার্টিজের ঘোড়াকেই অনুসরণ করেছি, কিন্তু পিঠে অন্য লোক ছিল। এর অর্থ হলো, কার্টিজ খেলছে। সে জানে, আমি তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছি। জানে, শেষ পর্যন্ত তার সাথে আমার দেখা হবেই। সে চাইছে তার শর্ত অনুসারে তার নির্বাচিত জায়গায় দেখাটা হোক। অথচ মাঝখান থেকে আমার ছ'জন ভাই মারা গেল।'

মৃদুকণ্ঠে শীলাকে বলল রানা, 'আমাদের দল, ওদের দল—এভাবে চিন্তা করি আমরা। একটু আগেও ভাবছিলাম, আমরা জিতেছি। কিন্তু কোন অ্যাপাচী মারা গেলে তামবারুর জন্যে ব্যাপারটা উল্টো।'

রানার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল শীলা। কিন্তু ডন হোমায়রা এসব কথা শুনতে একদম রাজি নয়। ঝট্ করে দাঁড়াল সে, রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে তামবারুর দিকে, গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার মেয়ে কোথায় তুমি জানো!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অভিযোগটা ঝেড়ে ফেলল তামবারু। 'কার্টিজ সম্ভবত মরু পেরিয়ে শয়তানের শিরদাঁড়ায় চলে যাবে। আমাদের নাম দেয়া একটা পাহাড়। ওটার চূড়ার কাছে প্রাচীন এক শহরের ধ্বংসাবশেষ আছে। উত্তরের বরফ ঢাকা দেশ থেকে আমার পূর্বপুরুষরা এই মহাদেশে আসার আগেও লোকজন বাস করত ওখানে। আগেকার দিনে অ্যাপাচীদের একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল ওটা।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল ভিকো। 'জায়গাটার কথা আমিও শুনেছি। পুয়েবলো বা অ্যাজটেক। তারা ওটার নাম দিয়েছিল মৃত্যুপুরী।'

'কিন্তু ওখানে পৌঁছুতে হলে পর্বতশ্রেণীর পুরানো প্যাক ট্রেইলে থাকতে হবে কার্টিজকে।' বলল তামবারু। 'মরুভূমির আগে আগুয়া ভাদ্রের কুয়া পানির একমাত্র উৎস। আজ রাতে যদি ট্রেইলে তাঁবু ফেলে সে, ওখানে পৌঁছুবে কাল দুপুরে।'

'সেক্ষেত্রে এখানে আমরা বসে আছি কি করতে?' ধমক দিল ডন হোমায়রা।

নিজের কাপে আরও কফি ঢালল রেমারিক। 'এখন তাকে ধরতে দু'দিন লাগবে আমাদের।'

'আমরা যদি পাহাড় টপকাই,' ওদের সামনে আকাশ ছুঁয়ে থাকা পাহাড় চূড়ার দিকে ইঙ্গিত করল তামবারু, 'তাহলে অত সময় লাগবে না। ওপারেই আগুয়া ভাদ্রে। সম্ভবত বিশ মাইলের মত।'

চোখ কুঁচকে তামবারুর দিকে তাকাল রানা। 'সম্ভব?'

'যুবা বয়সে একবার পেরিয়েছিলাম, অশ্বারোহী সৈনিকদের তাড়া খেয়ে।'

'সে তো অনেক যুগ আগের কথা। সময় গড়িয়েছে। ট্রেইল?'

আবার পাহাড় চূড়ার দিকে তাকাল তামবারু। 'চূড়ার কাছে একটা জায়গা আছে, রাতটা আমরা ওখানে কাটাতে পারি। না, ট্রেইল বদলায় না। সম্ভাবনা আছে কার্টিজের আগেই আমরা আগুয়া ভাদ্রেতে পৌঁছে যাব।'

ভিকোর দিকে ফিরল রানা। 'তুমি কি বলো?'

সায় দিল ভিকো। 'আগুয়া ভাদ্রের কুয়াটা গির্জার ভেতর। ওখানে পৌঁছে প্রথমেই কার্টিজের দল পানি খেতে চাইবে।'

ডন হোমায়রা প্ল্যান করল, 'কার্টিজকে আমরা বলব, পানি সে পেতে পারে, বিনিময়ে টেরেসাকে ফেরত দিতে হবে।'

'গেলে এখুনি রওনা হওয়া দরকার,' তাগাদা দিল তামবারু। 'সূর্য ডুবতে আর চার ঘণ্টা।'

অপ্রতিভ হেসে রানা অনেকটা আপনমনেই বলল, 'বুঝতে পারছি শেভ্রোলেটাকে রেখে যেতে হবে।'

'এদিকে দেখুন,' বলে একটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে বালির ওপর আঁক কাটল তামবারু। 'কার্টিজ পশ্চিম দিক থেকে আসছে। আমরা সরাসরি যাচ্ছি, সোজা তার পথের ওপর পৌঁছুব, ভাগ্য যদি সহায়তা করে। গাড়িটা যাবে মরুভূমি ধরে উত্তর দিকে, পাহাড়ের গোড়া ঘুরে, দীর্ঘ ঘুর পথে। কম করেও একশো মাইল,

তবে ঠাণ্ডা রাতে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'গাড়িটা কি বাতাসের চেয়ে দ্রুত ছোটে না?'

'কিন্তু যদি খাঁ খাঁ মরুভূমিতে ওটা বিগড়ে যায়?' জিজ্ঞেস করল শীলা। 'রোদে ওখানে একজন লোকের খুলি ফাটিয়ে দিতে পারে।'

'পাহাড় টপকাতে গিয়ে ঘোড়ার পা ভাঙে না? আমি যেভাবে বলছি, তাতে করে কার্টিজের আগে আগুয়া ভাদ্রেতে পৌঁছুনোর দুটো সুযোগ পাব আমরা।' রানার দিকে তাকাল তামবারু।

'তাহলে তাই হোক,' বলল রানা। 'আমি আর শীলা গাড়িতে যাচ্ছি, আমাদের সাথে আর কেউ?'

'দয়া করে আমাকে যদি সাথে নেন, সিনর,' বলল ভিকো। 'আপনি এলাকটা চেনেন না, আমি চিনি।'

'শীলা? তুমি কিছু বলছ না যে? ভিকোর ঘোড়া নিয়ে তুমি কি ওদের সাথে থাকতে চাও?'

কাকার দিকে একবার তাকাল শীলা। ছোট্ট করে জবাব দিল, 'না।'

'ঠিক আছে, তাহলে চলো রওনা দিই।'

টপ তুলে শেভ্রোলের ভেতর ছায়ার ব্যবস্থা করা হলো। খুব সাবধানে পিছনের সীটে উঠে বসল ভিকো, উত্তেজনায় হাতের আঙুল মটকাচ্ছে। গলা বের করে রেমারিককে বলল, 'আমার ঘোড়াটাকে সাথে রেখো।' শীলা আর রানা সামনের সীটে আগেই বসেছে।

স্টার্ট দিয়ে রেমারিকের উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা, 'আগুয়া ভাদ্রেতে আবার দেখা হচ্ছে।' বিশাল মরুর দিকে ছুটল গাড়ি।

শান্ত, নির্লিপ্ত চেহারা; ওদেরকে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল তামবারু। প্রায় এক ঘণ্টা পর একটা রিজ পেরোল ওরা, সামনে নরম শ্লেট পাথর আর মাটি মেশানো সরু কার্নিস। সবার পেছনে রয়েছে ডন হোমায়রা, পৌঁছেই জিজ্ঞেস করল, 'থামা হলো কেন?'

সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে পায়ে হেঁটে এগোল তামবারু, কার্নিস ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। খানিক পর ফিরে এসে বলল, 'যে-যার ঘোড়ার চোখ বেঁধে নাও। চাদর বা কম্বল ছেঁড়ো।'

কার্নিস ধরে এগোবার সময় সামনে থাকল তামবারু, মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁক রেখে ওরা তার পিছনে। কার্নিসটা যখন বাঁক নিতে যাচ্ছে, রেমারিকের দম বন্ধ হয়ে এল। ট্রেইল এখানে চার কি সাড়ে চার ফুট চওড়া। ডান দিকে কিছু নেই, শুধু বাতাস আর বহু নিচে উপত্যকার পাথুরে মেঝে। উল্টোদিকে পাহাড়ের খাড়া গা।

পাহাড়ের গা বেঁকে গেছে, তার সাথে ক্রমশ খাড়া হতে থাকা কার্নিসটাও। তামবারুর পেছনে রয়েছে রেমারিক, যতটা সম্ভব পাঁচিল ঘেঁষে থাকার চেষ্টা করছে সে।

চোখ ভরা আতঙ্ক আর অবিশ্বাস নিয়ে রেমারিক দেখল সামনের কার্নিস আরও সরু হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া দাঁড়াবার পর, একটা পাহাড়ী ছাগলও পাশ কাটাতে পারবে কিনা সন্দেহ। চোখ বাঁধা না থাকলে সন্দেহ নেই ভয়েই কিনারা থেকে লাফ দিয়ে পড়ত ঘোড়াগুলো। কিন্তু চোখ বাঁধা থাকায় কার্নিসের বাইরে পা পড়তে বাধা কোথায়? কিন্তু না, ঘোড়াগুলো একটা পা-ও ভুলে কোথাও ফেলল না। এক সময় চোখ বুজল রেমারিক। নিজের অবধারিত মৃত্যুর দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকার মানসিক শক্তি নেই তার। তারপর চোখ মেলে দেখল ছোট একটা মালভূমিতে বেরিয়ে এসেছে ওরা। সামনে একটা ঢাল, তেমন খাড়া নয়, মাঝখানে ঘোড়া থামিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে তামবারু, তার চারপাশে পাইন গাছের ছড়াছড়ি।

ঢালের মাথাতেও প্রচুর পাইন দেখা গেল। সবশেষে পৌঁছুল ডন হোমায়রা। মুখের ঘাম মুছে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'মরণকালেও মনে থাকবে,' বলে তামবারুর দিকে ফিরল। 'এখানে বিশ্রাম নিতে পারা যায়?'

মাথা নেড়ে বৃদ্ধ বলল, 'সামনে সহজ পথ, ঘোড়া ছোটাতে পারব। চূড়া পেরোবার পর খানিকটা জঙ্গল পাব, রাত কাটানোর ভাল জায়গা আছে।' তার পিছু পিছু আবার রওনা হলো ওরা।

মরুভূমির রঙ লালচে-বেগুনি, কোথাও কোথাও গাঢ় খয়েরি, ক্রমশ রঙ বদলে কালো হয়ে গেছে কিনারাগুলোয়। সন্ধ্যার শেষ আলো চূড়াগুলোয় গোলাপী আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

এত ওপরে পরিবেশ ঠাণ্ডা, পাইনের গন্ধ ভরা বাতাস নাক দিয়ে ঢুকে সারা শরীরে প্রশান্তি ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু এরই মধ্যে চড়াই ঠেলে ওঠা কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব বলে মনে হতে লাগল।

শেষ রিজটা মাথাচাড়া দিয়ে গাঢ় খিলান আকৃতির আকাশের সাথে মিশেছে, আকৃতিটার এক প্রান্তে জ্বলজ্বল করছে নিঃসঙ্গ একটা তারা। রিজ-এর মাথায় উঠে এল ওরা, খানিকটা নিচে পাইন বনের ভেতর সামান্য ফাঁকা জায়গা। হাত তুলল তামবারু, ঘোড়া থেকে নামল ওরা।

ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে রেমারিক। অনেকদিন হলো এত কঠিন পরিশ্রম করেনি সে। কাঁধে ব্যাগ ফেলে পা বাড়াল সে। ক্লান্তি নেই তামবারুর, এক জায়গায় বসে তিনটে বোল্ডারের মাঝখানে আগুন জ্বালছে।

আগুনের চারপাশে বসল ওরা। কারও মুখে কথা নেই। ডন হোমায়রাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হলো সে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে লাল শিখার দিকে।

মরুভূমি ধরে প্রথম কয়েক মাইল খুব সহজেই পেরিয়ে এল রানা। সমতল পাথুরে প্রান্তর, কোথাও কোথাও বালির বিস্তৃতি, এক পর্যায়ে ঘণ্টায় ষাট মাইল পর্যন্ত স্পীড তুলল রানা। শিশুসুলভ বাঁধনহারা হাসিতে মুখর হয়ে উঠল ভিকো,

পিছনের সীট থেকে বারবার টোকা দিল কাঁধে। 'সিনর রড, এ তো দেখছি ঘোড়ায় চড়ার চেয়েও মজার ব্যাপার!'

স্পীড কমাতে হলো সমতল খয়েরি প্রান্তরে পৌঁছে, পাথরের মেঝে এখানে ভাঙাচোরা, খানিক পরপর ছোট বড় ফাটল। এক সময় মেঝের ওপর থাকা সম্ভব হলো না, বড় একটা ফাটলের ঢাল বেয়ে নেমে এল গাড়ি।

গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাল রানা। এগুলো আসলে বহুকাল আগে শুকিয়ে যাওয়া নালা, একটার সাথে আরেকটা মিশে আছে। নালাগুলোর ভেতর স্পীড তোলা গেল না। প্রায়ই বাঁক নেয়ার পর দেখা গেল সামনে খাড়া দেয়াল, এগোবার পথ নেই, কাজেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে আসতে হলো আগের নালায়, এগোবার পথ পাবার জন্যে আরেকটায় ঢুকতে হলো। এদিকে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে দিনের আলো।

তবে সন্ধ্যার খানিক আগেই সাদা ধুলোয় ঢাকা প্রান্তরে উঠে এল শেভ্রোলে।

মিহি ধুলো, বাতাসে গতি না থাকায় ঝুলে আছে কুয়াশার মত। এক ঝাঁক ক্যাকটাসের পাশে গাড়ি থামাল রানা, শুকনো কিছু ডালপালা এক জায়গায় জড়ো করে আগুন জ্বালল ভিকো, শীলা কফি খেতে চেয়েছে। শেভ্রোলের ট্যাঙ্কে গ্যাস ভরল রানা, সারাক্ষণ ওর গা ঘেঁষে থাকল শীলা। রেডিয়েটর পরীক্ষা করে গুঙিয়ে উঠল রানা। 'এটাও দেখছি মরুভূমির স্বভাব পেয়েছে।' পানির ক্যান বের করল ও। 'ভেবেছিলাম ক্যান্টিন খালি হয়ে গেলে এই পানিটুকু খাওয়া যাবে।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্যানের সবটুকু পানি রেডিয়েটরে ঢেলে দিল।

গাড়ির বনেটের ওপর বসল ওরা, রানার দু'পাশে ভিকো আর শীলা, হাতে কফির কাপ। চারদিক ছাপিয়ে সন্ধ্যা নামছে। 'এখানে কি করছি আমরা?' ভিকো জিজ্ঞেস করল।

'গাড়িটাকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি।'

'ঘোড়ার মত এটারও তাহলে...' হেসে উঠল ভিকো।

শেভ্রোলের গায়ে মৃদু চাপড় দিল রানা। 'বন্ধু যদি হতাশ করে, কাল আমাদের জীবনে সূর্য উঠবে কিনা আমি জানি না।'

'মৃত্যু, সিনর রড, সে-ও তো কারও কারও কাছে পরম বন্ধুর মত। সবার জীবনেই আসে, কিন্তু খুব কম লোকই খুশি মনে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। আমার কাছে কিন্তু মৃত্যুকে অন্ধকার বলে মনে হয় না। দুটো জগতের মাঝখানে একটা দরজা আছে, সেটারই নাম মৃত্যু।'

'মনে হচ্ছে দ্বিতীয় জগৎটা সম্পর্কে তোমার খুব আগ্রহ,' হেসে উঠে বলল রানা।

'আমার বয়স কম হলেও বর্তমান জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মে গেছে, বুঝলেন। আরেক জগতে গিয়ে দেখতে পারলে হত সেখানে কি রাখা আছে আমার জন্যে। তারমানে এই নয় যে কাপুরুষের মত পালাতে চাইছি। যদি

যাই, অন্তত দু'একজন মনে রাখবে এমন একটা কিছু করে যেতে চাই। আর একটা কথা, আমি ঋণী থাকতে পছন্দ করি না, মি. মাসুদ রানা।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রানা। শান্তভাবে বলল, 'শীলা জানে, কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে?'

'ট্রেনে আপনাকে আমি চিনতে পারি,' মৃদু হেসে বলল ভিকো। 'দক্ষিণে যে শহর থেকে এসেছি, ওখানে আপনার ফটো নিয়ে এক লোক এসেছিল, শুধু বিদেশী ট্যুরিস্টদের দেখাচ্ছিল ফটোটা, কিন্তু আমার চোখে পড়ে যায়। ফটোয় অবশ্য আপনার এই গোঁফ ছিল না। দেখেই চিনতে পারিনি, চিনলাম যখন আপনি একা আমার সাথে কথা বললেন—সুযোগ দিলেন পালানোর।'

'কাউকে বলেছ?'

'আপনার প্রতি আমি ঋণী, সিনর। তাছাড়া, ধারণা করি আমাদের পেশাও এক।'

রানার হাতে মৃদু চাপ দিল শীলা। ওকে ডাকাত বা ওই ধরনের কিছু ভেবে ভিকো যদি তৃপ্তিবোধ করে তো ক্ষতি কি, ভাবল রানা।

গাছের শুকনো পাতা জড়ো করে বড় একটা বিছানা তৈরি করল ভিকো, লম্বা হয়ে চোখ বুজল। খানিক পর পাশ ফিরল সে, রানার পাশে শীলার শোয়ার জন্যে জায়গা করে দিল। রাত বেশ গাঢ় হয়েছে। পাখি, পোকামাকড়, বা বাতাস কোন শব্দ করছে না। খানিক পর বসল রানা, উঠতে যাবে, ওর হাত চেপে ধরল ভিকো।

'কোথায় যাচ্ছেন, সিনর?'

'পাহারায় একজনের থাকা দরকার।'

'আমি থাকছি,' বলে বিছানা ছেড়ে উঠে গেল ভিকো। হেঁটে আড়ালে চলে গেল সে।

মাঝরাতের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রানার, ওর কাঁধে কার যেন হাত পড়েছে। এক নিমেষে সম্পূর্ণ সজাগ হলো, লাফ দিতে যাবে, হাতটা আগেই পৌঁছে গেছে রিভলভারের দিকে। এমন সময় চিনতে পারল হাতটা।

'ঘুমের মধ্যেও তুমি খুব অস্থির থাকো,' ফিসফিস করে বলল শীলা। 'শুধু বলতে চেয়েছিলাম, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

চিৎ হলো রানা। অপ্রত্যাশিত তারার মেলা বসেছে আকাশ জুড়ে, প্রতিটি নক্ষত্র এত কাছে বলে মনে হলো, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

খুব ভোরে রওনা হলো ওরা। রওনা হবার আগে শুকনো বিস্কিট আর ফলের সাথে কফি খেয়েছে। খুব বেশি বেলা হয়নি, রোদ অসহ্য লাগায় টপ দিয়ে মাথা ঢেকেছে ওরা। পিছনের সীটে বসে একটা ল্যাসোর রশি নাড়াচাড়া করছে ভিকো। তার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে, ভোরের দিকে রানাকে

ল্যাসো সংক্রান্ত কয়েকটা কৌশল শিখিয়েছে সে।

বিনা নোটিশে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ হলো। হঠাৎ যেন উন্মাদ হয়ে উঠল শেভ্রোলে, বাগ মানাতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা। সামনের একটা চাকা, বাঁ দিকেরটা, ফেটে গেছে।

নিস্তব্ধতার মধ্যে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল ওরা। তারপর রানা জিজ্ঞেস করল, 'কারও কোথাও লেগেছে?'

'মনে হলো এইমাত্র হৃৎপিণ্ডটা উগরে দিলাম,' বলল ভিকো। 'এ-ধরনের কথার খুব চল আছে এদিকে—না, লাগেনি।'

'আমার লেগেছে কারণ তোমার লেগেছে,' বলল শীলা।

'আমি ঠিক আছি, কোথাও লাগেনি,' প্রতিবাদ করল রানা।

'আমি বলতে চেয়েছি মনে।'

'চলো তাহলে দেখা যাক বন্ধু ডোবাল কিনা।'

টায়ারটা বার্স্ট করেছে। কিন্তু আসল সমস্যা পিছনের অ্যাকসেল একটা বড় পাথরের ভেতর দেবে গেছে।

'জেসাস!' কপালে হাত চাপড়াল ভিকো। 'আমাদের ঘোড়া পটল তুলেছে।'

'এখুনি বলা যাচ্ছে না,' বলল রানা, মাটিতে কনুই আর হাঁটু গেড়ে গাড়ির তলাটা দেখছে ও। মুখ তুলল, বলল, 'জ্যাক দিয়ে উঁচু করতে হবে, তারপর ধাক্কা দিলে গড়িয়ে বেরিয়ে আসবে পাথর ছেড়ে।'

এত সহজ একটা সমাধান আছে জেনে পরম স্বস্তিতে হেসে উঠল শীলা। 'বুঝলে, রানা, আমিও তোমার গাড়িটার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি।'

মুচকি একটু হাসল শুধু রানা, কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল। জ্যাকটা বের করে অ্যাকসেলের এক ধারে, যেদিকটা মুক্ত, কায়দা করে লাগাল। পাম্প করতে শুরু করল ভিকো। ধীরে ধীরে উঁচু হলো শেভ্রোলে।

'হয়েছে,' বলল রানা। 'এসো।'

তিনজনের সবটুকু শক্তি লাগল। প্রথমে মনে হলো পণ্ডশ্রম হচ্ছে, প্ল্যানটা কোন কাজে আসবে না। কিন্তু তারপরই সামনের দিকে কাত হলো জ্যাক, গড়িয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি।

সাথে স্পেয়ার আছে, টায়ার বদল করতে কয়েক মিনিট লাগল। 'ওঠো সবাই,' তাগাদা দিল রানা। 'দেরি হয়ে যাবে।'

রানা গাড়ি ছাড়ার পর পেছন থেকে ভিকো বলল, 'একটা কথা, সিনর। ডন হোমায়রাকে অনেকদিন হলো চিনি আমি। এই অভিযান সফল হলেও, আমাদের তাতে যতই কিনা অবদান থাকুক, অবশ্যই সে আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানোর জন্যে পুলিসের হাতে তুলে দেবে। একবার তো বাঁচিয়েছেন, এবার আপনার ভূমিকা কি হবে?'

'তার আগে বলো, ডন হোমায়রা আমাকে নিয়ে কি করবে।'

'আমার কথা যদি শোনেন, তার দিকে ভুলেও পেছন ফিরবেন না।'

খানিক পর রানা বলল, 'সুযোগ তো অনেক পেয়েছ, তুমি কেটে পড়োনি কেন?'

'একটা বাচ্চাকে নিয়ে সমস্যা, সিনর। কারণ আমি একটা পুরুষমানুষ। ঠিক যে-কারণে আপনি হোমায়রাকে সাহায্য করছেন, আমিও ঠিক সেই কারণেই আপনার সাথে আছি।'

'বেশ ভাল,' বলল রানা। 'কিন্তু এভাবে পালিয়ে পালিয়ে কতদিন, ভিকো? একদিন তো ধরা পড়তেই হবে, তাই না?'

'জীবনে আমার একটাই স্বপ্ন, সিনর,' বলল ভিকো। 'হোমায়রার সোনা ভর্তি ট্রাঙ্ক ট্রেন থেকে লুট করা। বছরে দু'বার ট্রেনে করে মেক্সিকো সিটির ব্যাঙ্কে সোনা পাঠায় সে...'

'মেক্সিকো সিটিতে কাকার প্রাসাদ আছে,' বলল শীলা। 'লোকমুখে শুনি চল্লিশ-পঞ্চাশটা মেয়ে আছে সেখানে।'

অবাক হলো রানা। 'প্রাসাদ, টাকা সব থাকা সত্ত্বেও লোকটা এই নরকে পড়ে থাকে কেন?'

'নেশা,' বলল শীলা। 'মেক্সিকো সিটিতে থাকলে এখানকার লোকজনের ওপর অত্যাচার চালাবে কে? আমার পিছনেই বা লাগবে কে! স্যাডিস্টিক ক্যারেক্টর, রানা। নিজে এত কষ্ট করে শুধু নিরীহ লোকগুলোর ওপর নির্যাতন চালানোর সুযোগ পাবে বলে। মেক্সিকো সিটিতে তার এই নোংরা সাধ মিটবে না। বছরে দু'বার ওখানে যায় বটে, কিন্তু ক'দিন থেকেই আবার ফিরে আসে।'

'তা ভিকো, ডন হোমায়রার সোনা লুট করলে, তারপর?'

'আমি ভাল হয়ে যাব, সিনর। জীবনে আর অপরাধ করব না। বহু দূরের কোন শহরে চলে যাব...'

'ট্রাঙ্ক ভর্তি সোনা নিয়ে কি করবে?'

'অর্ধেকটা খরচ করব তাজমহল তৈরিতে, সিনর। আমার স্ত্রীর সমাধিতে।'

খানিক পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'তা এই মহৎ কাজে দেরি করছ কেন?'

'ট্রেনে সোনা পাহারা দেয় হোমায়রার পোষা কুকুররা, সংখ্যায় তারা একশো,' বলল ভিকো। 'কাজেই আমার দলে অন্তত পঞ্চাশজন থাকা দরকার। এত লোক একসাথে জোগাড় করতে পারছি না। আবার জোগাড় যদি বা হয়, তেমন দক্ষ নয় তারা।'

'মনে হচ্ছে আমার সাহায্য তোমার কাজে লাগতে পারে।'

অবিশ্বাসে বোবা হয়ে গেল আলবার্তো ভিকো। 'সিনর!' অবশেষে বলল সে। 'আপনি...আমাকে...সত্যি?'

'কিন্তু তার আগে টেরেসাকে আমরা উদ্ধার করব।'

'একশো বার!'

'ভাল একটা কাজ পেলাম হাতে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল শীলা। 'দু'দু'জন

ক্রিমিনালকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সৎপথে আনতে হবে। ঈশ্বর, আমাকে তুমি সাহায্য করো!'

চোদ্দ

শেভ্রোলের পাশে দাঁড়িয়ে ভিকোর জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, হাতে ধরা থম্পসনটা গুলি করার জন্যে তৈরি অবস্থায়। পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো, ওপর দিকের ঝোপ ভেদ করে ঢালের গায়ে বেরিয়ে এল ভিকো, তর তর করে নেমে এল নিচে। পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শীলার।

'কেউ নেই ওখানে,' ঘোষণা করল ভিকো। 'সবার আগে পৌঁচেছি আমরা, সিনর।'

'বাহ্!' গম্ভীর হলো রানা। 'এখন যদি কার্টিজ তার দল নিয়ে এসে পড়ে? আমরা মাত্র দু'জন।'

'তিনজন,' বলল শীলা।

'তা ঠিক, কিন্তু একমাত্র কুয়াটা গির্জার ভেতর,' বলল ভিকো। 'মরুর দিকে যাবার আগে পানি কার্টিজকে নিতেই হবে। আমরা যদি গির্জার ভেতর থাকি, আর সে যদি বাইরে থাকে...' কাঁধ ঝাঁকিয়ে থেমে গেল সে।

'বেশ, বুঝলাম। গাড়িটা?'

চারদিকের পাইন ঢাকা ঢালে চোখ বোলাল ভিকো। 'গাড়িটাকে আমরা এখানে রেখে পায়ে হেঁটে যাব।'

'কিন্তু অ্যাপাচীরা যদি দেখতে পায়? ভেঙে টুকরো করবে, নয়তো আগুন ধরিয়ে দেবে। উঁহুঁ, ঝুঁকিটা নিতে পারি না। গাড়িটা আমার দরকার।'

কয়েক পা এগিয়ে গেছে শীলা, একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, ঘাড় ফিরিয়ে ডাকল রানাকে, 'এই যে, গাড়িপ্রেমিক! এসে দেখে যাও, জলদি।'

রানার পিছু পিছু বাঁক পর্যন্ত হেঁটে এল ভিকো। বিরাট আকারের পাথরের মাঝখানে গভীর অন্ধকার দেখা গেল, প্রকৃতি যেন ওদের সমস্যার কথা ভেবে তিন দিক ঢাকা একটা গুহা বানিয়ে রেখেছে। 'মুখটা দেখছ? কেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে? তোমারটার মত আরও একটা গাড়ি ভেতরে ঢুকে যাবে, অথচ বাইরে থেকে কিছুই টের পাবে না কেউ। তবে গ্যাসোলিনের গন্ধ পেয়ে যদি ধরে ফেলে, সেজন্যে আমাকে দায়ী করা যাবে না।'

ভিকো আর রানা, দু'জনেই একমত হলো, গাড়ি লুকানোর জন্যে গুহাটা আদর্শ। শীলাকে চুমো খেল রানা। 'ধন্যবাদ।'

শেভ্রোলেকে গুহার ভেতর নামিয়ে নিয়ে গেল রানা। তারপর তিনজন মিলে পাথর, পাতা, ডাল যে যা পেল সব জড়ো করল মুখের সামনে। একসময় প্রবেশ পথটা অদৃশ্য হলো।

কাজ সেরে রওনা হলো ওরা। ভিকো সামনে থাকল, রানা আর শীলা হাত ধরাধরি করে পিছনে। ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে একবার তাকাল ভিকো, বলল, 'আমরা যখন বেড়াতে বেরুতাম, আমি আর আমার স্ত্রী, ঠিক আপনাদের মত হাত ধরাধরি করে হাঁটতাম। আপনাদের কিন্তু দারুণ মানিয়েছে।'

'সামনে তাকাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'উন্মাদ একটা দলের সামনে পড়তে চাই না।'

কয়েকটা ঢাল টপকে, কাঁটাঝোপ আর পাইন বন ঘুরে, অবশেষে একটা পাথুরে পাঁচিলের কিনারায় পৌঁছুল ওরা। শুয়ে পড়ে উঁকি দিতেই গির্জাটা দেখতে পেল রানা।

চৌকো একটা পাথুরে কাঠামো, খোলা দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, ছোট একটা মালভূমির ঠিক কিনারায় শক্তভাবে মাটির ভেতর গাঁথা। মালভূমিটা সম্ভবত পঁচিশ গজ চওড়া, হালকাভাবে ছড়ানো পাইন গাছ আর ঘন কাঁটাঝোপ দিয়ে ঘেরা।

গির্জাটা গ্র্যানিট পাথরের তৈরি, মাটি থেকে বিশ ফুট ওপর ছাদটাও পাথরের সমতল টুকরো দিয়ে বানানো। ওক কাঠের অত্যন্ত ভারী দরজা, গায়ে লোহার পাত ফাঁক ফাঁক করে জড়ানো। দরজার দু'দিকে ছোট আকারের দুটো জানালা। ছাদের ঠিক নিচে, কার্নিসের তলায় এ-ধরনের আরও জানালা রয়েছে সার সার।

দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল ভিকো, পিছু পিছু ঢুকল রানা। কাঠের একটা ক্রসসহ বেদিটা ছোট, একটা চেইন থেকে ঝুলছে কালো লণ্ঠন, পিছনের দেয়াল ঘেঁষে লম্বা একটা বেঞ্চ।

শান্ত, নিস্তব্ধ, ঠাণ্ডা পরিবেশ, ওপরের জানালাগুলো দিয়ে সকালের রোদ ঢুকছে ভেতরে। মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল ভিকো, বেদির দিকে এগোল।

মেঝের মাঝখানে কুয়াটা, কিনারায় সবুজ পাথর।

ধীরে ধীরে ঘুরছে রানা, প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখছে। দরজার পিছনে বিকটদর্শন একটা বার রয়েছে, লোহার তৈরি সুইং পিন-এর ওপর। নিচের দিককার সব ক'টা জানালায় কাঠের কবাট, ভেতর থেকে বন্ধ করা যায়।

'জায়গাটা যেন হামলা ঠেকানোর উদ্দেশ্যেই বানানো হয়েছে,' মন্তব্য করল ও।

'এক সময় রাখালদের আপৎকালীন ঠাঁই হিসেবে ব্যবহার হত,' বলল ভিকো। 'আশেপাশে আর কোথাও নয়, শুধু এখানে পানি পাওয়া গেছে, একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। সেজন্যেই গির্জাটা তৈরি করা হয় এখানে, প্রায় আড়াইশো বছর আগে।'

উল্টোদিকের একটা জানালা খুলে বাইরে তাকাল রানা। চোখ জুড়ানো দৃশ্য। শেলফের একেবারে শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আছে গির্জাটা, মরুভূমির ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় শয়তানের শিরদাঁড়া পর্যন্ত। শয়তানের শিরদাঁড়া আর

গির্জার মাঝখানে উপত্যকা, প্রায় হাজার ফুট নিচে।

বাতাস এত পরিষ্কার যে রানার মনে হলো হাত বাড়ালে শয়তানের শিরদাঁড়া ছুঁতে পারবে ও। কথাটা শুনে হাসল শীলা, ভিকো বলল, 'হাতটা লম্বা হতে হবে, সিনর। কম করেও পনেরো মাইল দূরে ওটা। শোনেননি, মরুর বাতাসে জাদু আছে।'

অপেক্ষা করতে করতে ঝিমিয়ে পড়ল ওরা। গির্জার ঠাণ্ডা শান্ত পরিবেশে ঘুম চলে এল চোখে। ভিকো বেঞ্চের ওপর একা লম্বা হয়েছে, রানা আর শীলা মেঝেতে—শীলা শুয়ে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে রানা। ভিকোর নাক ডাকছে, তারপর শীলাও ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল। চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে রানা।

কতক্ষণ এভাবে কেটে গেছে কেউ বলতে পারবে না, হঠাৎ বাতাসের একটা দীর্ঘশ্বাস কানে ঢুকতে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। তারপর পায়ের আওয়াজ শুনল। প্রথম একটা, তারপর আরেকটা। থম্পসনটা কোলের ওপর থেকে তুলল ও, নিঃশব্দে দাঁড়াল। লাথি মেরে গির্জার দরজা খুলে দেখল সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তামবারু, রাইফেলটা খোলা দরজার দিকে তাক করা।

পিছনে ঘোড়া নিয়ে গির্জার ভেতর ঢুকল তামবারু আর রেমারিক। ইতোমধ্যে শীলা আর ভিকোর ঘুম ভেঙেছে। সব ক'টা ঘোড়াকে গির্জার এক কোণে একসাথে বাঁধা হলো, ডালপালা দিয়ে তৈরি ঝাঁটা হাতে গির্জা থেকে পিছু হটতে শুরু করল বৃদ্ধ অ্যাপাচী, বালি থেকে সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলল সে।

ভেতর থেকে দরজায় বার লাগিয়ে ওদের দিকে ফিরল তামবারু। 'ওরা আসার পর, ঘোড়া থেকে না নামা পর্যন্ত কেউ তোমরা নড়বে না। তোমরা ওদের দিকে অস্ত্র তাক করবে, অ্যাপাচী ভাষায় ওদের সাথে যোগাযোগ করব আমি। তারপর কার্টিজের সাথে কথা বলার জন্যে বেরিয়ে যাব, তোমরা আমাকে কাভার দেবে।'

'পাগল নাকি!' জোড়া মুঠো নেড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল ডন হোমায়রা। 'প্রথম সুযোগেই যে-ক'টাকে পারা যায় গুলি করে ফেলে দেব আমরা। তারপর কার্টিজের সাথে দর কষব।'

'টেরেসা মারা যায় যাক, বলতে চাইছেন?' রেগে উঠে জিজ্ঞেস করল তামবারু।

'আমি টেরেসাকে গুলি করব বলেছি?' ছড়ি তুলে মারমুখো হলো ডন হোমায়রা।

'গুলি করে যাদেরকে ফেলতে চাইছেন তাদের হাতেই মেয়েটা থাকবে, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না? কিংবা ওদের মধ্যে কেউ যদি বেঁচে যায়, পাহাড়ের কিনারা থেকে বাচ্চাটাকে নিচে ফেলে দিতে পারে সে।'

শীলার দিকে ফিরে ডন হোমায়রা বলল, 'নিজে অ্যাপাচী কিনা, ওদেরকে

তো বাঁচাতে চাইবেই।'

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল শীলা।

তামবারু শান্তস্বরে বলল, 'শুনুন, ডন হোমায়রা। আমি এমন একটা বাচ্চাকে উদ্ধার করতে এসেছি, যে কিনা আপনার পাপের মাসুল দিচ্ছে। স্বগোত্রের লোকদের বোকার মত খুন করতে আসিনি আমি। আমার উদ্দেশ্য অযথা রক্তপাত এড়ানো। আপনি উন্মাদ লোক, কাজেই আপনার নিষ্ঠুরতা থেকে অ্যাপাচীদের অবশ্যই রক্ষা করার চেষ্টা করব আমি। উন্মাদ হয়ে গেছে কার্টিজও, কাজেই তার নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করব টেরেসাকে। কার্টিজ কেন উন্মাদ হলো সে প্রশ্ন আপাতত আমি তুলছি না।'

একদিনেই ডন হোমায়রার বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। তার বাঁ গালের একটা শিরা থেকে থেকে লাফাচ্ছে। হাতের ছড়ি ফেলে দিয়ে রাইফেলটা ধরল সে। লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হলো রানা।

একে একে সবার দিকে তাকাল ডন হোমায়রা। ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল সে। 'হ্যাঁ, মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছি আমি। আমার এক কথায় পাঁচশো লোক চলে আসত, কিন্তু বোকার মত তাদের আমি আনিনি।'

'তারা এলে আমরা আসতাম না,' জবাব দিল তামবারু।

শীলার দিকে তাকাল ডন হোমায়রা। 'তুই কি বলিস? তোর কি ধারণা?'

শান্তসুরে শীলা বলল, 'জীবনে এই প্রথম, কাকা, আমার মতামত জানতে চাইলে তুমি। আমার মনে হয়, আমরা তিনজন একমত—তামবারুকে দায়িত্ব দেয়া উচিত, সে যা ভাল বোঝে তাই করুক।' সমর্থনের আশায় রানা আর ভিকোর দিকে তাকাল সে. নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ওরা। 'তামবারু কি বলেছে মনে নেই? সফল হলে বলা হয় প্ল্যানটা ভাল ছিল। ওর প্ল্যান যদি ব্যর্থ হয় রাইফেল তো আমাদের হাতে থাকছেই, তাই না?'

ঝোঁকটা দমন করা রীতিমত কষ্টকর হয়ে পড়ল, চমৎকার ভাষণ দেয়ার জন্যে আরেকটু হলে হাততালি দিতে যাচ্ছিল রানা। অকস্মাৎ ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ পেল ওরা।

এক মুহূর্ত পর ব্লাফ-এর বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এল ঘোড়সওয়ার ফাঁকা জায়গায়, তার প্রায় ঠিক পিছনেই কার্টিজ।

ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সে তেজোদীপ্ত বীরপুরুষের দুর্বিনীত ভঙ্গিতে, ভঙ্গিটার মধ্যে অনায়াসসাধ্য সৌষ্ঠব ফুটে আছে, লাল শার্ট আর মাথার পট্টিতে অত্যন্ত বিপজ্জনক লাগছে তাকে। তাকে দেখামাত্র হিংস্র পশুর মত দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ ছাড়ল ডন হোমায়রা, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ঝট্ করে রাইফেল তুলল।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা, কিন্তু শীলাকে ঠেলে সরিয়ে তার কাছে পৌঁছুনোর আগেই গুলি হলো।

কাঁপা হাতের গুলি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, লাগল গিয়ে পনির ঘাড়ে। ছিটকে সামনের ধুলোয় পড়ল কার্টিজ। দ্রুতগতিতে গড়ান খেল দু'বার, অসম্ভব

ক্ষিপ্রতার সাথে পায়ের ওপর দাঁড়াল, তারপর ডাইভ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের ভেতর, ডন হোমায়রার দ্বিতীয় গুলিটাও ছুঁতে পারল না তাকে।

তার সঙ্গী তখনও চেষ্টা করছে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঝোপের দিকে এগোবার, একসাথে গুলি করল ওরা তিনজন—রানা, রেমারিক আর ভিকো। জিন থেকে পড়ে গেল লোকটা, ট্রেইল ধরে এক ছুটে অদৃশ্য হলো তার ঘোড়া।

ঝোপের দিকে একের পর এক গুলি করে চলেছে ডন হোমায়রা, তার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিল ভিকো। 'বুঝতে পারছেন না আর কোন লাভ নেই?'

রক্তচক্ষু মেলে ভিকোর দিকে তাকিয়ে থাকল ডন হোমায়রা, নিষ্প্রভ চেহারা, খুনের নেশায় আচ্ছন্ন দৃষ্টি। পরমুহূর্তে আটটা রাইফেল একসাথে গর্জে উঠল ঝোপের পিছন থেকে। জানালার কবাট ভেদ করে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ঢুকল, উল্টোদিকের দেয়াল থেকে খসিয়ে দিল প্লাস্টার। ধাক্কা দিয়ে ডন হোমায়রাকে মেঝেতে ফেলে দিল রেমারিক, হামাগুড়ি দিয়ে দুটো খোলা জানালার নিচে পৌঁছুল রানা আর ভিকো। জানালার প্রতিটি কবাটে মাত্র একটা করে ছোট ফুটো, অবশ্য বন্ধ করার পরও আলোর অভাব হলো না, কারণ ওপরের জানালাগুলো খোলা রয়েছে। বাইরে দেয়ালে আরও বুলেট আঘাত করল, বিধ্বস্ত হলো একটা জানালার কবাট। তারপর আর কোন শব্দ নেই।

একটা ফুটোয় চোখ রেখে সাবধানে বাইরে তাকাল রানা। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে নিহত অ্যাপাচী আর কার্টিজের ঘোড়া এখনও পড়ে রয়েছে। কিছুই নড়ছে না।

ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে নেবে রানা, পাশের জানালা থেকে রেমারিককে বলতে শুনল, 'কি ওটা?'

গাছের একটা ডাল ঝোপ থেকে লম্বা হয়ে বেরিয়ে এসেছে, মাথায় সাদা কাপড় জড়ানো। ভিকো বলল, 'ওরা আলোচনায় আসতে চায়।'

'দেখা যাক,' বলল রানা। 'ফাঁদও হতে পারে।' তামবারুর দিকে ফিরল ও। 'আপনার কি মনে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বৃদ্ধ বলল, 'জানার একটাই উপায় আছে।'

দরজা খুলে বাইরে বেরুল সে। দু'হাতে ধরে মাথার ওপর রাইফেলটা তুলল, তারপর সেটা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। খালি হাতে এগোল ফাঁকা জায়গাটার দিকে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কার্টিজ।

এক পা সামনে বাড়ল ডন হোমায়রা, ঝট্ করে তার দিকে রাইফেল তাক করল ভিকো। 'খবরদার বলছি! আপনি এক চুল নড়বেন না!'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ভিকোর দিকে লাফ দেবে ডন হোমায়রা, তারপর হঠাৎ কি যেন একটা নিভে গেল তার চোখে। ঘুরল সে, ঝুলে পড়ল কাঁধ জোড়া।

নিজেদের অ্যাপাচী ভাষায় কথা বলছে কার্টিজ আর তামবারু, প্রতিটি শব্দ

পরিষ্কার ভেসে আসছে গির্জার ভেতর। খানিক পর মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরল তামবারু, ফিরে এল ওদের কাছে। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল কার্টিজ, চিৎকার করে কি যেন বলছে সে নিজের লোকদের।

'কি কথা হলো?' ব্যাকুল চেহারা নিয়ে সামনে এগোল শীলা, বৃদ্ধের হাত দুটো চেপে ধরল।

'কার্টিজ আমার সাথে কোন আলোচনায় বা চুক্তিতে আসবে না। সে বলছে আমি তোমাদের দলে যোগ দিয়ে গোটা অ্যাপাচী জাতির সাথে বেঈমানী করেছি।'

'কি চায় সে?' জানতে চাইল রানা।

'আপনাকে,' বলল তামবারু। 'সে বলছে, তার বিশ্বাস, সাদা গাড়ির মালিকই আমাদের লীডার।'

'না,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে আপত্তি জানাল শীলা। 'কার্টিজকে আমি বিশ্বাস করি না। উঁহুঁ, রানাকে আমি কোন অবস্থাতেই যেতে দেব না।' তামবারুর হাত ছেড়ে রানার পাশে চলে এল সে, ওর একটা কাঁধ খামচে ধরল।

তার উদ্বেগের কারণ সবার কাছেই পরিষ্কার। ক্ষীণ একটু হেসে সাব-মেশিনগানটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা, দু'হাতে শীলার বাহু ধরল। 'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো, লক্ষ্মীটি। বেঁচে থাকতে হলে ঝুঁকি তো আমাদের সবাইকে নিতে হয়।'

ডন হোমায়রা বলল, 'কথা বলার জন্যে যে-ই যাক, আলোচনা হবে আমার নির্দেশে। শর্তগুলো আমি দেব।'

রানাকে কাছে টানল শীলা, ওর বুকে মুখ ঘষল, তারপর ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল এক পা। তার ঠোঁট কাঁপছে, কিছুই বলতে পারল না।

ঘুরে শান্তভাবে ডন হোমায়রার দিকে তাকাল রানা। 'শর্ত দেবেন, না? সে পরিস্থিতি আপনি রেখেছেন?'

গরম রোদে বেরিয়ে এল রানা, দৃঢ়পায়ে ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগোল। কোমরে হাত রেখে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে অ্যাপাচী সর্দার।

কয়েক ফুট দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, অনুভব করল ঘাড়ের পেছনে সড়সড় করছে চুল। প্রথম কথা বলল কার্টিজ, ইংরেজীতে, 'তারমানে, আপনি পাহাড় টপকে এলেন। এতদিন অসম্ভব বলেই জেনে এসেছি।'

'কি চাও তুমি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

কার্টিজ বলল, 'হোমায়রার কাছে একটা মেসেজ নিয়ে যান। তাকে বলুন, নিজেকে আমার হাতে তুলে দিক, বাচ্চাটাকে আমি আপনাদের হাতে তুলে দেব। ব্যস, আমাদের শত্রুতা মিটে যাবে, হোমায়রা বাদে আপনারা সবাই নিরাপদে ফিরে যাবেন।'

'কি করে বুঝব টেরেসা এখনও বেঁচে আছে?'

'নিজের চোখেই দেখুন।'

ঝোপের দিকে এগোল কার্টিজ, তার পিছু নিল রানা। গির্জার ভেতর

থেকে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ শোনা গেল. ককিয়ে উঠল শীলা। ঝোপের আড়াল থেকে. ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে খাড়া হলো দু'জন অ্যাপাচী, ওদেরকে পথ দেখিয়ে আরও ভেতর দিকে নিয়ে এল তারা। সামনে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গা. চারদিকে পাইন গাছের সারি। পদ্মাসনে একজন অ্যাপাচী বসে আছে মাটিতে, আর কাউকে রানা দেখল না। পাশেই কম্বলের ওপর বসে রয়েছে টেরেসা. তোবড়ানো পুতুলটা নিয়ে খেলছে।

মনমরা চেহারা, গোলমুখ শিশুর চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়, তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। 'হ্যালো, টেরেসা, চিনতে পারছ আমাকে?'

বাচ্চাটার ভেলভেট স্যুটে ধুলো-বালি লেগে আছে, ছিঁড়ে গেছে এক জায়গায়। চোখ থেকে চুল সরিয়ে রানাকে বলল সে, 'মায়ের কাছে যাব।'

'হ্যাঁ, তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।' ছোট্ট কাঁধে হাত বুলিয়ে সিধে হলো রানা, তাকাল কার্টিজের দিকে। 'তোমাদের পানির কি অবস্থা?'

'যথেষ্ট আছে।'

মাথা নাড়ল রানা 'শেষ কুয়া থেকে কম করেও পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে এসেছ, আশা করেছিলে এখানে পৌঁছুতে পারলে যথেষ্ট পাবে।'

'হোমায়রাকে বলুন, তাকে আমি আধঘণ্টা সময় দিয়েছি,' বলল কার্টিজ। 'তারপর আর কোন আলোচনা হবে না। তাকে আমি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি দিন বাঁচিয়ে রেখেছি।'

'তোমার ব্যথা আমি বুঝি, কার্টিজ,' নরম সুরে বলল রানা। 'প্রতিশোধ নিতে চাইছ, সেজন্যে তোমার ওপর আমি অসন্তুষ্টও নই। কিন্তু ঝগড়াটা তোমার সাথে হোমায়রার। তোমার ছেলের সাথে টেরেসার কোন ঝগড়া ছিল না। ঠিক?'

কার্টিজের মুখ যেন নির্মম পাথর, সেখানে কোন রকম ভাব নেই।

'প্রতিশোধ তুমি নিতে চাও নিয়ো, আমি অন্তত তাতে বাদ সাধব না,' আবার বলল রানা। 'কিন্তু তার আগে টেরেসাকে নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরতে দাও হোমায়রাকে।'

'আপনি যান।'

'কার্টিজ, প্লীজ...'

'আপনি যান।' সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেও, কার্টিজের দৃষ্টি রানাকে ভেদ করে স্থির হয়ে আছে।

পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফিরে আসছে। দু'পাশে ঝোপ. ঠেলে পথ করে নিল ও, অনুভব করল আশপাশ থেকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে ওর ওপর। গির্জায় ঢুকল ও, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

ছড়ি হাতে ছুটে এল ডন হোমায়রা। 'কি চায় ও?'

'আপনাকে!' বোমাটা তার মুখের ওপর ফাটাল রানা। 'আধঘণ্টার মধ্যে নিজেকে আপনি তার হাতে তুলে দিলে টেরেসাকে ফেরত দেবে, আমাদের সবাইকে নিরাপদে ফিরতে দেবে শহরে।'

'টেরেসাকে দেখেছ তুমি, রানা?' রানার সামনে দাঁড়াল শীলা। 'কেমন আছে সে?'

'কাপড়চোপড় ময়লা, তাছাড়া ভালই আছে।' ডন হোমায়রার দিকে ফিরল রানা। 'কি হলো? কি করবেন?'

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ডন হোমায়রার চেহারা, সারা মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। শব্দের খোঁজে ঘন ঘন ঢোক গিলল সে, তারপর অস্ফুটে জানতে চাইল, 'আমি কি একটা ছাগল নাকি যে ধরে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে? আমাকে ওরা কেন চাইছে বুঝতে পারছ না? কথা ছিল টাকার বিনিময়ে তোমরা আমার হাতে ফিরিয়ে দেবে টেরেসাকে।'

'কথা তো আরও অনেক কিছু ছিল,' বলল রানা। 'আপনি তো সব ভুলে বসে আছেন। আমার নির্দেশ ছাড়া আপনি গুলি করলেন কেন? যে সুবিধেটা আমরা পেতে পারতাম, গুলি করায় সেটা আমরা হারিয়েছি।'

'কেন, এখনও তো আমরা সুবিধেজনক পজিশনে রয়েছি। কুয়াটার কথা ভুলে যেয়ো না। ওটা আমাদের দখলে। ওদের নিশ্চয়ই পানি দরকার।'

'আরও দু'তিন দিন পানি ছাড়া থাকতে পারবে ওরা,' মন্তব্য করল ভিকো।

তামবারুর দিকে তাকাল রানা। 'আপনি বলুন। ডন হোমায়রাকে আমরা যদি কার্টিজের হাতে তুলে দিই, কি ঘটবে? সে কি তার কথা রাখবে? বাচ্চাটাকে নিয়ে নিরাপদে ফিরতে দেবে আমাদেরকে?'

'কিন্তু আমার নিরাপত্তার কি হবে?' চিৎকার করে জানতে চাইল ডন হোমায়রা। 'তুলে দেব বললেই হলো? আমি গেলে তো!'

'ওর কথা বাদ দিন,' তামবারুকে বলল রানা। 'আপনি আপনার ধারণা দিন।'

'ঠিক বলতে পারছি না,' বলল তামবারু। 'আঘাতটা লেগেছে কার্টিজের সবচেয়ে কোমল জায়গায়। হারাবার তার আর কিছুই নেই। সে যদি কথা দিয়েও কথা না রাখে, আমি আশ্চর্য হব না। অ্যাপাচী হিসেবে কার্টিজের মর্যাদাজ্ঞান এমনিতেই কম, তার ওপর এই মুহূর্তে তাকে উন্মাদ বললেই চলে।'

'আর পানি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'আমার ধারণা পানি ওদের নেই। কার্টিজের সাথে কথা বলতে গেলাম যখন, ওর ঘোড়ার অবস্থা আমি দেখেছি।'

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা। ভুরুর মাঝখানে ছোট্ট একটা ভাঁজ। তারপর আবার মুখ তুলে তামবারুর দিকে তাকাল। 'তার প্রস্তাব আমরা যদি ফিরিয়ে দিই, আপনার কি ধারণা বাচ্চাটাকে সে খুন করবে?'

'কোন কারণ ছাড়া খুনই যদি করতে চাইবে, এতক্ষণ ওকে বাঁচিয়ে রাখত না। যাই ঘটুক না কেন, টেরেসাকে কার্টিজ নিজের সাথেই রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।'

তার কথাগুলো নিয়ে ভাবছে সবাই, নিস্তব্ধতা নেমে এল। প্রথম মুখ খুলল ভিকো, 'কথাগুলো বলতে ব্যথায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু না বলেও

পারছি না—এখন যদি দয়া করে মহামান্য ডন হোসে হোমায়রা তার জীবনের মহত্তম ত্যাগ স্বীকার করে বসেন, তাহলেও কার্টিজকে শুধু এক মুহূর্তের জন্যে শান্ত করা যাবে। পরমুহূর্তে আবার রণমূর্তি ধারণ করবে সে।'

'পানির ব্যাপারটা আরেকবার পরীক্ষা করে দেখব আমি,' বলল রানা। একটা ক্যান্টিন তুলে নিয়ে কুয়ার সামনে চলে এল ও, সেটা ভরে বেরিয়ে এল গির্জা থেকে। ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে, ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কার্টিজ।

কয়েক ফুট দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'তামবারু বলছে, তোমার কোন মর্যাদাজ্ঞান নেই।'

কার্টিজের চেহারা নির্লিপ্ত, রাগের চিহ্নমাত্র ফুটল না। 'তাহলে তাই। এখন যা ঘটবে তার জন্যে আপনারা দায়ী থাকবেন।'

ক্যান্টিনটা বাড়িয়ে ধরল রানা। 'বাচ্চার জন্যে।'

'মর্যাদাজ্ঞান নেই এমন লোককে বিশ্বাস করছেন?' জিজ্ঞেস করল কার্টিজ। 'কি করে বুঝলেন পানিটুকু আমি খাব না?'

'এটা তোমার একটা পরীক্ষা বলতে পারো। তুমি কাপুরুষ কিনা প্রমাণ হয়ে যাবে।'

'তাহলে আমার সাথে আসুন,' আদেশের সুরে বলল কার্টিজ।

আবার পথ দেখিয়ে ঝোপের ভেতর দিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় নিয়ে আসা হলো রানাকে, যেখানে কম্বলের ওপর বসে খেলা করছে টেরেসা। এত তাড়াতাড়ি আবার রানাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল মেয়েটা। ঝুঁকে তাকে পানি খাওয়াল অ্যাপাচী সর্দার। টেরেসা পানি খাওয়ার পরও ক্যান্টিনে অর্ধেকের বেশি পানি থেকে গেল।

'বাকিটুকু তুমি খেতে পারো,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা।

ক্যান্টিন উপুড় করে সব পানি ফেলে দিল কার্টিজ। 'আমি পানি খাব,' বলল সে, 'টেরেসার বদলে হোমায়রাকে পাবার পর।'

'আমার একটা অনুরোধ ছিল,' সাবধানে বলল রানা।

একটা হাত তুলে রানাকে বাধা দিল কার্টিজ। তার চেহারা থমথম করছে। 'প্লীজ।'

'অনুরোধটা রাখবে কিনা তোমার ব্যাপার, আগে শোনো তো…'

হাতটা নামায়নি কার্টিজ। 'প্লীজ।'

'আমার কথা তুমি শুনবেই না?'

ক্যান্টিনটা রানাকে ফেরত দিল কার্টিজ। 'আপনি যান। আর পনেরো মিনিট সময় আছে। দু'জনের বেশি গির্জা থেকে বেরুবেন না। খালি হাতে আসবেন।'

গির্জায় ফিরে এল রানা। কি ঘটেছে শোনার জন্যে সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়াল। হঠাৎ চুপ করে গেল ও, কারণ আর সবার মত ওর কানেও শব্দটা এসেছে। ভোঁতা ড্রাম পেটানোর গুরুগুরু আওয়াজ। ভয়ে শিরশির করে উঠল শরীর।

'ওরা তোমাদেরকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে,' মন্তব্য করল তামবারু।

তারপরই শোনা গেল অ্যাপাচীদের দুর্বোধ্য ভাষার কীর্তন। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর ঢেউয়ের মত কখনও নামছে, কখনও চড়ছে।

'এটা ওদের সাহস সঞ্চয়ের গান,' আবার বলল তামবারু।

'ওরা যদি হামলা করে,' রেমারিক বলল, 'তার আগে মেসক্যালিন খেয়ে নেবে। নেশার মধ্যে নিজেদেরকে অজেয় মনে করে ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল ভিকো। 'কারও গায়ে রিভলভারের সব ক'টা বুলেট ঢুকিয়ে দাও, দেখবে তারপরও হেঁটে আসছে।'

'এ নিয়ে আর ভাববার কিছু নেই,' বলল রানা। 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিনিময় হবে। ডন হোমায়রার বিনিময়ে টেরেসাকে নিয়ে আসব আমরা।'

'না!' পিছু হটতে শুরু করল ডন হোমায়রা, হাত থেকে ছড়িটা পড়ে গেল। 'অসম্ভব! গির্জা ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না আমি!'

সবার দিকে মুখ করে দাঁড়াল তামবারু। রানাকে বলল সে, 'পানি না খেয়ে ফেলে দিয়েছে, এইটুকু দেখেই আপনি বিশ্বাস করছেন কার্টিজকে?'

রানা কোন জবাব দিল না।

'আপনার ধারণা সে তার কথা রাখবে?'

'রাখবে কিনা জানি না,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'তবে সুযোগটা নিয়ে দেখব।'

'আপনি অ্যাপাচীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বিশেষ করে কার্টিজদের সম্পর্কে।'

কথা না বাড়িয়ে ভিকোর দিকে ফিরল রানা। 'ডন হোমায়রাকে নিয়ে বাইরে এসো তুমি। বাচ্চাটাকে আনার জন্যে তোমার সাথে থাকব আমি। এইমাত্র আমাকে দু'বার দেখেছে সে, আমার কোলে উঠতে ভয় পাবে না।'

ডন হোমায়রার হাত দুটো মুচড়ে পিছনে নিয়ে গেল ভিকো, নিতম্বে হাঁটুর গুঁতো মেরে বের করে আনল বাইরে।

গির্জার বাইরে এসে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াল রানা, কার্টিজ যাতে দেখতে পায় ওর সাথে অস্ত্র নেই। গান থেমে গেল। ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিকের ঝোপে খস খস আওয়াজ হলো। কিনারায় বেরিয়ে এল কার্টিজ। তার পাশের ঝোপটাও ফাঁক হয়ে গেল, বেরিয়ে এল তরুণ এক অ্যাপাচী। কম্বলে গলা পর্যন্ত ঢাকা টেরেসা তার কোলে।

'ওকে নামিয়ে দাও,' চিৎকার করে বলল রানা।

তরুণ অ্যাপাচী ওর কথা বুঝল না। বিড়বিড় করে তাকে কি যেন বলল কার্টিজ, তরুণ তার পায়ের সামনে নামিয়ে রাখল টেরেসাকে। আর ঠিক তখুনি মেয়েটা চিনতে পারল ডন হোমায়রাকে, গুঁতো দিতে দিতে ফাঁকা জায়গাটায় বের করে আনছে ভিকো। কম্বল ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, বাবার দিকে ছুট দিল।

কিন্তু এক লাফে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে ফেলল কার্টিজ। 'থামো!'

ধমক দিল সে। 'এখুনি নয়।'

টেরেসার হাত ছেড়ে দিয়ে ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে চলে এল সে। 'অবশেষে, হোমায়রা!' বলল কার্টিজ। তারপর ভিকোর দিকে তাকাল। 'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

ডন হোমায়রাকে এই মুহূর্তে যেমন দেখাচ্ছে, দুনিয়ার ইতিহাসে এত ভীত ও করুণ আর বোধহয় কোন মানুষকে দেখা যায়নি।

কার্টিজ বলল, 'হোমায়রা, ফাদার পামকিনকে যখন গুলি করলে তখনই মারা গেছ তুমি। তুমি মারা গেছ যখন খনির ভেতর বাইশজন অ্যাপাচী মারা গেল। মারা গেছ যখন আমার ছেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। আজ আমি শুধু তোমার মৃত্যুর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করছি।'

'তোমার শেষ হয়েছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল কার্টিজ।

'বাচ্চাটাকে সামনে আনতে বলো,' নির্দেশ দিল রানা।

তরুণ অ্যাপাচীকে ইঙ্গিত করল কার্টিজ, কম্বলসহ টেরেসাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে এগিয়ে এল সে। টেরেসা দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ডন হোমায়রার দিকে, তাকে কোলে নিয়ে কার্টিজের পাশে দাঁড়াল অ্যাপাচী।

'এখন,' বলল কার্টিজ, 'পবিত্র একটা প্রাণের বিনিময়ে এক পাপীকে নেব আমরা।'

'নেওয়াচ্ছি!' বলেই অসম্ভব ক্ষিপ্রবেগে তরুণ অ্যাপাচীর দিকে লাফ দিল ডন হোমায়রা, তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল টেরেসাকে।

হাত থেকে বন্দী ছুটে যাওয়ায় মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে পড়ল ভিকো, পরমুহূর্তে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করল সে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল কার্টিজের শরীরে, ভোজবাজির মত কাপড়ের ভেতর থেকে লম্বা ব্যারেল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন বেরিয়ে এল, তার চোখ যেন বদ্ধ কোন উন্মাদের, লক্ষ্যস্থির করল হোমায়রার দিকে, বারবার ট্রিগার টানছে। মোচড় খাচ্ছে টেরেসা, চোখ বুজে চিৎকার করছে, ডন হোমায়রার হাত থেকে পড়ে গেল সে। ডন হোমায়রা হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ভিকোর দিকে তাক করল কার্টিজ।

'না!' হুঙ্কার ছেড়ে কার্টিজকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল রানা। কিন্তু সরে গেল কার্টিজ, তবে প্রাণে বেঁচে গেল ভিকো, কার্টিজের অস্ত্র অন্য দিকে ঘুরে গেছে।

কার্টিজকে না পেয়ে মাটিতে বুক দিয়ে পড়ল রানা, মুখ তুলতেই দেখল চার হাত দূর থেকে ওর মাথা লক্ষ্য করে অস্ত্র তুলেছে অ্যাপাচী সর্দার। গুলির শব্দ হলো।

দমকা বাতাসের মত হাসির একটা শব্দ হলো। তীব্র বাতাস পাওয়া ঘুড়ির মত উড়ে এল ভিকো কার্টিজ আর রানার মাঝখানে। 'আমি গেলাম, সিনর!' গুলির শব্দে চাপা পড়ে গেল তার হাসি আর কথা। হৃৎপিণ্ডে সদ্য তৈরি ফুটো

নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল সে রানার গায়ে। ত্রাহি চিৎকার করছে টেরেসা, ছোঁ দিয়ে তাকে তুলে নিল কার্টিজ, ঝোপের দিকে ছুটল তীরবেগে. পিছনে ফেলে গেল কম্বলটা।

ভিকোকে সরিয়ে দিয়ে দাঁড়াল রানা, টলছে। পরিষ্কার দেখতে পেল সর্দারের অপ্রত্যাশিত আচরণে হতভম্ব হয়ে পড়েছে তরুণ অ্যাপাচী। মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল সে এক সেকেন্ড, তারপর সর্দারের পিছু নিয়ে ঝোপের দিকে ছুটল।

হতভম্ব রানা, বেঈমানীর শিকার, স্থিরভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, আশা করছে গির্জা বা ঝোপের দিক থেকে বুলেট এসে লাগবে গায়ে। ঘাড় ফিরিয়ে লাশগুলোর দিকে তাকাল ও। ডন হোমায়রা আগেই মারা গেছে। ভিকোও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

রেমারিক, শীলা আর তামবারু, গির্জা থেকে বেরিয়ে এসেছে, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল, কিন্তু টেরেসাকে লাগার ভয়ে ঝোপের দিকে গুলি করছে না।

রেমারিককে কিছু বলার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল ও।

তামবারু বলল, 'সবাই তোমরা গির্জায় ফিরে যাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব আমি।' ঘোড়া ছুটিয়ে ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

অগভীর দুটো আলাদা কবর খুঁড়ে ডন হোমায়রা আর ভিকোকে মাটি চাপা দেয়া হলো। কাজটা সারার পর সবার শেষে গির্জায় ফিরে এল রানা।

উল্টোদিকের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল ও, মরুভূমির ওপর দিয়ে বহুদূর পাহাড়ে চলে গেছে দৃষ্টি। অদ্ভুত ব্যাপার, ক্লান্তি তো লাগছেই না, বরং মনে হচ্ছে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে এইমাত্র জেগেছে ও।

খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা বাতাস ঢুকল ভেতরে, বেদির ওপর চেইনের সাথে ঝুলে থাকা লণ্ঠনটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে দুলে উঠল। বাতাসের সাথে পাইনের গন্ধ ঢুকল নাকে। নিস্তব্ধতা যেন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা।

শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়ল রেমারিক, উদ্বেগ আর উত্তেজনার সমস্ত চিহ্ন মুছে গেছে চেহারা থেকে। নিভে যাওয়া আগুনের পাশে একটা কম্বলের ওপর চিৎ হয়ে রয়েছে শীলা, ভাঁজ করা এক হাত দিয়ে চোখ ঢাকা, অপর হাতটা মাথার নিচে। ঘাড় ফিরিয়ে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর দুটো ক্যান্টিনে পানি ভরল ও, থম্পসন সাবমেশিনগানটা তুলে নিল, বেরিয়ে এল বাইরে।

ঝোপ থেকে ফাঁকা জায়গাটায় এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে তামবারু, ভুরুতে ঘাম নিয়ে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে তার সামনে চলে এল রানা। 'আপনি হাঁপাচ্ছেন!'

'আমার ঘোড়া আরও জোরে হাঁপাচ্ছে,' বলল তামবারু। জিন থেকে নামল সে, হাতে লাগাম নিয়ে একটা পাথরের ওপর বসল।

'কার্টিজকে বিশ্বাস করে ঠকেছি, সেজন্যে আপনি কি আমার ওপর রেগে

আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাগ জিনিসটা হৃদয়ে মরচে ধরায়। রাগ শত্রুকে ধ্বংস করে না, যে রাগে তাকেই ধ্বংস করে। আমি যদি আপনার দেশে যেতাম, সেখানকার লোকজন সম্পর্কে আপনার মতামত মেনে নিতাম। কিন্তু এখানে, আপনাকে আমার ধারণার ওপর আস্থা রাখতে হবে। আমি ভাল খবর এনেছি।'

তার হাতে একটা ক্যান্টিন ধরিয়ে দিল রানা। ছিপি খুলে ঢক ঢক করে পানি খেল তামবারু। 'খবরটা হলো,' বলল সে, 'সঙ্গীরা কার্টিজকে ত্যাগ করেছে। সর্দার কথা রাখেনি, ফলে অ্যাপাচীদের শ্রদ্ধা হারিয়েছে সে।'

'কোন্ দিকে গেছে ওরা?' জানতে চাইল রানা।

'বাতাস কোন্ দিকে গেছে? যত খুশি অশ্বারোহী পুলিস আসুক, কেউ কখনও তাদেরকে খুঁজে পাবে না। তা না পাক টেরেসাকে নিয়ে কার্টিজ এখন একা। মরুভূমির এমন একটা দিকে যাচ্ছে সে, হারমোজা থেকে বহুদূরে বিশাল পাথরের দুর্গম একটা জগৎ সেটা। টেরেসাকে সাথে রাখার এখন একটাই কারণ, বাচ্চাটাকে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজে লাগানো। টেরেসা এখন কার্টিজের ঢাল। কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

কোল্টটা চেক করে হোলস্টারে রেখে দিল রানা, থম্পসনটা শোল্ডার স্ট্র্যাপের সাথে কাঁধে তুলল। 'আমার দোষে টেরেসাকে ফেরত পাইনি। তাকে ফিরিয়ে আনা এখন আমার দায়িত্ব।' হন হন করে মালভূমির কিনারা লক্ষ্য করে এগোল ও।

'ফিরে আসুন।' পিছন থেকে চিৎকার করে বলল তামবারু। 'এদিকের কিছুই আপনি চেনেন না, স্রেফ মারা পড়বেন। দ্বিতীয়বার ভুল করলে প্রথম ভুলের সংশোধন হয় না।'

কিন্তু কোন লাভ হলো না। বিদেশী যুবক ঢাল বেয়ে এত দ্রুত নেমে গেল, তামবারুর কোন কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

গির্জার ভেতর, শীলার পাশে ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসল তামবারু, কাঁধে হাত রেখে ধাক্কা দিল আস্তে করে। শীলার বন্ধ চোখের পাতা কেঁপে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে খুলে গেল। জাগরণের প্রথম মুহূর্তেই বুঝতে পারল সে, খারাপ কিছু ঘটেছে।

'কি ব্যাপার, তামবারু?' ঝট্ করে উঠে বসল শীলা, সম্পূর্ণ সজাগ।

'সে মরুতে গেছে।'

শীলার চোখ বড় হলো। 'একা?'

ম্লান হাসল তামবারু। 'সে এবং তার জেদ। এমন বোকামি আগেও বহু লোক করেছে।'

এক ঝটকায় সটান দাঁড়িয়ে পড়ল শীলা। 'আমি যাব।'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই যাব। সাথে অতিরিক্ত ঘোড়া নেব, ঘোড়া বদল করলে দ্রুত হবে গতি।' রেমারিকের দিকে তাকাল তামবারু। 'ওকে জাগাই?'

শীলা ব্যস্ত। চুল বাঁধল দ্রুত, কোমরে বেল্ট পরল।

'আমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম,' মৃদু কণ্ঠে বলল তামবারু। 'শুনল না।'

'কি বলছেন?' ধড়মড় করে উঠে বসল রেমারিক। 'কাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন?'

'কার্টিজের পিছু নিয়ে একা মরুভূমিতে নেমে গেছে রানা।'

রেমারিক দাঁড়াল। 'সর্বনাশ! ওরা ওকে পিঁপড়ের বাসার ওপর শোয়াবে। পিঁপড়ে দিয়ে একটু একটু করে খাওয়াবে।'

'ওরা কারা? তরুণ অ্যাপাচীরা কার্টিজকে ত্যাগ করেছে, কারণ কার্টিজ তার কথা রাখেনি। সে এখন একা।'

'আর টেরেসা?' তামবারুর সামনে এসে দাঁড়াল রেমারিক। 'জেসাস, এখনও আমরা দেরি করছি কেন!'

পাগলের মত দু'হাতে ঝোপ আর ডালপালা সরিয়ে গুহার মুখটা পরিষ্কার করল রানা। একবার রওনা হতে পারলে, জানে ও, কার্টিজকে ঠিকই ধরতে পারবে। কিন্তু গুহামুখ পরিষ্কার করে গাড়ি বের করতেই বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। পিছন দিকে চালিয়ে তুলে আনতে হলো শেভ্রোলেকে, অসাবধান হলে কিনারা থেকে নিচে পড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। মরুতে নেমে আসার পর স্পীড তুলল রানা।

তীব্র আগুনে-রোদে জ্বলছে মরু। গরম বাতাস যেন পুড়িয়ে দেবে গায়ের চামড়া। পাথর আর বালি থেকে ভাপ উঠছে, ঝোপঝাড়গুলো কাঁপছে তার ভেতর। কার্টিজ এখন কতদূর আন্দাজ করার চেষ্টা করল রানা। এখনও যদি সে না জানে তার পিছু নেয়া হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেয়ে যাবে। শেভ্রোলের এঞ্জিনের আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে ওর কাছে।

কার্টিজ যে তামবারুকে ঘৃণা করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কার্টিজের মতই বৃদ্ধ লোকটা সাহস, শক্তি আর বুদ্ধি রাখে। তামবারুও নিষ্ঠুর হতে পারে, তা ঠিক, কিন্তু তা শুধু এই অর্থে যে জীবন রক্ষার্থে নিষ্ঠুর হওয়া প্রকৃতিরই বিধান। স্বজাতির হয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে সে, হেরে যেতে দেখেছে। তারপরও নিজের সম্মানজ্ঞান হারায়নি, যেমন হারিয়ে বসেছে কার্টিজ। দু'জনের মধ্যে কত অমিল। তামবারুকে দেখে শ্রদ্ধা জাগে মনে। আর কার্টিজকে দেখে?

ওর সাথে বেঈমানী করেছে কার্টিজ। ওর মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে। ও বেঁচে আছে স্রেফ ভিকোর আত্মত্যাগের বিনিময়ে। দমকা বাতাসের মত দু'জনের মাঝখানে ভিকো যদি না এসে পড়ত, খুলি ফুটো হয়ে যেত ওর। ভিকোর প্রতি কৃতজ্ঞতায় রানার অন্তর ছেয়ে গেল। আর বিস্মিত হলো কার্টিজের ওপর ওর রাগ হচ্ছে না উপলব্ধি করে।

পুত্রশোকে মানুষ যদি অন্ধ, উন্মাদ হয়ে যায়; খুব একটা দোষ দেয়া যায় কি?

রোদ হয়ে উঠল শত্রু। তবু টপটা তুলে শেভ্রোলের মাথা ঢাকল না। অগভীর একটা খাদে নেমে এল ও, অপরদিকে উঠে পানি খাবার জন্যে থামল। ছিপি খুলে ক্যান্টিনটা উপুড় করল মাথার উপর, মাথা আর মুখ ভিজিয়ে বুকে গড়াল পানি।

ক্যান্টিন রেখে দিয়ে চারদিকে তাকাল রানা। কোথাও কোন শব্দ নেই। উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে জমাট বেঁধে আছে ভারী নিস্তব্ধতা। মুহূর্তের জন্যে মরুভূমির একটা অংশ বলে মনে হলো নিজেকে। হুইলে হাত রেখে স্থির বসে থাকল ও, নিঃশ্বাস ফেলছে কি ফেলছে না। তারপর শব্দটা কানে ঢুকল। অস্পষ্ট, ক্ষীণ। দুটো পাথরের মাঝখানে দেখা গেল গিরগিটিটাকে। সেই আগেরটার মতই সবুজ। সাথে শীলা থাকলে সে হয়তো এটার অশুভ কোন অর্থ করত।

রানা জানল না, জানার কথাও নয়, ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হুয়ান কার্টিজ। শেভ্রোলের কাছ থেকে মাত্র ছয়শো গজ দূরে সে, প্রতিপক্ষের চেয়ে প্রায় দেড়শো ফুট উঁচুতে।

পাথরের একটা উঁচু বেড় মরুভূমির কিনারা চিহ্নিত করছে, সেই বেড়ের মাথায় বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে কার্টিজ। ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে এখানে থেমেছিল সে। রানাকে দেখার পর দ্বিধায় পড়ে গেছে। প্ল্যানটা এখন তাকে বদলাতে হবে।

বিদেশী লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ কার্টিজ। সব কথাই তার কানে এসেছে, খনির ভেতর হ্যামার যখন তার ছেলেকে চাবুক মারছিল, এই লোকই হ্যামারকে বাধা দেয়। গুহা-ধসের পর, ভেতরে আটকে পড়া অ্যাপাচীদের উদ্ধারের জন্যে ডিনামাইটও ব্যবহার করতে চেয়েছিল সে। না, লোকটাকে সজ্ঞানে গুলি করার কোন ইচ্ছে তার ছিল না। খুন সে ভিকোকেই শুধু করত। কারণ হোমায়রাকে মেরে টেরেসাকে নিয়ে পালিয়ে আসার পথে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভিকো। কিন্তু বিদেশী লোকটা ভিকোকে বাঁচাবার জন্যে ডাইভ দিল। রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে, তারই মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে বসে। লোকটার ভাগ্য বলতে হবে, মরতে হলো সেই ভিকোকেই।

কিন্তু ভাবাবেগে ভেসে যাওয়ার সময় এটা নয়। এখনকার সমস্যা প্রাণ রক্ষা করা। লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ হলেও, পিছন থেকে অবশ্যই তাকে খসাতে হবে। একমাত্র উপায় তাকে খুন করা। জেদি মানুষ, মেরে না ফেললে পিছু ছাড়বে না। বিষণ্ন একটু হাসল কার্টিজ। মেঝেতে শুয়ে থাকা বাচ্চাটার দিকে তাকাল একবার। টেরেসা ঘুমাচ্ছে।

লোকটাকে খুন করার পর বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোন দরকার হবে না। ওকে সাথে রাখা মানে বোঝা বাড়ানো। যখন বুঝবে আর কেউ তার পিছু নেয়নি, পাহাড়ের কিনারা থেকে ফেলে দিলেই হবে।

কিন্তু তারপরও কয়েকটা প্রশ্ন খচ খচ করে বিঁধছে তার মনে। কোন্ জাতের মানুষ লোকটা? কোন্ ধাতুতে গড়া? ওর কি ভয়-ডর বলে কিছু নেই? কিসের আশায় পেছনে লেগে আছে? টেরেসা ওর কেউ হয় না, সে-ও হোমায়রার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল। তাহলে? টেরেসাকে ফেরত পাবার জন্যে ওর কেন এত গরজ?

রাইফেলটা পাথরে ঠেকিয়ে স্থির করল কার্টিজ। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের জন্যে দূরত্বটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, তবু গুলি করলে একটা কিছু লাভ হবে। গাড়িতে বুলেট লাগলে সামনে চলে আসবে জেদি লোকটা। তখন তার দু'চোখের মাঝখানে বুলেট ঢোকাতে কোন অসুবিধে হবে না।

সাবধানে ট্রিগার টানল সে।

শেভ্রোলের নাকে বুলেট লাগতেই সীটের ওপর লাফিয়ে উঠল রানা, পরমুহূর্তে মাথা নিচু করল। দ্বিতীয় বুলেটটা লাগল বনেটে। মাথা না তুলেই স্টার্ট দিল ও, দ্রুতগতি টার্গেটে পরিণত হলো শেভ্রোলে। তবে আর কোন গুলি হলো না।

চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব নিয়ে কার্টিজ দেখল ওর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে গাড়িটা, ট্রিগারে আঙুল পেঁচিয়ে তৈরি হয়ে থাকল সে। হঠাৎ করে তার দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। ভুরু কুঁচকে উঠল তার, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বাচ্চাটা এখনও ঘুমাচ্ছে, ঘোড়াটাও বাঁধা রয়েছে নাগালের মধ্যে, তাড়াতাড়ি নতুন একটা পজিশনে সরে গেল সে। দুটো বড় পাথরের মাঝখানে শুয়ে পড়ল, খানিক পরই আবার দেখতে পেল গাড়িটাকে। তবে আগের মত ছুটছে না, দাঁড়িয়ে রয়েছে, যদিও এঞ্জিনের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল সে।

কিন্তু শুধু গাড়ি, কোন আরোহী নেই।

লাল একটা ঝলক চোখে ধরা দিয়েই মিলিয়ে গেল, আর তাই দেখেই কার্টিজের নতুন পজিশন জেনে নিল রানা। গাড়ি থামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ না করেই, থম্পসন নিয়ে নেমে পড়ল ও। ইতোমধ্যে আন্দাজ করে নিয়েছে কার্টিজের খানিকটা ওপর পৌঁছুতে হলে চড়াই বেয়ে দুশো ফুটের মত উঠতে হবে ওকে, তাহলেই শিকারী পরিণত হবে শিকারে।

শীলা, রেমারিক আর তামবারু পাহাড় থেকে নামতে রানার চেয়ে কম সময় নিল, কারণ বৃদ্ধ অ্যাপাচীর অভ্যস্ত চোখে ট্রেইলের অস্তিত্ব ধরা পড়ল সহজেই। সমতল প্রান্তরে নেমে আসার পর তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল তারা, খানিক পর ভারমুক্ত ঘোড়াগুলোর পিঠে চড়ে বসল।

দাঁড়িয়ে থাকা শেভ্রোলেটা শীলার চোখে ধরা পড়ল। হাত তুলে গতি মন্থর করার ইঙ্গিত দিল তামবারু, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। গুলির শব্দ হলো

ঠিক তখুনি। দূর থেকেও পরিষ্কার বুঝতে পারল ওরা, গাড়িতে লেগেছে।

শীলা বুঝতে পারল না রানা আহত হয়েছে কিনা, কিন্তু গুলির শব্দ শোনার পর তার যে অনুভূতি হলো, নিজের কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল এই দুর্ধর্ষ চরিত্রের অকুতোভয় লোকটাকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসে সে।

রানার মত তামবারুও সিদ্ধান্ত নিল কার্টিজকে কোণঠাসা করতে হলে তার ওপরে কোথাও পৌঁছুতে হবে। ঘোড়া বেঁধে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। খানিক পরই ঝুলে থাকা সমতল একটা পাথরে পৌঁছুল দলটা, তামবারুর ইঙ্গিতে পাথরের সাথে লেপ্টে শুয়ে থাকল শীলা আর রেমারিক। বুকে হেঁটে সামনে এগোল তামবারু, তারপর ওদেরকেও ক্রল করে সামনে বাড়ার ইঙ্গিত দিল।

হাত তুলে দেখল সে। কার্টিজের ঘোড়াটাকে দেখতে পেল ওরা। ছোট্ট আর একটা জিনিস দেখতে পেল, এইমাত্র জাগছে। ছ্যাঁৎ করে উঠল শীলার বুক। 'টেরেসা!'

'সাবধান!' অস্ফুটে বলল তামবারু, ওদের সরাসরি নিচের পাথরগুলোর দিকে হাত লম্বা করল। একজন স্নাইপারের আদর্শ পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছে কার্টিজ। কিন্তু আশপাশে কোথাও রানাকে দেখা গেল না।

'তুমি আর রেমারিক বাচ্চাটাকে তুলে নেবে। তোমরা প্রায় পৌঁছে গেছ দেখলে কার্টিজকে সামলাব আমি।'

দম ফিরে পেয়ে জায়গা বদল করল রানা, যেখান থেকে কার্টিজকে দেখা যাবে। দেখতে পেল ঠিকই, কিন্তু সাথে রাইফেল না থাকায় হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল ওর। থম্পসন দিয়ে কাজ সারতে হলে রেঞ্জ আরও কমিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয় সুযোগ নাও পাওয়া যেতে পারে, প্রথমবার গুলি করেই আহত করতে হবে কার্টিজকে।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নিচে নামতে শুরু করল রানা। হঠাৎ ডান দিক থেকে কিসের যেন আওয়াজ ভেসে এল। তাকাতেই দেখল কার্টিজের ঘোড়া মাটিতে পা ঠুকছে। শীলাকেও পরিষ্কার দেখতে পেল ও, রেমারিকের আগে আগে দৌড়াচ্ছে। এক মুহূর্ত পর ঝুঁকল শীলা, রাইফেল ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে তুলে নিল টেরেসাকে।

দৃশ্যটা কার্টিজও দেখতে পেল। একমাত্র সম্বল চুরি হতে দেখলে কাঙাল যেমন হাউমাউ করে ওঠে, কার্টিজও তেমনি দুর্বোধ্য চিৎকার করে উঠল। তার সামনে পাথরের আড়াল থেকে দাঁড়াল রানা, যেন নিরেট একটা প্রাচীর খাড়া হলো, হাতের থম্পসনটা তপ্ত সীসা উদ্গিরণের জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু রানাকে দেখেও থামল না কার্টিজ, ঘুরে গিয়েই ছুটল শীলা আর রেমারিকের দিকে। রানা দেখল পাথরে ভাঁজ করা হাঁটু গেড়ে নিচু হলো রেমারিক এঁকেবেঁকে ধেয়ে আসা টার্গেটের দিকে ভালভাবে লক্ষ্যস্থির করার জন্যে। মাত্র একবার গুলি করল সে, একটা বোল্ডারের ছাল তুলে বেরিয়ে গেল বুলেট। ভাব দেখে মনে

হলো দ্বিতীয়বারও ট্রিগার টেনেছে. কিন্তু কোন গুলি হলো না।

কার্টিজ ছুটছে, তার পেছনে রানাও ছুটছে, কিন্তু মাঝখানে এখনও দূরত্ব কম নয়, আর কার্টিজের সামনে একই সরল রেখায় টেরেসাকে নিয়ে শীলা থাকায় গুলি করতে সাহস পেল না রানা।

হাঁটু গেড়ে থাকা রেমারিক কেন যে গুলি করছে না বুঝতে পারল না রানা। ছোট বড় পাথর টপকে তীরবেগে ছুটছে ও, অসাবধান হলেই আছাড় খাবে। রেমারিক তার রাইফেলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, সম্ভবত গুলি না বেরুবার কারণটা ধরতে পারছে না। ইতোমধ্যে তার কাছে পৌঁছে গেল কার্টিজ, এক লাথিতে তার হাত থেকে ফেলে দিল রাইফেল। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখতে পেল, টেরেসাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে রাইফেল তুলছে শীলা।

শীলা যে ভুল করছে বুঝতে পারলেও রানার কিছু করার নেই। উচিত ছিল টেরেসাকে নিয়ে উল্টোদিকে দৌড়ানো।

কার্টিজের জন্যে সিদ্ধান্তে আসা সহজ হয়ে গেল। রেমারিককে লাথি মারার জন্যে পা তুলেছিল সে, লাথি না মেরে ছুটল বাচ্চাটার দিকে। মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। একবার যদি টেরেসাকে তুলে নিতে পারে কার্টিজ, থম্পসনটা কোন কাজেই আসবে না।

শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে ছুটল রানা। শেষ মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতের অস্ত্র, ঝুঁকি নিয়ে ডাইভ দিল একটা বোল্ডারের কিনারা থেকে, ডান পা দিয়ে আঘাত করল কার্টিজের হাঁটুর পিছনে, আছড়ে ফেলল শক্ত পাথরের বুকে।

বিস্ময় আর হতাশার ধাক্কাটা প্রচণ্ড ঘুসির মত লাগল, তখনও কার্টিজের সাথে গড়াচ্ছে রানা। এক হাতের ভাঁজে টেরেসাকে বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেছে অ্যাপাচী সর্দার। বাচ্চাটাকে কখন যে সে তুলে নিয়েছে টেরই পায়নি রানা।

কার্টিজের একটা হাত রানার গলায় ইস্পাতের মত চেপে বসল। ওর কণ্ঠনালীতে দেবে যাচ্ছে আঙুলগুলো। দু'জনের কেউই এখন গড়াচ্ছে না, রানার বুকের ওপর চেপে বসেছে কার্টিজ। তার মুখ আর সূর্য, দুটোই ঝাপসা হয়ে আসছে রানার চোখে। সূর্যটাকে আড়াল করে আরেকটা মুখ ঝুঁকে পড়ল, তামবারুকে চিনতে পারল রানা। তারপর দেখল, ভাঁজ করা হাত দিয়ে কার্টিজের গলা পেঁচিয়ে ধরেছে সে। 'জাহান্নামে ঠাঁই হোক তোমার,' বলল সে, তার অপর হাতে ঝিক্ করে উঠল ছুরির ফলা।

ছুরি চালাল তামবারু, ঠিক সেই মুহূর্তে কার্টিজকে মানুষ নয় অসুর বলে মনে হলো রানার। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে, একটা গড়ান দিল সে। ঘ্যাচ করে পাঁজরের পাশে ছুরি খেল রানা। হাঁটুর আঘাতে রানাকে সরিয়ে এক লাফে খাড়া হলো যেন একটা দানব। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা, ক্ষতটা এক হাতে চেপে ধরল। ছুরিটা ফিরিয়ে নিয়ে বোকার মত ফলার দিকে তাকিয়ে

আছে তামবারু, হতভম্ব হয়ে গেছে সে।

কোন কিছুই পরোয়া করল না কার্টিজ। বিপদের ভয় তুচ্ছ করে, এলোমেলো পা ফেলে, চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে উল্লাস আর আগুন, হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটছে, যেন খেয়াল নেই বা গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না তার ঠিক পিছনেই পাহাড়ের কিনারা, খাড়া গা ঝপ্ করে নেমে গেছে দেড়শো ফুট।

ঠিক কিনারায় পৌঁছে থামল কার্টিজ, এক হাতে টেরেসা, অপর হাত বাতাসে লম্বা করে দিয়ে তাল সামলাচ্ছে যাতে পিছন দিকে পড়ে না যায়। টলতে টলতে দাঁড়াল রানা, ক্ষতস্থানে সেঁটে থাকা আঙুলগুলোর ফাঁক গলে রক্ত গড়াচ্ছে। অপর হাতটাও খালি। অকেজো রাইফেল ফেলে দিয়ে সিধে হয়েছে রেমারিকও, রানার দশ গজ পিছনে রয়েছে সে। একা শুধু শীলা সশস্ত্র। রানার বাঁ দিকে, খানিকটা পিছনে রয়েছে সে। রাইফেলটা দু'হাতে ধরে আছে, মাজ্‌ল্ নিচের দিকে।

রানার ঠিক পাশে তামবারু, ছুরি ধরা হাতসহ স্থির একটা পাথুরে মূর্তি।

এক পা সামনে বাড়ল রানা।

'ফেলে দেব, আর যদি এক পা-ও সামনে এগোও ফেলে দেব মেয়েটাকে!' টলমল করে উঠল কার্টিজের পা, বিস্ফারিত চোখে দানবীয় উল্লাস।

ব্যথায় কুঁচকে আছে রানার মুখ, সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, পুরোপুরি সিধে হতে পারছে না। 'না, কার্টিজ,' থেমে থেমে বলল ও। 'টেরেসাকে তুমি ফেলবে না। আমি আসছি, কার্টিজ, ওকে তুমি আমার হাতে তুলে দেবে!' নিজের কানেই কথাগুলো অবিশ্বাস্য, প্রলাপের মত শোনাল। আরও এক পা সামনে বাড়ল রানা।

'ফেলব না?' উন্মাদের মত গলা ছেড়ে হেসে উঠল কার্টিজ। 'দেখো ফেলি কিনা। কি ভেবেছ আমাকে, মৃত্যুকে ভয় করি? না হে, বিদেশী বন্ধু, না! জানি বাচ্চাটাকে ফেলে দিলে তোমরা আমাকে নিয়ে কি করবে। ভেবেছ সে সুযোগ দেব তোমাদেরকে? শোনো হে, শুধু টেরেসাকে ফেলব না, ওর সাথে আমিও লাফ দেব!' আবার তার অট্টহাসি শুরু হলো।

'এখন পর্যন্ত যা কিছু করেছ তুমি, তোমার জায়গায় আমি হলে, আমিও ঠিক তাই করতাম,' কার্টিজ থামতে বলল রানা। 'হোমায়রাকে মেরেছ, সেজন্যে আমরা কেউ তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। বলা যায়, পবিত্র একটা দায়িত্ব পালন করেছ। লোকটা বেঁচে থাকার অধিকার অনেক আগেই হারিয়েছিল।' আরও এক পা এগোল রানা। 'আমাকে গুলি করেছিলে তুমি, জানি সেটা রাগের মাথায়, সজ্ঞানে নয়—কারণ যার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তাকে কোন অ্যাপাচী গুলি করবে না। নাকি তুমি জানো না আমি তোমার ছেলেটাকে হ্যামারের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম?'

আবার এক পা বাড়ল রানা। দু'জনের মাঝখানে এখনও আট গজের মত

দূরত্ব।

ঠিক এই সময় ছোট্ট হাত তুলে কার্টিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাল টেরেসা, খিলখিল করে হেসে উঠল। ঝট্ করে চোখ নামিয়ে তার দিকে তাকাল কার্টিজ।

'প্রতিশোধ তো পুরুষমানুষই নেয়, তুমিও নিয়েছ,' আবার বলল রানা। 'কিন্তু বাচ্চা একটা মেয়েকে যদি বাঁচতে না দাও, নিজের কাছেই তুমি ছোট হয়ে যাবে। বলছ, তুমিও লাফ দেবে। কিন্তু আত্মা? শুধু শুধু কোন কারণ নেই তবু আত্মাটাকে চিরকালের জন্যে অশান্তির আগুনে ফেলবে কেন?'

কার্টিজের চেহারা একটুও বদলায়নি, আগের মতই দর দর করে ঘামছে সে, চোখ দুটো বিস্ফারিত,কিনারায় দাঁড়িয়ে টলমল করছে, ঘৃণা আর আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে দু'চোখ থেকে। কিন্তু তার মনের ভেতর কি ঘটে যাচ্ছে বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। 'তোমার এত দরদ কেন? টেরেসা তোমার কেউ নয়, তার জন্যে তুমি কেন ঝুঁকি নিচ্ছ? বুঝতে পারছ না, নাগালের মধ্যে পেলে তোমাকে নিয়ে নিচে লাফ দেব আমি?'

পিছন থেকে রানার শার্ট চেপে ধরল শীলা। 'থামো, রানা! তোমাকে আমি আর এক পা-ও...' কখন যেন ওর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে শীলা।

ঝাঁকি দিয়ে শার্টটা ছাড়িয়ে নিল রানা, শীলার দিকে ফিরেও তাকাল না। ধীরে ধীরে এগোল ও। 'আমাকে নিয়ে লাফ দেবে? তার সুযোগ তুমি পাবে?' কার্টিজকে জিজ্ঞেস করল ও, ছুরি খাবার পর এই প্রথম নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'বোকা নাকি তুমি? ভেবেছ টেরেসাই আমার একমাত্র উদ্বেগ? বুঝতে পারছ না, কেন ঝুঁকি নিচ্ছি? তুমি সত্যি একটা আহাম্মক, কার্টিজ। তা না হলে এতক্ষণে ঠিক বুঝতে পারতে আসলে আমি টেরেসাকে একা নয়, তোমাকেও বাঁচানোর চেষ্টা করছি।'

'আমাকে?'

'কারণ তোমার মধ্যে আমি নিজের চেহারা দেখতে পেয়েছি। একটা জিনিস লক্ষ করেছ? তুমি যেমন নিজের ব্যাপারে জেদি, আমিও তেমনি আমার ব্যাপারে? এখানেই আশ্চর্য একটা মিল রয়েছে আমাদের মধ্যে। তাছাড়া, তোমার প্রতি যে আমার সহানুভূতি আছে তা কি নতুন করে প্রমাণ করতে হবে? পুত্রশোকে কাতর পিতা তুমি, কিভাবে তোমাকে আমি মরতে দিই, বলো?'

'আমার ছেলের মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী! তাকে আমি চড় মেরেছিলাম, তাই সে আমার ওপর রাগ করে খনিতে কাজ করতে গিয়েছিল।' এটাই কার্টিজের শেষ কথা, কথা শেষ করেই পাহাড়ের কিনারা থেকে লাফ দিল সে।

ছুটল রানা, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, কার্টিজের ছুঁড়ে দেয়া টেরেসাকে ঠিকই লুফে নিতে পারল, কিন্তু কিনারায় পৌঁছে কার্টিজকে পেল না। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর, বুঝতে পারল ওর হাত থেকে টেরেসাকে ছিনিয়ে নিল শীলা, লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে ওকে ধরে ফেলল রেমারিক আর তামবারু।

সূর্যটা দপ্ করে নিভে গেল, তারপর আর কিছু মনে নেই রানার।

পনেরো

ডাক্তার তথা নার্সের ভূমিকায় দারুণ উতরে গেল শীলা। তবে আট ঘণ্টা বিরতিহীন ঘোড়া ছুটিয়ে কাছের একটা শহর থেকে ওষুধপত্র সব কিনে আনতে হয়েছে তামবারুকে। হপ্তা পেরোবার আগেই সুস্থ হয়ে উঠল রানা মাথা চুলকে বৃদ্ধ তামবারু মন্তব্য করল, 'কেউ বললে বিশ্বাস করবে আমার ছুরিটা ভোঁতা হয়ে গেছে? অথচ নির্ঘাত জানি কার্টিজের শরীরে বিঁধলে আরও ধারাল হয়ে উঠত।'

শীলার বেডরূমেই ঠাঁই নিয়েছে রানা। ওর সাথে শীলাও প্রায় সারারাত থাকে, তবে শোয় না কখনও, বিছানার ধারে বসে থাকে। ঘুম পেলে পাশের ঘরে চলে যায়। রানা সুস্থ হবার পর অনুমতি পাওয়া গেল, এখন থেকে দু'জন এক বিছানাতেই শুতে পারবে। 'ভয় নেই,' গভীর রাতে রানার বুকের ওপর চড়াও হলো শীলা, 'এক জিনিস দ্বিতীয়বার চাইবে না।'

টেরেসাকে শীলা আপন সন্তানের মতই গ্রহণ করেছে। দিনের বেলা টেরেসা, রাতের বেলা রানা, এই তার এখনকার রুটিন। হোটেল দেখাশোনা করছে একা রেমারিক।

'কি বললে বুঝলাম না,' বলল রানা, শীলার মাথাটা দু'হাতে ধরে বুকের ওপর থেকে তুলল খানিক। 'এক জিনিস দু'বার চাইব না মানে?'

'টেরেসার কথা বলছি। নতুন জন্ম হয়েছে ওর। সবটুকু কৃতিত্ব তোমার, আমি ওর মা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শীলা। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, রানা। ঈশ্বরই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। টেরেসার মধ্যে তোমাকে খুঁজে পাব আমি।'

ডন হোমায়রার নিকটতম আত্মীয় হিসাবে, তার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হলো শীলা, এবং অধিকার বলে রানার পাওনা সব টাকা মিটিয়ে দিল। তামবারু আর রেমারিকের নেতৃত্বে খনিতে ডিনামাইট ফাটানো হয়েছিল, জীবিত কাউকে পাওয়া যায়নি। যারা মারা গেছে তাদের আত্মীয়স্বজনকে প্রতিশ্রুত টাকা নিজের হাতে বিলি করেছে রানা। ট্যালবটের পাওনা টাকা দান করা হলো রেমারিককে, তাকে যাতে চিরকাল দুর্গম একটা এলাকায় হোটেল ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে না হয়। তামবারুকেও বড় একটা অঙ্ক সাধা হলো, কিন্তু সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল বৃদ্ধ। দ্বিতীয় হপ্তা শেষ হবার আগেই বাতাসে করুণ সুর ছড়িয়ে পড়ল, সিদ্ধান্ত হয়েছে ফিরে যাবে রানা।

আগের দিন গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকল ওরা। প্রেম করল, আলো জ্বেলে তাকিয়ে থাকল পরস্পরের দিকে, কথা হলো খুব কম। মাঝ রাতের

দিকে রানাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল শীলা, ভোর পর্যন্ত ওর মাথার কাছে বসে থাকল সে।

পরদিন সকালে রওনা হলো রানা। সাথে শীলাও যাচ্ছে। শীলাকে একা ফিরতে হবে, তাই সীমান্ত পর্যন্ত তামবারুও সাথে থাকছে। ওদিকের পথ-ঘাট ভালভাবে চেনে সে, পাসপোর্ট ছাড়া সীমান্ত পেরোতে হলে তার পথ-নির্দেশ কাজে লাগবে রানার।

রানা শেভ্রোলে নিয়ে রওনা হলো, পিছনে ঘোড়ার পিঠে থাকল শীলা আর তামবারু। অবশ্য খানিক পর ঘোড়া থেকে নেমে গাড়িতে এসে উঠল শীলা, তার ঘোড়াটা তামবারুর জিম্মায় দিয়ে।

গাড়িতে পাশাপাশি বসল ওরা, দু'জনেই নীরব ব্যথায় মূক ও কাতর।

প্রথমে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'শুধু যদি তোমার সাথে আমার ঢাকায় দেখা হত!'

'ঢাকায় দেখা হলে আমাকে তুমি লক্ষই করতে না,' মৃদুকণ্ঠে বলল শীলা।

'তোমাকে আমি অন্য কোন গ্রহে দেখলেও চিনতে পারতাম,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা।

'কি হলো, ভুলে গেছ?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল শীলা। 'তুমি না বলেছিলে আমাকে একটা উপহার দেবে?'

মুচকি হাসল রানা। 'দেব যখন বলেছি, ভুলব কেন! পাবে।'

সীমান্তে পৌঁছুল ওরা। ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপে ঢাকা নির্জন একটা এলাকা। গাড়ি থামিয়ে নামল রানা, দু'হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিল শীলাকে।

'এই, কি করছ!'

'প্লীজ, কাম উইথ মি,' অনুরোধ করল রানা।

'তোমাকে ভালবাসি, রানা,' বলল শীলা। 'কিন্তু আমি এমন একটা লোকের সাথে যেতে পারি না যাকে আদর আর ভালবাসা দেয়ার জন্যে কাছে পাব না আমি। তোমার যে পেশা বা দায়িত্ব, তাতে করে আমার এখানে থাকাও যা, তোমার সাথে থাকাও তাই।'

'শেভ্রোলেটায় নতুন মেক্সিকান প্লেট লাগিয়ে নেবে। সব বলা আছে রেমারিককে, সে-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে,' শীলাকে নামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'আমার ইচ্ছে, লাল রঙ করে নিয়ো। ব্যস, তাহলে আর কেউ বিরক্ত করবে না।'

'কি বলছ!' আকাশ থেকে পড়ল শীলা। 'গাড়িটা তুমি আমাকে…?'

'প্রিয় বন্ধুকে প্রিয় জিনিসটা উপহার দিয়ে যাচ্ছি, তুমি আপত্তি কোরো না।'

'কিন্তু তুমি যাবে কিভাবে?' প্রবলবেগে মাথা নাড়ল শীলা। 'অসম্ভব…!'

'তোমাকে এত শখের জিনিস উপহার দিচ্ছি, তুমি তোমার ঘোড়াটা আমাকে প্রেজেন্ট করবে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার ঘোড়া…গড, সব তুমি ঠিক করে রেখেছ!'

'প্লীজ, শীলা।'

দুটো ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো তামবারু, খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল বুড়ো। হাসছে সে। শীলার হাত ধরে ঘোড়ার পিঠে চড়ল রানা। ঝুঁকে চুমো খেল তার হাতে। 'কথা দিলাম, আবার আসব...'

'তোমার মেয়ের চোখে সে খবর আগাম পেয়ে যাব আমি,' শান্ত গলায় বলল শীলা।

ঘোড়া ছোটাল রানা, পিছন ফিরে একবারও তাকাল না।

কোথায় যাচ্ছে নিজেরও সঠিক জানা নেই রানার। গা ঢাকা দিয়ে থাকার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি ওর। সীমান্ত পেরিয়ে এলেও দুর্গম এলাকা থেকে বেরুতে এখনও সময় লাগবে।

* * *